সূচনা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এর এক দিকে আছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অপর দিকে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চিতাভস্ম থেকে যে নব্য বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি হল, তারই বিচিত্র কথা ও কাহিনী। তাকেই বলা হয় উনিশ শতকী বাঙালী রেনেসাঁসের সাহিত্য। রেনেসাঁস বা সাংস্কৃতিক নবায়ন, যা য়ুরোপকে মধ্যযুগের শীতরিক্ত প্রান্তর থেকে সূর্যকরোজ্জ্বল মানবমহিমার প্রাঙ্গণতলে এনে ফেলেছিল, প্রায় তারই অনুরূপ সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল বাংলাদেশে মধ্যযুগে, চৈতন্যাবির্ভাবের পর, ষোড়শ শতাব্দীতে। তাকেই বলা হয় চৈতন্য-রেনেসাঁস। তাঁর পূর্বে, খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব,—চর্যাগীতিকা যার একমাত্র দৃষ্টান্ত। হয়তো এইকালে নাথধর্মকেন্দ্রিক কিছু কিছু গাথা ও গীতিকার প্রচলন ছিল। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজত্বের অবসান হল, সামাজিক অবক্ষয়ই তার অন্যতম কারণ। তারপর ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে পূর্বভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠান শাসনের কাল শুরু হয়। নানা উত্থান-পতন-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই পাঠান শাসন চলেছিল। ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের প্রচেষ্টায় পাঠান শাসনের গৌরব অন্তর্হিত হল এবং যে সমস্ত ক্ষমতাবান ভূস্বামী পাঠান শাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন (তাঁরা সংখ্যায় বারোজন, এইজন্য তাঁরা ইতিহাসে 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত), তাঁরাও ক্রমে ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে দিল্লীর মুঘল শাসন-ব্যবস্থা বাংলায় কায়েম হয়ে বসল।

পাঠান আমলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও ধর্মান্তরীকরণের ধারা প্রবলভাবে চললেও দেশের অর্থ দেশেই থাকত, সুতরাং আর্থিক বিপর্যয় দেশবাসীকে ততটা পীড়িত করেনি, কিন্তু মুঘলযুগেই বাঙালীর সব দিক থেকে সর্বনাশ ঘনিয়ে এলো। মুঘল রাজশক্তির সাম্রাজ্যবাদী লোভ শোষণের যন্ত্ররূপেই দেখা দিল, ফলে এদেশে দুর্ভিক্ষ ও নানাবিধ দুঃখকষ্ট নিত্যই বিরাজ করতে লাগল। অবশ্য প্রাক্‌চৈতন্যযুগে (১৪শ-১৫শ শতাব্দী) বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ শুরু হয়েছিল তা মুঘলযুগে অর্থাৎ চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যযুগে ক্রমেই সম্প্রসারিত হল, তার নানা প্রমাণ পুঁথি-আশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দেশে নানাধরনের অশান্তি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা বিরাজ করলেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শুভ আদর্শের ফলে আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতি সত্ত্বেও বাঙালী-সমাজ ভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভূমাকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য (পদশাখা ও জীবনীশাখা), অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের

অনুবাদ), নাথ সাহিত্য (গোরক্ষনাথ-মীননাথ-ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী ও আরাকান-চাটিগ্রামের মুসলমান কবিদের কাব্য (দৌলত কাজী, আলোয়াল বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের পদাবলী), কিছু পূর্বানুবৃত্তি সত্ত্বেও, মধ্যযুগী বাংলা সাহিত্যকে গৌরবময় উচ্চতর ভূমিকায় স্থাপন করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীকে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবে প্রভাবে বাঙালীর সামগ্রিক চেতনায় যে বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হয় তার স্পষ্ট চি লক্ষ্য করা যাবে এই যুগের সাহিত্যে, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে। বাঙালী এই সামগ্রিক ও আত্মিক জাগরণ সমাজতাত্ত্বিকগণের কাছে 'চৈতন্য রেনেসাঁস' না পরিচিত। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মানসিক ঐশ্বর্য য়ুরোপকে মধ্যযুগে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ধার করে হেলেনীয় অর্থাৎ গ্রীক-রোমা মানববোধের মধ্যে স্থাপিত করে, ঠিক তেমনি চৈতন্যযুগেও সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নবজন্মান্তর হয়। এতদিন বাংলা সাহিত্যে শরীর থেকে গ্রামীণতার গন্ধ দূর হয়নি, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের স সঙ্গে বাংলার জল-মাটি-মনে তুলসীমঞ্জরীর সদ্‌গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য, মঙ্গলকাব্য, সংস্কৃত অনুবাদ-মহাকাব্য বাঙালীর মনে নতু সৃষ্টির প্রেরণা এনে দিল। বাংলা সাহিত্য নাগরিকতা লাভ করতে না পারলে সেকালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রেম-ভক্তি, জ্ঞা ও নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি বাঙালী-চেতনারই বিচিত্র স্বরূপ বলে গৃহী হতে পারে। ভাবাবেগে-উদ্বেলতা বৈষ্ণবধর্ম, সাধনা ও সাহিত্যের মূল প্রকৃতি নব্যন্যায় বিশুদ্ধ বুদ্ধির ঐশ্বর্য। একটির অধিষ্ঠানভূমি হৃদয়, আর একটির প্রাণ কেন্দ্র মস্তিষ্ক। এই দুই বিপরীত ধর্ম বাঙালীর সাহিত্য ও সাধনায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতেই এই বৈসাদৃশ্য বাঙালীর সাহিত্য ও জীবে প্রাধান্য লাভ করেছিল। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যে ভাঁটার টা শুরু হয়ে গেলে শ্রীচৈতন্যাদর্শের ভাবাবেগও ক্রমেই প্রশমিত হয়ে এল, বৈষ্ণ সাহিত্য নবীনতা হারিয়ে প্রাণহীন কারুকর্ম ও নীরস তত্ত্বের ব্যায়ামে পর্যবসিত হল অবশ্য বাংলা সাহিত্যের সীমা ও প্রসার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল তাতে সন্দেহ নেই। এইটুকু বলেই আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

সপ্তদশ শতাব্দী ঃ উত্তর-চৈতন্য যুগ
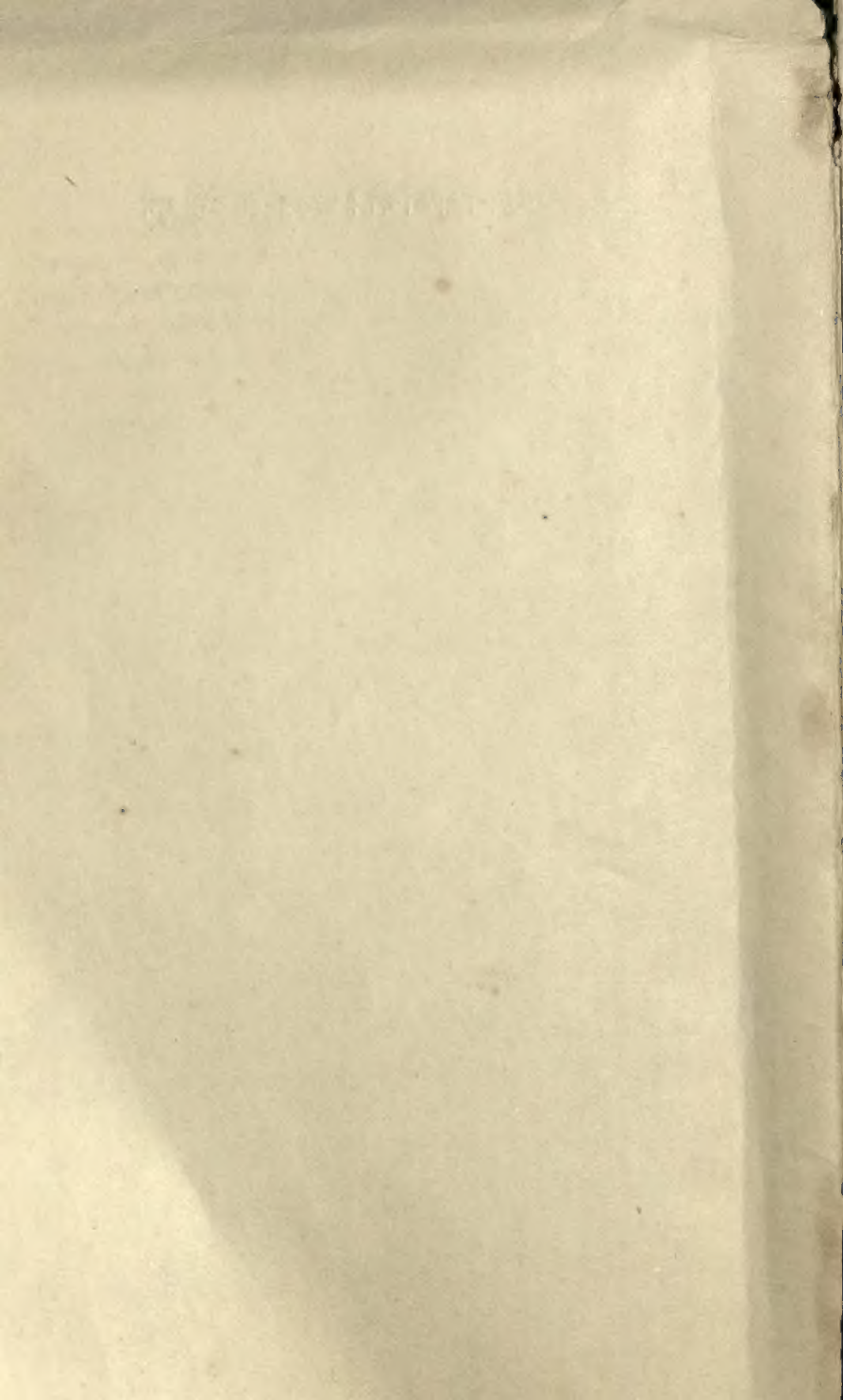
প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

১. পটভূমিকা

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আলোচনা করার পূর্বে এই সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক পটভূমিকার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। রাজন্যবৃত্তের দিক থেকে দেখলে এই শত বৎসরের ইতিহাস হল বাংলায় মুঘল-শাসনের সুদৃঢ়ীকরণের যুগ। আবার মুঘলশাসনের দুর্বলতার সূচনাও এই শতাব্দীর একেবারে শেষভাগ থেকে শুরু হয়ে যায়। ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে আকবর শাহের মৃত্যু—যিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর বিচিত্র ঐশ্বর্যমণ্ডিতরূপে স্থাপন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগেই বাংলাদেশের স্থানীয় সামন্তেরা হতবল হয়ে পড়লে এদেশে মুঘল মহিমার পতাকা উড়তে লাগল। ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে মুঘল-সূর্য ক্রমে ক্রমে রাহুগ্রস্ত হল, বাংলায় দিল্লীর প্রতাপ হ্রাস পেতে লাগল, স্থানীয় শাসক-সুবাদারের দল রাতারাতি নবাব বনবার 'খোয়াব' দেখতে লাগল এবং সে 'খোয়াব' বাস্তবে পূর্ণ হতেও বেশী বিলম্ব হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতে লাগলেন। অবশ্য দিল্লীর তোশাখানায় তখনও যথারীতি রাজস্ব প্রেরিত হত। দক্ষিণ-ভারতের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ঔরংজেবও যুদ্ধ-খরচ বাবদ মোটা টাকা পেতে লাগলেন বাংলা থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির অন্তরে তখন ক্ষয়ের মারীবীজ প্রবেশ করেছে, সেই সুযোগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সুবাদার মসনদে বসবার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং সমর্থও হলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ—আকবরের মৃত্যু থেকে ঔরংজেবের মৃত্যুর মধ্যে বাংলার ভাগ্যগগনে অনেক তারকার উদয় ও বিলয় হয়েছে। আকবরের পরে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে (১৬০৫—১৬২৭) বাংলার বারো ভুঁইয়াদের শক্তি ধূলিসাৎ হলো; শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও কুচবিহার-রাজদের স্বাতন্ত্র্যও লুপ্ত হয়ে গেল। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ বাংলার সুবাদার হয়ে এসে অতি অল্পদিনের মধ্যে মুঘল-অধিকৃত বাংলাদেশে শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহে অনেকটা শৃঙ্খলা আনলেন। ইতিমধ্যে ১৬২২ খ্রীঃ অব্দের দিকে যুবরাজ শাহ্‌জাহান পিতা ও বিমাতার (নূরজাহান) বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়ালেন। তিনি

কিছুকাল বাংলাদেশে বেশ রাজকীয় মহিমায় বাস করতে লাগলেন। যাই হোক মিটমাট হয়ে গেল, ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পর শাহ্‌জাহান মুঘল সম্রাট হলেন। তাঁর তিরিশ বৎসরব্যাপী শাসনে (১৬২৭-৫৮) হুগলীর পর্তুগীজরা খুব জব্দ হয়েছিল, চট্টগ্রামের বোম্বেটেদের বাসা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, আসামেও মুঘলশক্তির একাধিপত্য স্থাপিত হয়—অবশ্য শেষজীবনে শাহ্‌জাহানকে পারিবারিক ব্যাপারে নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর নির্বাচিত বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁ খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময়ের কিছু আগে থেকে পশ্চিমবাংলায় পর্তুগীজরা বাণিজ্যের পশরা মেলে বসে, এবং বঙ্গোপসাগরে বোম্বেটেগিরি করতে থাকে। শাহ্‌জাহানের সময়ে এদের ঔদ্ধত্য খানিকটা সঙ্কুচিত হয়েছিল। শাহ্‌জাদা সুজা একুশ বছর বাংলায় সুবাদারী করেছিলেন। তাঁর সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদি বিশেষ না হওয়ায় দেশে কিছু শান্তি ও স্বস্তি ছিল। ১৬৫৮-৫৯ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে শাহ্‌জাহান-তনয়দের সংঘর্ষের সময়ে বাংলাতেও কিছু কিছু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে ঔরংজেব 'আলমগীর' হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হলেন। তাঁর শাসনকালের (১৬৬০-১৭০৭) মধ্যে তাঁর কয়েকজন বিচক্ষণ সুবাদার (যথা—মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ) এবং দেওয়ান (মুরশিদকুলি খাঁ, পরে ইনি সুবাদার হন) বাংলার শাসনযন্ত্রকে যথাসম্ভব মুঘল রাজ্যশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে আনতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অতিলোভী, লম্পট ও অপদার্থ ছিলেন (যেমন—ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ এবং নাতি আজিম উদ্দিন), কেউ-বা ছিলেন সংযত ও বিচক্ষণ (যেমন—মুরশিদকুলি খাঁ)। বলাই বাহুল্য বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল সুবাদারেরা টাকাপয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, তাঁরা কেউ-ই এদেশের লোক ছিলেন না, প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে সমস্ত বিত্তসহ খানদানি অঞ্চল দিল্লী, আগ্রা, লাহোরে গিয়ে বসবাস করতেন—অনেকে আবার ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। কাজেই মুঘল আমলে বাংলার কোন কোন বিষয়ে কিছু সুযোগ-সুবিধে হলেও দেশ যে শোষণের ফলে নীরক্ত হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বরং পাঠান আমলে পথঘাট, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদির তেমন সুব্যবস্থা না থাকলেও দেশের টাকা দেশেই থাকত বলে বাংলাদেশ মুঘল আমলের মতো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কারণ পাঠান সুলতান, আমীর-ওমরাহ কথায় কথায় দিল্লী-আগ্রায় ছুটতেন না, এ দেশই তাঁদের দেশ হয়ে গিয়েছিল।

ঔরংজেবের রাজত্বের শেষভাগে মুঘল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, সিংহাসন নিয়ে ঔরংজেবের পুত্র-পৌত্রদের শবমাংসভুক প্রাণীর মতো কাড়াকাড়ির ফলে অনেক অঞ্চল কার্যত মুঘল শক্তির বাইরে গিয়ে পড়েছিল—বাংলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর সূর্য অস্ত গেল, অষ্টাদশ শতাব্দী এসে পড়ল, কয়েক বছর এগিয়েও গেল। ইতিমধ্যে জীর্ণ শরীরে আলমগীর বাদশাহ দাক্ষিণাত্যে মাটি নিলেন, মুঘল সাম্রাজ্যের বৃহৎ বনস্পতি ভেঙে পড়ল—অনেক আগেই তাতে ঘুণ ধরেছিল। তখন ইংরেজ বণিক বাংলার গঞ্জে-হাটে পসরা নামাতে আরম্ভ করেছে, আর চারদিকে ইতস্তত লোভের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক হলেও মাঝে মাঝে ধর্মান্তরীকরণের ধাক্কা যে হিন্দুসমাজকে বিচলিত করত তাতে সন্দেহ নেই। পীর-ফকির-দরবেশের উৎপাত তো ছিলই, তার সঙ্গে কখনও কখনও রাজশক্তি হাত মেলাত। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি 'তমদ্দুনে'র (নাগরিক সংস্কৃতি) কিছু কিছু প্রভাব হিন্দুরাও স্বীকার করেছিল রাজভয়ে বা রাজ-প্রসাদের লোভে। হিন্দুসমাজের উচ্চকোটিতে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব বহুব্যাপক হয়েছিল, তার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবই দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া বৈষ্ণব নামে এক উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সমাজের ঈষৎ নীচুতলায় নাথধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। মুসলমানি সুফী ও সিয়া সম্প্রদায় বাংলায় বেশ প্রাধান্য পেয়েছিল। শাহ্‌জাদা সুজা সিয়াদের ভালোবাসতেন। ভারতের বাইরে থেকেও অনেক সিয়া বাংলায় এসেছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষার কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, বৈষ্ণবসমাজ বাদ দিলে সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের শিক্ষার বড় দুরবস্থা হয়েছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজেদের চেষ্টায় সমাজ, আখড়া ও কেন্দ্রে বৈষ্ণব সাহিত্যাদি অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর হিন্দুসমাজে ক্রমেই শিক্ষার অবস্থা মন্দীভূত হয়ে আসছিল। সামন্তচক্র ভেঙে পড়েছিল, হিন্দু ভূস্বামীরাও সুবাদারের অত্যাচারে ও অবিচারে ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং ইতিপূর্বে তাঁরা টোলচতুষ্পাঠীর পরিচালনায় যতটা সাহায্য করে আসছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে তাতে ভাঁটার টান আরম্ভ হল। অবশ্য মুঘল সুবাদার মক্তব-মাদ্রাসার জন্য সরকার থেকে সাহায্য করতেন, কিন্তু হিন্দু প্রজারা তার ফল থেকে বঞ্চিত ছিল।

এই শতাব্দীতে নব্যন্যায় এবং সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি

হয়েছিল। নব্যন্যায়ের কয়েকখানি মূল্যবান টীকা সপ্তদশ শতাব্দীতেই লিখিত হয়েছিল। বৃন্দাবনের সনাতন-রূপ-জীবগোস্বামী রচিত বৈষ্ণব ভাবদ্যোতক রসশাস্ত্র, কাব্য-নাট্যাদি বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। দু'একজন কবি-পণ্ডিত দু'একখানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা করেছিলেন। পুরাতন কাব্যনাটকের অনেক টীকা এই শতাব্দীতে পাওয়া গেছে। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে নব্যন্যায়, বৈষ্ণব সংস্কৃত গ্রন্থ, তন্ত্রের দু'চারখানি মৌলিক পুঁথি হিন্দুসমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। বেদান্তের চর্চাও যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ—বেদান্তের অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী টীকা-ভাষ্যের সংখ্যাধিক্য।

২. মনসামঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কয়েকখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়, আগের যুগের কাব্যের মতো তাদের গৌরব না থাকলেও সে সব কাব্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন। এ যুগের সমস্ত মঙ্গলকাব্যই কিছু নিষ্প্রাণ, কিছু গতানুগতিক। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এই শতাব্দীর মৌলিক গ্রন্থ—যদিও তার কাব্যগুণ নিতান্তই ক্ষীণ। সমাজে বৈষ্ণব ও পুরাণ প্রভাবের জন্য মঙ্গলকাব্যের ভাষা, বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শে এই দুই প্রভাবই বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। এখানে সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

বাইশ-কবি মনসামঙ্গল (বাইশা)॥ পূর্ববঙ্গে মনসার পূজা ও ভাসান গানের বিশেষ প্রচার হয়েছিল, নানা মনসামঙ্গল কাব্যের রচনাও এই অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কেউ কেউ একাধিক কবির অংশবিশেষ একত্র গ্রথিত করে মনসামঙ্গলের একপ্রকার সঙ্কলন প্রচার করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে এর দু'টি ধারা ছিল, একটির নাম ষট্‌কবি মনসামঙ্গল। এতে ছ'জন প্রধান কবির মনসা-মঙ্গল থেকে অংশ-বিশেষ বেছে নিয়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হত। আর একটি ধারার নাম বাইশকবি মনসামঙ্গল বা সংক্ষেপে 'বাইশা'। এতে বাইশজন ছোট-বড়ো কবির রচনাংশ একসঙ্গে গ্রন্থন করা হত। ষট্‌কবির কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাইশার পুঁথি দুর্লভ নয়। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কলকাতা থেকে একাধিকবার বাইশ কবি ছাপা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে —এখনও বাইশকবির চাহিদা আছে। অবশ্য সমস্ত পুঁথিতে বাইশ জন কবির নামের সাদৃশ্য নেই, ছাপা পুস্তিকাতেও বাইশ জনের নাম ও রচনার নানা

গণ্ডগোল আছে। এই বাইশ জনের নাম ও রচনাংশ অধিকাংশ ছাপা গ্রন্থে আছে ঃ—বিশ্বেশ্বর, আকিঞ্চন দাস, রঘুনাথ দ্বিজ, রমাকান্ত, জগন্নাথ বিপ্র, বংশীদাস দ্বিজ, সীতাপতি, রাধাকৃষ্ণ, বল্লভ ঘোষ, নারায়ণদেব, গোপীচন্দ্র, জানকীনাথ, কমলনয়ন, যদুনাথ, বলরাম, হরিদাস ভট্ট, রামনিধি, অনুপচন্দ্র ভট্ট, রামকান্ত, মহিদাস, দ্বিজ হরিদাস। এ'দের মধ্যে নারায়ণদেব ও বংশীদাসের রচনাই বেশী গৃহীত হয়েছে। এ সব বাইশা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, আধুনিক কালে সঙ্কলিত ছাপা পুস্তিকাগুলি অধিকাংশ স্থলে আরও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। কারণ মুদ্রণের সময় সম্পাদকগণ এর পাঠ যথেচ্ছা বদলে ফেলেছেন। সাহিত্যের দিক থেকেও এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। তবে বৈষ্ণব পদসঙ্কলনের মতো মনসার ভক্তগণও মনসামঙ্গলের নানা কবির রচনার অংশ গ্রহণ করে ধারাবাহিকতাযুক্ত পালাগান সংগ্রথিত করেছিলেন—এইজন্যই সাহিত্যের ইতিহাসে এর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিজ বংশীদাস ॥ ময়মনসিংহের কবি দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে একদা খুব জনপ্রিয় ছিল, এর মুদ্রিত সংস্করণ দুর্লভ নয়। কবির পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির জন্য তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি বলেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতীও বিদুষী ও কবি-প্রতিভাশালিনী ছিলেন। কন্যার প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি, কৌতূহলী পাঠক যথাস্থানে তা দেখে নেবেন।

একদা বংশীদাস পূর্ববঙ্গে বহুপঠিত হলেও এখন তাঁর পুঁথির সংখ্যা বড়োই অল্প। তাঁর পদ্মাপুরাণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। মুদ্রিত পাঠ সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়। পুঁথির পাঠেও নানা গোলমাল আছে। বংশীদাস তাঁর কাব্যে নিজের সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখে গেছেন ; তা থেকে জানা যাচ্ছে তাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায়-উপাধিক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাঁর পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে ময়মনসিংহের এক গ্রামে বসবাস করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে যাদবানন্দ ও অঞ্জনা। কবি সংস্কৃতসাহিত্য, পুরাণ ও দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁর কাব্যেও তার চিহ্ন আছে। কবির কোন কোন পুঁথিতে হেঁয়ালির ভাষায় লেখা রচনাকালের নির্দেশ পাওয়া যায়। তার থেকে ১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ অব্দ নির্ধারিত হয়েছে। কুলজী ধরেও তাঁকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি এত প্রাচীন নয়। মনে হয় কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীতেই রচিত হয়েছিল। এ'র কাব্য

আকারে বেশ দীর্ঘ, যথারীতি দেবখণ্ড ও মানবখণ্ডে বিভক্ত। দেবখণ্ডে পুরাণ-অনুসারে হরপার্বতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু শিবকাহিনীর শেষের দিকে কবি আর পুরাণ অনুসরণ করেননি, বাংলাদেশের বহু প্রচলিত গ্রাম্য শিবায়ন কাহিনী অবলম্বন করেছেন। পরবর্তী মানবখণ্ডে অর্থাৎ বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত মনসামঙ্গলের ধারা অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে বেশ পুরাণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের চাঁদ সদাগর শৈব নয়, সে শাক্ত। ফলে ঘটনায় মাঝে মাঝে চণ্ডী ও মনসার অবাঞ্ছিত কলহ আত্মপ্রকাশ করেছে, কারণ চণ্ডী তাঁর ভক্ত চাঁদসদাগরকে যেন-তেন-প্রকারেণ জয়ী করতে চেষ্টা করেছেন। পত্নী ও কন্যার কলহের মাঝখানে পড়ে বৃদ্ধ শিবকেও কম দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত চণ্ডী ও মনসার বিবাদ মিটে গেলে বেহুলা স্বর্গে গিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনল। গল্পের মধ্যে গতানুগতিকতার মধ্যেও কবি কিছু কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য চরিত্রাঙ্কনে তাঁর কৃতিত্ব এমন কিছু বিস্ময়কর নয়। তিনি দেবদেবীর চরিত্র নিয়েই যেন বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক, মনসা, চণ্ডী ও মহাদেবের চরিত্রগুলি মন্দ হয়নি। দু'এক স্থলে কবি বেশ পরিহাসপটুতা দেখিয়েছেন, অবশ্য আদিরসের নির্বাধ বর্ণনা হয়তো আধুনিক পাঠকের ততটা রুচিকর হবে না।

বংশীদাসের রচনায় তৎসম শব্দ (সংস্কৃত) ও অলঙ্কার বিন্যাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—কবি যে বেশ পণ্ডিত ছিলেন, এতেই তার প্রমাণ। কবি শাক্ত দেবীর বন্দনা লিখলেও ধর্মমতে বোধ হয় বৈষ্ণব ছিলেন। কারণ কাব্যের মধ্যে তিনি চমৎকার বৈষ্ণব পদের উল্লেখ করেছেন যেগুলি তাঁর নিজের রচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বপ্লাবী বৈষ্ণবধর্মের বন্যাধারা তাঁকেও স্পর্শ করেছিল—তা স্বীকার করতে হবে। যাই হোক, নারায়ণদেব বা বিজয়গুপ্তের মতো প্রতিভা না থাকলেও কবি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীর কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ॥ ছাপাখানার যুগে এদেশে মনসামঙ্গলের যে-কবি প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। পশ্চিম-বঙ্গের এই কবি মুদ্রণের পূর্বেও পূর্ববঙ্গে বেশ প্রচার লাভ করেছিলেন। ঐ অঞ্চলে তাঁর কাব্য 'ক্ষেমানন্দী' নামে একদা প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর অনেক সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন পুঁথি পাওয়া গেছে। তাই অবলম্বন করে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তাঁর মনসামঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্য ১৮৪৪ খ্রীঃ

অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে শুধু এ'র সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, পূর্ববঙ্গের অতিখ্যাত নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের নাম এদেশে তখনও প্রচারিত হয়নি।

মনে হয় কবির নাম ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস তাঁর উপাধি। কারণ কেয়াপাতে জন্ম হয়েছিল বলে মনসার অপর নাম কেতকা—কবি তাঁরই দাস। তবে ছাপাখানার যুগে মুদ্রক-প্রকাশকেরা এই নামের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ পৃথক কবি। কিন্তু একথা ঠিক নয়। রচনার গোড়ার দিকে কবি চণ্ডীমঙ্গলের সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কিঞ্চিৎ অনুকরণে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যাচ্ছে কবিরা কায়স্থ; বারা খাঁ নামে এক ফৌজদারের অধীনে তাঁর পিতা শঙ্কর চাকরী করতেন। বারা খাঁ দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন। দলিলপত্রাদি থেকে মনে হয় বারা খাঁ ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তার পর সম্ভবত তিনি নিহত হন। বর্ধমানের পানাগড় রেল স্টেশনের অনতিদূরে দামোদরের তীরে বারা খাঁর কবর এখনও আছে, তিনি হিন্দু-মুসলমানের নিকট পীর বলে শ্রদ্ধালাভ করে আসছেন। বারা খাঁর হত্যার পর কবির পিতা উপদ্রুত অঞ্চল ছেড়ে ভারমল্ল নামে এক জমিদারের আশ্রয়ে এসে বাস করতে থাকেন। এই ভারমল্লেরও সন-তারিখ পাওয়া গেছে। ১৬৭৫-৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে ভারমল্ল ছিলেন যুবকমাত্র। কবির পিতা প্রবীণ ভারমল্লের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অনুমান হয়, কবির কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল। কবি তাঁর আত্মপরিচয়ে বারা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁদের অঞ্চলের অরাজকতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেখানে কবি বলেছেন যে, তাঁর পিতাকে ভারমল্ল আশ্রয় দিয়েছিলেন। একদিন কিশোর ক্ষেমানন্দ ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে জলায় গেছেন খড় কাটতে, গিয়ে দেখেন আর সব ছেলেরা জলায় মাছ ধরছে। তিনি তাদের হাত থেকে মাছের হাঁড়ি কেড়ে নিয়ে ভাইয়ের হাতে সেটা বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। ছেলের দল কবিকে গাল দিয়ে চলে গেল। সহসা কবি সেই নির্জন জলার ধারে এক মুচিনীর সাক্ষাৎ পেলেন। মুচিনী তাঁকে কাপড় কিনতে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই মুচিনী অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই সর্পভূষণা মনসাদেবী আবির্ভূত হয়ে কবিকে মনসামঙ্গল কাব্য রচনার নির্দেশ দিলেন। কবি তাঁর

নির্দেশেই মনসামঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। এই আত্মপরিচয়ের বর্ণনাটি বেশ মনোজ্ঞ, কিন্তু সর্বত্র কবিকঙ্কণের প্রভাব রয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, কোন কোন প্রতিভাবান কবি অল্পকালের মধ্যেই বিস্মৃত হন, আবার অল্প প্রতিভার কবি কালজয়ী হন। ক্ষেমানন্দ দ্বিতীয় স্তরের কবি। তাঁর কবিপ্রতিভা নিতান্তই সাধারণ স্তরের, কিন্তু তিনি স্বল্প প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কাহিনী-গ্রন্থনেও এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই, তবে ঊষাহরণ পালাটি মন্দ নয়। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীও চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি কিছু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপথ বর্ণনায় তিনি বাস্তব ভৌগোলিক তথ্য নিপুণভাবে অনুসরণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি এই অঞ্চলের পথঘাট ও নদনদীর যথাযথ বর্ণনা দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? পূর্ববঙ্গের কবিরা বরং এ বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। চরিত্রচিত্রণে প্রশংসা করার কিছু নেই, বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রে তিনি বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তবে মনসার রুষ্ট, ক্ষুব্ধ, বিষাক্ত চরিত্রটি মন্দ হয়নি। তাঁর রচনাভঙ্গিমাও সাধারণ স্তর ছাড়াতে পারেনি, এতে তীক্ষ্ণতা ও তির্যকতার খুব অভাব। তবে তাঁর ভাষা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃত-গন্ধী। কোন কোন স্থলে তিনি মুকুন্দরামকে প্রায় হুবহু নকল করেছেন—যেমন নৌকাডুবির প্রক্কালে বাঙাল মাঝিদের বিলাপ। পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল ও মনসা-উপাসনার বৈশিষ্ট্য জানতে হলে ক্ষেমানন্দের এই কাব্যের সাহায্য নিতে হবে।

মানভূম থেকে দেবনাগরী হরফে লেখা ক্ষেমানন্দের ভণিতায় আঞ্চলিক শব্দে পূর্ণ একখানি অতিক্ষুদ্র মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। ভাষা দেখে একে অর্বাচীন বলেই মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করলে তাঁর ভণিতার অনুকরণে প্রান্তীয় অঞ্চলে বোধহয় কেউ এই পুস্তিকাখানি লিখে থাকবেন। এটি যে সুপরিচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচিত নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রত-পাঁচালী জাতীয় পুঁথিটি আধুনিক কালের হলেও এর রচনারীতি নিন্দনীয় নয়, স্বল্পপরিসরে চরিত্রগুলি ভালই ফুটেছে।

তন্ত্রবিভূতি ॥ তন্ত্রবিভূতি মনসামঙ্গলের এক নবাবিষ্কৃত কবি। পূর্বে তাঁর নাম শুনলেও কেউ তাঁর কাব্যের বড়ো একটা খোঁজখবর রাখতেন না। ডক্টর আশুতোষ

দাস এই কাব্য আবিষ্কার ও প্রচার করার পর এই কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া গেছে। উত্তরবঙ্গের এই কবির মনসামঙ্গল বড় বিচিত্র ধরনের। মালদহ থেকে এঁর পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে অধিকাংশ স্থলে তন্ত্রবিভূতির ভণিতা থাকলেও দু' এক স্থলে জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাও আছে। জগজ্জীবনও একই অঞ্চলের কবি, তিনি কিছু পরে আর একখানি মনসামঙ্গল রচনা করেন। লিপিকারদের অনবধানতার জন্য একের পুঁথিতে অন্যের ভণিতা ও রচনা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কাব্যের কাহিনীতে প্রচলিত কাহিনীর চেয়ে কিছু নূতনত্ব দেখা যায়, চরিত্রগুলিও একেবারে গতানুগতিক নয়। মনে হয় উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গলের একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত ছিল, এর সঙ্গে ধর্মমঙ্গল-কাব্যের তত্ত্বও কিছু কিছু মিশে গেছে। তন্ত্রবিভূতি কাব্যটির কোন কোন ক্ষেত্রে উগ্র ও অনাবৃত আদিরস বর্ণনা করেছেন বলে আধুনিক পাঠক তাঁর প্রতি কিছু বিরূপ হতে পারেন। কিন্তু রচনারীতি, কাহিনী প্রভৃতি বিচার করলে কবিকে প্রশংসাই করতে হবে। অনুমান জগজ্জীবন ঘোষালের কিছু পূর্বে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই কাব্য রচনা করেন।

জগজ্জীবন ঘোষাল॥ জগজ্জীবন ঘোষালও উত্তরবঙ্গের কবি, সম্ভবতঃ তন্ত্রবিভূতির কিছু পরে মনসামঙ্গল রচনা করেন। এঁর কাব্যও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কবি কাব্যের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যাচ্ছে, দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে (এখন পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) ঘোষাল বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রূপ, মাতার নাম রেবতী। কবির স্ত্রীর নামও (পদ্মমুখী) কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কাব্যটি কবে রচিত হয়েছিল, পুঁথিতে তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। কিন্তু তাঁর কোন কোন পুঁথিতে ক্ষেমানন্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং ক্ষেমানন্দের পরেই অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয় বলে অনুমান করি। তাঁর কাব্যও যথারীতি দেবখণ্ড ও বানিয়াখণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু তিনি বানিয়াখণ্ডে তন্ত্রবিভূতিকে পদে পদে অনুসরণ করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যেন বেমালুম নকল করে গেছেন। তাঁর কাব্যের প্রারম্ভেও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতো সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে। শিবদুর্গার গ্রাম্যকাহিনীও কবি কিঞ্চিৎ অনুসরণ করেছেন। বেহুলার কাহিনী নতুন ধরনের—উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। চরিত্র ও স্বাভাবিক বর্ণনায় তিনি মোটামুটি প্রতিভার পরিচয়

দিয়েছেন, কিন্তু আদিরসের বর্ণনাগুলি অতিশয় ঘৃণ্য—এদিক দিয়ে কবির রুচি নিন্দার যোগ্য। আর তা ছাড়া তিনি স্থানে স্থানে পূর্ববর্তী কবি তন্ত্রবিভূতির কাব্য থেকে এত বেশী উপাদান সংগ্রহ করেছেন, ভাষাভঙ্গিমা নকল করেছেন যে, তাঁর কাব্যের মৌলিকতার গৌরব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তবে স্থানীয় মনসামঙ্গলধারার বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কাব্য কথঞ্চিৎ উল্লেখ দাবি করতে পারে।

এ'রা ছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন স্বল্পপ্রতিভাধর কবি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন, তাঁদের দু' চারখানি পুঁথিও পাওয়া গেছে। বিষ্ণু-পাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারামদাস প্রভৃতি কয়েকজন কবির মনসামঙ্গল যৎসামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুপাল পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তের অনেক অংশ আত্মসাৎ করেছিলেন, তাঁর কাব্যের গোড়াতেও ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব আছে। মাঝে মাঝে সরল গ্রাম্যভাব বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কবির 'রেঢ়ো বুলি'-ও কম কৌতুকজনক নয়। ষষ্ঠীবর দত্ত নিয়ে নানা গোলমাল আছে। যে ষষ্ঠীবর মনসামঙ্গল লিখেছিলেন তাঁর কাব্য বাংলাদেশে ততটা প্রচারিত হয়নি, শ্রীহট্টেই তাঁর কাব্যের বিশেষ প্রচার দেখা যায়—শ্রীহট্টের অধিকাংশ মনসামঙ্গলে তাঁর অনেক রচনা চলে গেছে। তাঁকে কেউ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলেছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো আধুনিক মার্জিত ভাষা দেখে তাঁকে ভারতচন্দ্রেরও পরবর্তী মনে হয়। কালিদাস ও সীতারাম দাসের মনসা-মঙ্গল বিশেষ কোন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। অবশ্য সীতারামদাস মূলত ছিলেন ধর্মমঙ্গলের কবি—তাই মনসাকে ধর্মের পূজারিণীরূপে অঙ্কিত করেছেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বৈদ্য হরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, বিপ্র জানকীনাথ, বৈদ্য জগন্নাথ প্রভৃতি আরও কয়েকজন কবি মনসামঙ্গল রচনা করে যশোলাভের বৃথা চেষ্টা করেছিলেন।

৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুণগত উৎকর্ষ বিশেষ কিছু নেই, সংখ্যাও অতি অল্প। ষোড়শ শতাব্দীই হচ্ছে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ যুগ। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, পুরাণের আনুগত্য আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এর ফলে এই শতাব্দীতে পুরাণের ওপর সম্পূর্ণরূপে ভিত্তি করে এবং লৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রায় বর্জন করে দুর্গামঙ্গল নামে এক ধরনের মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, যাকে মঙ্গলকাব্য না বলে পুরাণের অনুবাদ বা অনুকরণ বলা যায়। প্রথমে আমরা এই শতাব্দীর উল্লেখ-

যোগ্য মাত্র একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পরিচয় দেব, তারপর দুর্গামঙ্গলের কথা উল্লেখ করব।

দ্বিজরামদেব ॥ চণ্ডীমঙ্গলের আর এক শক্তিশালী কবি দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল সম্প্রতি ডক্টর আশুতোষ দাস আবিষ্কার করেছেন, তাঁরই সম্পাদনায় এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ দাসের আবিষ্কারের পূর্বে এই কবির নামও জানা ছিল না। এ কাব্যের পুঁথি নোয়াখালি জেলা থেকে পাওয়া গেছে, কিন্তু রামদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর কাব্যে প্রচুর চট্টগ্রামের শব্দ পাওয়া গেছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থ মধ্যে এই শক্তিশালী কবি বিশেষ কোন আত্মপরিচয় দেননি। তাঁর নাম রামদেব, ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম, পিতার নাম কবিচন্দ্র—এর বেশী আর কোন পরিচয় তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁর কাব্যের শেষে কালজ্ঞাপক দু'টি ছত্র আছে।* তা থেকে নিশ্চিত রূপে এর রচনাকাল নির্ধারণ করা যায় না। মনে হয় কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল।

দ্বিজ রামদেবের আগে মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন—এ'দের মধ্যে মাধবাচার্য আবার দ্বিজরামদেবের স্বদেশবাসী—চট্টগ্রামের লোক। কবি মাধবাচার্য রামদেবের ওপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু রামদেব কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গলের একাধিক কবি এ কাব্যের যে বাঁধাবাঁধি আকার দিয়েছিলেন, তার ওপর মৌলিকতা দেখান সহজ ছিল না। মাধবাচার্যের কাব্যপরিকল্পনার দ্বারা রামদেব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা সত্য বটে; কিন্তু কবি-প্রতিভায় তিনি মাধবাচার্যকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে তিনি মুকুন্দরামেরও সমকক্ষতা করেছেন।

কবি শাক্ত মঙ্গলকাব্য লিখলেও তাঁর অন্তরটি ছিল বৈষ্ণব ভক্তিরসে ভরপুর। কাব্যের মধ্যে তিনি গুটিকয়েক বিষ্ণুপদ সংযোজিত করেছেন, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলী রূপেই তা গণনীয়। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবি মাধবাচার্যও তাঁর কাব্যে কয়েকটি 'বিষ্ণুপদ' লিখেছিলেন, কিন্তু কবিত্বের দিক থেকে সেগুলি এত উৎকৃষ্ট নয়। রচনাশক্তির দিক থেকে রামদেবের কোন কোন অংশ মুকুন্দরামেরও ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারত। তবে মুকুন্দরামের প্রসন্ন জীবনরসের বৈশিষ্ট্যটি তাঁর

---

* ইন্দুবান ঋষিবাণ বেদ সনজিত।
রচিলেক রামদেব সারদাচরিত ॥

হাতে পড়ে অনেক সময় বিষণ্ণ করুণরসে পরিণত হয়েছে। হাস্যরসে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল না। ফলে যে-গুণে মুকুন্দরাম সমগ্র বাঙালী পাঠকের প্রীতি লাভ করেছেন, দ্বিজরামদেব সে গুণের অভাবের জন্য তা পারেননি। তবু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরামের পরেই যদি কোন কবিকে স্থান দিতে হয়, তবে নির্দ্বিধায় দ্বিজ রামদেবকে সেই স্থান দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে দ্বিজ জনার্দনের ব্রতকথাজাতীয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্য হিসাবে এটি অকিঞ্চিৎকর, তবে কিছু পুরাতন মনে হচ্ছে। হরিরাম নামে আর এক কবি চণ্ডীমঙ্গল লিখেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে—এ-ও বিশেষত্ববর্জিত।

দুর্গামঙ্গল ॥ বাংলাদেশে পুরাণে-লৌকিক-কাহিনীতে-সংমিশ্রিত কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী সংবলিত চণ্ডীমঙ্গল (ভবানীমঙ্গল-অভয়ামঙ্গল নামেই সেকালে পরিচিত ছিল) কাব্যই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন শিক্ষিত সমাজে পুরাণের প্রভাব প্রসারিত হল, তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতীতে বর্ণিত দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক দৈত্যদানব বধের পৌরাণিক কাহিনীও কিছু কিছু প্রচার লাভ করেছিল। বলাই বাহুল্য এই শাখাটি লৌকিকভাব-বর্জিত এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও পুরাণ-ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে রাজা দনুজমর্দনদেব দশভুজা দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন বলে শোনা যায়। এই উপলক্ষে চণ্ডীপাঠ হত। তখনই বোধহয় সংস্কৃতে-অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের জন্য চণ্ডীর কাহিনী বাংলায় বিবৃত করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দু'জন কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীকাহিনী অবলম্বনে দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্য সাধারণত 'চণ্ডিকাবিজয়' নামেই পরিচিত ছিল। দ্বিজ কমললোচন ও ভবানীপ্রসাদ রায় এই ধরনের দু'খানি কাব্য লিখে পুরাণোক্ত কাহিনীকে সাধারণ সমাজে প্রচারিত করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিজ কমললোচন রংপুরের লোক। কাব্যের মধ্যে তিনি শাহ্‌সুজার নাম উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চণ্ডিকাবিজয় কাব্যটি রচিত হয়। কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী তাঁর প্রধান অবলম্বন। সুরথ রাজা, মেধস্ মুনি ও সমাধি বৈশ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে কাব্য আরম্ভ হয়েছে, তারপর ক্রমে ক্রমে দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভাদি অসুর-দলন বর্ণিত হয়েছে। কবি বহুস্থলেই মার্কণ্ডেয় পুরাণকেই যেন

অনুবাদ করেছেন। অবশ্য দু'এক স্থলে কবি পৌরাণিক স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে এ যুগের মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে দৈত্যেরা চণ্ডিকাকে বন্দুক নিয়েও আক্রমণ করেছিল।

কবি ভবানীপ্রসাদ রায় 'দুর্গামঙ্গল' শীর্ষক যে চণ্ডীমহিমাবিষয়ক কাব্য রচনা করেন, তাও অনেকটা আগের কাব্যের মতই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণ। ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর জন্ম। কবি ছিলেন জন্মান্ধ, বাল্যে আবার মাতাপিতাও মারা যান। অসহায় কবিকে জীবনধারণের জন্য কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কবি অন্ধ অবস্থাতেই শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে সু-অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তবে তাঁর কাব্যে কিছু কিছু লৌকিক প্রভাবও আছে। মনে হয় কবির এ কাব্য তিনশত বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু ভাষাতে আধুনিক ছাপ প্রকট। যাই হোক, অন্ধকবির কবিত্বশক্তি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ময়মনসিংহের আর এক কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কিয়দংশ অবলম্বনে দুর্গামঙ্গল রচনা করেছিলেন। এঁর নাম রূপনারায়ণ। খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্য রচিত হয়। নানা ছন্দে তাঁর বেশ দখল ছিল। এ ছাড়াও আরও দু'এক জন স্বল্প কবি-প্রতিভাধর ব্যক্তি চণ্ডিকার ব্রতকথা জাতীয় পুঁথি লিখেছিলেন, যার কাব্য হিসেবে বিশেষ কোন মূল্য নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের বিশেষ প্রভাব। মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাবে দুর্গামঙ্গল জাতীয় কাব্যগুলিতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৪. কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্য

এখানে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেকগুলি মঙ্গলকাব্যের রচনাকার একজন মধ্যমশ্রেণীর কবির সাধারণভাবে একটু উল্লেখ করতে চাই। এঁর নাম কৃষ্ণরাম দাস। যদিও প্রতিভা বিচারে ইনি মধ্যমশ্রেণী কখনও অতিক্রম করতে পারেননি, তবু বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য তাঁর নানা ধরনের মঙ্গলকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

কবি তাঁর কোন কোন কাব্যে নিজের সম্বন্ধে দু'একটি তথ্য দিয়েছেন, তা থেকেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতার অদূরে নিমিতা (আধুনিক নিমতে গ্রাম) গ্রামে তাঁর বাস। এই গ্রামের বাসিন্দা সাবর্ণগোত্রীয় চৌধুরীদের কাছ থেকে জোব চারনক সুতোনুটী-গোবিন্দপুর-কলকাতা কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভগবতী দাস, জাতিতে তাঁরা কায়স্থ। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন, তখন শায়েস্তা খাঁ বাংলার

সুবাদার। এই কবির ভণিতায় মোট পাঁচখানি কাব্য পাওয়া গেছে—(১) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, (২) রায়মঙ্গল, (৩) ষষ্ঠীমঙ্গল, (৪) শীতলামঙ্গল, (৫) কমলামঙ্গল। পরে আমরা কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কালিকামঙ্গলের পরিচয় দেব। এখানে তাঁর অন্য চারখানি মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে। বাংলার আর কোন কবি পাঁচ ধরনের পাঁচখানি মঙ্গলকাব্য লেখেননি —এর জন্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' হল ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায় বা দক্ষিণের রায়ের মহিমা-বিষয়ক কাব্য। কাব্যটি ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত নিম্নবঙ্গে বাঘের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য জনসাধারণ দক্ষিণরায় (বা দক্ষিণের রায় অর্থাৎ দক্ষিণ-বাংলার রাজা) দেবতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বাংলার বাইরেও ভদ্রেতর সমাজে ব্যাঘ্রদেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে। এই ব্যাঘ্রদেবতা অঞ্চলবিশেষে নানা নামে পরিচিত। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের দেবতার নাম দক্ষিণরায়, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা বড় খাঁ গাজি নামেই পরিচিত। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও ব্যাঘ্রদেবতাকে বলে সোনারায়—মুসলমান সমাজে ইনি পীর সোনারায় নামে পরিচিত। এঁরা নিজেরা বাঘ নন, বাঘের পিঠে চড়ে এঁরা পরিভ্রমণ করেন। সমস্ত ব্যাঘ্রসমাজ এঁদের বশংবদ। বাংলাদেশে দক্ষিণরায়ের পাঁচালী বা রায়মঙ্গলে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জমিদারের ঝগড়া-ঝাঁটি বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এর সঙ্গে স্থানীয় ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রচলিত রায়মঙ্গলে দু'টি আখ্যান লক্ষ্য করা যাবে। একটি হল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সদাগরের কাহিনীর অনুকরণে বণিক পুষ্পদত্তের কাহিনী, আর একটি হচ্ছে হিন্দু বাঘদেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে মুসলমান বাঘপীর বড় খাঁ গাজির সংঘর্ষের গল্প। পূর্বের গল্পটি নিতান্তই অনুকরণ, এতে কোনরূপ প্রতিভা বা শিল্পলক্ষণ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় আখ্যানটি চমকপ্রদ। এই শেষোক্ত আখ্যানে দুই ব্যাঘ্রনেতা দক্ষিণরায় (হিন্দু) ও বড় খাঁ গাজির (মুসলমান) ভয়াবহ সংঘর্ষ বর্ণিত হয়েছে। দু'জনের দ্বন্দ্বে যখন সৃষ্টি যায় যায় হল, তখন স্বয়ং নারায়ণ একদেহে হিন্দু ও মুসলমানের বেশ পরিধান করে দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজির বিরোধ মিটিয়ে দিলেন। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত কাহিনীর পশ্চাতে উপদ্রুত হিন্দু জমিদার ও হিন্দুসমাজ এবং উপদ্রবকারী মুসলমান জমিদারের বাস্তব সংঘর্ষের কাহিনী স্থান পেয়েছে। কবি কৃষ্ণরামের আগেও কেউ কেউ বোধ হয়

এই বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর পাঁচালী লিখেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলই কিঞ্চিৎ প্রতিভার পরিচায়ক। বাঘ-সংক্রান্ত বাস্তব তথ্য সংগ্রহ এবং দুই নেতার যুদ্ধ বর্ণনায় কবি কিছু মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু পুষ্পদত্তের গল্পটি উল্লেখের যোগ্য নয়। কবি বাস্তবতার হুবহু নকল করতে গিয়ে পীর বড় খাঁ গাজির মুখে হিন্দী-উর্দু মিশ্রিত অশ্লীল 'বদজোবান' ব্যবহারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। এদিক দিয়ে তাঁর রুচি অতিশয় নিন্দনীয়।

কৃষ্ণরামের তৃতীয় কাব্য 'ষষ্ঠীমঙ্গল' * ১৬০১ শকে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৬৭৯-৮০ অব্দে রচিত হয়। শিশুরক্ষয়িত্রী ষষ্ঠীঠাকরুণের পূজা বাংলার স্ত্রীসমাজে সুপ্রচলিত। মৃতবৎসার দেশে নবজাতককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মাতৃরূপিণী এই ধরনের গ্রাম্য দেবীর উপাসনা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য এইরূপ শিশুরক্ষয়িত্রী দেবীর উল্লেখ বৌদ্ধ ও হিন্দু পুরাণেও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ হারীতী এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ও স্কন্দপুরাণে নানা ধরনের ষষ্ঠীদেবীর পূজা-উপাসনার বর্ণনা আছে। বাংলাদেশের স্ত্রীসমাজে প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন মনোভাব মিশিয়ে ষষ্ঠীঠাকরুণের পূজার্চনা প্রচলিত হয়। কবি কৃষ্ণরাম এই পল্লীকাহিনীর ওপর কিছু রং ফলিয়ে ষষ্ঠীমঙ্গল লিখেছেন। বলা বাহুল্য এ গল্পও বণিকসমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগে বিত্তকৌলীন্যে সম্পন্নঘর বণিকদের যে সমাজে বেশ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল এই সমস্ত উপকথা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে একমাত্র ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল বাদ দিলে (এর নায়ক ক্ষত্রিয় রাজকুমার) আর সমস্ত প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যে বণিকসমাজের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। এই অকিঞ্চিৎকর ব্রত-পাঁচালীতে কৃষ্ণরাম দেখিয়েছেন, এক বণিকবধূ লোভের বশে ষষ্ঠীপূজার নৈবেদ্য খেয়ে ফেলেছিল এবং ষষ্ঠীঠাকরুণের কালো বেড়ালের ওপর দোষারোপ করেছিল। ফলে তার নবজাত সন্তানগুলি কালো বেড়ালের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল। বধূটির অনুশোচনায় ষষ্ঠীদেবী দয়া করে তার সন্তানগুলি ফিরিয়ে দিলেন এবং তাকে ষষ্ঠীপূজাও শিখিয়ে দিলেন। এই ছড়া-ব্রতকথা জাতীয় পুস্তিকা কোন দিক দিয়েই কাব্যের কোঠায় পৌঁছাতে পারেনি। তবে মাঝে মাঝে বাৎসল্যরসের যে দু' একটি স্নেহমিশ্রিত বর্ণনা আছে সেগুলি নিতান্ত মন্দ হয়নি।

---

* কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরই তাঁর প্রথম কাব্য। পরে কালিকামঙ্গল প্রসঙ্গে তাঁর এ কাব্যের আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গলে'র রচনার কোন সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। কাব্যের ভাষা দেখে মনে হচ্ছে, শীতলামঙ্গলের কৃষ্ণরাম আমাদের সুপরিচিত কৃষ্ণরামই বটে। এতে কবির 'রায়মঙ্গলে'র উল্লেখ আছে। রায়মঙ্গল ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়েছিল। তাই মনে হয়, শীতলামঙ্গলের রচনাকাল এর পরেই হবে। এটি কিন্তু কিয়দংশে পুরোমাপের মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে। কাহিনী অনেকটা চণ্ডীমঙ্গলের মতো। মারীগুটিকার দেবী শীতলার উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ও হিন্দুপুরাণেও আছে। বেদে উল্লিখিত দুর্ভাগ্যের প্রতীক কালীই নাকি পরবর্তী কালে শীতলা হয়েছেন। বৌদ্ধদের পর্ণশবরী দেবীও শীতলার মতো—ইনিও রোগীকে মারীগুটিকা থেকে আরোগ্য করেন। মনে হচ্ছে, বৌদ্ধ পর্ণশবরীই বাংলাদেশের শীতলায় পরিণত হয়েছেন। কারণ বাংলার শীতলাদেবীর মতো পর্ণশবরীও গাধার পিঠে চড়ে পরিক্রমণ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এঁর উল্লেখ আছে। দক্ষিণভারতের 'শীতলাম্মা' (শীতলামাতা) হচ্ছেন এই শীতলাদেবী।

কৃষ্ণরাম এই ছোট কাব্যটির কাহিনী সম্বন্ধে বেশ অবহিত ছিলেন। এতে শীতলামাহাত্ম্যবিষয়ক তিনটি কাহিনী আছে—মদনদাসের গল্প, মুসলমান কাজীর গল্প, আর হৃষীকেশ বণিকের গল্প। প্রথম দুই গল্পে উদ্ধত মদনদাস ও কাজীকে শীতলার অনুচর অত্যন্ত পীড়িত করে তাদের বলপূর্বক শীতলাভক্ত করলেন। তৃতীয় গল্পটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সদাগরের কাহিনীর অনুকরণে বর্ণিত হয়েছে। অনুকরণ বলে এতে মৌলিকতা নেই—চরিত্রগুলিও নিতান্ত গতানুগতিক। তবে রসিকতা ও বিদ্রূপের স্থলে কবি স্বভাবসিদ্ধ গ্রাম্য বর্বরতার সাহায্য নিয়ে অকপটে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আর কোন কবি এ ধরনের উলঙ্গ ঘৃণ্য শব্দ প্রয়োগ করতে সাহস করেননি। এদিকে কৃষ্ণরামের বেশ 'এলেম' ছিল।

কৃষ্ণরামের সর্বশেষ কাব্য 'কমলামঙ্গল' কবে রচিত হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। ভণিতা থেকে এই কৃষ্ণরামকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কৃষ্ণরাম বলেই মনে হচ্ছে। প্রাগ্‌বৈদিক, বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, গ্রামীণ ঐতিহ্য অবলম্বনে ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীঠাকরুণ বা কমলাদেবীর উদ্ভব হয়েছে। বিশেষত ধান্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এই দেবীর বেশী সম্পর্ক। মনে হয়, যে জন্য ক্ষেত্রপাল, পণ্ডাসুর এবং শিবায়নের কৃষিশিবের উদ্ভব হয়েছে, ঠিক সেই আদর্শেই ধান্যের প্রতীক হিসেবে কৃষিলক্ষ্মীরূপিণী কমলাদেবীর পূজা
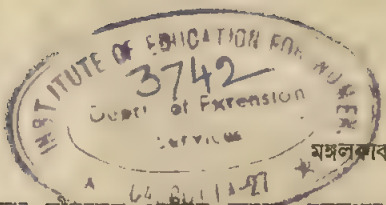
গ্রামের স্ত্রীসমাজে প্রচলিত হয়েছে, ব্রতকথার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণরামের কমলাও ধানের অলঙ্কার পরেছেন। তাই সমাজতত্ত্বের দিক থেকে মনে হচ্ছে, প্রাগার্য অস্ট্রিকযুগের কৃষিজীবী বাংলাদেশে এই রকম কোন ধান্যদেবীর পূজাদি কৃষি-কল্যাণে প্রচলিত হয়েছিল। কালক্রমে তার ওপর আর্য পালিশ পড়ে কমলাদেবী নারায়ণের লক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছেন।

'কমলামঙ্গল' কৃষ্ণরামের সর্বশেষ কাব্য। কারণ এর রচনা অতি শিথিল। মনে হচ্ছে কবিপ্রতিভা এতে অস্তমিত হতে বসেছে। বাংলাদেশে বালকবালিকা-সমাজে যে দুই বন্ধুর গল্প প্রচলিত আছে, কবি এই কাব্যে সেই রূপকথাটি গ্রহণ করেছেন। তার সঙ্গে মুকুন্দরামের ধনপতি বণিকের সমুদ্রযাত্রা জুড়ে দিয়ে কবি এক বিচিত্র জগাখিচুড়ি প্রস্তুত করেছেন। মুকুন্দরাম অনেক কবির প্রতিভার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের একাধিক কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির কাহিনী—বিশেষত তাঁর নৌবাণিজ্যের বর্ণনা বেমালুম আত্মসাৎ করেছেন। কৃষ্ণরামও মানসিক আলস্যবশত প্রায় কোন মঙ্গলকাব্যেই বিশেষ কোন মৌলিক গল্পের অবতারণা করেননি। পুচ্ছগ্রাহিতা মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের মারাত্মক ব্যাধি বিশেষ—কৃষ্ণরাম তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়, এ কাব্য ব্রতকথার সীমা ছাড়াতে পারেনি। তবে এক বিষয়ে কবি প্রশংসার যোগ্য। এতে তিনি বিচিত্র ধানের নামধাম ও গুণ বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের ধানচালের সংবাদ পেতে হলে কৃষ্ণরামেরই দ্বারস্থ হতে হবে। অনেক জায়গায় মনে হয়, তিনি নিজে যেন কৃষিকার্য করে ধান ফলাতেন। যাই হোক, কৃষ্ণরাম সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও শেষভাগে যে মঙ্গলকাব্য লিখেছিলেন তার অধিকাংশই ব্রতকথা ও ছড়াপাঁচালীর সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে কাব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি।

৫. কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)

সূচনা ॥ দেবী কালিকার মহিমা নিয়ে কালিকামঙ্গল কাব্য রচিত হলেও অন্য মঙ্গলকাব্য থেকে এর একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ কালিকা-মঙ্গল 'বিদ্যাসুন্দর' নামেও পরিচিত। এতে কাঞ্চীর রাজকুমার কালীভক্ত সুন্দর এবং বর্ধমানের রাজকুমারী বিদ্যার গুপ্ত প্রণয় এবং পরে বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাগরিক সমাজে এই তপ্ত আদিরসের কাব্য জনপ্রিয় হয়েছিল। এতে দেবী কালিকার কথা নামমাত্র,

বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়রসের আখ্যানই এর আকর্ষণের মূল কেন্দ্র; এমনকি দেবী কালিকাকে বাদ দিলেও কাব্যটির বিশেষ অঙ্গহানি হয় না। গুণসিন্ধু-তনয় সুন্দর অবশ্য দেবী ভক্ত। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের বীরসিংহ-তনয়া অনূঢ়া বিদ্যাকেও কালিকার ভক্তে পরিণত করা হয়েছে। সুন্দর দেবীর কৃপাতে এবং তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রপূত সিঁধকাঠির সাহায্যে বিদ্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। পরে সে বীরসিংহের চরদের দ্বারা ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের জন্য মশানে নীত হয়। সেখানে তার স্তবে কালিকা সদলবলে উপস্থিত হয়ে রাজার রক্ষিবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দেন। এতে বীরসিংহের চৈতন্যোদয় হয়। তিনি বুঝতে পারেন সুন্দর সদ্বংশজাত রাজপুত্র এবং দেবী কালিকার অনুগৃহীত। তখন তিনি অনুতপ্ত হয়ে ত্রুটি স্বীকার করেন এবং কন্যার সঙ্গে সুন্দরের মহাসমারোহে বিবাহ দেন। সুন্দর কিছুদিন শ্বশুরবাড়ীতে কাটিয়ে বিদ্যাকে নিয়ে দেশে ফিরে যায়, সেখানে যথাকালে তার একটি পুত্র হয়। সে ঘটা করে দেবীর মন্দির বানিয়ে তাঁর পূজা প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করে। রামপ্রসাদের সুন্দর আবার তান্ত্রিকমতে শব-সাধনাও করেছিল। কাল পূর্ণ হলে তারা স্বর্গযাত্রা করে। এই গল্পটি বাংলার যাবতীয় কালিকামঙ্গলে প্রায় একধরনে বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য নামধামে একটু-আধটু পার্থক্য আছে, দু-এক স্থলে কাহিনী-বিন্যাসেও কিছু নূতনত্ব আছে। এই শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর কথা আমরা এর পরের পর্বে বলব।

এই কাহিনীটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ বিদ্যাসুন্দরের গুপ্তপ্রণয় নিয়ে সংস্কৃতেও অনেক কাব্য, উদ্ভট কবিতা, শৃঙ্গার রসের শ্লোক লেখা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর জড় বহু দূরে সম্প্রসারিত। সংস্কৃতে গদ্যে, পদ্যে এবং গদ্যে-পদ্যে-মিশ্রিত অনেক রোমান্টিক প্রণয়গাথা প্রচলিত আছে। যেমন সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', বাণভট্টের 'কাদম্বরী' প্রভৃতি। এতে একাধিক প্রেমের আখ্যান আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের পতনের দিনে এবং ভারতসংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে উগ্র ও কুরুচিপূর্ণ কামকাহিনী সাধারণ সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, গুপ্তপ্রণয়ের অসামাজিক ও অশালীন কাহিনীও কিছু কম রচিত হয়নি। রাজশেখর সূরীর আখ্যানে নায়ক মদনকীর্তি ও রাজকন্যা মদনমঞ্জরীর গুপ্তপ্রণয় এবং মদনকীর্তির ধৃত হওয়ার গল্প কতকটা বাংলা বিদ্যাসুন্দরের মতো। এদেশে কালিকামঙ্গলের পশ্চাতে একাধিক সংস্কৃত প্রণয়াখ্যানের প্রভাব রয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন।

কাশ্মীরী কবি বিহ্লনের ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ নামে পঞ্চাশ শ্লোকে গ্রথিত গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনী সুপরিচিত। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন, যিনি ‘বিক্রমাঙ্কদেব চরিত’ লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি নাকি এই ‘চৌরপঞ্চাশিকা’র রচনাকার। কেউ কেউ বলেন, কবি নিজেই গুপ্তপ্রণয়ের ফলে রাজদ্বারে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তারই চিহ্ন রয়েছে উক্ত পঞ্চাশটি শ্লোকে। বাংলা কালিকামঙ্গলেও সুন্দর ধরা পড়ে রাজসভায় নীত হয়ে ‘চৌরপঞ্চাশিকা’র দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক আউড়ে একাধারে নিজের পরিচয়, কালিকার বন্দনা এবং বিদ্যার রূপগুণের প্রশংসা করে এক ঢিলে তিন পাখি মেরেছে। সুতরাং বাংলা কালিকামঙ্গলের অধিকাংশ কবি ‘চৌরপঞ্চাশিকা’র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। শোনা যায়, কবি বররুচি নাকি সংস্কৃতে একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখেছিলেন। সুপরিচিত বররুচিই এই কাব্যের রচনাকার কিনা জানা যাচ্ছে না। তবে বাংলাদেশে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া গেছে। এটি একসময় কলকাতার সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশক ও সম্পাদক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ছেপেও ছিলেন। কোন কোন অর্বাচীন পুরাণেও (যথা—ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড) বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী আছে। উর্দু এবং ফারসি ভাষাতেও এ কাব্য অনূদিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতার গৌরদাস বৈরাগী বিদ্যাসুন্দরের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। দুশো বছর আগে মিথিলায় কাশীনাথ নামক এক মৈথিলী কবি বাংলা-মৈথিলী মিশ্রভাষায় ‘বিদ্যাবিলাপ’ শীর্ষক একখানি নাটিকাও রচনা করেছিলেন।

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে মনে হচ্ছে, রাজপুত্র-রাজকন্যার গুপ্তপ্রণয়ের গল্প একদা সারা ভারতবর্ষেই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিহ্লনের ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ এবং বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যই হল সেই জনপ্রিয়তার প্রধান প্রমাণ। পরে বাংলাদেশে এবং অন্য প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষায় এই ধরনের আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল। তবে বাংলার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ওপরে কালিকাভক্তির একটি মোড়ক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরের দুঃসাহসিক (সম্ভবত অবৈধ) নারীচৌর্যকর্মে দেবী প্রভূত সাহায্য করেছেন, ধৃত সুন্দরকে রক্ষা করেছেন। প্রতিদানস্বরূপ সুন্দর ‘বিদ্যা’ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দেশে ফিরে গিয়ে ঘটা করে দেবীর পূজা প্রচার করে দেবীর ঋণ পরিশোধ করেছে। মনে হয়, সমাজে প্রথমে বিদ্যাসুন্দরের অবৈধ কামকাহিনী বাস্তব মানুষেরই তৃষাতপ্ত আখ্যানরূপে প্রচলিত

ছিল, পরে সমাজনেতারা কিঞ্চিৎ নৈতিক বুদ্ধির বশে এর ওপর দেবী কালিকার পাদস্পৃষ্ট গঙ্গোদক ছিটিয়ে কাহিনীটিকে নিছক মর্ত্যপ্রেমের আখ্যান থেকে মঙ্গলকাব্যের সীমায় উন্নীত করতে চেয়েছিলেন—তাঁরা পুরোপুরি সমর্থ হয়েছেন একথা বলতে পারি না। কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে কালীভক্তির রক্তবাসের আবরণ থাকলেও তার ভিতরকার রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর চীনাংশুক ঢাকা পড়েনি। সুন্দর কাব্যের একাধিক স্থলে দেবীর বন্দনা ও চৌতিশা স্তব (চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর বন্দনা) পাঠ করলেও আসলে সে মীনকেতনেরই জয়ধ্বনি করেছে। এই বাস্তব রস, হোক তা আদিরস-পীড়িত অসামাজিক কাহিনী, এই বৈশিষ্ট্যই কালিকামঙ্গলের প্রধান আকর্ষণের কারণ।

অবশ্য কেউ কেউ নিছক কামকথার অনাবৃত-প্রকাশ সহজ মনে মেনে নিতে পারেননি। তাই আধুনিক সমালোচকেরা বিদ্যাসুন্দরের আড়ালে নানারূপ রূপক-প্রতীক খুঁজে বেড়ান। তাঁদের ধারণা, এটা নিছক প্রণয়াখ্যান নয়। নারী খোঁজে সুন্দরকে অর্থাৎ সৌন্দর্যকে, আর পুরুষ খোঁজে বিদ্যাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে। রূপকের ছলে এই দুইয়ের মিলনই নাকি কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত হয়েছে। নারী ও পুরুষ, বিশেষত নারী যথার্থ কী খোঁজে তা স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বলতে পারবেন না, কুতো মনুষ্যাঃ। সে যাই হোক, জোর করে টেনেবুনে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে পবিত্র রূপক বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে কাব্যরসের শিরে সর্পাঘাত হয়। কাম যেখানে দূত, সেখানে নামাবলিধারী পুরোহিত মহাশয়কে এনে ফেললে সাধারণ মতে রসভঙ্গ হয়, আলঙ্কারিকের মতে 'রসাভাস' দোষ ঘটে। সুতরাং বিশুদ্ধ কামচিত্রকে অধ্যাত্ম-বিল্বদলে পূজা করার প্রয়োজন নেই—অন্তত কাব্যরসিকের তাতে সমর্থন থাকতে পারে না।* কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্য যে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পৃক্ত নয়, মানুষের কাহিনীই এখানে প্রধান, একথা মেনে নিয়ে আমরা এর উৎপত্তি থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

* অবশ্য মুসলমান সুফী কবিরা কোন কোন সময়ে বিদ্যা ও সুন্দরকে আধ্যাত্মিক রূপক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সাধনা হল মানবীয় রূপকে অধ্যাত্ম প্রেম উপলব্ধি করা। তাই তাঁরা য়ুসুফ-জুলেখা, বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতিকে রূপকার্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কালিকামঙ্গল ধরনের কাব্যে রূপকার্থ খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

দ্বিজ শ্রীধর ॥ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ গবেষক স্বর্গত মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ দ্বিজ শ্রীধর নামীয় কোন-এক কবির কালিকামঙ্গলের কয়েকখানি পৃষ্ঠামাত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এই কবির আর বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর কাব্যের যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে কিন্তু কালিকার কোন উল্লেখ নেই, হয় তো পরে ছিল। কবি কাব্যের মধ্যে হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ্‌ এবং তাঁর পুত্র যুবরাজ ফিরুজ শাহের নাম করেছেন। ফিরুজ শাহের নির্দেশেই তিনি এই কাব্য রচনায় অগ্রসর হন। এ'র তারিখ ধরে মনে হচ্ছে কাব্যটি ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হয়। কাব্যটি বোধহয় পুরোপুরি রোমান্টিক ধরনের রচিত হয়েছিল, এতে কালিকার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ না থাকাই সম্ভব। কারণ পাঠান সুলতানের প্রীতির জন্য এই কাব্য রচিত হয়েছিল, সুতরাং তাতে বোধ হয় হিন্দুর দেবী-মাহাত্ম্য ছিল না। সে যাই হোক, প্রাপ্ত কয়েকখানি পৃষ্ঠা থেকে কবির কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

সা বিরিদ খাঁ ॥ ইনিও চট্টগ্রামের কবি, পূর্বোল্লিখিত আবদুল করিম সাহেব এ'রও পরিচয় উদ্ধার করেন। এ'র বিদ্যাসুন্দর মূলত লৌকিক কাহিনী। একদা চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চল শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, এখানে অনেক মুসলমান সূফী সাধকও বসবাস করেছিলেন। সা বিরিদ খাঁ সেই ঐতিহ্যেই লালিত হয়েছিলেন। কাব্যের গোড়াতে তিনি নিজের সম্ভ্রান্তবংশ ও অন্যান্য পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যটি যদিও মানবরসের কাহিনী, তবু কবি যে হিন্দুর কালিকা সম্বন্ধে একেবারেই চুপ করেছিলেন তা নয়। কাব্যের গোড়াতেই তিনি কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক জুড়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, কালিকার প্রসাদেই গুণসার নৃপতি সুন্দরকে পুত্ররূপে লাভ করেন। কবির সংস্কৃত-প্রধান রচনাশক্তি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, দুঃখের বিষয় কাব্যের সবটা পাওয়া যায়নি বলে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় না। কবি এই আখ্যানের নামধাম ও কাহিনীতে কিছু কিছু নূতনত্ব সঞ্চার করেছেন। মনে হয়, এটিও পুরোপুরি লৌকিক রসের বিদ্যাসুন্দর কাব্য। কবি হিন্দুর পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁর রচনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কঙ্ক ॥ ময়মনসিংহে কঙ্ক নামে বিদ্যাসুন্দরের এক কবির যে আবির্ভাব হয়েছিল এ খবর একদা প্রায় কেউ-ই জানতেন না। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসী

ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভক্ত চন্দ্রকুমার দে নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি এই কবির পরিচয় ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করেন। পরে দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমারকে সাহিত্য-জগতে প্রচার করেন। দে মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার বহু আখ্যান পেয়েছি। এঁর সম্বন্ধে ময়মনসিংহ-গীতিকা প্রসঙ্গে আবার আলোচনা করব। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় "লীলার বারমাসী" বলে একটি ছোট আখ্যান আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কঙ্ক বা কঙ্কধর ব্রাহ্মণকুমার হয়েও অবস্থাবৈগুণ্যে চণ্ডালের দ্বারা লালিতপালিত হন। গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণের কাছে তিনি বিদ্যাভ্যাস করতেন। ক্রমে তিনি গর্গের কন্যা লীলার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু এই আকর্ষণ ব্যর্থপ্রণয়ে পর্যবসিত হয়। কঙ্ক রচিত বিদ্যাসুন্দরের গোড়াতে যে কবিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাও কতকটা এই রকম। সুতরাং "লীলার বারমাসী"-তে বর্ণিত কঙ্ক এবং বিদ্যাসুন্দরের কঙ্ক একই ব্যক্তি এবং উক্ত বারমাসীর আখ্যানও মোটামুটি ঠিক।

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে চৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে; পালাগানটিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি চৈতন্যদেবকে দেখবার জন্য নাকি নবদ্বীপ যাত্রা করেছিলেন। এই প্রমাণের বলে তাঁকে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে স্থাপন করার চেষ্টা চলেছে। অবশ্য এসব ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত নয়—কিসের সন্দেহ পরে বলছি। কাব্যটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এতে বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু কালিকার মহিমার স্থলে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ দেবতা সত্যপীরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সুতরাং একে 'কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর' না বলে 'সত্যপীরমঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কবি নিজে সত্যপীরের কৃপা লাভ করেছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর বিদ্যাসুন্দরে সত্যপীরের গৌরব বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কঙ্কের কাব্যটি যে বিচিত্র তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার উদ্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর আগে হয়নি। তা হলে কবিকে চৈতন্যের সমসাময়িক ষোড়শ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়া যায় না। উপরন্তু তাঁর কাব্যের ভাষা একেবারে হাল আমলের মতো, এতে কোথাও প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নেই। এই জন্য কাব্যের রচনাকাল বা কবির সময় নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহের আরও কারণ আছে। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কোন পুঁথি থেকে পাওয়া গেছে, না ময়মনসিংহ-গীতিকার মতো লোকের মুখ থেকে লিখে নেওয়া হয়েছে,

সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে পরিষ্কার করে সেবিষয়ে কিছু বলেননি। দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, এর একখানি পুঁথি তাঁর কাছে ছিল। কিন্তু তারও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু সংগ্রাহক চন্দ্রকুমারের মুখের কথার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই কাব্য কখনোই পুরো ছাপা হয়নি। ময়মনসিংহের একখানি স্থানীয় মাসিক পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে একটি প্রবন্ধে এই তথাকথিত পুঁথি থেকে যে পংক্তিগুলি উদ্ধার করেছিলেন, তার বাইরে এই কাব্য সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। এর ভাষা একেবারে আধুনিক কালের মতো। পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে বলে এ কাব্য কিছুতেই সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে যেতে পারে না, উপরন্তু পুঁথিটিও (যদি সত্যিই পুঁথি থেকে থাকে) গায়েব হয়ে গেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে এ কাব্যকে যথেষ্ট পুরাতন ও প্রামাণিক বলা যায় না। তবে কবি যে-কালেরই হোন না কেন, তাঁর ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন; বিদ্যাসুন্দরের স্বভাবসিদ্ধ স্থূল ব্যাপার তিনি সাধ্যমতো এড়িয়ে চলেছেন—এ জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। তবে তাঁর কাব্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহমুক্ত নই।

কৃষ্ণরাম দাস ॥ ইতিপূর্বে আমরা নিমতার কবি কৃষ্ণরামের একাধিক মঙ্গলকাব্যের কথা বলেছি। এখানে তাঁর আর একখানি মঙ্গলকাব্যের কথা বলি। এ কাব্য কিন্তু তাঁর সর্বপ্রথম রচনা। নিতান্ত তরুণ বয়সে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি কৃষ্ণরাম এ কাব্য লিখে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ছায়ায় তাঁর যশ অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদকে বাদ দিলে কৃষ্ণরামই হচ্ছেন কালিকামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি।

কাব্যের প্রারম্ভে তরুণ কবি হেঁয়ালির ছলে যে সন-তারিখের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি কালিকামঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন। কাব্যের মধ্যে তিনি ঔরংজেব বাদশাহ ও সুবাদার শায়েস্তা খাঁয়ের নাম করেছেন। শায়েস্তা খাঁয়ের সুবাদারীর সময় ধরেও ঐ সময়ে পৌঁছান যায়। কবি বলেছেন, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি এই কাব্য সমাপ্ত করেন। এর গোড়ার দিকে খানিকটা পৌরাণিক আখ্যান ছিল মনে হয়। কিন্তু তাঁর যে পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে শুধু লৌকিক আখ্যানটুকুই আছে। মনে হয়, সমাজে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর অতিশয় চাহিদার ফলে পুঁথিলেখকেরা পৌরাণিক অংশ বাদ দিয়ে শুধু লৌকিক নায়ক-নায়িকার আখ্যানটি নকল করেছিলেন।

কাব্যের কাহিনী প্রায় গতানুগতিক, তবে দু'চার স্থলে ঘটনা ও চরিত্রের যৎসামান্য নূতনত্ব আছে। পরবর্তী কালে রামপ্রসাদ তাঁর কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে কৃষ্ণরামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য আমরা আগে কৃষ্ণদাস প্রসঙ্গে দেখেছি, কৃষ্ণরাম অশ্লীল শব্দোচ্চারণে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। তাঁর প্রথম যৌবনের এই কাব্যেও তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে বিদ্যা যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে তার গ্রাম্য বর্ণনা পড়তে পড়তে একালের পাঠক লজ্জায় অধোবদন হবেন। যাই হোক দু'-একটি চরিত্র বর্ণনায় এবং পরিণত ভাষা ব্যবহারের তিনি অনেক স্থলে পরিপক্ক কবিবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—যদিও তখন তাঁর বয়স কুড়ি পার হয়নি। তাঁর এই কাব্যপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, তিনি মাটির ঢেলা দিয়ে ইমারত গড়তে গিয়েছিলেন, আর ভারতচন্দ্র তাই দিয়ে বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছেন। প্রতিভায় তিনি ভারতচন্দ্র থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছেন। কথা উঠবে, কাঁচা বয়সে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী কালে রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল প্রভৃতিতেই বা তিনি কি এমন বাহাদুরি দেখিয়েছেন? দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির যেটুকু গৌরব প্রাপ্য তাঁর কালিকামঙ্গলের জন্য তিনি তার বেশী দাবি করতে পারেন না।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী ॥ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই কবিকে আবিষ্কার ও প্রচার করেছেন। এই কবি ভারতচন্দ্রেরও আগে, সপ্তদশ শতাব্দীর কোন-এক সময়ে বিশুদ্ধ মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে কালিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। চিন্তাহরণবাবু এই কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। কাব্যটির শেষাংশ নষ্ট হয়ে গেছে বলে এর রচনাকাল জানা যায় না। তবে কবি যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। কারণ তিনি কাশীজোড়ার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ্ ছিলেন। এঁর কাব্যে যে সমস্ত স্থানীয় দেবদেবীর উল্লেখ আছে তাঁরা সকলেই রাঢ়ের দেবদেবী। এতে তাঁকে রাঢ়ের কবি বলেই মনে হচ্ছে। রচনা ও কাহিনী-গ্রন্থনে অল্পস্বল্প নূতনত্ব থাকলেও এতে কবির বিশেষ কোন প্রতিভা ফুটে ওঠেনি। সুন্দরকে তিনি উৎকলের রাজপুত বলেছেন—এ সংবাদ নতুন বটে। কবি সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের শেষের দিকে তিনি এমন সমস্ত আজগবি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে, এটি প্রায় অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। এ কাব্য এতই নীরস যে, পাঠকসমাজে এর প্রচার ছিল না। চিন্তাহরণবাবু এ কাব্য আবিষ্কার না করলে কবিকে হয়তো

অনন্তকাল ধরে অজ্ঞাতবাস করতে হত। তবে দেব-দেবীদের কৌতুকাবহ চরিত্র বর্ণিত হওয়াতে এতে খানিকটা চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে।

এই সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রাণরাম চক্রবর্তী বলে আর একজন কবি বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল লিখেছিলেন। আবার কারও মতে ইনি ভারতচন্দ্রেরও পরবর্তী। রচনাবস্তুতে কিছুমাত্র প্রতিভা নেই। এ'র বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।" এখানে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কথা সমাপ্ত করলাম। এর পর যথাস্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীর কালিকামঙ্গলের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৬. শি বা য় ন

সূচনা ॥ বাংলাদেশে মধ্যযুগে শিব-দুর্গাকে অবলম্বন করে কতকগুলি আখ্যান-কাব্য রচিত হয়েছিল যা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের মতো। এগুলি শিবায়ন নামে পরিচিত। কোন কোন মঙ্গলকাব্যের গোড়ার দিকেও শিব-দুর্গার ঘরগৃহস্থালীর গল্প আছে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত শাক্ত পদাবলীতেও শিবের যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। বাংলার শিবকাহিনী-বিষয়ক শিবায়ন কাব্যগুলি বড়ো বিচিত্র। এতে পৌরাণিক প্রমথেশ মহেশ্বরের চেয়ে গ্রাম্য কৃষাণ শিবের চিত্রই বেশী ফুটেছে। বলতে গেলে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনায় শিবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

বৈদিক যুগের রুদ্র, পৌরাণিক যুগের শিবশঙ্কর এবং বাংলাদেশের কৃষিজীবী শিব বাহ্যত একই মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন, শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও অনেক পূর্ব থেকে শিবের ধরনের কোন এক বৃষভধ্বজ বা লিঙ্গরূপী দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাগার্য দ্রাবিড়দের প্রধান দেবতাই ছিলেন শিব। অনেকে মনে করেন আর্যেরা বাইরের থেকে আসবার সময়ে শিব-রুদ্রকে সঙ্গে করে ভারতে প্রবেশ করেন। আবার কেউ বলেন, ভস্মভূষিত শ্মশানবাসী শিবের পরিকল্পনার পশ্চাতে অনার্য প্রভাব আছে। তিনি যেমন রুদ্র, তাঁর গৃহিণীও তেমনি প্রলয়ঙ্করী, তিনি যেমন ভূতভৈরব বেষ্টিত, তাঁর অর্ধাঙ্গিনীও তেমনি ডাকিনী-যোগিনী সেবিতা। এতে মনে হয় কোন আর্যেতর পার্বত্য জাতির মধ্যে শিবের খুব প্রভাব ছিল। নানা পুরাণেও তাঁকে শবর-পুলিন্দ-বর্বর জাতির দেবতা বলা হয়েছে, কোন কোন পুরাণকার তাঁকে আবার শূদ্রদের

গ্রাম্য দেবতাও বলেছেন। এই সব উপাদান থেকে শিবকে মিশ্রদেবতা মনে হচ্ছে। পূর্বে তিনি বহির্ভারতীয় দেবতা ছিলেন, পরে দ্রাবিড় ও অন্যান্য আর্যেতর জাতির পূজা লাভ করেন। তারপর তিনিই বেদে হন রুদ্র, পুরাণে শিবশঙ্কর —সতী-গৌরী-পার্বতী-উমা যাঁর গৃহিণী। তিনিই আগমশাস্ত্রের প্রবক্তা। শান্তভাবের সঙ্গে বীভৎসভাবও তাঁর মধ্যে মিশে গেছে। ক্রুদ্ধ হলেই তিনি কালান্তক সংহার-মূর্তি ধারণ করেন, আবার পরক্ষণেই কিন্তু নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচঞ্চল স্তব্ধতায় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন। এই সমস্ত আপাত বৈপরীত্য থেকে মনে হচ্ছে শিবপরিকল্পনায় আর্য-অনার্য, বেদ-পুরাণ, কাব্য-মহাকাব্য, আগম-তন্ত্র, গ্রামীণ কৃষি-সভ্যতা—সবই মিশে গেছে। তবে মনে হয় একদা সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত শিবই পূজিত হতেন, তাঁকে কেন্দ্র করে দক্ষকন্যা সতী ও হিমাচল-দুহিতা উমা-সংক্রান্ত অনেক ঘরোয়া কাহিনী পুরাণাদিতে স্থান পেয়েছে। এই ধরনের মার্জিত ও উচ্চ আদর্শের গার্হস্থ্য কাহিনী সে যুগের উচ্চকোটির সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে ভস্ম-ভূষিত ভয়ঙ্কর শিবের বর্ণনাও আছে। আর এরই সঙ্গে গ্রাম্য কৃষিসভ্যতার প্রতীক আর এক শিবকাহিনীর প্রচার হয়েছিল—বাংলা শিবায়ন কাব্যে যার ধারা অনুসৃত হয়েছে। মনে হয় ভারতের গ্রাম্যজীবনে কৃষিকার্যের দেবতারূপে এই শিব পূজা পেয়েছিলেন—আর এই পরিকল্পনাটি যে আদিম অনার্য শিবসংস্কার থেকে জন্মলাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার শিবায়নের শিবকাহিনীতে যুগপৎ পুরাণ ও গ্রাম্যকাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই ধরনের।

শিবায়নের সমস্ত কবি গোড়ার দিকে পৌরাণিক কাহিনী শিবের বর্ণনা করেছেন। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড, সতীর হিমাচল গৃহে উমা রূপে জন্মগ্রহণ, মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ,—এই পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনী প্রায় সমস্তই শিবায়নেই এক ধরনের। সংস্কৃতে রচিত নানা শিবপুরাণ এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে কবিরা অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কেউ কেউ তার সঙ্গে রুক্মিণীহরণ, হরিহরের যুদ্ধ, তারকাসুর বধ, অন্ধক আখ্যান, পরশুরাম ও বাণরাজার গল্প এই পৌরাণিক অংশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ গল্পগুলিও অর্বাচীন পুরাণাদি থেকে নেওয়া। শিবচতুর্দশীর ব্রতকথাও কোন কোন কবি এই প্রসঙ্গে বলে নিয়েছেন। কিন্তু শিবায়নের দ্বিতীয়াংশে কৃষক শিবের যে বিচিত্র গল্প বলা হয়েছে তাই হল অধিকতর কৌতূহলপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। মধ্যযুগের

শিবভক্ত কবিরা পুরাণের শিব-দুর্গা এবং লৌকিক ধরনের শিবকাহিনীকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের সমন্বয় করতে চেয়েছেন। লৌকিক অংশের কাহিনী কৈলাসে হর-পার্বতীর ঘরগৃহস্থালীর গল্প থেকে শুরু হয়েছে। দারিদ্র্যের জন্য হর-পার্বতীর অপভাষায় কলহ, চাষবাস করে দারিদ্র্য ঘোচাতে শিবের প্রয়াস, ভৃত্য ভীমের সঙ্গে জমি প্রস্তুত করা, বীজ বপন, ধান্যচারার পরিচর্যা, শিববিরহে দুর্গার কষ্ট, শিবকে বাগ্‌দিনীবেশে ছলনা করবার জন্য শিবের কৃষিক্ষেত্রে দেবীর যাত্রা, বৃদ্ধ শিবের বাগ্‌দিনী আসক্তি, তরুণী পরস্ত্রীর আসঙ্গ লোভে শিবের হাঁটুজলে নেমে মাছ ধরা, দেবীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, ব্যাপার বুঝে চিন্তিত মুখে শিবের কৈলাসে ফিরে এসে লাম্পট্য অপরাধের অভি-যোগে দেবী কর্তৃক বিশেষ 'আপ্যায়ন' লাভ, অভিমানে দেবীর সপুত্র-কন্যা পিত্রালয়ে গমন, মহাদেবের শাঁখারীর ছদ্মবেশে শ্বশুর ভবনে যাত্রা, সেই ছদ্মবেশে দেবীকে শাঁখা পরানো, তারপর যথাকালে দুজনের পুনর্মিলন, বৃদ্ধ হরের নবযুবকের মতো ব্যবহার, তারপর স্ত্রী-সন্তানাদিসহ প্রসন্ন মনে কৈলাসে ফিরে আসা—শিবায়নের দ্বিতীয়াংশে এই লৌকিক কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য মানসিক প্রবণতা ও রুচি অনুসারে কোন কবি পৌরাণিক অংশের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন (যথা—রামকৃষ্ণ), কেউ বা কৃষক ও পরস্ত্রীলুব্ধ কামুক শিবের কাহিনীকে বেশ ফলাও করে বর্ণনা করেছেন (যেমন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য)। এই অংশ থেকে বেশ অনুমান করা যাচ্ছে যে, আর্যেতর অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদি-বঙ্গবাসীদের সমাজ যখন মূলত কৃষিনির্ভর ছিল, তখন সেই দূরাস্তৃত অতীতের কৃষক সমাজে যে-ধরনের কৃষিদেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, বহু শতাব্দী পরেও তার ক্ষীণ ধ্বংসাবশেষ এ দেশে বজায় ছিল। পরবর্তী কালে পৌরাণিক শিব এবং আদিম কৃষিসংস্কৃতির কোন অমার্জিত স্থূল দেবতাকে সংমিশ্রিত করে শিবায়ন কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে।* এখন সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন শিবায়ন-কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

শঙ্কর কবিচন্দ্র ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে মোট দু'জন শিবায়নের কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে—শঙ্কর কবিচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ। অবশ্য শঙ্কর কবিচন্দ্র আরও অনেক বিষয়ে কাব্য লিখেছিলেন—ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শীতলামঙ্গল

* কৃষিদেবতা শিবের প্রভাব মিথিলাতেও লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতি কৃষক-শিবের বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে কয়েকটি পদ লিখেছিলেন।

প্রভৃতি কাব্য লিখে তিনি বহুমুখী কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'ভাগবতামৃত' এখনও বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। শঙ্কর কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অন্য কাব্যে রচনাকাল উদ্ধৃত হয়েছে। তার থেকে মনে হয় ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে তিনি শিবায়ন রচনা করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও জীবিত ছিলেন এবং বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহের (১৭১৮-১৭৪৮) সভাকবি ছিলেন। তাঁর কয়েকখানি কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

শঙ্করের শিবায়নের পুরো পুঁথি পাওয়া যায়নি। শুধু তাঁর 'শঙ্খপরা' ও 'মাছধরা' শীর্ষক দুটি পালামাত্র পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় কবি গোটা শিবায়ন লিখলেও এই লৌকিক পালা অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী কালের কবি রামেশ্বর এই পালার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'মাছধরা' পালায় মেছুনীবেশিনী দেবী কর্তৃক শিবকে কামাবিষ্ট করবার বাস্তব বর্ণনা আছে। রুচির কথা বাদ দিলে এই অংশটুকু বেশ বাস্তবধর্মী ও চিত্তাকর্ষক। বাগ্‌দিনী-মহাদেবের কামাচারের বর্ণনার সময় কবি সভ্যভব্য মার্জিত নাগরিকতা ছেড়ে গ্রাম্য রসের হাঁটুজলে নামতেও দ্বিধা বোধ করেননি। ভাষার মধ্যে যে তীক্ষ্নতা লক্ষ্য করা যায় তাই পরবর্তী শতাব্দীতে রামেশ্বর, ভারতচন্দ্র ও ঘনরামের মধ্যে উজ্জ্বলতা ও বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করেছিল। বিষয়বস্তু বা কাব্যরসের দিক থেকে না হলেও ভাষার দিক থেকে এই কবিরা যে নাগরিক মার্জিত রুচির বাক্‌রীতি পুষ্ট করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে।

রামকৃষ্ণ রায় ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দু'একজন এমন ভাগ্যহীন কবি ছিলেন যাঁরা প্রতিভা সত্ত্বেও যথোচিত খ্যাতিসম্মান পাননি। শিবায়নের আর এক কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র তারই একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। প্রতিভায় তিনি সমসাময়িক অনেক কবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, রুচিতে তিনি অনিন্দ্যগুণের অধিকারী, পরিমাণ-সামঞ্জস্যে তাঁকে বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু তবু তিনি উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি, সাহিত্যের ইতিহাসকারেরাও তাঁর সম্বন্ধে 'নম' 'নম' করে সেরেছেন। এর কারণ বোধ হয়, কবি ছিলেন 'সীরিয়স' ক্লাসিক ধরনের ভূয়োদর্শী ব্যক্তি। রঙ্গরস-ধামালির উতরোল উল্লাস তাঁর মধ্যে বড়ো একটা নেই—এই ধরনের শিবায়ন কাব্যে যার বাড়াবাড়ি বিরক্তিকর। বোধহয় গণমানস এই কারণে কবির প্রতি বিরূপ হয়েছিল। এই জন্যই তাঁর কাব্যের দু'খানি ছাড়া আর কোন

পুঁথি পাওয়া যায়নি, তাও আবার একখানা নানারকম গণ্ডগোলে পূর্ণ। রামেশ্বরের শিবায়নের অতি-জনপ্রিয়তাই রামকৃষ্ণের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা চলতে পারে, জনপ্রিয়তাই সাহিত্যের শেষ আপীল-আদালত নয়।

রামকৃষ্ণের পূর্বপুরুষের বাস হাওড়া জেলার আমতার নিকট রসপুর গ্রাম। এ গ্রাম এখনও আছে, বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায় মহাশয় বহু পরিশ্রম করে কবির নির্ভুল পুঁথি প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। রামকৃষ্ণ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ, পূর্ব উপাধি 'দেব'। পরে তাঁরা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। কবি নানাশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের মতোই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তাঁর পিতাও সুপণ্ডিত ছিলেন। শেষজীবনে একটা দুর্ঘটনা তাঁর মর্মান্তিক দুঃখের কারণ হয়েছিল। একদা বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম কবির গ্রামে হামলা করে তাঁর গৃহদেবতাকে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে যান। এর ফলে দুঃখে-অপমানে কবি এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েন যে, অচিরে তাঁর মৃত্যু হয়। এঁদের দলিলেও এই শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে।

কবি তাঁর কাব্যকে 'শিবমঙ্গল' আখ্যা দিয়েছেন। এতে কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, স্কন্দ পুরাণ—যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থে শিবের প্রসঙ্গ আছে সেখান থেকে তিনি কাহিনী গ্রহণ করেছেন—কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাবও তাঁর কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ছাব্বিশ পালায় বিভক্ত 'শিবমঙ্গলে' কবি সৃষ্টিতত্ত্ব, কালবিভাগ, তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি ভূমিকার পর মূল কাহিনী গ্রন্থনে অগ্রসর হয়েছেন। সতীর দেহত্যাগ, যজ্ঞভঙ্গ, কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাবে মহাদেবের তপোভঙ্গ, মদনভস্ম, পার্বতীর সুকঠোর তপস্যা এবং মহাদেব-পার্বতীর পরিণয় বর্ণিত হয়েছে। তার পর কবি মূল কাহিনী ছেড়ে কয়েকটি পৌরাণিক শাখা কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন—পুরাণোক্ত মনসার কাহিনী, সমুদ্রমন্থন, বলিরাজ ও সগর রাজার গল্প, মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন, ত্রিপুরাসুর ও তারকাসুর বধের কাহিনী, অন্ধকবধ, পরশুরাম-রাবণের গল্প, ঊষা-অনিরুদ্ধের প্রণয়কাহিনী, বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, বাণের পক্ষে মহাদেবের যোগদান, পরিশেষে হরিহরের মিলন—এবং ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহে কবি কাব্য সমাপ্ত করেছেন। এই উপকাহিনীগুলি ক্ষীণসূত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কবি

শিবায়ন লিখতে বসেছেন, কিন্তু বড়োই আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র একটি পালা (২২শ পালা) ভিন্ন এই সুদীর্ঘ কাব্যের অন্য কোথাও লৌকিক শিবের বর্ণনা দেননি। অবশ্য হর-পার্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি লৌকিক পৌরাণিক কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছেন। সংস্কৃত কাব্যপুরাণে অতিশয় নিবিষ্টচিত্ত এই মার্জিত রুচির কবি এ কাব্যের নানাস্থানে লৌকিক প্রভাব সাধ্যমতো এড়িয়ে গেছেন। এতে অবশ্য কৃষক শিবের বিড়ম্বিত জীবন-সম্পর্কিত কৌতুকাবহ বর্ণনার আধিক্য নেই, কিন্তু যথার্থ পৌরাণিক সাহিত্যের স্রষ্টারূপে কবি অধিকতর গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। বাংলাদেশের যদি কোন কবি গ্রাম্য মঙ্গলকাব্যকে পুরাণের সীমানায় তুলে ধরতে প্রয়াস করে থাকেন, তবে তিনি হলেন শিবমঙ্গলের কবি-পণ্ডিত রামকৃষ্ণ রায়। কাহিনীর ঘনাপিনদ্ধ গ্রন্থনৈপুণ্য, চরিত্রগুলির পৌরাণিক মহিমা ও সংযম, সর্বোপরি কবির মার্জিত ভাষা ও পরিমিত অলঙ্করণ প্রশংসনীয় গৌরব লাভ করেছে। তাঁর কাব্যের একমাত্র ত্রুটি, তিনি জীবনের লঘু-তরল দিকটিকে উপেক্ষা করেছিলেন। এর ফলে তাঁর নানাগুণে প্রশংসনীয় কাব্যটি কিঞ্চিৎ নীরস মনে হয়। তিনি যদি ভারতচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার কিঞ্চিৎ অধিকারী হতেন তা হলে তাঁর মধ্যে হয়তো ভারতচন্দ্রের চেয়েও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন আর-এক কবিকে পেতাম। ধর্মমতের দিক থেকেও তিনি পুরাণের আদর্শ অনুসরণ করে হরিহরের অভেদত্ব প্রমাণ করেছেন—এদিক দিয়ে তাঁর ধর্মবোধ বিশেষ উদার বলে মনে হয়। পরিশেষে আর একটি কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। কবির কাব্যের একাধিক স্থলে চমৎকার গদ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। যথা—"পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন, এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখে নারদকে কহিতেছেন, অবধান করহ।" কিংবা, "অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারাসকল শিবের করে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করিয়া হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন, অবধান করহ।" এ গদ্য একেবারে আধুনিক গদ্য। যাঁরা মনে করেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা রামকৃষ্ণের এ গদ্যরীতি দেখলে পূর্বমত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। এবার আমরা 'মৃগলুব্ধ' নামে শিবচতুর্দশী সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীর ব্রতকথা জাতীয় পুঁথির উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

মৃগলুব্ধ ॥ চট্টগ্রামে 'মৃগলুব্ধ' নামে শিবমহিমাবিষয়ক কয়েকখানি পৌরাণিক ধরনের পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে যার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকলেও বিষয়-

বৈচিত্র্যের জন্য উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টাতেই দু'জন কবির 'মৃগলুব্ধ' পুঁথি পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম একদা প্রধান শৈবতীর্থ ছিল, এখনও চন্দ্রনাথ তীর্থ পূর্বমহিমা অক্ষুন্ন রেখেছে। এখানে শিবমহিমাবিষয়ক কাব্য রচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নানা অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথা ও আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি মূলতঃ এক 'মৃগলুব্ধ' অর্থাৎ ব্যাধের কাহিনী। কি করে এক ব্যাধ শিবের কৃপায় উদ্ধার পেল এবং রাজা মুচকুন্দ ও তাঁর রাণী শিবচতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষে শিবমাহাত্ম্য শুনে সশরীরে স্বর্গে গেলেন—'মৃগলুব্ধে' তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীতে এবং শিবচতুর্দশীর ব্রতকথায় ব্যাধের কাহিনীর প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, মনে হয়, একদা শিব নিষাদ জাতির দেবতা বলেই পূজিত হয়েছিলেন।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মোট তিনজন কবির 'মৃগলুব্ধে'র পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন। তার মধ্যে দু'জনের নামধাম জানা যাচ্ছে—(১) রামরাজা ও (২) রতিদেব। কিন্তু তৃতীয় কবির পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাঁর নামও জানা যায় না। মনে হয় উক্ত অজ্ঞাতনামা তৃতীয় কবিই মৃগলুব্ধ পুঁথির আদি রচনাকার—অবশ্য এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে রামরাজা ও রতিদেবের রচনার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, রতিদেব বোধহয় রামরাজার কিছু পরবর্তী কালের কবি, কারণ তাঁর কাব্যে রামরাজার রচনার বেশ কিছু প্রভাব আছে। এই রামরাজা বোধহয় চট্টগ্রামের কোন মগবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়ে বৌদ্ধ মগেরা ভাষায় ও ধর্মকর্মে চট্টগ্রামের হিন্দুদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। পরে তারা আবার বৌদ্ধধর্মে ফিরে গেলেও কেউ কেউ হিন্দুর ধর্মকর্ম ও ভাষা ছাড়তে পারেনি। রামরাজা সেই রকম কোন হিন্দুভাবাপন্ন মগ। এঁর পুঁথিটিও চট্টগ্রামের এক মগ ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে পাওয়া যায় বলে কবির মগ বংশধারা সম্বন্ধে অনেকে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে জোর করে কিছুই বলা যায় না। এতে আছে, পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শিব পরম ধার্মিক রাজা মুচকুন্দ ও তাঁর রাণী বুদ্ধিশীর শিবচতুর্দশী ব্রতের কথা বলেন। রাণী স্বামীকে রাত্রি জেগে শিবের আরাধনায় সাহায্য করবার জন্য এক ব্যাধের গল্প বলেন। ঘোর রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টিতে কাতর হয়ে এক ব্যাধ বেলগাছে উঠে রাত কাটাবার সংকল্প করে। তলায় ছিলেন শিব—অবশ্য প্রস্তরীভূত লিঙ্গশরীরে। সেদিন আবার শিবচতুর্দশী—ব্যাধ আনমনে দু'চারটি

বেলপাতা ছিঁড়ে নীচে ফেলছিল, দৈবক্রমে সেই বেলপাতা পড়ল গিয়ে শিবলিঙ্গের ওপর। খুশি হয়ে শিব ব্যাধকে নরজন্ম থেকে মুক্ত করে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ব্যাধ নরজন্মে ব্যাধ হলেও আসলে সে ছিল স্বর্গের এক বিদ্যাধর, ইন্দ্রের অভিশাপে তাকে মর্ত্যে ব্যাধজন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। শাপমোচনের কাল নিকটবর্তী হলে অরণ্যে তার ঐ ধরনের অনুকূল যোগাযোগ ঘটে গেল এবং শাপের অবসানে স্বর্গের বিদ্যাধর স্বর্গে ফিরে গেল। এই গল্পটি রাণী রুক্মিণী সারারাত জেগে স্বামীকে শোনালেন। অনেকটা সংস্কৃত 'কাদম্বরীর' মতো এতে দু-তরফা গল্প বর্ণিত হয়েছে—গল্পের মধ্যে আর একটা গল্প সংগ্রথিত আছে। পার্বতীকে শিব গল্প বলছেন, সেই গল্পে আবার দেখা যাচ্ছে, রাণী তাঁর স্বামীকে গল্প বলছেন। গল্প শোনার পর রাজা বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে শিবলিঙ্গের উপাসনা করলেন। ফলে শুধু রাজারাণী নন, তাঁর গোটা রাজ্যটাই, মায় প্রজাপাঠক সহ, শিবত্ব লাভ করল। রাজার পুণ্যে সকলেই কৈলাসে গিয়ে পরম সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন। রামরাজার রচনা নিতান্তই সাধারণ স্তরের ব্রতকথা ধরনের, তবে সতী হারিয়ে মহাদেবের বিলাপের অংশটুকু চমৎকার হয়েছে।

রতিদেবও চট্টগ্রামের কবি, তাঁর 'মৃগলুব্ধ' অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে লেখা, ভাষাভঙ্গীও কিছু উৎকৃষ্ট। অবশ্য তিনি রামরাজার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনে হয় কবি ১৫৯৬ শকাব্দে (১৬৭৪ খ্রীঃ অঃ) এই ব্রতকথা রচনা করেন—কারণ তাঁর একটি পুঁথিতে সন-তারিখজ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া গেছে। কাব্যের শুরুতে কবি সবিস্তারে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কবি কাহিনী-গ্রন্থনে ও রচনারীতিতে যে রামরাজার চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। রামরাজা অকিঞ্চিৎকর ব্রতকথা লিখেছিলেন, রতিদেব যথার্থ কাব্য ফেঁদেছেন। তাঁর ভাষা ও রচনাভঙ্গিমায় সংস্কৃতের ঝঙ্কার লক্ষণীয়। ব্যাধের বাস্তব চরিত্র বর্ণনায় কবির মুন্সিয়ানা প্রশংসার যোগ্য।

দীনেশচন্দ্র সেন রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' ধরনের রচনাকে বলেছেন, "শৈবধর্মের ভগ্নধ্বজা"। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ বাংলাদেশে শৈবধর্ম কোনদিনই বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারেনি—যদিও শৈবতীর্থ আছে একাধিক। কৃষক-শিব-সংক্রান্ত আখ্যান শিবায়নে এবং শিবচতুর্দশীর পৌরাণিক আখ্যান 'মৃগলুব্ধে'র মধ্যে কোনও প্রকারে স্থান করে নিয়েছে। আদিযুগের বাঙালী দলে

দলে মহাযানী শাখাভুক্ত হয়ে নানা বৌদ্ধ উপযানের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু মধ্যযুগে শাক্ত ও বৈষ্ণবমত সমগ্র জাতিকে গ্রাস করেছিল। তার মধ্যে পড়ে শৈবধর্ম ও শৈবসম্প্রদায় সঙ্কুচিতভাবে আত্মরক্ষা করেছে। শিবায়নগুলির তবু একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে, কিন্তু 'মৃগলুব্ধে'র বিশেষ কোন কাব্যগৌরব খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭. ধর্মমঙ্গল কাব্য

সূচনা ॥ ধর্মমঙ্গল কাব্য আলোচনার আগে ধর্মঠাকুর ও 'ধর্ম' সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ জানা প্রয়োজন। কারণ ধর্মঠাকুরের পূজার্চনা এখনও পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গে প্রচলিত আছে। সেই পূজাপার্বণ উপলক্ষে ধর্মঠাকুরের মহিমা সম্বন্ধে ধর্মমঙ্গল কাব্য পাঠ ও গান হয়। এক সময়ে চণ্ডী ও মনসাদেবীকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলাদেশেই চণ্ডী-সম্প্রদায় ও মনসা-সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। এখন আর সে রকম কোন বিশিষ্ট উপসম্প্রদায় নেই, কিন্তু ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে এখনও উপসম্প্রদায় আছে; তাদের ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ এখনও বেশ জনপ্রিয়। সমগ্র পশ্চিম-বাংলা এবং দক্ষিণ-বাংলার কোন কোন স্থানে ধর্মের মন্দির আছে, বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে খুব ঘটা করে ইতরভদ্রে মিলে ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকে, ধর্মের গাজনেও অনেকে সন্ন্যাস নেয়। তাই ধর্মঠাকুর ও ধর্মঠাকুরের সেবকের দল এই শতকেও বেশ জনপ্রিয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য এবং মঙ্গলকাব্যের উপসম্প্রদায় 'ধর্ম' সম্প্রদায়ের মতো আজ আর বেঁচে নেই। উপরন্তু প্রায় অধিকাংশ মঙ্গলকাব্য স্ত্রীদেবতার মহিমা ঘোষণা করেছে, কিন্তু ধর্মঠাকুর পুরুষ-দেবতা—এ-ও একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিও নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, ধর্মমঙ্গল কাব্য সারা বাংলাদেশে প্রচলিত নেই, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার বাইরে ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীতে অনেক কাল্পনিক গল্প-আখ্যান থাকলেও এর পটভূমিকায় প্রাচীন গৌড়দেশের (অর্থাৎ রাঢ় দেশ) ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনা করা যাক। পশ্চিম ও দক্ষিণ-বাংলার অনেক গ্রামে ধর্মের 'থান', মন্দির ও আস্তানা আছে। কোন কোন সময়ে গাছ-তলাই ধর্মের অধিষ্ঠান ভূমি। বহু মন্দিরে ধর্মের কোন মূর্তি নেই, তাঁর শিলা-মূর্তি বেদীর ওপর স্থাপিত। এই শিলামূর্তিগুলির বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধরনের

গড়ন। কোনটি কচ্ছপের মতো, কোনটি কাঁকড়াবিছের মতো, কোনটি গোলাকার, কোনটি চৌকো, কোনটির আবার বিশেষ কোন আকৃতি নেই। চব্বিশ পরগণা জেলার দু'একটি গ্রামে আমরা ধর্মের সাকার মূর্তিও দেখেছি—তাঁর বিশালমূর্তি, অনেকটা বীরবেশ। সুতরাং যাঁরা বলেন, বাংলাদেশে ধর্মের কোন মূর্তি নেই তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। দেবতার এই ধরনের বিচিত্র রূপ ও আকৃতি দেখে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। সেই প্রশ্ন এবং প্রশ্নের জবাব নানা জনে নানা ভাবে দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমের য়ুরোপীয় পণ্ডিতগোষ্ঠীরা বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে অনেক সন্ধান চালিয়ে গবেষণার দ্বারা মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁদের বিশ্বাস, আধুনিক হিন্দুধর্মের অনেকটা বৌদ্ধধর্মের দান। তাঁদের কথামতো অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন, হিন্দুধর্ম, আচার-আচরণ, ব্রতপূজার অন্তরালে বৌদ্ধধর্ম লুকিয়ে বেঁচে আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা-দেশের গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে অনেক পুঁথিপত্র সন্ধান করেন। সেই সন্ধানের ফলে ধর্মমঙ্গল, ধর্মঠাকুরের ছড়া, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি পুঁথি আবিষ্কৃত হতে থাকে। শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে ধর্মঠাকুরের পরিচয় ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখলেন, বাংলাদেশের ডোম ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা মহাসমারোহে হয়ে থাকে। কোন কোন সময়ে এতে উচ্চবর্ণেরাও অল্পস্বল্প যোগ দিয়ে থাকেন। হরপ্রসাদ অনুমান করেন যে, এই ধর্মঠাকুর হচ্ছেন বৌদ্ধ-ধর্মেরই প্রচ্ছন্ন রূপ। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে নির্যাতিত বৌদ্ধধর্ম সমাজের অন্তেবাসীদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, ধর্ম-উপাসনা ঐ রকম এক ব্যাপার। কারণ ধর্মঠাকুরের মূর্তিপূজার রেওয়াজ নেই, শিলামূর্তিই অধিকাংশ স্থলে ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হন। তাঁকে 'ধর্মপূজা বিধানে' বহুস্থানে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে, কোথাও কোথাও 'বুদ্ধ-বৌদ্ধ' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি যে কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ড—এও বৌদ্ধধর্মের নিরাকার শূন্যবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর নাম ধর্মনিরঞ্জন। বৌদ্ধ-ধর্মের ত্রিশরণ 'ধর্ম-বুদ্ধ-সঙ্ঘ'-এর 'ধর্ম' কথাটিই এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন অবশ্য ধর্মের মন্দিরে পূজাপার্বণ, সন্ন্যাস-গাজন, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপার পুরোপুরি হিন্দুধর্মের অনুগত হয়ে থাকলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং তাঁর পরবর্তী অনেক গবেষক ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা বলেই মনে করেছিলেন।

কিন্তু আধুনিক কালে অনেক পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই দেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এঁরা এঁকে বৌদ্ধ দেবতা না বলে আরও পিছিয়ে বৈদিক-যুগে যেতে চান। এঁরা বৈদিক সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে এই ডোম-দেবতার পূজাদির কিছু কিছু মিল আছে। বিশেষতঃ বৈদিক বরুণ ও সূর্যের সঙ্গে এঁর বেশ সাদৃশ্য আছে। কেউ কেউ আবার বৈদিক যুগেই থেমে থাকতে চান না, আরও পিছিয়ে প্রাগার্য, বহির্ভারতীয় হিট্টি, প্রাচীন পারসিক, দরদ, কাশ্মীরী প্রভৃতি প্রাচীন নরগোষ্ঠীর দেবদেবীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে উৎসুক। এই সমস্ত তথ্য থেকে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ জটিল রহস্যে ঢেকে গেছে। গবেষকদের এই সমস্ত অনুমান ও সিদ্ধান্তের কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত ও তথ্যসঙ্গত। বৈদিক দেবতার সঙ্গে ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ধর্মের গাজন ও আনুষঙ্গিক উপচারে বৈদিক যাগযজ্ঞের সুদূরতম অনুকরণ করা হয়। আবার বৌদ্ধ ভাবও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ ধর্ম-মঙ্গলে, 'ধর্মপূজাবিধানে' ও 'শূন্যপুরাণে' সেরকম ইঙ্গিত আছে। আবার দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুর নারায়ণের অবতারে পরিণত হয়েছেন, কোথাও তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ভক্তের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন, কোথাও-বা মুসলমান ফকিরের বেশেও হাজির হয়েছেন। আরও দেখা যাচ্ছে, অঞ্চল ভেদে বাংলার গ্রামাঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পৃথক পৃথক নাম আছে। যেমন বেলডিহা গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম বাঁকুড়া রায়, শ্যামবাজার গ্রামের ধর্মঠাকুর দলু রায় নামে পরিচিত, গোপালপুরের ধর্মঠাকুরের বড় অদ্ভুত নাম—কাঁকড়াবিছে। তাঁর শিলামূর্তি অনেকটা কাঁকড়া-বিছের মতো দেখতে বলে তিনি এই নামে অভিহিত হন। দেপুরের ধর্মঠাকুর জগৎ রায় নামে, পশ্চিমপাড়ার ধর্ম যাত্রাসিদ্ধি নামে, বরুণগ্রামের ধর্ম মোহন রায় নামে পূজা লাভ করে আসছেন। প্রত্যেক গ্রামের ধর্মঠাকুরের পৃথক পৃথক নাম দেখা যায়। যাই হোক কালবিচারে ধর্মঠাকুরের শিকড় কিন্তু বহু অতীতে প্রসারিত। এতে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ—সব সংস্কারই মিশিয়ে আছে। তবে তাঁর শিলামূর্তি, পূজাদি ও ডোম ভক্তসম্প্রদায় বিবেচনা করলে মনে হয়, বাংলার প্রাগার্য অস্ট্রিক সভ্যতাও এর মূলে বিশেষভাবে বর্তমান। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁর ওপর ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাব

বেশি পড়েছে। সুতরাং ধর্মঠাকুরের মূলে নানারকম আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কার মিশে গিয়ে মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের দেবতা অনেকটা হিন্দু পৌরাণিক সংস্কারের অধীন হয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে। মধ্যযুগে পৌরাণিক সংস্কারের প্রাধান্যের সময়ে এইভাবে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সমন্বয় ঘটেছিল।

আগেই বলেছি, রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা, তাঁর পূজা-অর্চনা বেশ সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাঁর একটি বড় সম্প্রদায়ও আছে। প্রথম দিকে বর্ণহিন্দু সমাজে এই মিশ্র দেবতার বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। মূলতঃ ডোম সমাজেই এই দেবতার বিশেষ প্রাধান্য ছিল, এখনও আছে। ডোমের পুরোহিত বা ডোম-ব্রাহ্মণ এখনও পুরুষানুক্রমে এই দেবতার পূজা করে আসছেন। ফলে ধর্ম-ঠাকুরের বার্ষিক পূজায় ডোম সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকার; তাদের পূজা হবার পর ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের ভক্তেরা পূজা করতে পান। ডোম ছাড়াও জেলে, নাপিত, যুগী, বাগ্‌দী, সদ্‌গোপ, ধোপা, ময়রা, আগুরি—এরাও এ পূজায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে থাকে। তবে ব্রাহ্মণ-কায়স্থপ্রধান গ্রামে ধর্মের মন্দিরে ডোম জাতির আর ততটা আধিপত্য নেই, সেখানে ধর্মঠাকুর নারায়ণ হয়ে ব্রাহ্মণের দ্বারা ভোগরাগ লাভ করছেন। কিন্তু দু-এক শতাব্দী পূর্বে ধর্মঠাকুর যে নিম্নবর্ণের সমাজে পূজিত হতেন, এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজে তিনি প্রবেশাধিকার পাননি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ধর্মের মন্দির, পীঠস্থানে বা গাছতলায় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমার মধ্যে যে-কোন বারোদিন খুব ঘটা করে দেবতার বার্ষিক পূজা হয়, এ ছাড়া নিত্যপূজা তো আছেই। যারা মানত করে অভীষ্ট ফল পায়, তারা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা দেয়, ছাগ বলি দেয়, অপুত্রক রমণীরা সন্তান লাভের জন্য দেবতার মন্দিরে ধর্ণা দেয়—আরও অনেক অদ্ভুত ব্রতকৃত্য অনুষ্ঠান করে। এই প্রসঙ্গে ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত রামাই (রমাই) পণ্ডিতের ছড়া আবৃত্তি করা হয়, এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যও পড়া হয়। তাতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ—সকলেই যোগ দিয়ে থাকে। পুত্রলাভের জন্য মেয়েরা সমবেত হয়, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তেরাও অনেক দূর-দূরান্তর থেকে উৎসবে যোগ দিতে আসে। লোকজীবনের মধ্যে ধর্মঠাকুরের প্রভাব এখনও বেশ বজায় আছে, যদিও এতে ব্রাহ্মণদের প্রধান্য ও পৌরাণিক দেববাদের আভাস সহজেই চোখে পড়বে। যাই হোক ধর্মঠাকুরের পূজা-উপাসনায় প্রাচীন

গ্রামীণ সংস্কার (অর্থাৎ প্রাগার্য আদিম সংস্কার) এখনও অনেকটা বজায় আছে —তা এই দেবতার স্বরূপ ও পূজাপদ্ধতি এবং এঁর ভক্তসম্প্রদায়ের পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। এখন সংক্ষেপে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সম্পর্কে দু' এক কথা বলা যাক।

সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে দুটি কাহিনী দেখা যায়—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং (২) লাউসেনের গল্প। এর মধ্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনীই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্যান্য দু' একখানি 'ধর্ম'-সাহিত্যে শুধু হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে, লাউসেনের কোন উল্লেখই নেই। কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মের কৃপায় হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের কাহিনীটিই অধিকতর প্রাচীন, ঐতরেয় আরণ্যকের বিশ্বামিত্র-শুনঃশেফের যে গল্পই আছে, ধর্মসাহিত্যের হরিশ্চন্দ্রের গল্প প্রায় সেইরকম। আমাদের মনে হয়, হরিশ্চন্দ্রের গল্পটিই ধর্মমঙ্গলের মূল এবং আদিম গল্প। তারপর রাঢ়ের ইতিহাসের ছিটেফোঁটা নিয়ে লাউসেনের বীরত্বের গল্প গড়ে উঠেছে। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র (কোন কোন পুঁথিতে হরিচন্দ্র) তাঁর রাণী মদনা—এঁরা নিঃসন্তান বলে লোকে তাঁদের গাল দেয়। মনের দুঃখে স্বামী-স্ত্রীতে ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ভক্তেরা ধর্মের পূজা করছে। তাঁরাও ধর্মের উপাসনা আরম্ভ করলেন, এবং ধর্মের কাছে পুত্রলাভের বর পেলেন। অবশ্য কথা রইল, পুত্রটি জন্মাবার পর যথাকালে তাকে ধর্মের কাছে বলি দিতে হবে। অপুত্রক রাজা তাতেই রাজী হলেন। তবু তো সন্তানের মুখ দেখতে পাবেন। এদিকে পুত্র জন্মাল, বড়ো হল। তার নাম রাখা হল লুইচন্দ্র (বা লুইধর)। কালক্রমে রাজা-রাণী প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেন। তারপর একদিন ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে একাদশীর পারণ করবার জন্য রাজপুত্র লুইচন্দ্রের মাংস আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা-রাণী লুইচন্দ্রকে কেটে ফেলে নির্মম ব্রাহ্মণের জন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন। তখন ধর্ম নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজা-রাণীর প্রতিজ্ঞারক্ষণের অদ্ভুত নিষ্ঠাকে প্রশংসা করলেন এবং লুইচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। বাস্তবিক রাজা-রাণী লুইচন্দ্রকে কাটেননি, তাঁদের পরীক্ষার জন্য ধর্ম লুইকে নিজের কোলে রেখেছিলেন। লুইচন্দ্র 'মা'-'মা' বলে রাণীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতঃপর রাজা মহাসমারোহে ধর্মের পূজাদির আয়োজন করলেন। ধর্মপূজার এই কাহিনীটি অতি পুরাতন।

ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনী অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি, কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে সমধিক উল্লেখযোগ্য। বলতে গেলে এই দ্বিতীয় কাহিনীই যথার্থ ধর্মমঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত। ধর্মের সেবক বীর লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। কাহিনীটির সঙ্গে রাঢ়-ভূমির পালযুগের ইতিহাসের ক্ষীণ সম্পর্ক আছে, স্থানীয় গ্রামজনপদ-নদনদীরও উল্লেখ আছে। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটি পৌরাণিক ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, লাউসেনের কাহিনী ঐতিহাসিক ও লৌকিক আখ্যানকে অবলম্বন করেছে। লাউসেন হচ্ছেন রাজা কর্ণসেন ও রাণী রঞ্জাবতীর একমাত্র পুত্র। কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত। ইছাই ঘোষ বলে আর-এক দুর্দান্ত সামন্তের আক্রমণে কর্ণসেনের ছয় ছেলে মারা যায়, তিনি কাতর হয়ে পড়েন। তখন গৌড়েশ্বর তাঁর প্রিয় সামন্তকে পুনরায় গৃহবাসী করবার জন্য নিজ অনূঢ়া শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিয়ে দিলেন। রঞ্জার ভাই, গৌড়েশ্বরের শ্যালক—তার নাম মহামদ বা মাহুদ্যা। সে এই খবর পেয়ে বৃদ্ধ ভগিনীপতির ওপর খুব চটে গেল এবং আঁটকুড়ো বলে উপহাস করতে লাগল। অভিমানে রঞ্জা ধর্মঠাকুরের কাছে নিদারুণ কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করল, শালে ভর দিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে প্রাণত্যাগে উদ্যত হল। অবশেষে ধর্ম আবির্ভূত হয়ে তাকে পুত্র বর দিলেন, যথাকালে রঞ্জাবতী সর্বগুণান্বিত এক পুত্র লাভ করল। তার নাম লাউসেন। মাহুদ্যা এ খবর পেয়ে আরও চটে গেল, এবং ভাগিনাকে শিশুকালেই বিনাশ করবার জন্য নানা চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় লাউসেন প্রতিবারই রক্ষা পেল। ক্রমে লাউসেন যুবক হল, অসাধারণ বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হল। পথের মধ্যে ভয়ানক জন্তু-জানোয়ার মেরে সে বীরত্বের খ্যাতি দৃঢ়তর করল, এবং ব্যাপিকা রমণীদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে নৈতিক চরিত্রবলেরও পরিচয় দিল। মাহুদ্যার কুপরামর্শে গৌড়েশ্বর তাকে নানাবিধ দুরূহ দুঃসাধ্য কর্মে পাঠালেন; যে সমস্ত কাজ তিনিও করতে পারেননি, নবযুবক লাউসেন অবলীলাক্রমে তা করল, প্রতিবেশী রাজাদের হারিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলল। এইসব ব্যাপারে মাহুদ্যা জলে-পুড়ে মরতে লাগল। লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে সে লাউসেনের রাজ্য আক্রমণ করতে গিয়ে ভাগিনা-বধূর দ্বারা ভালোমতো আপ্যায়িত হয়ে বেত্রাহত কুকুরের মতো পালিয়ে গেল। লাউসেনের কোনরকম

ক্ষতি করতে না পেরে মাহুদ্যা এক মারাত্মক চাল দিল। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর অনেক সময় দুর্বৃত্ত শ্যালকের কথা মতোই চলতেন। মাহুদ্যা গৌড়েশ্বরকে বলল, লাউসেন যদি ধর্মের বরে অসাধ্য সাধন করে থাকে, পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাক না। ধর্মের কৃপায় সেই অদ্ভুত ব্যাপারও সম্ভব হল। চারিদিকে লাউ-সেনের জয়জয়কার পড়ে গেল আর দুষ্কর্মের প্রতিফলস্বরূপ মাহুদ্যার কুষ্ঠব্যাধি হল। অবশ্য লাউসেনের দয়ায় এবং ধর্মের নিকট লাউসেনের অনুরোধে সে রোগমুক্ত হল। ধর্মের মহিমা ঘোষণার পর লাউসেন পরম গৌরবে রাজত্ব করতে লাগল, তার পরে কাল পূর্ণ হলে সে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য দিয়ে স্বর্গযাত্রা করল।

উল্লিখিত গল্পটিতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সংকেত আছে; মনে হয় পালযুগে ধর্মপালের পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ঘটনার একটু-আধটু প্রভাব এই কাহিনীতে থাকতে পারে। ঢেকুরগড়ের দুর্দান্ত সামন্ত ইছাই ঘোষ হয়তো ইতিহাসের ঢেক্করীবিষয়ের ঈশ্বর ঘোষ হতে পারেন। কিন্তু এসব বিষয়ে অনেক মতান্তর দেখা দিয়েছে। ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত দু' একটি ব্যক্তি বা স্থানের নাম ইতিহাসে পাওয়া গেছে। অবশ্য ইতিহাসের কালের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের কালের ও অন্যান্য ব্যাপারের বিশেষ সঙ্গতি নেই। মনে হয় কল্পনার কাহিনীতে ইতিহাসের ঈষৎ রং ধরেছে মাত্র। এর কতটুকু প্রকৃত ইতিহাস, আর কতটুকু স্থানীয় গল্পকাহিনী, তার পরিমাণ নির্দেশ সহজ নয়। কিন্তু এর ঐতিহাসিক দাবি মানি আর নাই মানি, কাব্যটিতে যে বাস্তব জীবনচিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী, যুদ্ধবিগ্রহের জীবন্ত বর্ণনা এবং রাঢ় দেশের পুরাতন যুগের জীবন-আলেখ্য আছে তা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের পট-ভূমিকা আদ্যন্ত কাল্পনিক, সুর পৌরাণিক। ধর্মমঙ্গলের পটভূমিকা বাস্তব, সুর অনেকটা ইতিহাস-ঘেঁষা। কাব্যটি বাস্তবিক মহাকাব্যের মতো বিপুলকায়। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যই থেকে গেছে, মহাকাব্যের কোঠায় উঠতে পারেনি। এই শ্রেণীর সাহিত্যে একজনও উপযুক্ত প্রতিভাধর কবি আসেননি বলে এই বিশাল আকারের কাব্য নানা বিচিত্র বর্ণনা ও চরিত্রে পূর্ণ হলেও কোন দিক দিয়েই পাঁচালীর স্তর ছাড়িয়ে মহাকাব্যের বিশাল প্রান্তরে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। যাঁরা ধর্মমঙ্গল কাব্যকে বাংলার "জাতীয় মহাকাব্য" (National Epic) বলতে চান আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কারণ

লাউসেনের 'কেরামতে'র কাহিনী য়ুরোপের মধ্যযুগের ব্যালাডের মতো। তাতে গোটা জাতির আত্মবোধ ফুটে ওঠে না, কাজেই তা 'জাতীয়' নয়। আর তা ছাড়া এর কাব্যলক্ষণ বহুস্থলে অতিবিলম্বিত, বিরক্তিকর ও পর্যুসিত পৌনঃপুনিকতায় শ্রীভ্রষ্ট। সুতরাং ধর্মমঙ্গলকে মহাকাব্য বললে মহাকাব্যের জাতিনাশ হবে। এবার ধর্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবি এবং ধর্মঠাকুরের মাহিমাবিষয়ক কয়েকটি রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

ধর্মপূজাবিধান ॥ ধর্মপূজার আদিপুরোহিত বলে প্রচারিত রামাই (রমাই) পণ্ডিতের নামে ধর্মপূজার নিয়মকানুন-সংক্রান্ত কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেছে। রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজকের নিকট ধর্মের অবতার বলে অতিশয় সম্মানিত। তাঁর কথা আমরা পরের অনুচ্ছেদে 'শূন্যপুরাণে'র আলোচনায় বলেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, রামাই পণ্ডিত ঠিক কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন তা নিয়ে বিষম গণ্ডগোল থাকলেও এই নামে যে একজন ডোম পণ্ডিত সর্বপ্রথম ধর্মপূজা প্রচার করেছিলেন, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। ধর্মপূজা ও ব্রত সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত যে ছড়াগুলি পাওয়া গেছে তা সাধারণতঃ 'সংজাত খণ্ড' নামে পরিচিত। এতে বোধ হয় পূর্বে ধর্মঠাকুরের শোভাযাত্রা বা বিজয় বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এগুলিকে যে আকারে পাওয়া গেছে, তাতে এদের মন্ত্রলক্ষণ বেশী প্রকাশ পেয়েছে। স্বর্গীয় ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ধরনের কিছু কিছু মন্ত্রতন্ত্র ও ছড়া-ব্রতকথা সংগ্রহ করে 'ধর্মপূজাবিধান' নাম দিয়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে ধর্মপূজা-সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে আছে আর একটি বিচিত্র ব্যাপার। এর নাম 'কলিমা জালাল'। এটি মুসলমানের প্রভাব; ধর্মঠাকুরের উপাসকদের দলে মুসলমানদেরও যে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল এই ছড়াটি তার প্রমাণ। নিরাকার শূন্যরূপী ধর্মঠাকুরকে মূর্তিপূজাবিরোধী মুসলমানের পক্ষে উপাসনা করা সহজ হয়েছিল। এতে আবার শিবের কৃষিকর্মেরও বর্ণনা আছে। সুতরাং কৃষিজীবী নিম্নবর্ণের সমাজে ধর্মঠাকুরের যে বিশেষ প্রভাব ছিল তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য সাহিত্যের দিক দিয়ে এই ছড়াগুলি উল্লেখযোগ্য নয়—তবে ধর্মঠাকুর ও 'ধর্ম' সম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা ও আচার-বিচার-সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান ইঙ্গিত এই সমস্ত ছড়া থেকে পাওয়া যায়।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ প্রভৃতি ॥ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন। তার পর থেকে এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে—রামাই পণ্ডিতের গোত্রকুল, আবির্ভাব-সময় প্রভৃতি নিয়েও কম জল্পনাকল্পনা হয়নি। জনশ্রুতি মতে তিনিই মর্ত্যধামে ধর্মপূজা প্রচার করেন, কারও মতে তিনি স্বয়ং ধর্মের অবতার। কেউ কেউ তাঁর ঐতিহাসিক ও বাস্তব পরিচয়ও উদ্ধার করেছেন। এবিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা মুস্কিল, কারণ জনশ্রুতি ছাড়া প্রামাণিক তথ্যের অভাব। তবে এই নামে ধর্মের উপাসক ও প্রচারক এক ডোমপণ্ডিত বর্তমান ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিরা রামাইকে ধর্মপূজার আদিপ্রবর্তক বলে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণকুমার, কিন্তু বাল্যকালে মাতাপিতৃহীন হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কেই-বা তাঁকে যজ্ঞোপবীত দেবে? তাই যথাকালে ব্রাহ্মণকুমারের চূড়াকরণ হতে পারল না দেখে স্বয়ং ধর্মঠাকুর এসে তাঁকে তাম্রদীক্ষা দিলেন, অর্থাৎ তামার তাগা পরিয়ে দিলেন। এই হল তাঁর তামার পৈতে, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। তারপর থেকে ধর্মের পুরোহিতেরা সকলেই তাম্রধারণ করে থাকেন। অতঃপর রামাই বল্লুকানদীর তীরে গিয়ে ধর্মের তপস্যা করতে লাগলেন। তিনি ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন কিন্তু সংসারাদি করলেন না। তাঁর পর কে ধর্মপূজা করবে? তখন ধর্মনিরঞ্জনের নির্দেশে অতি বৃদ্ধবয়সে রামাই দারপরিগ্রহ করলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম কেশবতী। ধর্মের পুষ্পার্ঘ্যাসিক্ত জল পান করে কেশবতী যথাকালে এক পুত্রের জন্ম দিলেন। রামাই পুত্রের নাম রাখলেন ধর্মদাস। ধর্মদাস বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পিতার নির্দেশে নানাস্থানে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। একদিন দুষ্ট কলির প্ররোচনায় তিনি কিছু অনাচার করে ফেলেন। তা জানতে পেরে রামাই পুত্রকে অভিশাপ দিলেন, "হইবি ডোমের পুরোহিত"। এ কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে, রামাইয়ের পুত্র থেকেই ধর্মপূজকগণ ডোমের পুরোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামাই ছিলেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুমার, যদিও চূড়াকরণের বদলে তাঁর তাম্রদীক্ষা হয়েছিল। যাই হোক পুত্র পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে খুব দুঃখ করতে লাগলেন। রামাই পণ্ডিত পুত্রকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এর জন্য কোন চিন্তার কারণ নেই। ডোমের পুরোহিত হলেও ধর্মদাস ও তাঁর সন্তানসন্ততি সমাজে ব্রাহ্মণের মতোই শ্রদ্ধা পাবে। এরপর ধর্মদাস রাজা রণজিত ও তাঁর সভার ঋষিদের ধর্মঠাকুরের বিরোধিতার জন্য খুব নাকাল

করলেন। তারপর এ'রা আর্ত হয়ে ধর্মের পূজা করে বিপদ থেকে মুক্ত হলেন, ধর্মঠাকুরের বরে রাজার যথাকালে একটি পুত্রসন্তান হল। ক্রমে ধর্মদাসের বংশ বৃদ্ধি পেল, অনেক সন্তান হল। কাজেই ধর্মের উপাসক ডোম জাতির পুরোহিতের অভাব ঘুচে গেল। এখনও রাঢ়দেশে 'পণ্ডিত' (গ্রাম্য উচ্চারণে পাঁড়িত) উপাধিধারী ডোমের ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁরা ধর্মপূজায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন। যাই হোক এ সমস্ত গল্প যে নিতান্তই গল্প তা সকলেই বুঝতে পারবেন। এর পিছনের সমস্ত ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র—যদিও বাংলার কোন কোন বিখ্যাত গবেষক সেরকম ব্যর্থশ্রম প্রচুর করেছেন। কিন্তু রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

রামাইয়ের ভণিতাযুক্ত ও প্রসঙ্গ নিয়ে দু'খানা পুঁথি পাওয়া গেছে, (১) শূন্য-পুরাণ, (২) অনাদ্যের পুঁথি।* শূন্যপুরাণের প্রকৃত নাম 'আগমপুরাণ' বা 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি'। কিন্তু এতে নানাস্থানে 'শূন্যের' উল্লেখ আছে বলে সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু একে 'শূন্যপুরাণ' বলে অভিহিত করেছেন। এর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত 'আগম পুরাণ'। কারণ এর ভণিতায় রামাই 'আগম পুরাণ'ই বলেছেন। শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় চললেও এতে নানাজনের হস্তক্ষেপ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের গাজনে যে সব ছড়া ব্যবহৃত হত, এতে সেগুলি এবং আরও নানা আনুষঙ্গিক ব্যাপার সংগৃহীত হয়েছে। ধর্ম-নিরঞ্জন কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি উৎপত্তিপর্ব এবং ধর্মপূজার ব্রত, উপাসনা, ভোগরাগ রন্ধন, পূজাবিধি বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য এতে সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। এও কতকটা 'ধর্মপূজাবিধানে'র মতো। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ধর্মমঙ্গলের সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখ আছে। একস্থানে শিবের কৃষি-কার্যের বর্ণনাও আছে। এতে মনে হয় একদা ধর্মঠাকুর ও কৃষক শিবঠাকুর প্রায় এক হয়ে গিয়েছিলেন। এর আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' (অর্থাৎ উষ্মা) শীর্ষক কতকগুলি অদ্ভুত ছড়া। এই ছড়া কোন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যেও পুনরুল্লিখিত হয়েছে। সদ্ধর্মীদের (বৌদ্ধ) ওপর যাজপুরের (উড়িষ্যা) বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করতে থাকলে ধর্মের উপাসকগণ ধর্মঠাকুরের কাছে আর্তস্বরে নিবারণের প্রার্থনা জানাতে লাগল। তখন ধর্মঠাকুর বৈদিক ব্রাহ্মণদের শাস্তি দিয়ে ধর্মের উপাসকদের রক্ষার জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন।

* অবশ্য 'অনাদ্যের পুঁথি'তে কোন কবির নাম নেই। এটি রামাইয়ের রচনা নয়।

সঙ্গে এলেন স্বর্গের দেবদেবীরা। তবে তাঁরা এলেন মুসলমানের ছদ্মবেশে। এঁরা জাজপুরে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদের জেহাদের ধ্বনি করতে করতে বৈদিক ব্রাহ্মণদের উচিত শাস্তি দিয়ে সদ্ধর্মীদের রক্ষা করলেন। এই ছড়াটি কাব্যাদর্শে নিকৃষ্ট হলেও একযুগের বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এর বিশেষ দাম আছে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দু একসময়ে বোধ হয় ধর্মের দলকে (বৌদ্ধ সংস্পর্শজনিত) খুব নিগ্রহ করতেন। ইতিমধ্যে বাংলায় মুসলমান অভিযান সুরু হল এবং হিন্দুর ওপরে মুসলমানের অত্যাচার চলতে লাগল। এতে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ধর্মের দল মনে মনে খুব পুলকিত হয়েছিল। তারা মনে করেছিল স্বয়ং ধর্মরাজ ও অন্যান্য দেবদেবী তাদের রক্ষার জন্য মুসলমানের ছদ্মবেশে এসে হিন্দুদের উৎপীড়িত করছেন। হিন্দু, মুসলমান ও ধর্মের (বৌদ্ধ ?) দলের পারস্পরিক বিরোধের সম্পর্কটি দূর ঐতিহাসিক স্মৃতিবহ ইঙ্গিতের সাহায্যে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় বর্ণিত হয়েছে।

শূন্যপুরাণের দু'এক স্থলে গদ্যের সুর আছে। এইজন্য কেউ কেউ শূন্য পুরাণে উল্লিখিত গদ্যকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত বলে খুব পুলকিত হয়ে থাকেন। প্রথমত ঐ পংক্তিগুলি গদ্য নয়, ভাঙা পয়ার মাত্র। অশিক্ষিত লিপিকারের হাতে পড়ে ছড়ার পয়ার পংক্তির ঐ রকম হাড়ির হাল হয়েছে—যা গদ্য বলে ভ্রম হয়। দ্বিতীয়তঃ, শূন্যপুরাণের ভাষায় দু'চারটি পুরাতন ও আঞ্চলিক শব্দ থাকলেও একে কিছুতেই প্রাচীন গ্রন্থ বলা যায় না। যাঁরা একে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পুরাতন বলেন, ভাষাতত্ত্বের বিচারে তাঁদের সিদ্ধান্ত অলীক প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা একে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলেন, তাঁদের অভিমতও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। ভাষার বাইরের গড়ন দেখে একে অতি অর্বাচীন কালের রচনা বলে মনে হয়—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হওয়াও অসম্ভব নয়। আর তা ছাড়া এর বিশেষ কোন নির্ধারিত কাল স্থির করা যায় না। কারণ কোন-একজন ব্যক্তি কোন-এক বিশেষ সনে-শকাব্দে এ ছড়া রচনা করেননি। 'ধর্ম' সম্প্রদায়ের মুখে-মুখে ছড়াগুলি চলত, পরে এক বা একাধিক ধর্মসেবক এগুলিকে পুঁথি আকারে সঙ্কলিত করেন। ভাষাবিন্যাস বা শব্দযোজনা প্রাচীন নয়—আপাততঃ শুধু এইটুকু বলা যায়। 'ধর্ম'সম্প্রদায় ও ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে এতে অনেক মূল্যবান তথ্য থাকলেও সাহিত্যের দিক থেকে এর বিশেষ কোন দাম নেই।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি পুঁথির কথা সেরে ফেলা যাক। বিশ্বভারতী

গবেষণাকেন্দ্র থেকে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের সম্পাদনায় কিছুকাল পূর্বে 'অনাদ্যের পুঁথি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এরও কোন নাম পাওয়া যায়নি, 'অনাদ্যের পুঁথি' নামটি সম্পাদক প্রদত্ত। এতে রামাই পণ্ডিতের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের জন্য পুঁথিটি উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে ডঃ মণ্ডল এটি সম্পাদনা করেছেন। ভাষা দেখে মনে হচ্ছে, রচনাটি ঐ একই সময়ের হবে—খুব পুরাতন নয়। এর কবিরও কোন নাম পাওয়া যায় না, তবে রচনাকার রাঢ় অঞ্চলের লোক বলে মনে হচ্ছে, কারণ এতে অনেক 'রেঢ়ো বুলি' আছে। পুঁথিটিতে রামাইয়ের গল্পটি বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে রামাইয়ের ছেলের নাম শ্রীধর, কিন্তু অন্যত্র তাঁর নাম ধর্মদাস। সে যাই হোক শ্রীধর গৌড়ে যবনরাজার দেশে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করতে গেলে মুসলমান নবাব তাঁকে তাঁর সঙ্গীসাথীদের কয়েকজনকে মেরে ফেলেন। রামাই কাতর হয়ে পড়লে স্বয়ং ধর্ম আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বর দিলেন যে, রামাইয়ের পুত্র ও তার দলবল ধর্মের বরে বেঁচে উঠবে, গৌড়ের যবনরাজ কুকর্মের জন্য উচিত শাস্তি পাবে। তখন রামাই নানা সঙ্গীসাথী জুটিয়ে চললেন যবনরাজ্যে, পথে তিনি অসীম বীরত্বের সঙ্গে হিংস্র বন্য পশুকে মেরে ফেললেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইখানে পুঁথি খণ্ডিত হয়েছে। এর পর নাটকীয় ঘটনাটি কোন্ পথে অগ্রসর হয়েছিল তা অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে। রামাই সদলবলে যবনরাজাকে পর্যুদস্ত করবেন, পাপী রাজা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে সকাতরে রামাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইবেন, ধর্মের কৃপায় রামাইয়ের পুত্র ও অন্যান্য ধর্মসেবক বেঁচে উঠবেন, শেষে অনুতপ্ত যবনরাজা ধর্মের উপাসনা করে রোগমুক্ত হবেন—কাহিনীর শেষ বোধ হয় কতটা এই ধরনের ছিল। রামাই পণ্ডিতের কাহিনী যে ধর্মপূজকদের সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কতটুকু ঐতিহাসিক, আর কতটুকু গল্প—তা নির্ধারণ করা দুরূহ। মুসলমান রাজার সঙ্গে ধর্মের চেলাদের বিরোধ বাধার কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত বোধ হয় এই পুঁথিটিতে প্রচ্ছন্নাবস্থায় আছে; কিন্তু তার ঐতিহাসিক তথ্যাদি উদ্ধার করা অসম্ভব। পুঁথিটিতে রামাই পণ্ডিত-সংক্রান্ত একটা নতুন কাহিনী আছে বলে এখানে এর উল্লেখ করা হল। এবার সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

ময়ূরভট্ট ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ময়ূরভট্টের রচিত বলে 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামে একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের মতে এই ময়ূরভট্টই হচ্ছেন সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিতম কবি। সুতরাং তাঁর 'শ্রীধর্মপুরাণ'ই প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল কাব্য। সম্পাদক মনে করেন, ময়ূরভট্ট একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি, তাঁর কাব্যও সেই সময়কার রচনা। অবশ্য প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্টের উল্লেখ আছে। সুতরাং মনে হয় ময়ূরভট্ট নামে ধর্মমঙ্গলের কোন পুরাতন কবি ছিলেন। সংস্কৃতে রচিত 'সূর্যশতকে'র কবির নামও ময়ূরভট্ট। এই কাব্যের টীকায় ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে নানা গালগল্প আছে। তবে এঁর সঙ্গে বাংলার ময়ূরভট্টের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না। ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব কুলপঞ্জিকা ও অন্যান্য তথ্য থেকে প্রমাণ করেছেন ময়ূরভট্ট সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কুলপঞ্জিকাদি বংশপরিচয়-সংক্রান্ত পুঁথিপত্রের প্রমাণ খুবই সন্দেহজনক। তাই সম্পাদক বসন্তকুমার ও ডঃ শহীদুল্লাহের মত সংশয়াতীত নয়। উপরন্তু ময়ূরভট্টের কোন প্রামাণিক পুঁথি পাওয়া যায়নি। বসন্তবাবু বলেছেন, তিনি ময়ূরভট্টের কোন পুঁথি দেখেননি। ভূতনাথ পণ্ডিত নামে ধর্মের এক আধুনিক পূজারীর নিকট নাকি এই পুঁথি ছিল। কিন্তু তিনি কোন কারণবশতঃ সে পুঁথি বসন্তবাবুকে দেখাননি, আজ-কালকার খাতায় টোকা কাহিনী দিয়ে তিনি বসন্তবাবুকে বলেন যে, এই হচ্ছে সেই পুঁথির যথার্থ নকল। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর কাছে ময়ূরভট্টের মূল কাব্য আছে, তবে সেটি সংস্কৃতে রচিত। বোধহয় ময়ূরভট্টই সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংস্কৃত গ্রন্থের একখানা অনুবাদও করেছিলেন। বসন্তবাবু ভূতনাথ পণ্ডিতের কাছ থেকে সেই অনুবাদের নকল পেয়ে মহানন্দে তাই 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামে ছাপিয়ে দেন, এবং কবিকে ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন ও আদিকবি বলে প্রচার করেন। কিন্তু ছাপা গ্রন্থটির ভাষা এত আধুনিক যে, অনেকেরই এতে সন্দেহ হয়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বহু অনুসন্ধান করে শ্রীধর্মপুরাণের আধুনিক ময়ূরভট্ট ভূতনাথ পণ্ডিতের কারসাজি ধরে ফেলেন। তাঁর মতে উক্ত শ্রীধর্মপুরাণ কোন প্রাচীন কাব্য নয়, আধুনিক কালের স্বল্পশিক্ষিত ডোমপণ্ডিত (হুগলী জেলার অধিবাসী) ভূতনাথ পণ্ডিতের রচনা। এই অর্বাচীন গ্রন্থকে অতিপ্রাচীন প্রমাণ করার জন্য বাংলা সাহিত্যের অনেক পাকামাথা স্বর্গমর্ত্য আলোড়িত করেছিলেন। কিন্তু এখন এর প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে আমাদের আর কোন মোহ

নেই। বাংলা সাহিত্যে পর্ণথি নিয়ে এই রকম ভেল্কি খেলা একাধিক বার হয়েছে। ইতিপূর্বে চৈতন্যজীবনীকাব্য প্রসঙ্গে আমরা এই রকম একটি বৃহৎ 'ফাক্কিকা'র কথা ('গোবিন্দদাসের কড়চা') বলেছি। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এই তথাকথিত ময়ূরভট্টের কাব্য সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করেছেন। ছাপা বইটির সঙ্গে নাকি অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যের কাব্যের বহু স্থলে হুবহু মিল আছে। শুধু ভণিতার রামচন্দ্রের জায়গায় ময়ূরভট্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীহস্তের কারসাজি বোধ হয়। অতঃপর ভৌতিক ময়ূরভট্টের প্রসঙ্গে যবনিকা পড়া উচিত। এর ভাষাও একেবারে হাল আমলের মতো। সুতরাং এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন যুক্তিই ধোপে টি'কবে না। এতে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং তাঁর পুত্র ধর্মদাসের আখ্যান-প্রসঙ্গে ধর্মের মহিমা ও পূজা প্রচার বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক তথাকথিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ আমাদের কাছে জালগ্রন্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে এখানে এর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না।

রূপরাম চক্রবর্তী ॥ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। অন্ততঃ বিশজন ছোট-বড়ো-মাঝারি কবি ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু কারও মধ্যে মৌলিক প্রতিভার বড়ো একটা চিহ্ন পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল-কবিদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর খানিকটা প্রতিভা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরামও রচনাবৈচিত্র্যের জন্য কিছু প্রশংসা দাবি করতে পারেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোট চারজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন যাঁদের কিঞ্চিৎ রচনাশক্তি ছিল। এ'রা হলেন রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস এবং যদুনাথ রায়। এ'দের মধ্যে রূপরাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলে তাঁর কথা দিয়েই আমরা শুরু করি।

রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য বেশীর ভাগ পর্ণথিতে 'অনাদ্যমঙ্গল' নামে উল্লিখিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মকে কোথাও কোথাও অনাদ্য, অনাদি ও নিরঞ্জন বলা হয়েছে। সেই সূত্রে কবি রূপরাম তাঁর কাব্যকে 'অনাদ্যমঙ্গল' বলেছেন। আমরা আলোচনার সমতা রাখবার জন্য তাঁর কাব্যকে ধর্মমঙ্গলই বলব। কিছুকাল পূর্বে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় রূপরামের কাব্যের কিয়দংশ প্রকাশ করে কবির আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে দুঃখের বিষয় ডঃ সেন সমগ্র কাব্য প্রকাশ করেননি, শুধু লাউসেনের জন্ম থেকে আখড়ায় মল্লবিদ্যা শিক্ষা পর্যন্ত,

মূল কাব্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রকাশ করেছেন। বইটির একাধিক সংস্করণ হয়েছে—কিন্তু গোটা কাব্যের পুরো আকার দর্শন এখনও বহু সময়সাপেক্ষ। যাই হোক ডঃ সেন যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তার থেকেই রূপরাম সম্বন্ধে মোটা-মুটি ধারণা করা যায়। কবির কোন কোন পুঁথিতে কাব্যরচনাকালের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে প্রহেলিকা থেকে সন-তারিখ খুঁজে বার করা শুভঙ্করেরও সাধ্যাতীত। কোন কোন পুঁথিতে শাহ্‌সুজার উল্লেখ আছে। সুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। এ উল্লেখ ঠিক হলে রূপরামের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রহেলিকার ধরনের লেখা পয়ার থেকে ১৬০৪-১৬০৫, কেউ ১৬৪৯, কেউ ১৬৫০, কেউ ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। সুতরাং পুঁথিতে উল্লিখিত ইঙ্গিত থেকে প্রকৃত সন-শকাব্দ নির্ধারণ করা অতি দুরূহ। অন্য প্রমাণাভাবে আমরা রূপরামের কাব্যকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা বলে ধরে নিতে পারি। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। মাণিক গাঙ্গুলির (অষ্টাদশ শতাব্দী) ধর্মমঙ্গলে আদিরূপরাম বলে আর এক কবির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এতে কেউ কেউ মনে করেন যে, দু'জন রূপরাম ছিলেন—একজন আদিরূপরাম আর একজন শুধু রূপরাম। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে কিছু বলা যায় না। আরও পুঁথির প্রমাণ না পেলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করা যাবে না।

রূপরাম বোধহয় ধর্মমঙ্গলের প্রথম কবি যিনি লাউসেনের কাহিনীকে ছড়া-পাঁচালী ও ব্রতকথার সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলকাব্যের আকার দিয়েছেন। তাঁর আগে হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীটি ধর্মঠাকুরের সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। রূপরাম মূল কাহিনীটিকে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন—অবশ্য তাঁর কাব্যের পুরো পালা প্রায়ই পাওয়া যায় না, ছাপাও হয়েছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এর থেকে তাঁর কবিপ্রতিভার সবটা জানা না গেলেও তিনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন, তা স্বীকার করতে হবে। চরিত্র-চিত্রণ, বর্ণনাভঙ্গিমা, আত্মকথাপ্রসঙ্গে বাস্তব-চিত্রাঙ্কন-কুশলতা এবং ভাষা ও রচনারীতি বিচার করলে তাঁকে প্রশংসাই করতে হবে। ধর্মমঙ্গলের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ঘনরাম রচনাচাতুর্যে অধিকতর খ্যাতি লাভ করলেও সৃষ্টিশক্তিতে রূপরামের প্রতিভা অনেক বেশী সার্থক। বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি-শ্রীরামপুরে পণ্ডিত বংশে তাঁর

জন্ম হয়। তাঁর পিতা-ভ্রাতারাও বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালে কবি লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না বলে জ্যেষ্ঠের দ্বারা সর্বদা তর্জিত হতেন। কাব্যের প্রারম্ভে কবি অতি মনোরম ভঙ্গীতে নিজের কথা বলেছেন। তাতে বালকের সারল্য অতি চমৎকার ফুটেছে। একদা তিনি বাঘ দেখে পুকুরপাড়ে বিপদে পড়লে স্বয়ং ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়ে কিশোর-কবিকে তাঁর মহিমাবিষয়ক ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে আদেশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কবি কাব্য রচনা করে গানের দলে যোগ দিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে ধর্মের গানও গাইতেন। তাঁর রচনা-ভঙ্গিমা যে প্রশংসার যোগ্য তা আমরা আগেই বলেছি। কোন কোন সময়ে তাঁকে প্রায় মুকুন্দরামের মতো প্রতিভাশালী মনে হয়, বিশেষত করুণরস ও হাস্য-পরিহাসে তিনি মুকুন্দরামের সমকক্ষ। তাঁর প্রতিভা ছিল বলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবিরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন। গোটা কাব্য মুদ্রিত হলে কবির প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা যাবে।

রামদাস আদক॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত এই কবি গতানুগতিক পথে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে রামদাসের 'অনাদিমঙ্গল' সম্পাদনা করেছিলেন। অবশ্য বসন্তকুমার রামদাস আদকের বংশধরদের মুখ থেকে শুনে কাব্যের অধিকাংশ লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদিত কাব্যের মূল কিন্তু কোন পুঁথি নয়, লোকের মুখ থেকে শোনা পয়ার-ত্রিপদী। অবশ্য তিনি একখানি খাতাও উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক যুগের ধর্মের গায়কেরা ঐ খাতা থেকে গান গাইতেন। কাজেই রামদাস আদকের মুদ্রিত 'অনাদিমঙ্গল' সর্বাংশে প্রাচীন কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়। কাব্যের প্রারম্ভে ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথামতো কবি আত্মকথা বর্ণনা করেছেন বেশ ফলাও করে। আরামবাগের নিকটে এক গ্রামে চাষীকৈবর্ত বংশে কবির জন্ম হয়। জমিদারের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে তিনি যখন মাতুলালয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে বিপন্ন কবির কাছে ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বললেন যে, তিনি হচ্ছেন ঝাড়গ্রামের ধর্মঠাকুর কালুরায়। কবিকে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে আদেশ করলেন। কিন্তু কবি যে মূর্খ। তখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর সমতুল্য ধর্মঠাকুর কবিকে কৃপা করলেন, দেবতার বরে মূর্খ তরুণ হলেন পণ্ডিত ও কবিপ্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে এক ব্রাহ্মণ-জমিদার তাঁর জমিদারী সেরেস্তায় কবিকে উচ্চপদ দিয়েছিলেন।

রামদাসের 'অনাদিমঙ্গলে'র কোন কোন পুঁথিতে যে সন-তারিখের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় কাব্যটি ১৫৮৪ শকে বা ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়েছিল। অবশ্য মুদ্রিত কাব্যটির কতটুকু পুঁথি থেকে নেওয়া হয়েছে, আর কতটুকু লোকের মুখ থেকে শুনে লিখে নেওয়া হয়েছে, সম্পাদক তা পরিষ্কার, করে বলেননি বলে কাব্যটির গুণ বিচার করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু কবির ভাষা অতি পরিচ্ছন্ন, ক্লাসিক ধরনের বাঁধুনি অতি চমৎকার। মাঝে মাঝে অলঙ্কার, শব্দযোজনা ও রূপনির্মিতি রীতিমতো বিস্ময়কর শ্রীসৌষ্ঠব লাভ করেছে, যা সমসাময়িক অনেকের কাব্যেই দুর্লভ। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর কাব্যটির প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উঁকি দেয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, রূপরামের কাব্যের সঙ্গে রামদাসের কাব্যের অনেক স্থলে গাঢ় রকমের মিল আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, রামদাস যেন রূপরামের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীও আত্মসাৎ করেছেন। রূপরামের দ্বারা রামদাস যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, স্থানে স্থানে তিনি অগ্রচারী কবিকে নকলও করেছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না; অধিকতর সুপ্রচারিত ও প্রতিভাশালী কবির দ্বারা রামদাস আদক যে স্বেচ্ছায় প্রভাবিত হয়েছিলেন এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। কারণ যেখানে তিনি অনুকরণ করেননি, সেখানে তাঁর মৌলিক প্রতিভার চিহ্ন দেখা যায়। নিজের ধর্মমতেও কবির মতামত ও অভিরুচি বিশেষ প্রশংসনীয়, ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অশিক্ষিত ও অনুন্নত কৃষকসমাজে বর্ধিত হয়েও কবি যে ধরনের রুচিজ্ঞান, পরিমাণবোধ ও সাত্ত্বিক বর্ণনা-ভঙ্গিমার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁকে বিশেষ প্রশংসা করতে হয়।

সীতারাম দাস ॥ ১০০৪ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ অব্দে সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর অষ্টাদশ শতকের অনেকগুলি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। তাতে কবির আত্মকাহিনীটুকু কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম—এই গ্রামে ধর্ম-ঠাকুরের মন্দির আজও প্রসিদ্ধ। সুখসাগর গ্রামে তাঁর নিজবাড়ী, পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। কবি প্রথমে ডোমের ঠাকুর ধর্মের পূজা করতে ও নাম প্রচার করতে কিছু সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। কারণ তখন উচ্চবর্ণের সমাজে ধর্মের ততটা প্রচার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নে ধর্মের প্রত্যাদেশ পেয়ে কবি সাহস করে ধর্মের মহিমাবিষয়ক কাব্য লিখলেন। এই কাব্যটি সমাপ্ত করতে

কবির মোট চল্লিশ দিন লেগেছিল। কবির আত্মকাহিনীটি বেশ সজীব বলে মনে হয়।

কাব্যারম্ভে কবি মাঝে মাঝে ময়ূরভট্টের নাম করেছেন। তাঁর মতে ময়ূরভট্ট প্রকৃতই ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে সেই কাব্যের কিছু কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা কবির এ মন্তব্য প্রমাণাভাবে মেনে নিতে অপারগ। বোধহয় তিনি জনশ্রুতিতে ময়ূরভট্টের নাম শুনেছিলেন, তাই রচনার মধ্যে পূর্ব-সূরীর দোহাই দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনী পরিচ্ছন্ন ও বিবৃতিমূলক, চরিত্রে বিশেষ কোন নূতনত্ব নেই। তাঁর অধিকাংশ পুঁথি কয়েকটি পালার সমষ্টিমাত্র—তাও আবার অর্ধশিক্ষিত ডোমপণ্ডিতের নকল। ফলে পুঁথিগুলি নানা ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ। যাই হোক তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য শুধু এই শ্রেণীর কাব্যের আর একখানির সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে মাত্র—এর বেশী এর আর কোন গৌরব প্রাপ্য নয়।

যদুনাথ (যাদবনাথ) ॥ কিছুকাল পূর্বে বিশ্বভারতী থেকে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় আর একখানি নতুন ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। কবির নাম যদুনাথ বা যাদবনাথ। মনে হয় ইনি হাওড়া জেলার লোক, কারণ পুঁথিটি হাওড়া জেলার একটি গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে। সৌভাগ্যের বিষয় পুঁথিটি অখণ্ডিত ও সম্পূর্ণ। কাব্যের মধ্যে কবি নিজের সম্বন্ধে যে যৎসামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে, শোভা সিং নামে এক বিদ্রোহী দুর্দান্ত জমিদার বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করে তাঁর কন্যার ওপর অত্যাচার করতে গিয়ে সেই রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ করে—এটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। কবি রাজা কৃষ্ণরামের সেই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেছেন, "সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার।" ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যদুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। অবশ্য নিজের কাব্যকে কবি সর্বত্র 'আগমপুরাণ' বলেছেন। কবি ধর্মঠাকুরের মহিমা লিখতে বসলেও বৈষ্ণব ও শাক্তমতের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। খুব সংযত ও মার্জিত ভাষায় রচিত 'আগমপুরাণে' কবি শুধু রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনী বলেছেন, লাউসেনের কোন উল্লেখ করেননি। ধর্ম-উপাসকেরা আগমপুরাণে শুধু হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী এবং কোন কোন সময়ে তার সঙ্গে রামাই পণ্ডিতের জীবনকথাও বলতেন। কিন্তু ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হত। যদুনাথের কাব্য ধর্মপুরাণ বা আগমপুরাণ—এ ঠিক

আসল ধর্মমঙ্গল কাব্য নয়। এতে কবি হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায়, এমন কি মুসলমান পীরফকিরের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কাহিনীতে হরিশ্চন্দ্রের প্রথম দিকে ধর্ম-বিরোধিতা, পরে শক্তির আরাধনা করে ধর্মের কৃপায় পুত্রলাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং তার পরের গল্প অন্যান্য ধর্মপুরাণ বা আগম-পুরাণের মতো। কাহিনীটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। রাণী মদনার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাও বেশ ফুটেছে। কবি তাঁতী বা যুগী—যে সম্প্রদায়ভুক্ত হন না কেন, এ কাব্যে পুরাণজ্ঞান ও সংযত রচনার ভালো পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ধর্মমতের দিক থেকে তিনি বোধহয় চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কারণ কাব্যের নানাস্থানে সেই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য কাব্যটি বিশেষ জন-প্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয় না, এর একাধিক পুঁথিও পাওয়া যায়নি। লোকচিত্তরঞ্জক উদ্ভট বর্ণনা পরিত্যাগ করে যদুনাথ এমন একটি শান্ত সংযত বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন যা সাধারণ সমাজে হয়তো গৃহীত হয়নি। তা নাই হোক, এ যুগের রসিক পাঠক কবিকে নিশ্চয় প্রশংসা করবেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর একজন কবির উল্লেখ করে আমরা এই প্রসঙ্গে যবনিকা ফেলতে চাই—তিনি হলেন শ্যামপণ্ডিত।

শ্যামপণ্ডিত ॥ ইনি ভণিতায় শ্রীশ্যামপণ্ডিত বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্য 'নিরঞ্জনমঙ্গল' নামে অধিকতর পরিচিত। 'পণ্ডিত' উপাধি দেখে মনে হয়, কবি ডোমের ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাব্যের মধ্যে দু'চারটি এমন স্থানীয় ব্যাপারের উল্লেখ আছে যে, এঁকে বীরভূমের অধিবাসী বলে মনে হয়। একখানি পুঁথিতে ১৬২৫ শকাব্দের উল্লেখ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন, ১৭০৩-১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। ভাষা দেখে তাঁকে বেশী পুরাতন মনে হয় না। এখনও বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মের গাজনের সময় তাঁর কাব্য পড়া হয়। তাঁর পুঁথিগুলি খুব বিশুদ্ধ নয়, কারণ তাতে অন্য কবির ভণিতাও আছে। কবির কাব্যটি বিশেষ কোন দিক দিয়ে উল্লেখ-যোগ্য নয়। ভাষা, কাহিনী প্রভৃতি একেবারে 'জলবত্তরলং' ধরনের। সুতরাং এখানে এই ধরনের সাহিত্যগুণবর্জিত পুঁথি সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

ধর্মের ব্রত-পূজা, ধর্ম-সেবক সম্প্রদায়, ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলের কাহিনী এবং কবি-পরিচয় ইত্যাদি আলোচনা করে দেখা গেল, প্রাগার্য যুগ থেকে এ দেশে এই ধরনের শিলামূর্তি দেবতার পূজাদি হয়ে এসেছিল, পরে তাতে বৈদিক ও

পৌরাণিক সংস্কারের পালিশ পড়ে; এতে বৌদ্ধধর্মের যৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন যে নেই এমন মনে হয় না। রাঢ় অঞ্চলে অনুন্নত সমাজে এই দেবতার পূজাদি অনেক কাল থেকে চলে এলেও ষোড়শ শতাব্দীর আগে কোথাও ধর্মঠাকুর-সংক্রান্ত নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনে হয়, মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা যখন গ্রাম্য সংস্কারের মাজাঘষা চলছিল, তখনি ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চবর্ণেরা ধর্ম-ঠাকুরের মহিমার প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হন, কেউ কেউ নিমরাজি হয়ে দেবতার পূজার্চনা ও মহিমা-বিষয়ক মঙ্গলকাব্য রচনায় অগ্রসর হন। তবে ধর্মপূজায় যেমন ডোম সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকার, তেমনি ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল-কাব্য রচনায় নিম্নবর্ণের ডোম ও ধর্মসেবক কবিদেরও বেশ যোগ দিতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি সমাজের নীচুতলায় এবং ওপরতলায় জনপ্রিয় হতে থাকে। রাঢ় অঞ্চলে এই দেবতার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়; এখনও সে প্রভাব কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। সেদিক থেকে এই দেবতা ও এই মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে শুধু সাহিত্যের তরফ থেকে নয়, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকেও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাথসাহিত্য

১. সূচনা

বাংলাদেশে শৈব নাথসম্প্রদায় এখনও আছে। যুগীনামেই এই সম্প্রদায় সাধারণত পরিচিত। দশম শতাব্দীর দিকে সারা উত্তর-ভারতের গোরক্ষপন্থী নাথসম্প্রদায় ছিল, পশ্চিম-ভারতেও এ'দের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বাংলা-দেশেও এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল থেকে নিজেদের সাধনভজন করে আসছিলেন এবং এখনও নানা শাখা-প্রশাখায় এ'রা বাংলাদেশের নানাঅঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন। এ'দের ধর্মকর্ম ও আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে অনেক ছড়া-পাঁচালী, লোকগীতি আখ্যানকাব্য পাওয়া গেছে, সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে যার মূল্য স্বীকার করতে হবে। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করতেন, এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি ছড়াগান ও আখ্যানকাব্য বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর দিকেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই রচনাগুলি অত প্রাচীন নয়। ছড়াগুলি উত্তর-বঙ্গের কৃষকদের মুখ থেকে শুনে লিখে নেওয়া হয়েছে—কাজেই এগুলি হাল আমলের। 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন'-এর পুঁথিও দু'এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে পুরাতন নয়। কাজেই প্রাপ্ত নাথসাহিত্যকে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে কোন-না-কোন প্রকার নাথ-সাহিত্য রচিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তুর্কী অভিযানের পর প্রায় দু'শ বছর ধরে এদেশে যে ভয়াবহ অরাজকতা চলেছিল, তার বন্যাধারায় বোধ হয় এই জাতীয় সাহিত্যের নিদর্শন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। চর্যাগীতিকার পুঁথি নেপাল থেকে পাওয়া গেছে, এ পুঁথি বাংলায় থাকলে আমরা পেতাম বলে মনে হয় না। এ-ও সেই অরাজকতার আঘাতে বিলুপ্ত হয়ে যেত। যাই হোক, নাথসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার আগে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলে নেওয়া যাক।

একদা ভারতের কোন কোন দার্শনিকগোষ্ঠী জড়দেহকে মুক্তির বাধা না বলে সোপান হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা নানাধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক,

রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত ভিষগ্‌বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ব করে তার সাহায্যে মোক্ষ-মুক্তি-নির্বাণ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন। এঁরা দর্শন হিসেবে পতঞ্জলির যোগদর্শন এবং ক্রিয়াকর্ম হিসেবে তন্ত্র ও হঠযোগের বিশেষ সাহায্য নিয়ে পিণ্ডদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এক কথায় এঁদের যোগীসম্প্রদায় বলে, কারণ এঁদের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি পতঞ্জলির যোগদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এঁরা 'কায়াসাধনা' করতেন, অর্থাৎ পিণ্ডদেহ বা ভূতকায়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেউ কেউ মনে করতেন, এই সাধনার দ্বারা ভঙ্গুর জীবদেহকে "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ" করা যায়।

যোগের দ্বারা প্রাণায়ামাদির সাহায্যে এঁরা নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। পূরক-কুম্ভক-রেচক শীর্ষক বায়ু বশীভূত করে এঁরা মোক্ষলাভের প্রথম সোপান অতিক্রম করতেন। তারপর তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব অবলম্বনে নিজ দেহমধ্যে শিরঃস্থিত সহস্রদলযুক্ত পদ্ম-সহস্রারে, শিবশক্তির মিলনসম্ভূত দিব্যানুভূতি লাভ করতেন। তখন অবশ্য পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ অপার্থিব দিব্যদেহে পরিণত হত। এঁরা মূলতঃ আত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী ততটা নন। সাধন-প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজের মোক্ষ লাভ—এই হল এঁদের সাধনা। শিব এঁদের আদিগুরু—তিনিই আদিনাথ। তাঁর শিষ্য মীননাথ, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। এই গোরক্ষনাথের পবিত্র জীবনকাহিনী নিয়ে সারাভারতেই কত গান-গল্প রচিত হয়েছে। ইনি নিজের গুরু মীননাথকে বুদ্ধিভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করে স্মরণীয় হয়েছেন। শিব আদিনাথ হলেও চরিত্রগৌরবে গোরক্ষনাথ অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন, মানুষ হয়ে মাহাত্ম্যে দেবতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই নাথ-পন্থীরা কোন কোন প্রদেশে 'গোরক্ষপন্থী' নামেও পরিচিত।

নাথধর্মে ন'জন গুরুর কথা জানা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরাও তাঁদের চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সঙ্গে এই ন'জন নাথেরও পূজা করতেন। চর্যাগীতিকার পদে ও টীকায় নাথধর্ম ও নাথগুরুর উল্লেখ আছে। নাথধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে এই ন'জন নাথের নামধাম থাকলেও এক গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে অন্য গ্রন্থের বর্ণনার রেখায় রেখায় মিল নেই। মোটামুটি তাঁদের নামধাম এই রকম : পূর্বে গোরক্ষনাথ, উত্তরাপথে জলন্ধর (জ্বালামুখী তীর্থ), দক্ষিণে নাগার্জুন (গোদাবরী নদীর কাছে), পশ্চিমে দত্তাত্রেয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর-পশ্চিমে জড়ভরত, কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রোপকূলে মৎস্যেন্দ্রনাথ—এই হচ্ছেন

ন'জন নাথগুরু। মারাঠী কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে, আদিনাথ শিবের কাছে 'মহাজ্ঞান' (অর্থাৎ পিণ্ডদেহে মোক্ষ লাভ বা অমরত্ব লাভ) শিক্ষা করেন শিব-ঘরণী পার্বতী, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও জালন্ধরিপাদ। মৎস্যেন্দ্রের (বাংলাদেশের মীননাথ) দু'জন শিষ্য—গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ। জালন্ধরের দুই শিষ্য—কানিফা (বাংলার কানুপা) ও ময়নামতী। গোরক্ষনাথের দুই শিষ্য—গৈনীনাথ ও চর্পটিনাথ। এঁদেরও নানা শিষ্যপরম্পরা আছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় তার ততটা প্রয়োজন নেই। বাংলা সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মৎস্যেন্দ্রনাথ অর্থাৎ মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ অর্থাৎ হাড়িপা, রাণী ময়নামতী, কানুপা এবং ময়নামতীর একমাত্র সন্তান গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে নিয়ে কিছু কিছু ছড়া-পাঁচালী ও কাব্যকাহিনী লেখা হয়েছে। আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু এইটুকু। এর মধ্যে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীকে কেন্দ্র করে একাধিক পুঁথি লেখা হয়েছে। ময়নামতী ও তাঁর ছেলে গোপীচন্দ্রের বিষয়ে বেশীর ভাগ মৌখিক ছড়া পাওয়া গেছে। আলোচনার সুবিধের জন্য এই নাথসাহিত্যকে দুটি বৃত্তে ভাগ করা যায়—(১) গোরক্ষনাথ বৃত্ত, (২) ময়নামতী-গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বৃত্ত। এইভাবে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

২. গোরক্ষনাথ বৃত্ত

গোরক্ষনাথের মহিমাবিষয়ক কাহিনী এবং ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের আখ্যান নাথসাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত বাংলার বাইরেও নাথসাহিত্য প্রধানত এই দুই শাখায় বিভক্ত। অবশ্য নাথধর্ম, দর্শন ও তত্ত্ব-সংক্রান্ত কিছু কিছু রহস্যবাদী কবিতা ও গান বাংলা ও বাংলার বাইরে প্রচলিত আছে। কিন্তু কাহিনী বলতে ঐ দু'টি গল্পকথাই জনসমাজে প্রচারিত হয়েছে।

গোরক্ষনাথকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে চান। অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে যে-কোন সময়ে তিনি মর্ত্যদেহ ধারণ করে বর্তমান ছিলেন, এমন কথা শোনা যায়। ভারতের নানা অঞ্চলে তাঁর আবির্ভাব-স্থান বলে কল্পিত হয়েছে। এবিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। কারণ নানাপ্রকার জনশ্রুতি এবং পরোক্ষ উল্লেখ ভিন্ন তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাসের দিক থেকে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় না। যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা মনে করেন গোরক্ষনাথ পেশোয়ারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোগী-সম্প্রদায় অর্থাৎ গোরক্ষপন্থীরা মনে করেন, তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী

ছিলেন, পরে বিহারের গোরক্ষপুরে বাস করেছিলেন। এই সমস্ত তথ্য থেকে মনে হয়, তিনি উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম-ভারতে কোন-না-কোন সময়ে মর্ত্যশরীরে বর্তমান ছিলেন। সম্ভবত তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মতো বহু স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর নানা অঞ্চলের শিষ্যেরা গুরুকে তাঁদের অঞ্চলে আবির্ভূত বলে দাবি করেছিলেন। যাই হোক, তাঁকে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী মনে হচ্ছে না, খুব সম্ভব তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এর বেশী আর বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে শিব-মৎস্যেন্দ্রনাথের পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে তাঁর কাহিনী জুড়ে গিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

গোরক্ষনাথকে ঘিরে নানাপ্রদেশেই অনেক রকমের গল্পের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা শুধু বাংলাদেশের গোরক্ষনাথ-কাহিনীরই আলোচনা করব। গোরক্ষনাথ কর্তৃক পথভ্রষ্ট গুরু মীননাথকে উদ্ধার করার কাহিনী নিয়ে এদেশে দু'রকমের বই লেখা হয়েছিল, একটির নাম 'গোরক্ষবিজয়' বা 'গোর্খবিজয়', আর একটির নাম 'মীনচেতন'। দুটির বিষয় একই। গোরক্ষনাথের বিজয়কাহিনী বা গুরু মীননাথকে চেতন করা অর্থাৎ উদ্ধারের গল্পই পুঁথি দু'খানিতে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত গোরক্ষমহিমা-বিষয়ে তিনখানি পুঁথি ছাপা হয়েছে, (১) ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন', (২) মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়', (৩) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের 'গোর্খবিজয়'। এখন মুস্কিল হয়েছে—এই তিনখানি পুঁথি পৃথক কাব্য কিনা, এবং এর রচনাকার বলে উল্লিখিত শ্যামদাস সেন, শেখ ফয়জুল্লা ও ভীমসেন তিনজনই পৃথক কবি কিনা। এই তিনখানির মধ্যে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেনের 'মীন-চেতন' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় (১৯১৫ সাল), তারপরে প্রকাশিত হয় আবদুল করিম সাহেব সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' (১৯১৭ সাল) কয়েক বৎসর পূর্বে ড: পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের 'গোর্খবিজয়' ছাপা হয়েছে (১৯৪১)। নলিনীকান্তের সম্পাদিত 'মীনচেতন' কাব্যের মাত্র দু' জায়গায় শ্যামদাসের ভণিতা আছে, আর কোথাও এই কবি বা অন্য কারও ভণিতা নেই। তাই থেকে ডঃ ভট্টশালী মনে করেন, কবির নাম শ্যামদাস সেন। পুঁথিটিতে 'মীনচেতন' নাম আছে বলে সম্পাদক সেই নামই বহাল রেখেছেন। এর কিছু পরে করিম সাহেব আটখানি পুঁথি অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' সম্পাদনা

করে প্রকাশ করেন। তিনি পুঁথিগুলিতে কবীন্দ্রদাস, শেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতা পেয়েছেন। এর মধ্যে যেটি প্রাচীনতর ও নির্ভরযোগ্য তাতে পুঁথির নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—"ইতি মীননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয় সমাপ্ত"। কোন কোন পুঁথিতে শুধু 'গোর্খ (গোরক্ষ, গোক্ষ) বিজয়' আছে। তাই করিম সাহেব অনুমান করেন মূল কাব্যটির নাম বোধ-হয় 'মীনচেতন-গোরক্ষবিজয়' বা 'গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন' ছিল। পরে নানা লিপিকারের হাতে পড়ে গল্প-আখ্যায়িকা কখনও 'গোরক্ষবিজয়' কখনও-বা 'মীনচেতন' নামে উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য নলিনীকান্ত সম্পাদিত 'মীনচেতন' এবং করিম সাহেব সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়ের' কাহিনী অধিকাংশ স্থলেই একরকম, ভাষাও তাই। সুতরাং করিম সাহেবের অনুমান অনেকটা ঠিক।

এখন দেখা যাক গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনের প্রকৃত রচনাকার কে—এক, না একাধিক। করিম সাহেবের মতে ফয়জুল্লাই প্রকৃত রচনাকার, অন্য সকলে গায়েন মাত্র। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন যে, ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন বা ভীমসেন—কেউ-ই কাব্যের রচনাকার নন—এঁরা গোরক্ষ-গীতিকার গায়ক মাত্র। দীনেশচন্দ্রও মনে করতেন, শেখ ফয়জুল্লা মূল রচনাকার নন—তাঁর মতে ফয়-জুল্লাও সঙ্কলক। আবার কেউ কেউ সমস্যার জড় মেটাবার জন্য বলেছেন যে, ভীমসেন, শ্যামদাস এবং ফয়জুল্লা—তিনজনেই গোরক্ষবিজয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। অনেকে ভীমসেনকেই প্রাচীনতম রচনাকার, আর অন্য দু'জনকে পরবর্তী কবি বলতে চান। যোগীসম্প্রদায়ের গায়কেরা এই তিনজনের রচনাকে একসঙ্গে গ্রথিত করে গান করে থাকেন। এসব বিষয়ে সেকালে অর্ধশিক্ষিত উপধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক কালের মতো সতর্ক বিচারবিশ্লেষণ প্রচলিত ছিল না। এ সমস্ত কাহিনী ছিল মূলত ধর্মীয় গানের অঙ্গ। সাধক ও ভক্তের দল গেয় বস্তুটার প্রতি যতটা অনুরক্ত ছিলেন গানের রচনাকার সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিলেন না। তা'ছাড়া এ ধরনের গান অনেকটাই ছিল মৌখিক। পরে কিছু কবিত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত গান-পাঁচালী-ছড়াকে সঙ্গীতপূর্ণ কাহিনীর আকার দিয়েছেন। সুতরাং কে যে সমস্ত গানের প্রকৃত রচয়িতা তা বলা সহজ নয়। আমাদের অনুমান শেখ ফয়জুল্লা এবং ভীমসেনই (এঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র) ছড়া-পাঁচালীগুলিকে মোটামুটি আখ্যান-কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। রচনাদি দেখে মনে হচ্ছে, এগুলি বেশী পুরাতন

নয়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীরই হওয়া সম্ভব। এখানে গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনের গল্পটি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে।

এই আখ্যানে নাথসম্প্রদায়ের সর্বজনমান্য যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথের অদ্ভুত মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কামক্রোধবিজয়ী সাত্ত্বিক পুরুষ গোরক্ষনাথ কীভাবে তাঁর পথভ্রষ্ট গুরুকে নারীদের কবল থেকে উদ্ধার করলেন—এ কাব্যের মূল কাহিনীতে তারই পরিচয় আছে। দেখা যাচ্ছে, আদিপুরুষ নিরঞ্জনের মুখ থেকে শিব, নাভি থেকে মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদ (বা জালন্ধরিনাথ), কান থেকে কানিফা (কানুপা) এবং জটা থেকে গোরক্ষ (গোর্খ)-নাথের জন্ম হল। শিব জন্মালেন আদিপুরুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ থেকে, আর গোরক্ষনাথ জন্মালেন উত্তমাঙ্গের সন্ন্যাসের চিহ্ন জটা থেকে। কাজেই গোরক্ষ কামক্রোধবিজয় সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে জন্মালেন গৌরী। গৌরীকে শিব নিরঞ্জনের নির্দেশে বিয়ে করলেন। এর পরে মীননাথ ও হাড়িপা (জালন্ধরিপাদ) মহাদেবের শিষ্য হলেন, গোরক্ষনাথ মীননাথকে গুরু বলে বরণ করলেন এবং কানুপা হলেন হাড়িপার শিষ্য। তারপর তাঁরা যোগধ্যানে নিমগ্ন হলেন। একদিন মহাদেব গৌরীকে সংগোপনে যখন গুহ্যাতিগুহ্য 'মহাজ্ঞান' তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন তখন লোভী মীননাথ মাছের রূপ ধরে তা শুনে নেন। তাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন যে, মীননাথ যা শুনেছেন তা সব ভুলে যাবেন। এর-পর একদিন মহাদেবের শিষ্যদের নৈতিক বল পরীক্ষার জন্য পার্বতী তাঁদের নিমন্ত্রণ করে অন্ন পরিবেশন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত সিদ্ধা তাঁর ভুবন-মোহন লাবণ্য দেখে মনে মনে কামের বশীভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু গোরক্ষ-নাথ তাঁকে মাতৃভাবে দেখলেন, এবং মনে মনে বললেন, আহা, ইনি যদি আমার মা হোতেন, তা হলে এঁর কোলে শিশু হয়ে দুধ খেতাম। পার্বতী অন্য শিষ্যদের চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য অভিশাপ দিলেন, কিন্তু তিনি গোরক্ষনাথকে আরও পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন এবং পথের একপাশে বিবস্ত্রা অবস্থায় শুয়ে যতিশ্রেষ্ঠের মনে বিকার সৃষ্টি করতে চাইলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ এতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং এই অনুচিত কর্মের জন্য দেবীকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেললেন। যাই হোক শিব গোরক্ষনাথকে বিয়ে করে সংসারী হতে বললেন। বাধ্য হয়ে গোরক্ষনাথ এক রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন যাপন করলেন না, কারণ তিনি যোগমার্গের সাধক, এ পথ তাঁর নয়। স্ত্রী এতে

দুঃখ পেলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তাঁর স্ত্রী পুত্রসন্তান পাবেন—এর নাম কর্পটীনাথ। অতঃপর স্ত্রীপুত্রাদি ছেড়ে যোগী পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে কানুপার কাছে শুনলেন, তাঁর গুরু মীননাথ কদলী (অর্থাৎ স্ত্রীলোক) রাজ্যে গিয়ে জপধ্যানাদি বিসর্জন দিয়ে ভোগসুখে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর একটি ছেলেও হয়েছে, তার নাম বিন্দুনাথ। তখন গোরক্ষ উপযুক্ত শিষ্যের কাজ করবার জন্য ব্যস্ত হলেন এবং গুরুকে সংসারের মোহজাল থেকে উদ্ধার করে আবার যোগসন্ন্যাসের পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তার জন্য তিনি সুরক্ষিত কদলীর পুরীতে গিয়ে নানা কৌশলে নর্তকীর বেশে মীননাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং নৃত্যগীতের ছন্দে গুরুকে বিস্মৃত 'মহাজ্ঞান' স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। গুরু সবই বুঝতে পারলেন বটে, কিন্তু সহজে কি স্ত্রীপুত্রাদি ও সংসারের বাঁধন কাটা যায়? গোরক্ষনাথ নিরুপায় হয়ে গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে মেরে ফেলে গুরুর মোহভঙ্গের চেষ্টা করলেন। কদলী রমণীরা কলরব করতে লাগল। তখন গোরক্ষনাথ বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু নারীদের বাদুড় করে উড়িয়ে দিলেন। বাদুড়ের দল উড়ে চলে গেল কোথায় কে জানে! মীননাথের মোহ দূর হল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, যেন স্বপ্নভঙ্গের পর, শিষ্যের হাত ধরে আবার সন্ন্যাসের পথে বার হলেন, পুত্র বিন্দুনাথও সন্ন্যাস নিয়ে তাঁদের অনুসরণ করল।

কাহিনীটি কিন্তু নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এতে একদিকে সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের মায়ামোহবর্জিত নিঃস্পৃহ বৈরাগী মন এবং কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা চমৎকার ফুটে উঠেছে, আর একদিকে মীননাথের সাংসারিক মায়ামুগ্ধ বিড়ম্বিত চরিত্রটিও সুপরিকল্পিত হয়েছে। দেহের ওপরে আত্মার জয়ঘোষণা করা এই সমস্ত নাথপন্থী যোগী-কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—এই আদর্শটি গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কেউ কেউ এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে উচ্চতম কাব্যধর্ম উপলব্ধি করেছেন—কেউ কেউ একে নাটকীয় ও মহাকাব্য ধরনের রচনা বলতেও কুণ্ঠিত হননি। এ সমস্ত উচ্ছ্বাস নিতান্তই ভক্তির আবেগ মাত্র। কাহিনীটি এবং চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য বটে, এবং উপযুক্ত কবির হাতে পড়লে এ ধরনের কাব্য মহাকাব্যের উচ্চতা লাভ করতেও পারত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে স্বল্প-প্রতিভাধর অর্ধশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের দল এগুলি লিখত, শ্রোতারা প্রায়ই ছিল নিরক্ষর এবং পুঁথির জ্ঞান বর্জিত। সুতরাং এ ধরনের কাহিনী লোক-

সাহিত্যের দিকে যতটা অগ্রসর হয়েছে, মার্জিত সাহিত্যের দিকে ততটা যেতে পারেনি। সুতরাং একে উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত বলে পুলকিত হবার কারণ নেই। তবে এ'রা মূলত ছিলেন নিরীশ্বরবাদী, নিজের আত্মার মুক্তি-মোক্ষ নিজের সাধনার দ্বারাই সম্ভব—এ'রা ছিলেন এই মতের প্রচারক। দেবদেবীর প্রতি এ'দের যে খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল না, তার প্রমাণ শিব-দুর্গার চরিত্র। গোরক্ষনাথের কাছে দুর্গাকে কি রকম নাকাল হতে হয়েছিল, তা কাব্যটি পড়লেই বোঝা যাবে। এ'রা আকারবিশিষ্ট ঈশ্বর-চেতনায় উদাসীন বা বিমুখ ছিলেন বলে মুসলমান সাধকেরাও এই দলে যোগ দিতে বিশেষ কোন মানসিক বাধা পাননি। এই কাব্যের সর্বাধিক পরিচিত কবিও মুসলমান—শেখ ফয়জুল্লা যাঁর কথা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। এখনও এই যুগীসম্প্রদায় নীরবে তাঁদের সাধনভজন করে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্প্রদায়ে গোরক্ষমাহিমা সুবিদিত। মধ্যযুগে সারা বাংলাদেশে এ'দের বিশেষ প্রভাব ছিল।

৩. ময়নামতী-গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বৃত্ত

বাংলাদেশে কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষত উত্তরবঙ্গের কৃষকসমাজে রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর মাতা রাণী ময়নামতীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ছড়া-পাঁচালীর আকারে এখনও প্রচলিত আছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের নানাপ্রদেশেও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসবিষয়ক সকরুণ কাহিনী গড়ে উঠেছে, কোন কোন প্রদেশের লোকনাট্যেও এ কাহিনীর প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশে মৌখিক ছড়া-পাঁচালী ছাড়াও দু'একটি পুঁথিও পাওয়া গেছে। অনেকে এ কাহিনীর বাস্তব সত্তা ও ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনেক অনাবশ্যক গবেষণা করেছেন এ ধরনের লোক-কাহিনীর পিছনে সর্বদা ইতিহাসের লেজুড় খুঁজতে গেলে বিড়ম্বিত হতে হবে। তবু গবেষকদের চেষ্টা ও চিন্তার বিরাম নেই। কেউ বলেন, বাংলাদেশ থেকেই মূল কাহিনীটি বিহার, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে গিয়েছিল। বাংলার কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহার-কুলের রাজা মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী হলেন রাণী ময়নামতী এবং পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র। এ কাহিনীর কেন্দ্র কিন্তু রংপুর। নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচন্দ্র নাটকে' গোপীচন্দ্রকে বঙ্গের রাজা বলা হয়েছে। প্রাচীন কবি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্য 'পদ্মাবতে'ও গোপীচন্দ্র বাংলার রাজা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। গুজরাটী উপাখ্যানে গোপীচন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্রকে (মাণিকচন্দ্র নন)

বাংলার রাজা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ময়ূরভঞ্জ থেকে গোপীচন্দ্র-সংক্রান্ত ওড়িয়া ভাষায় রচিত যে কাহিনী পাওয়া গেছে, তাতেও তাঁকে 'বঙ্গের রায়' বলা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এ কাহিনীর উৎপত্তিস্থান হচ্ছে বাংলাদেশ, আর এদেশ থেকেই কাহিনীটি অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনীটি নাথসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এর জড় পূর্বতন কাহিনী 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে নিহিত আছে।

'গোরক্ষবিজয়ে' দেখানো হয়েছে, একমাত্র গোরক্ষনাথ ব্যতীত অন্য নাথ আচার্যেরা দেবী দুর্গাকে দেখে ক্ষণকালের জন্য কামের বশীভূত হয়েছিলেন এবং দেবী তার জন্য তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপাকে তিনি অভিশাপ দিলেন, মেহারকুলের রাণী ময়নামতীর কাছে গিয়ে হাড়ীর নীচ কর্ম করতে হবে। তাঁর সঙ্গে ময়নামতীর সম্পর্ক গুরুভাই-ভগিনীর মতো, কারণ তাঁরা দু'জনেই গোরক্ষনাথের শিষ্য। অভিশাপের ফলে জালন্ধরি বা হাড়িপা ময়নামতীর রাজ্যে গিয়ে নীচ হাড়ীর কর্ম অবলম্বন করলেন। কানুপাকে দুর্গা অভিশাপ দিয়েছিলেন, বিমাতার প্রতি আকর্ষণের হেতু তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। কানুপা-বিমাতা-সংক্রান্ত কোন পালা বা পাঁচালী বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। বাংলার বাইরে কানুপার ঐ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে।

রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর মূল বিষয়। রাণী ময়নামতী অদ্ভুত শক্তি 'মহাজ্ঞানে'র অধিকারিণী ছিলেন। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে দেখলেন যে, তাঁর স্বামী রাজা মাণিকচন্দ্রের শীঘ্র মৃত্যু হবে। তাঁকে দীর্ঘায়ু দেবার জন্য রাণী স্বামীকে তাঁর কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা করতে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা পৌরুষে ঘা লাগবে বলে স্ত্রীর কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' নিতে অস্বীকার করলেন। ফলে তিনি যমদূতের বশীভূত হয়ে মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করলেন। যমদূতের সঙ্গে দারুণ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েও লুপ্ত-আয়ু স্বামীকে ময়নামতী বাঁচাতে পারলেন না। স্বামীর মৃত্যুর অল্প দিন পরে তাঁর গোপীচন্দ্র নামে একটি পুত্র হল। গোপীচন্দ্র ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ময়নামতী পুত্রকে অদুনা-পদুনা নাম্নী দুই রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন—এই দু'জন কিন্তু পরস্পরের ভগিনী। অতঃপর ময়নামতী দেখলেন, তাঁর সন্তানেরও তাঁর স্বামীর মতো অকালমৃত্যু হবে। হাড়িপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে কিছুকাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজক না হলে তাকে কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু তরুণ যৌবনে স্ত্রীদের ছেড়ে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, অদুনা-পদুনাও গোপনে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। স্ত্রীদের প্ররোচনায় গোপীচন্দ্র মাতৃচরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করতে কুণ্ঠিত হলেন না, হাড়িসিদ্ধা-জালন্ধরি-পাকে জড়িয়ে তিনি প্রকাশ্যেই মায়ের বিরুদ্ধে অসতীত্বের অভিযোগ আনলেন। তখন নিজেকে নিষ্কলঙ্ক সতী প্রমাণের জন্য ময়নামতী বাধ্য হয়ে ছেলের কাছে সুকঠোর পরীক্ষা দিলেন। অতঃপর গোপীচন্দ্রের অভিযোগ, অসম্মতি ও প্রতিবাদ আর টিকল না। তাঁকে মায়ের নির্দেশ মতো হাড়িসিদ্ধার কাছে মন্ত্র নিয়ে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী সাজতে হল। হাড়িসিদ্ধা তাঁকে হীরানটীর বাড়ীতে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। বহু দুঃখকষ্টে গোপীচন্দ্রের দিন কাটতে লাগল। অবশেষে সন্ন্যাসের কাল অবসান হলে হীরানটীর কবল থেকে তাঁকে হাড়িসিদ্ধা উদ্ধার করলেন এবং আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান শেখালেন। পরে সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্র গৃহী হয়ে দুই স্ত্রীকে নিয়ে মহাসুখে রাজত্ব করতে লাগলেন, মায়ের উপদেশে সন্ন্যাস নেবার ফলে তাঁর আর অকালমৃত্যু হল না। এই কাহিনী রংপুরের কৃষকসমাজে কতকটা এই আকারে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এই কাহিনীর একটি পুঁথিগত পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তাতে এর পরিণাম অন্য ধরনের।

এই পুঁথির নাম 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। এতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর মাহমুদ প্রভৃতি কবিদের ভণিতা পাওয়া যায়। এর ভাষা মার্জিত, বর্ণনার মধ্যেও গ্রন্থনৈপুণ্যের আভাস আছে। মনে হয় কৃষকসমাজে উপরের কাহিনীটি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে কোন কোন হিন্দু-মুসলমান কবি সেই লোক-গাথাটিকে মেজেঘষে একটি আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দচন্দ্র বারো বছর সন্ন্যাসজীবন যাপনের পর দেশে ফিরে স্ত্রীদের কাছে সন্ন্যাসজীবনে-পাওয়া নানাপ্রকার শক্তির খেলা দেখাচ্ছিলেন। এতে হাড়িসিদ্ধা চটে গিয়ে গোবিন্দচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। ফলে রাজা স্ত্রীসমাজে বড়োই অপ্রস্তুত হলেন। তখন তিনি হাড়িসিদ্ধার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীদের প্ররোচনায় তাঁকে মাটির ভিতরে পুঁতে রাখলেন। হাড়িসিদ্ধা বারো বছর সেই-ভাবে মাটির তলায় রইলেন। শেষে তাঁর শিষ্য কানুপা তাঁকে উদ্ধার করেন এবং রাজাকেও হাড়িসিদ্ধার ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর রাজার সংসার-বাসনা দূর হল, তিনি রাজধর্ম ও স্ত্রীদের ছেড়ে দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে গিয়ে সাধনা করতে লাগলেন, এতে তাঁর মা ময়নামতীও খুশী হলেন। মৌখিক কাহিনীটি—

গোপীচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন—এই ধরনের গার্হস্থ্য-জীবনের বর্ণনায় সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পুঁথিটিতে দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত গোবিন্দচন্দ্র (পুঁথিতে তাঁকে গোবিন্দচন্দ্রই বলা হয়েছে) সংসার ছেড়ে নাথযোগী হয়ে যান। পুঁথিটির কাহিনী নাথধর্মমতের অধিকতর অনুগামী। কারণ যোগমার্গ অবলম্বন করে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং তার দ্বারা মোক্ষলাভই হল নাথধর্মসাধনের মূল কথা। কিন্তু কৃষকদের মুখ থেকে সংগৃহীত ছড়ায় দেখা যাচ্ছে, গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসগ্রহণের পর বাড়ী ফিরে স্ত্রীদের সমভিব্যাহারে দিব্যি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন। গ্রাম্য লোকরুচি, যা ছাড়া-পাঁচালীতে প্রকাশ পেয়েছে, তা সংসারযাত্রার পুনর্মিলন দেখতে অভ্যস্ত—রাজা গোপীচন্দ্র দীর্ঘকাল হীরানটীর কাছে বন্ধক থেকে বাড়ী ফিরে এলেন, তারপরে সুখে রাজ্যপাট চালাতে লাগলেন—সাধারণ শ্রোতা কাহিনীটিকে এইভাবে দেখেছিল।

এ কাহিনীটি মূলত লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, লোকমুখে শ্রুত ছড়া-পাঁচালীই তার প্রমাণ। এতে শিথিল ধরনের আখ্যান জনরুচির অনুরূপ করেই বিবৃত হয়েছে, কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনার ঢঙে অশিক্ষিত মনের ছাপ পড়লেও ধর্মতত্ত্বাদি ব্যাখ্যায় এই সমস্ত বর্ণজ্ঞানহীন লোককবিরা বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ে মায়ের ওপর দোষারোপ, মাতৃচরিত্রে সন্দেহ, শাশুড়ীর বিরুদ্ধে বধূদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ব্যাপার বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে অদুনা-পদুনার বিলাপের ভাবাটি অমার্জিত হলেও আর্ত হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে করুণ বেদনা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। কেউ কেউ এই সমস্ত কাহিনীর উচ্চতর সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ এতে উল্লিখিত সমাজচরিত্রগুলিকে মধ্যযুগের বাংলার যথার্থ সমাজকথা বলে এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে খুব আলোচনা করে থাকেন, কেউ-বা গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর স্থানকাল নিয়েও নানাধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আনন্দবোধ করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অশিক্ষিত কৃষক-কবিদের মুখে-মুখে রচিত এই সমস্ত তুচ্ছ ছড়া-পাঁচালীকে পুঁথিগত সাহিত্যের সমতুল্য না ভাবাই উচিত। এতে যে সমাজচিত্র আছে, তাতে মধ্যযুগের স্থানীয় সমাজের কিছু কিছু প্রভাব থাকলেও আসলে এগুলি দূর অতীতের স্মৃতিবহ বিস্মৃতপ্রায় চিত্র—তার বেশী এর দাম দেওয়া যায় না। ত্রিপুরার মেহারে এখনও এই গানে উল্লিখিত স্থানের নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, কোন এক সময়ে স্থানীয় কোন অঞ্চলে

এ ধরনের ঘটনা ঘটুক আর না ঘটুক, স্থানীয় কবিরা কাহিনী রচনার সময় পট-ভূমিকা হিসেবে নিজ নিজ অঞ্চলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত কাহিনীর পশ্চাতে ইতিহাসের 'পাথুরে প্রমাণ' আবিষ্কার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

এখন মৌখিক ছড়া-পাঁচালী ও পুঁথির পরিচয় নেওয়া যাক। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের নিকট সর্বপ্রথম গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামে দেবনাগরী হরফে ঐ বৎসরের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি কোন পুঁথি বা খাতা থেকে অথবা কারও মুখ থেকে এ গান সংগ্রহ করেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক তখনকার শিক্ষিত বাঙালী এ গানের কোন খোঁজখবর করেছিলেন বলে মনে হয় না। দীনেশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬) সর্বপ্রথম সাহিত্যের ইতিহাসে এই ছাড়া-পাঁচালী সম্বন্ধে অতি উপাদেয় আলোচনা করেন। পরে এই ছড়ার প্রতি সাহিত্যানুরাগীদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই ছড়াগীতিকে বৌদ্ধ-প্রভাবিত মনে করে বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন—যদিও সেরকম মনে করার কোন কারণ এ ছড়াতে নেই। নাথধর্ম বৌদ্ধধর্মের বংশাবতংস নয়, যোগমার্গীয় শৈবধর্মের সঙ্গেই নাথধর্মের আত্মীয়তার মেলবন্ধন ঘটেছে। যাই হোক এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, উত্তরবঙ্গে, বিশেষত রংপুর অঞ্চলের কৃষকসমাজে এ গানের বেশ প্রচলন আছে। রংপুরের নীলফামারী মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ১৯০৭-১৯০৮ সালের দিকে গ্রীয়ার্সনের পন্থা অবলম্বন করে তিনজন যোগী ভিখারীর মুখ থেকে গোপীচন্দ্রের সমস্ত গানটি লিখে নিলেন। এর অনেক পরে ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে গ্রীয়ার্সন এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত গান অবলম্বনে (বোধহয় বিশ্বেশ্বরবাবুর দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত) পালাগান মুদ্রিত হয়। ১৯২৪ সালে এই পালার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে পুঁথির পাঠ গৃহীত হয়েছিল। একটি হল ভবানীদাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' এবং আর একটি—সুকুর মহম্মদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ('যোগীর পুঁথি'-নামে অধিকতর পরিচিত)। বলাই বাহুল্য প্রথম খণ্ডটি বিশুদ্ধরূপে লোকসাহিত্য এবং মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি পুঁথিসাহিত্যের

অন্তর্ভুক্ত, কারণ এতে কাহিনী দুটি পুঁথি থেকেই পাওয়া গেছে, এবং পুঁথি দু'টির কবির নামও জানা যাচ্ছে—ভবানী দাস ও সুকুর মহম্মদ।

অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও এই কাহিনীর মুদ্রণ ও প্রচারের চেষ্টা চলেছিল। বাংলা ১৩০৮ সনে শিবচন্দ্র শীল একটি পুঁথি অবলম্বনে (১৮০০ খ্রীঃ অব্দে নকল করা) 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' সম্পাদিত করে প্রকাশ করেন। কাব্যটির রচনাকারের নাম দুর্লভ মল্লিক। ইনি সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। কাহিনীটি বেশ সংহত, রচনাও মার্জিত। তা হলে দেখা যাচ্ছ, যুগী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ছড়া-প'াচালীর প্রভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিও এ কাহিনীতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই কাব্যের কাহিনীর শেষে আছে, গোবিন্দচন্দ্র (অর্থাৎ ছড়া-প'চালীর গোপীচন্দ্র) সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কবি যে যোগীসিদ্ধাদের তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন—তার প্রমাণ, এতে অনেকটা জায়গা জুড়ে সাধনতত্ত্বের বর্ণনা আছে। হয়তো স্বয়ং কবি নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অতটা ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কাব্যটির বিশেষ কোন সাহিত্যগুণ নেই। সম্পাদক সে যুগে অল্পস্বল্প ইতিহাস ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' বৌদ্ধ প্রভাব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এর পশ্চাতে অনেক ঐতিহাসিক সূত্রেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। অবশ্য শীল মহাশয়ের অনেক মন্তব্য পরবর্তী যুগের নতুন আবিষ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর অতন্দ্র ও একনিষ্ঠ গবেষণা এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে।

বাংলা ১৩২১ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' প্রকাশিত হয়। মনে হয়, লোকমুখে প্রচলিত ছড়া-প'াচালী অবলম্বনে ভবানীদাস নামে কোন কবি ময়নামতীর গান ফেঁদেছিলেন। অবশ্য এ পুঁথি সত্যই ভবানীদাসের কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কারণ এর ভণিতা সম্বন্ধে কয়েকজন সমালোচক সন্দেহ তুলেছেন। এতে বহু ইসলামি শব্দ আছে। মনে হয় এতে মুসলমান কবিও বেশ হাত চালিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানের' দ্বিতীয় খণ্ডেও ভবানীদাসের আর-এক পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে। ভবানীদাসের ভণিতায় অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে। সুতরাং তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাংলা ১৩৩২ সালে আবদুল সুকুর মহম্মদের

'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামে আর একখানি পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। সুকুর মহম্মদের এইখানি যথার্থ পুঁথি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গোপীচন্দ্রের গানের' দ্বিতীয় খণ্ডে সুকুর মহম্মদের যে কাব্য ছাপা হয়েছে, তা বটতলায় ছাপা গ্রন্থের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। তাই তার চেয়ে ভট্টশালী-সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' অনেক বেশী প্রামাণিক। যাই হোক গোপীচন্দ্রের কাহিনী-সংক্রান্ত ছড়া-পাঁচালী ও পুঁথিপত্র থেকে মনে হচ্ছে, নাথধর্মাবলম্বী যুগীসম্প্রদায়ের (এখনও এ সম্প্রদায় আছে) ধর্ম, আচার এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ে অনেক ছড়া-পাঁচালী লোকের মুখে মুখে ফিরত, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে অনেক কবি এই ধরনের অনেকগুলি কাহিনী লিখেছিলেন। তার কিছু কিছু আমাদের যুগেও এসে পেঁাছেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কৌতূহলজনক উপাদানের কথা বলি। ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে এটির সংবাদ জানা গেছে। নেপালে প্রাপ্ত নেপালী গদ্যে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক' পাওয়া গেছে, রচনাকাল ১৬২০-৫৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে। এটি নেপালী ভাষায় রচিত হলেও এর গানগুলি কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা। এই গান থেকেই জানা যাচ্ছে গোপীচন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে তাঁর অন্তঃপুরে বেশ একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলে ঘোষিত হলেও এর ভাষা হাল আমলের মতো।

নাথধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত যেমন কতকগুলি আখ্যানকাব্য ও ছড়া-পাঁচালী রচিত হয়েছিল, তেমনি আবার বিশুদ্ধ তত্ত্বদর্শন-সংক্রান্ত কতকগুলি ছড়া-পদও পাওয়া গেছে, যাতে কোন কাহিনী নেই, শুধু সাধনভজনের গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ পদ বা বিচ্ছিন্ন পংক্তি আছে। কিছুদিন আগে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়ে'র পরিশিষ্টে এই ধরনের নাথ সাধনভজনকেন্দ্রিক কতকগুলি ছড়া মুদ্রিত করেছেন। তিনি এই রকম চারখানি পুঁথি পেয়েছেন—'যোগীর গান', 'যুগীকাচ', 'গোর্খসংহিতা', 'যোগচিন্তামণি'। এই সমস্ত গীতসংগ্রহে দেহকে অমর করবার কৌশল, হঠযোগ, তন্ত্র ইত্যাদি নানা নাথ যোগতত্ত্ব রূপকের ছলে বিবৃত হয়েছে। এঁদের কেউ কেউ যোগরহস্য ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণের রূপকও গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন। তাঁরা হিন্দুর যোগদর্শন গ্রহণ করলেও মাঝে মাঝে ইসলামী সাধনার শব্দাদিও ব্যবহার করেছেন। এই গান ও ছড়াগুলি গুহ্য সাধনভজনের ইঙ্গিতবাহী, নাথসম্প্রদায়ের বাইরে এর চল নেই—অবশ্য এখনও এগুলি যুগীসম্প্রদায়ের মধ্যে গীত হয়, যুগী ভিখারীরা এই গান গেয়ে ভিক্ষা

করে থাকে। তবে এগুলির কাব্যগুণ নিতান্তই ক্ষীণ, সুতরাং এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। শৈব নাথধর্ম হাজার-দেড়হাজার বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষেই চলেছে, এবং এখনও জীবিত আছে। এঁদের প্রচারমূলক সাহিত্যও আছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে এখানে এঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদ-সাহিত্য

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মারফতে বাঙালীর চিন্তভাবনা ও আবেগ উত্তরাপথের পৌরাণিক সংস্কৃতির নিবিড় সংস্পর্শে আসে এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ হয় তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুবাদ-শাখার সংখ্যাগত গৌরব কিঞ্চিৎ খর্ব হলেও মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস একাই সমগ্র শতাব্দীর মানদণ্ড হিসেবে বিরাজ করছেন। এই শতাব্দীতে সমগ্রভাবে অনুবাদ-শাখার গুণগত উৎকর্ষও খুব চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি, পুরাতনের পূর্বানুবৃত্তি চলেছে শিথিলভাবে, গত শতাব্দীর পুঁথির নকল চলেছে প্রচুর—কিন্তু কাশীরামকে বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্যের বিশেষ গৌরব করার মতো সম্পদ নেই। এখানে সংক্ষেপে সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

১. রা মা য় ণ-পাঁচালী

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত রামায়ণের দু'এক পালা পাওয়া গেছে, যার কবিও বিশেষ পরিচিত নন, প্রাপ্ত পুঁথিগুলিরও বিশেষ কোন কাব্যগুণ নেই। কৃত্তিবাসের সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলেই বড়ো কেউ রামকথায় হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হননি। কেউ কেউ নিজেদের অক্ষম রচনা কৃত্তিবাসের ভণিতায় চালিয়ে দিয়ে সারস্বত অমরত্বলাভের সুলভতম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অদ্ভুত রামায়ণের দু'চারটি অনুবাদে কৃত্তিবাসের ভণিতা দেখা যায়, কিন্তু এ-ও খুব সংশয়জনক। তবে এই শতাব্দীর রামায়ণ-অনুবাদক হিসেবে অদ্ভুত আচার্যের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে তাঁর সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করা যাচ্ছে।

অদ্ভুত আচার্য ॥ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পূর্বে বিশেষ কেউ অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনেক আগেই সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এই কবির পুঁথি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বুকানন নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কর্মচারী জমিজরিপ কার্যে কিছুকাল উত্তরবঙ্গে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সেই ভ্রমণ ও অবস্থান সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত

হয়, তাতে তিনি বলেন যে, উত্তরবঙ্গে অদ্ভুত আচার্য নামে এক কবির রামায়ণের বিশেষ প্রচার আছে—ছাপার অক্ষরে অদ্ভুত আচার্যের সেই প্রথম উল্লেখ। পরে প্রাচীন কাব্যানুরাগী পণ্ডিতের দল এই কবি ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। মালদহ থেকেও কবির পুঁথি পাওয়া গেল। অতঃপর ১৯১৩ সালে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হলে পাঠকেরা এই কবি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। কবির অধিকাংশ পুঁথি মালদহ ও রংপুর থেকে পাওয়া গেছে। পুঁথিতে কবিপ্রদত্ত আত্মবিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে—কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। বাল্যবয়সেই তিনি বহু শাস্ত্র পাঠ করে প্রাজ্ঞ হয়েছিলেন। একদা স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রামকথা লিখতে আদেশ করলেন এবং কিশোর কবিকে আশীর্বাদ করলেন। পুঁথিতে তাঁর জীবনকথা সম্বন্ধে নানা গোলমাল আছে। অনুমান তাঁর জন্মস্থান বগুড়া বা রাজশাহী জেলার কোন গ্রাম। কোন পুঁথিতে এই গ্রামের নাম সোনাবাজু, কোথাও বা একে অমৃতকুণ্ড বলা হয়েছে।

রজনীকান্তের সম্পাদনায় অদ্ভুত আচার্যের কব্যের যৎসামান্য প্রকাশিত হবার পর এবিষয়ে নতুন করে নানা তথ্য, প্রশ্ন ও সমস্যার উত্থাপন করেন ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী। তিনি নানা অনুসন্ধান করে দেখলেন সোনাবাজু গ্রাম পাবনা শহরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল—তারই অদূরে অমৃতকুণ্ডা গ্রাম, এখনও এ-গ্রাম আছে। ডঃ ভট্টশালী সমসাময়িক কুলজীগ্রন্থ এবং স্থানীয় জমিদার বংশের ইতিহাস থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, অদ্ভুত আচার্য (নিত্যানন্দ) ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি অদ্ভুত আচার্য উত্তর বাংলায় যে কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। তাঁর জনপ্রিয়তার আর একটি প্রমাণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাঁর কিছু কিছু রচনা চলে গেছে। কবির রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ বলে পরিচিত হলেও মূল সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। মনে হয় তিনি রামায়ণের সাতকাণ্ডই রচনা করেছিলেন। কবির পরিচ্ছন্ন রচনারীতি বেশ সুখপাঠ্য, করুণরস ও গভীর আবেগের স্থলেও তাঁর লেখনী সজল ও সরস। বিশেষত তিনি আবেগ ও বেদনার বর্ণনায় নিরাভরণ প্রাণের কথা সহজ ভাষায় বলেছেন বলে সেই স্বাভাবিক রচনা

মানবিক গুণে সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। বর্ণনার রীতিতে তিনি মোটামুটি কৃত্তিবাসের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রতিভা কৃত্তিবাসের তুলনায় কিছু নিকৃষ্ট তা স্বীকার করতে হবে। কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকির ধারাকে কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু অনুসরণ না করলেও তাঁর সামঞ্জস্যবোধ প্রায় অধিকাংশ স্থলেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অদ্ভুত আচার্য এমন সমস্ত উদ্ভট ও আজগুবি আখ্যান সংযোজন করেছেন যে, তাতে প্রতিভার অসংযম ও কল্পনার সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করে বিষণ্ণ হতে হয়। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী অদ্ভুত আচার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে গিয়ে কৃত্তিবাসের প্রতি কিছু কৃপণতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাঁর মতে, অদ্ভুত আচার্যের প্রতিভা কোন কোন দিক থেকে কৃত্তিবাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। ডঃ ভট্টশালীর এ অভিমত একদেশদর্শী ও পক্ষপাত-দুষ্ট বলে মনে হয়। জনপ্রিয়তায় ও প্রতিভায় অদ্ভুত আচার্য কৃত্তিবাসের চেয়ে নিম্নতর স্থানাধিকারী—এ সত্য স্বীকার করাই ভালো। তিনি যদি এতই প্রতিভাশালী ও জনপ্রিয় কবি হন, তা হলে তাঁর পুরো পুঁথি পাওয়া যায়নি কেন, সে প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া যায় না। তাঁর খণ্ডিত পুঁথির সংখ্যাও নগণ্য মাত্র। সে যাই হোক, অদ্ভুত আচার্য কৃত্তিবাসের সমকক্ষ না হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণ-সাহিত্যে কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অবশ্যস্বীকার্য।

রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কিছু রামায়ণাশ্রিত রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। অখণ্ডিত ও খণ্ডিত পুঁথির হিসেব নিলে আরও আটজন রামায়ণ-কবির পুঁথি পাওয়া যাবে। এ'দের অনেকেই কৃত্তিবাসকে অবলম্বন করেছিলেন, কেউ কেউ সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কোন কোন কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ-সাহিত্যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যাম দাস, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কয়েকজন কবি রামায়ণের নানা আখ্যান অবলম্বনে ঈষৎ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন—তবে পুরো রামায়ণ অনুবাদে কারও দম ছিল না। তাই তাঁরা রামায়ণের জনপ্রিয় দু' একটি কাহিনী অবলম্বন করেছিলেন, কেউ কেউ অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কোন কোন আখ্যান একসঙ্গে মিশিয়ে নূতনতর বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গলের কবি বংশী-দাসের বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী চিরকৌমার্য অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর বেশ কবি-

প্রতিভা ছিল। লোককথা অবলম্বনে তিনি নাকি ছড়া-প'াচালীর ঢঙে সংক্ষেপে রামকাহিনী লিখেছিলেন। প্রসিদ্ধ ছড়াসংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এই রামায়ণ সংগ্রহ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র (চতুর্থ খণ্ড) এই রামায়ণের কিছুটা মুদ্রিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, চন্দ্রাবতী মূল রামায়ণকে পাশ কাটিয়ে গ্রাম্য রামকথার ওপর ভিত্তি করেছিলেন, রচনাতেও স্থানে স্থানে মেয়েলি ঢঙ আছে। কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ সন্ধান করে দেখেছি, 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় প্রকাশিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সর্বাংশে খ'াটি ও প্রাচীন রচনা নয়। এ ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর হতেই পারে না, বহু স্থলে উৎকট আধুনিক পদবিন্যাস লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। তাই আমাদের মনে হয়, কবির যখন কোন প্রামাণিক পু'থি পাওয়া যায়নি এবং পালাসংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ভিন্ন আর কেউ এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য দিতে পারছেন না, তখন চন্দ্রাবতীর তথাকথিত রামায়ণকে নিঃসংশয়ে প্রামাণিক ও প্রাচীন বলে মেনে নেওয়া যায় না। এবার মহাভারতের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

২. মহাভারত-কথা

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কাশীরামদাসের মহাভারত বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অদ্ভুত গৌরব লাভ করেছে। বস্তুতঃ কৃত্তিবাসকে বাদ দিলে কাশীরামই হচ্ছেন মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম জাতীয় কবি। অবশ্য তাঁর পূর্বেও কেউ কেউ বিশালকায় মহাভারতের কোন কোন আখ্যান, অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম দাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত সংহিতাকে কোথাও পুরোপুরি, কোথাও বা অংশত অনুসরণ করেছিলেন। তবে অধিকাংশ কবিই মহাভারতের দু-এক পর্ব, বা কোন পর্বের কোন একটি বিখ্যাত সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে মহাভারত রচনার সাধ মিটিয়েছিলেন। অশ্বমেধ পর্বের দিকে এ'দের যেন একটু বেশী ঝোঁক ছিল, কারণ অশ্বমেধ পর্বের একাধিক পু'থি নানা কবির ভণিতায় পাওয়া গেছে। কেউ কেউ আবার জৈমিনি ভারতের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এসব রচনার রচনাগত বিশেষ কোন গৌরব নেই। তবে কাশীরামে রকিছু পূর্বে আবির্ভূত কবি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন।

নিত্যানন্দ ঘোষ ॥ কাশীরামের মতো এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে না পারলেও নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'গৌরীমঙ্গল' নামে একটি পংথিতে আছে, কাশীরাম দাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নকল করা নিত্যানন্দের একখানি পংথি (১৬৭৬ খ্রীঃ অঃ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পংথিশালায় আছে। কাজেই তাঁকে বেশ প্রাচীন মনে হচ্ছে।

কাশীরামের সঙ্গে নিত্যানন্দের রচনার বহু স্থলেই গভীর সাদৃশ্য আছে। মনে হয় অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য কাশীরামের পংথিতে নিত্যানন্দের কোন কোন রচনা চলে গেছে। অর্ধশিক্ষিত নকলনবিশেরাই এই রকম অনেক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছেন। নিত্যানন্দের রচনা কোন বিশেষ কাব্যগুণের অধিকারী না হলেও বাহুল্যবর্জিত সহজ স্বাভাবিক রচনায় তাঁর কিছু কৃতিত্ব স্বীকার্য। অবশ্য কাশীরাম যেমন বিচিত্র কল্পনার সঙ্গে ঝঙ্কারমুখর ভাষার মিলন ঘটিয়ে একটি নিপুণ বাক্‌রীতি গড়ে তুলেছেন, নিত্যানন্দের প্রতিভা ঠিক সে ধরনের ছিল না। তাঁর কাব্য মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেনি বলে কবির যথার্থ প্রতিভা সম্বন্ধে বাংলার পাঠকসমাজ ততটা অবহিত নন। কাশীরামের সমতুল্য না হলেও পরিমিত ক্ষেত্রে তিনি বেশ কুশলতার সঙ্গেই বিচরণ করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে।

কাশীরাম দাস (দেব) ॥ কৃত্তিবাসের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে গিয়ে বাঙালীর নিত্যস্মরণীয় হয়েছে, তিনি মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কায়স্থ-বংশীয় কাশীরাম দাস। তাঁর পৈতৃক উপাধি ছিল 'দেব'। উত্তর-ভারতে ভক্তকবি তুলসীদাস গোস্বামী রামায়ণ অবলম্বনে সুবিখ্যাত 'রামচরিতমানস' রচনা করে ভক্তের হৃদয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন; কিন্তু মহাভারত নিয়ে ওদেশে সেরকম কোন প্রাদেশিকভাষী কবির আবির্ভাব হয়নি। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্য ভাগ্যবান। মহাভারত-মহাসাগর সন্তরণ করা অতি দুরূহ, বিশেষতঃ বাংলার মতো প্রাদেশিক ভাষায়। সেই বিশালকায় মহাগ্রন্থকে কবি কাশীরাম বাঙালীর উপযোগী করে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। তাই এই কায়স্থ কবিকে বাংলার ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরাও মহাসম্মানে শিরোধার্য করেছেন।

কাশীরামের কুলপরিচয় ও রচনাদি নিয়ে এক সময়ে বহু আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনার কিছু কিছু নিদর্শন সাহিত্যপরিষদ পত্রিকার পুরাতন

ফাইলে পাওয়া যাবে। যদিও কাশীরাম কৃত্তিবাসের অনেক পরবর্তী কালের কবি, তবু তাঁর কুলপরিচয়াদি নিয়ে কৃত্তিবাসের মতোই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কবি মহাভারতের দু-এক স্থানে নিজের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন। তাঁর অগ্রজ-অনুজেরাও কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কাব্য থেকেও কাশীরাম সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই সমস্ত বর্ণনা থেকে তাঁর বংশধারা ও কাব্য রচনাদি সম্বন্ধে এই ধরনের দু'চারটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে: তাঁরা তিন ভাই—কৃষ্ণরাম, কাশীরাম ও গদাধর। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়, মতান্তরে এ গ্রামের নাম সিদ্ধি। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি, সিঙ্গি গ্রামেই কবির পিতৃভূমি, এ গ্রাম এখনও আছে। সেই গ্রামে আজও কাশীরামের স্মৃতিপূত স্থানগুলি আছে। কবির কনিষ্ঠ ভাই গদাধরের 'জগৎমঙ্গলে' এই বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ আছে। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। তাঁর অনুজ গদাধরের পুত্রের নাম নন্দরাম দাস। কাশীরামের কোন কোন পুঁথিতে নন্দরামের ভণিতা আছে। কবির গুরু অভিরাম মুখোটির উপদেশে কবি মহাভারত পাঁচালী রচনায় প্রবৃত্ত হন। কাশীরামের দু-একখানি পুঁথিতে সন-তারিখ জ্ঞাপক পয়ারের নির্দেশ আছে। তা থেকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৬০৪ ও ১৬০২-৩ খ্রীস্টাব্দের ইঙ্গিত পেয়েছেন। ১৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে নকলকরা কাশীরামের মহাভারতের একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে। এ তারিখে কোন ভুল না থাকলে আমরা অনুমান করতে পারি, ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে কাশীরাম মহাভারত অনুসরণে ভারতপাঁচালী রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশীরামের একখানি পুঁথিতে ১০০২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আর একখানি পুঁথিতে ১০২০ বঙ্গাব্দ (১৬১৩ খ্রীঃ অব্দ) আছে। তাই আমাদের মনে হয়, কবির কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকেই রচিত হতে আরম্ভ হয়।

কাশীরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কিনা তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। কারণ কাশীরামের কোন কোন পুঁথিতে আছে যে, মহাভারতের আদি পর্ব, সভা পর্ব, বন পর্ব ও বিরাট পর্বের খানিকটা রচনা করার পর তিনি স্বর্গারোহণ করেন।[১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

১ আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

পুঁথিশালায় রক্ষিত কাশীরামের কোন কোন পুঁথিতে আমরা এই ধরনের উক্তি দেখেছি। সেখানে আরও আছে যে, মৃত্যুকাল নিকটবর্তী দেখে কাশীরাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের ওপর অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে যান। অবশ্য কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর (নন্দরামের পিতা) বলেছেন যে, তাঁর অগ্রজ কাশীরাম গোটা মহাভারত রচনা করেন—দু-এক পর্ব নয়। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কাশীরাম-বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে, কাশীরাম মাত্র চারটি পর্ব রচনা করে লোকান্তরিত হন। তাঁর বংশের সকলেই অল্পাধিক কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা বা আর কেউ মহাভারতের আর চোদ্দটি পর্ব রচনা করে কাশীরামের কাব্যের পূর্ণতা সাধন করেন। সেই সমস্ত পর্বের অধিকাংশ স্থলেই কাশীরামের ভণিতা নেই। প্রথম চার পর্বে তাঁর এক-হাতের রচনা বলে তার বাঁধুনি প্রশংসনীয়, রচনাও মোটামুটি এক ধরনের। কিন্তু তার পরের পর্বগুলি বিভিন্ন লোকের রচনা বলে তাতে নানা ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক অংশ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি কাব্যটি একই হাতের রচনা। কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। সে যাই হোক, কাশীরামের মহাভারত কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতোই খ্যাতি লাভ করেছে।

কেউ কেউ বলেন কাশীরাম নাকি সংস্কৃত জানতেন না, মূল মহাভারত নাকি তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল। তিনি কথকদের মুখ থেকে মহাভারতের গল্প শুনে তাই পয়ারে ত্রিপদী ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন—এ কথা কেউ কেউ বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে কাশীরামের রচনা মিলিয়ে দেখেছি, কবি বেশ ভালো সংস্কৃত জানতেন। মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক যেভাবে তিনি বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে রূপায়িত করেছেন, তাতে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী বলেই মনে হচ্ছে। আর তা ছাড়া তাঁর ভাষা, শব্দপ্রয়োগ ও অলঙ্কার এতই সংস্কৃত-ঘেঁষা যে, এ ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। অত্যন্ত সংস্কৃত প্রভাবিত বলে তাঁর রচনা স্থানে স্থানে একটু কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি সংস্কৃত জানতেন না, কথকদের মুখ থেকে মহাভারত কাহিনী শুনে ভারত পাঁচালী রচনা করেছিলেন—এ সমস্ত জল্পনার পিছনে কোন সত্য নেই।

কাশীদাসী মহাভারতের প্রথম চার পর্বে দেখা যাচ্ছে, কবি সংক্ষেপে মূল কাহিনী অনুসরণ করেছেন, দু-এক স্থলে দু-একটি আখ্যান তিনি নিজে বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রচনার গুণে বানানো গল্পও মূলের অনুবাদ বলে মনে হয়। মধ্যযুগের সব অনুবাদকের মতো কাশীরাম মহাভারতের মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ করেছেন বলা চলতে পারে। কবি প্রসন্ন ভঙ্গীতে পরিচ্ছন্নভাবে কাহিনীটি বিবৃত করেছেন, কোথাও কোথাও তত্ত্ব ও নীতিকথাগুলিকে প্রায় হুবহু অনুবাদ করেছেন। তাঁর বর্ণনা বেশ সরস গতিযুক্ত হলেও উত্তর-চৈতন্য-যুগের প্রভাবে ভাষার মধ্যে বড়ো বেশী তৎসম শব্দ (অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ), সমাস-সন্ধির কিছু বাড়াবাড়ি এবং আলঙ্কারিক অতিরেক দেখা যায়—যার ফলে তাঁর ভাষা ও রীতি মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ স্খলদ্‌গতি হয়ে পড়েছে—কৃত্তিবাসের মতো গ্রামীণ সরলতা তাঁর ভাষার বহু স্থলেই লক্ষ্য করা যায় না। উপরন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর জীবন ও সমাজের এত বেশী ছাপ পড়েছে যে, রামকাহিনী বাঙালীর ঘরের সামগ্রী হয়ে গেছে। কাশীদাসী মহাভারতে ঠিক ততটা বাঙালীয়ানা দেখা যায় না। তবে কাশীরামের বিনয়াবনত বৈষ্ণব মনটি রচনার মধ্যে অকৃত্রিমভাবেই ধরা পড়েছে—ভক্তবংশে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তা তাঁর রচনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। এদিক থেকে উত্তর-চৈতন্য যুগের ভক্তির ধারা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে প্লাবিত করেছিল। তাঁর নামে আরও কয়েকখানি পুঁথি ও পালা পাওয়া গেছে, তবে এগুলি যথার্থ তাঁর রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেযুগে অনেক স্বল্পপ্রতিভাধর কবি কোন বড়ো কবির ভণিতায় কাব্য রচনা করে নিজেদের অক্ষম রচনাকে কালের দরবারে পাংক্তেয় করতে চেষ্টা করতেন। কাশীরামের ভণিতা দিয়ে অনেক কবি যে অনেক অযোগ্য রচনা কলমবন্দী করেছিলেন তাতে সন্দেহ নাই।

৩. ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্য

ষোড়শ শতাব্দীর মতো সপ্তদশ শতাব্দীতেও ভাগবতের কয়েক স্কন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ রচিত হয়েছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগবতের আখ্যান অবলম্বন করে স্বাধীন ধরনের কয়েকখানি কাব্য লেখা হয়েছিল। অবশ্য রামায়ণ-মহাভারতের মতো কোন উচ্চতর প্রতিভাশালী কবি ভাগবতে হস্তক্ষেপ করেননি বলে বাংলা সাহিত্যে ভাগবত-অনুসারী রচনা রামায়ণ-মহাভারতের মতো জনপ্রিয়তা লাভ

করতে পারেনি। তা ছাড়া ভাগবতে মূলত কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় বর্ণনা আছে, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ততটা অনুকূল নয়। ভাগবত বৈষ্ণবসমাজের উপনিষদ বলে বিবেচিত হলেও এর শুধু বৃন্দাবনলীলাটুকু (যার মধ্যে মাধুর্য রসের বেশী প্রকাশ হয়েছে) বাংলার বৈষ্ণবসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উপরন্তু বৈষ্ণব আবেগ ও উপাদান এই শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পথ পেয়েছে বলে ভাগবতের অনুসরণে রচিত অনুবাদাশ্রয়ী বাংলা কাব্য কাব্য-গুণেও যেমন কিছু খর্ব, তেমনি এর জয়প্রিয়তাও মন্দগতি।

মোটামুটি ভাগবত অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ভক্তকবি কৃষ্ণলীলা-কাহিনী রচনা করেছিলেন। কাশীরামের অগ্রজ কৃষ্ণদাস, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত, দুর্লভ নন্দন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধ ও পালা অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ভাগবতাচার্য 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী' নামে সমগ্র ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে-ছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কবিরা সমগ্র ভাগবতে হস্তক্ষেপ করতে ভরসা পাননি। এঁরা খুব সংক্ষেপে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অনুসরণ করেছিলেন। কেউ কেউ আবার লোকায়ত মতের বশবর্তী হয়ে ভাগবত-বহির্ভূত রাধাকৃষ্ণলীলা, বড়াই বুড়ি, দানলীলা প্রভৃতি গ্রাম্য কাহিনীও নিজ নিজ কাব্যে গ্রহণ করেছেন।

দু'জন কৃষ্ণদাস ভাগবত অবলম্বনে দু'খানি কাব্য লেখেন—'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ও 'গোবিন্দবিজয়'। কবিশেখর ভণিতাযুক্ত 'গোপালবিজয়' নামে যে কাব্য পাওয়া গেছে তাও ভাগবতেরই অনুসরণ। এঁদের মধ্যে শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তীর 'গোবিন্দমঙ্গল' উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবি আরও নানা কাব্য রচনা করে উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল। তিনি ভাগবতের প্রত্যেক স্কন্ধ থেকে কিছু কিছু কাহিনী নিয়ে এই কাব্য গ্রথিত করেন—এতে দু-টি-চারটি ভাগবত-বহির্ভূত পালাও আছে।

পরশুরাম নামে আর এক কবি ভাগবত অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। এঁর পুরো নাম পরশুরাম চক্রবর্তী। ইনি ভাগবত থেকে কাহিনী নিয়ে স্বাধীনভাবে কাব্য গ্রথিত করেন—যথারীতি তিনিও ভাগবতবহির্ভূত কৃষ্ণলীলা গ্রহণ করেছেন। তখন সমাজে মূল ভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে জনসমাজে-প্রচলিত রাধাকৃষ্ণঘটিত লৌকিক কাহিনীরও খুব জনপ্রিয়তা ছিল। এইজন্য

যাঁরা বিশুদ্ধ ভাগবত অনুসরণ করতেন তাঁরাও ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, লৌকিক গ্রাম্য কাহিনীর অমার্জিত অংশকে বাদ দিতে পারতেন না।

যেমন ভাগবতকে মোটামুটি অবলম্বন করে সপ্তদশ শতাব্দীতে একাধিক কৃষ্ণলীলা কাব্য রচিত হয়েছিল, তেমনি ভাগবত-বহির্ভূত গ্রামীণ কৃষ্ণকাহিনী অবলম্বনেও একাধিক কাব্য রচিত হয়েছিল। বাংলার সমাজে অনেক প্রাচীনকাল থেকে রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে কিছু অমার্জিত ধরনের রাখালী গাথা গড়ে উঠেছিল। এর উগ্র আদিরসের প্রতি জনচিত্তের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। অনেক কবি এর প্রলোভন দমন করতে পারেননি। তাঁরাও জনচিত্তের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে ভাগবতকে বাদ দিয়ে আদিরসাত্মক কৃষ্ণকাহিনী রচনা করেছিলেন। কবি-শেখরের কাব্যের অন্তর্ভুক্ত দানলীলা, দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি ভাগবত-অনুসারী রচনা হলেও এতে নানাস্থানে গ্রামীণ কৃষ্ণকাহিনীর প্রভাব আছে। এই ধরনের একটি কাব্যের এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

কবির নাম ভবানন্দ, কাব্যের নাম 'হরিবংশ'। এই কাব্যের পুঁথির সংখ্যা অতি অল্প। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কয়েকটি পুঁথি অবলম্বনে ১৩৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই কাব্য প্রকাশ করেন। কাব্যের মধ্যে কবি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। সম্পাদকের মতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালে কবি ভবানন্দ 'হরিবংশ' রচনা করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে অধিকাংশ পুঁথি পাওয়া গেছে বলে তাঁকে সতীশচন্দ্র পূর্ববঙ্গবাসী বলতে চান। সবচেয়ে প্রামাণিক পুঁথিখানি পাবনা থেকে পাওয়া গেছে। কবির ভাষাতে পূর্ববঙ্গের ছাপ বড়ো একটা নেই। ভাষা ইত্যাদি দেখে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে হয় না।

হরিবংশ নামেই হরিবংশ—এর সঙ্গে সংস্কৃত বিখ্যাত পুরাণ 'খিল হরিবংশ' বা অন্য কোন প্রামাণিক সংস্কৃত পুরাণের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। গোড়ার দিকে কবি খানিকটা পুরাণের ঢঙ বজায় রাখলেও এর পর তিনি লৌকিক ও গ্রাম্য আদর্শে রাধাকৃষ্ণলীলা অনুসরণ করেছেন। অবশ্য কৃষ্ণ ও গোপীদের লীলা, কৃষ্ণের মথুরায় গমন প্রভৃতি কাহিনীগুলি কিয়দংশে ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। কিন্তু প্রধান কাহিনী সম্পূর্ণরূপে পুরাণবহির্ভূত। কবি রচনায় বার বার সংস্কৃত গ্রন্থের নজির দিয়েছেন। কিন্তু এ একপ্রকার ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

কারণ তিনি সংস্কৃত পুরাণাদির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি। অনেকটা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতো রাধাকৃষ্ণের অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ শৃঙ্গারলীলা বর্ণনায় ভবানন্দ অধিকতর নিপুণতা দেখিয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁর রুচি প্রায় গ্রাম্য বর্বরতার ধার ঘেঁষে গেছে। অবশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী বয়নে তাঁর কিছু কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে, ভাষাভঙ্গিমাও মন্দ নয়। দু'-এক স্থলে উদ্ধৃত বৈষ্ণব পদগুলিও বেশ আন্তরিক হয়েছে। কিন্তু সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই কাব্যকে যতটা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন, এ কাব্য ঠিক ততটা প্রশংসার যোগ্য নয়।

ভাগবতকে অনুসরণ করে এই শতাব্দীতে যেমন কয়েকখানি কৃষ্ণলীলা কাব্য রচিত হয়েছিল তেমনি সংস্কৃতে রচিত কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরা, বিশেষত সনাতন, রূপ, জীব ও গোপাল ভট্ট রচিত বৈষ্ণব কাব্য ও তত্ত্ব গ্রন্থগুলির কিছু কিছু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় অনুবাদ হতে আরম্ভ করে। মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত থেকে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক যে ভক্তিরসের কাব্য আনেন, এই শতাব্দীতে তার অনুবাদ করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রূপগোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংস্কৃত কাব্য-নাটক যদুনন্দন বাংলা কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত রায় রামানন্দের ভক্তিরসের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও প্রশংসার যোগ্য। ভাগবতের দু-একটি প্রসিদ্ধ আখ্যান নিয়েও স্বাধীনভাবে ছোট ছোট আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল। এ সব অধিকাংশই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল, সবগুলির কাব্যগুণও এমন কিছু প্রশংসনীয় নয়। যাই হোক সপ্তদশ শতাব্দীতে একা কাশীরামই অনুবাদ-সাহিত্যের সমস্ত দীনতা ঘুচিয়েছিলেন—যদিও তাঁর নামে প্রচারিত মহাভারতের অতি সামান্যই তাঁর রচনা।

—

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্য

১. ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার পর তাঁর বিরহে গৌড়বঙ্গ, উৎকল ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগোষ্ঠী যে অনাথ হয়ে বিষণ্ণতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুও মর্ত্যকায়া ত্যাগ করলেন, ফলে হতাশা আরও গভীর ও বেদনাবহ হয়ে পড়ল। কিন্তু মরা নদীতেও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, হৃতসর্বস্ব বৈষ্ণব সমাজেও নতুন ভাবপ্রবাহ বন্যার আকারে দেখা দিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত-আচার্যের তিরোধানের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলার বৈষ্ণবসমাজ ধীরে ধীরে শোকাহত জড়তা কাটিয়ে উঠল, বাংলার নানা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ কেন্দ্র গড়ে উঠল, নতুন আচার্য ও নেতারা আবির্ভূত হলেন, বৈষ্ণব সমাজ আবার নবভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠল, সমাজের মধ্যম স্তর ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও চৈতন্য-প্রভু-প্রবর্তিত প্রেমমূলক বৈষ্ণব মতাদর্শ ও আচার-আচরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বস্তুত সপ্তদশ শতাব্দীতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংকীর্ণতর সম্প্রদায়-সীমা ছাড়িয়ে সারা বাংলায় সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করল। জমিদার, সামন্ত ও ধনী অভিজাত ব্যক্তিরাও এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব আচার্যদের চরণে শরণ নিলেন, ফলে অভিদ্রুত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ উচ্চতর সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হল। কতকগুলি বৈষ্ণবকেন্দ্র থেকেও এই মতবাদ বিশেষভাবে সমাজের সর্বস্তরে বিস্তীর্ণ হতে লাগল, নানা সময়ে কোন উৎসবকে উপলক্ষ করে বৈষ্ণবদের সম্মেলন আহৃত হল, ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবসম্প্রদায় সংহত হয়ে বিশাল ধর্মশাখায় পরিণত হল। বৃন্দাবনের জীবগোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সমাজ বিশালত্ব লাভ করলেও এ যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীর মতো ততটা উৎকর্ষ দেখা যায় না। সংখ্যায় বৈষ্ণব কবিরা বেড়েছেন, বহু পদ রচিত হয়েছে, বৈষ্ণব সমাজ ও আদর্শ বিষয়ক অনেক ইতিহাস-কাব্য লেখা হয়েছে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ যে ম্লান হয়ে এসেছে তা স্বীকার করতে হবে। এই যুগ বৈষ্ণবসমাজের আত্মসংহতি ও আত্মবিস্তারের যুগ, কর্ম ও প্রচারের যুগ। কিন্তু সৃষ্টিমূলক বৈষ্ণব সাহিত্য এ

যুগে যে কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার নানা প্রমাণ এই শতকের সাহিত্যের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। আমরা প্রথমে এই যুগের বৈষ্ণব কেন্দ্র ও কেন্দ্রপাত আচার্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব, তারপর বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করব।

২. আচার্য ও কেন্দ্র

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐশ্বর্য কিছু ম্লান হলেও কয়েকজন আচার্য এই ধর্ম ও মতাদর্শকে অতি দ্রুত সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী মহলে ও অভিজাত বংশে জনপ্রিয় করে তোলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ। এই ত্রয়ী সাধক যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্যায় মহাপ্রভুর আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁদের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণবধর্ম সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যক্তির মত ও বিশ্বাসকে গ্রাস করতে পারত না। এই তিনজন আচার্য নানাস্থানে জন্মালেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বৃন্দাবনের আচার্যদের কাছে। এঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ, নরোত্তম কায়স্থ এবং শ্যামানন্দ সদ্‌গোপবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শেষোক্ত দু'জন অব্রাহ্মণ হলেও চারিত্রিক শুচিতার জন্য ব্রাহ্মণদেরও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছিলেন।

শোনা যায় (অন্তত 'ভক্তিরত্নাকর,' 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতির মতে) গৌড়ে মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে ভক্তিধর্ম শিথিল হয়ে পড়লে মহাপ্রভুর আশীর্বাদে চৈতন্যদাস নামক এক ভক্তের শ্রীনিবাস নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইনিই বৈষ্ণব ধর্মকে নবতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, মহাপ্রভুর আশীর্বাদের এই হল প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য। শ্রীনিবাসের জন্মের সময় মনে হয় মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত আচার্য—কেউ-ই জীবিত ছিলেন না। অবশ্য কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে যে, শ্রীনিবাস আচার্য বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নাকি মহাপ্রভু সন্দর্শনে নীলাচল যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার বার্তা পেয়ে মর্মাহত হন। এসব বিষয়ে কোন কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। কারণ ভক্তের দৃষ্টিতে সন-তারিখ বা ঘটনার বস্তুগত যাথার্থ্য অনেক সময় লঙ্ঘিত হয়ে যায়। কাজেই একাধিক বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীনিবাস সম্বন্ধে একাধিক বিবরণী আছে—এর মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রামাণিক তা বলা মুশকিল। চৈতন্যভক্ত পিতা চৈতন্যদাসের নিকট পুত্র শ্রীনিবাস প্রথম যৌবনে ভক্তিধর্ম শিক্ষা করে শিক্ষা পূর্ণ করার জন্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং

গোপাল ভট্টের কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করেন। জীব-গোস্বামীও তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন। এই বৃন্দাবনে আর দু'জন শিক্ষার্থী ও ভক্তের সঙ্গে তাঁর গাঢ় বন্ধুত্ব হয়। একজন হলেন রাজশাহীর খেতুরীর জমিদার-পুত্র নরোত্তম, আর একজন উৎকলের শ্যামানন্দ। শিক্ষা-সমাপ্তির পরে তাঁদের যোগ্য পাত্র জেনে জীবগোস্বামী গৌড়ে ভক্তিধর্ম সুদৃঢ় করবার জন্য তাঁদের এদেশে প্রচারকার্যে পাঠিয়ে দিলেন। যদিও তিনজনই বৃন্দাবনে সারাজীবন কাটাতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু জীবের নির্দেশে তাঁরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃন্দাবন ছেড়ে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করলেন। জীব বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ তাঁদের সঙ্গে গৌড়ে পাঠাতে উদ্যোগী হলেন। রূপ-সনাতন-গোপালভট্টের সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথি একটি বৃহৎ পেটিকায় ভরে জীব গোযানে প্রেরণ করলেন। সঙ্গে রক্ষকেরা চললেন, আর চললেন তিনবন্ধু শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

পথে বেশ নিরাপদেই দিন কাটতে লাগল। কিন্তু বিপদ বাধল গৌড়ে এসে। যখন তাঁরা গ্রন্থসহ বনবিষ্ণুপুরে এসে উপস্থিত হলেন তখন অতর্কিতে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। দস্যুরা গ্রন্থপূর্ণ পেটিকাটিকে ধনরত্ন মনে করে লুঠ করে নিয়ে গেল। তিনবন্ধু হায় হায় করতে লাগলেন। প্রাণের চেয়েও মূল্যবান গ্রন্থ অপহৃত হওয়া প্রাণত্যাগের চেয়েও দুর্বিষহ। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ক্ষুব্ধ চিত্তে নিজ নিজ বাসভূমিতে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস পুঁথির আশা ছাড়লেন না। তিনি সংবাদ পেলেন বনবিষ্ণুপুরের দুর্দান্ত রাজা বীরহাম্বীর নিজেই দস্যুদলের নেতা, দস্যুরা তাঁরই নির্দেশে লুঠতরাজ করে থাকে। শ্রীনিবাস তখন নিজ পরিচয় গোপন করে বীরহাম্বীরের সভাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে দস্যুরাজ বীরহাম্বীরের কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হল। তিনি গ্রন্থপেটিকা অপহরণের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হলেন। ভাগ্যক্রমে সমস্ত গ্রন্থই পাওয়া গেল, কোনটি নষ্ট হয়নি। তারপর বীরহাম্বীর সপরিবারে ও সবান্ধবে বৈষ্ণব ভক্তে পরিণত হলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নিলেন। শ্রীনিবাসের নির্দেশে ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুপুর অঞ্চল বৈষ্ণব-সাধনার তীর্থে পরিণত হল। বীরহাম্বীরের বংশধর দীর্ঘকাল বৈষ্ণব মতাদর্শ বজায় রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া যাক। গ্রন্থা-পহরণের সংবাদ শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এতই মর্মাহত হয়ে পড়েন যে, তিনি নাকি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এ কথা বোধ হয় সত্য নয়। কারণ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো ভক্ত, দার্শনিক ও কবি বার্ধক্যে কি এতদূর আত্মবিস্মৃত হবেন যে, আত্মহত্যার মতো মহাপাতক আশ্রয় করবেন? তা মনে হয় না। গ্রন্থ চুরির সংবাদে বৃদ্ধ বয়সে তিনি হয়তো শোক সামলাতে পারেননি—তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল—এ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীনিবাস শুধু যে বীরহাম্বীরকে চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন তা নয়। বহু দস্যু, জমিদার ও ভক্তের দল তাঁর ভক্ত হয়ে জীবনকে ধন্য মনে করেছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্যের অন্যতম। শ্রীনিবাস খুব উচ্চস্তরের সাধকও ছিলেন—অধ্যাত্ম আবেগে তিনি চিত্তের গভীরে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করে বহু সময় ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজে সুগভীরভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল, দরিদ্র অকিঞ্চনের ধর্ম আভিজাত্যের বর্ম ভেদ করতে পেরেছিল তাঁরই চারিত্রিক ঐশ্বর্যের দ্বারা। তবে এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে একটি কথা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলতে হবে। রাজা-মহারাজার গুরুগিরি করার ফলে তাঁকে নিত্যই ধনকুবেরদের সংস্পর্শে আসতে হত। ফলে তাঁর আচার-আচরণে যৎসামান্য রাজসিক ভাব অনুপ্রবেশ করেছিল, যা তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তিনি দুটি বিবাহ করেছিলেন। এই বিয়েতে তাঁর শিষ্য রাজা বীরহাম্বীর প্রচুর আড়ম্বর করেছিলেন। তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধেও রাজশিষ্যের বায়ে খুব 'দীয়তাং, ভুজ্যতাং' হয়েছিল। তাঁর এই আচরণ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ভালো লাগেনি, তাঁর সাড়ম্বর বিবাহের সংবাদে তাঁরা কিছু ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন। সে যাই হোক, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের দ্রুত প্রসারের জন্য তাঁর প্রভাবই দায়ী। তাঁর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ মান্যা হয়েছিলেন, তাঁরও অনেক শিষ্য ছিল।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় (দত্ত) শ্রীনিবাসের ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই মহাপ্রভুর কথা শুনে তিনি বিষয়ভোগে নিরাসক্ত হয়ে পড়েন, তারপরে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এসে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্রাদি পড়তে থাকেন। তখন শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতি স্থাপিত হয়। গ্রন্থাপহরণের পর তিনবন্ধুর মধ্যে শ্রীনিবাস গ্রন্থ উদ্ধারের আশা না ছেড়ে বনবিষ্ণুপুরেই রয়ে যান। নরোত্তম ক্ষুব্ধচিত্তে নিজ গ্রাম খেতুরীতে ফিরে যান এবং রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে দীনভাবে সাধন-ভজন করতে থাকেন।

শ্যামানন্দও কিছুকাল তাঁর সান্নিধ্যে বাস করেছিলেন। তাঁর এমন মহিমা যে, দুর্দান্ত ডাকাত দস্যুবৃত্তি ছেড়ে তাঁর ভক্তশিষ্যে পরিণত হয়। একদিক দিয়ে নরোত্তম বৈষ্ণবসমাজে এক অভাবনীয় বিপ্লবের সূচনা করেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করে কিছু করেননি, তাঁর অলোকসামান্য প্রভাবেই সেই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল, যা বহু শতাব্দীর সাধনাতেও সম্ভব হয় না। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম জাতি-পাঁতির ভেদ মানেনি বটে, কিন্তু তাঁর সময়েও বৈষ্ণব সমাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে কিছু সামাজিক ভেদ ছিল। সামাজিক চাতুর্বর্ণ্যকে চৈতন্যদেব বিপ্লবীর মতো কালাপাহাড়ী মন নিয়ে ভাঙতে-চুরতে চাননি। আর তা ছাড়া তিনি শেষ দিকে এতই ভাবরসে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, এ-সব বিষয় চিন্তা করবার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। তাই তাঁর সময়ে বৈষ্ণবসমাজে কিছু প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু কায়স্থসন্তান ঠাকুর নরোত্তমের এমনই মাহাত্ম্য যে, বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণরাও তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। বৈষ্ণবসমাজের তিনিই হচ্ছেন প্রথম অব্রাহ্মণ গুরু ও আচার্য। তাঁর সাত্ত্বিক চরিত্রের জন্য নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র তাঁকে সর্বসমক্ষে ব্রাহ্মণ বলে আলিঙ্গন করেন। এর ফলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কিছু বাদপ্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাঁরা তাঁর গুরুপদ মানতে চাননি, তাঁরাই পরিশেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়ে যান। এই অসাধারণ সামাজিক পরিবর্তন আইন করে হয়নি, জোর করে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। তাঁর চরিত্রই তাঁর চারিদিকে ভক্তি ও সাত্ত্বিকতার জ্যোতির্বলয় রচনা করেছিল।

তাঁর আর একটা বড়ো কাজ, খেতুরী গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বৈষ্ণব-সম্মেলন আহ্বান। মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা ও উৎকলের বহু বৈষ্ণব এই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এর পূর্বেও দু' একটি বৈষ্ণব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু খেতুরী উৎসব ইতিহাসের দিক থেকে অতিব্যাপক ও মূল্যবান। এই উৎসবে বিভিন্ন বৈষ্ণব গুরু আচার্য ও সম্প্রদায় যোগ দিয়ে বৈষ্ণব তত্ত্বাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, পদাবলী-কারদের শ্রেষ্ঠ পদ কীর্তনের আকারে গান করা হয়েছিল, কীর্তনের বিভিন্ন ঘরানার গায়কগণও এই উৎসবে নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। স্বয়ং নরোত্তম বিশেষ ধরনের কীর্তনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এই সময়েই তিনি

ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হয়। অতঃপর, তাঁর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে মৃদু প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠেছিল, তা এই সম্মেলনের পর সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। সমগ্র উত্তর-বঙ্গে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য নরোত্তমের প্রভাবই বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল। তিনি কবি-প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রার্থনাবিষয়ক পদগুলি আন্তরিকতায় অনুপম। সুগভীর সাধন-ভজনবিষয়ক কিছু কিছু পুঁথি তাঁর ভণিতায় পাওয়া গেছে। এগুলির অধিকাংশই তাঁর রচিত নয় বলে মনে হয়। বৈষ্ণব সামাজিক ইতিহাসে তাঁর প্রভাব অপরিমেয়, বৈষ্ণব ভক্তজনের হৃদয়ে তাঁর স্থান নিত্যস্থায়ী।

শ্যামানন্দের দ্বারা উৎকলে চৈতন্যধর্ম বিশেষ প্রচার লাভ করে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিজ ভক্তি ও সাত্ত্বিক চরিত্রের দ্বারা বৈষ্ণবসমাজে পূজার্হ স্থান লাভ করেছিলেন। উড়িষ্যায় দরিদ্র সদ্‌গোপ বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল দুঃখী। তিনি অনুন্নত সমাজে জন্মে বহু কষ্টে সংস্কৃত বিদ্যাদি অর্জন করেন। পরে তাঁর মধ্যে ভক্তির শুদ্ধ প্রকাশ দেখে হৃদয়চৈতন্য নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর 'দুঃখী' নাম বদলে কৃষ্ণদাস নাম রাখেন। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে জীব গোস্বামীর সান্নিধ্যে আসেন এবং গভীরভাবে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। রাধাকৃষ্ণলীলা তিনি নিত্য ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ করতেন। তাই জীবগোস্বামী তাঁর নতুন নামকরণ করেন—শ্যামানন্দ। পরবর্তী কালে তিনি সেই নামেই পরিচিত হন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। গ্রন্থ চুরির পর শ্যামানন্দ খেতুরীতে বন্ধু নরোত্তমের নিকট অবস্থান করে সাধন-ভজনে কালাতিপাত করেন। পরে উৎকলে তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উৎকলের জমিদার ও সামন্তরাজগণ তাঁকে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। অনেক দুর্দান্ত দস্যু তাঁর চরণোপান্তে পতিত হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিল। এমন কি শের খাঁ নামে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত নিজ ধর্মমত ও ডাকাতি বিসর্জন দিয়ে তাঁর শিষ্য হন। শ্যামানন্দ শের খাঁর নতুন নাম দেন—চৈতন্যদাস। ইনি কিছু কিছু পদও রচনা করেছিলেন। রসিক মুরারি নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা সস্ত্রীক শ্যামানন্দের শিষ্য হয়েছিলেন। বস্তুত শ্যামানন্দের প্রভাবেই উৎকলে চৈতন্যধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন বৈষ্ণব আচার্য-আচার্যার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিত্যানন্দ যেমন খড়দহ কেন্দ্র থেকে চৈতন্যধর্ম প্রচার করে পশ্চিম-বঙ্গের বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তেমনি তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং জ্যেষ্ঠা পত্নীর সন্তান বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) তাঁর তিরোধানের পর খড়দহ কেন্দ্রকে অতিশয় প্রধান করে তুলেছিলেন। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবী বৈষ্ণবসমাজে অতিশয় মান্যা ছিলেন। এঁদের মধ্যে জাহ্নবাদেবী আচার্যার গৌরব লাভ করে বহু শিষ্যকে মন্ত্র দান করেছিলেন, এবং বৈষ্ণবসমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি খেতুরী উৎসবে সশিষ্য উপস্থিত ছিলেন এবং তারপর কিছু-কাল বৃন্দাবনে অবস্থান করে স্থানীয় গোস্বামীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

তাঁর সপত্নী-পুত্র প্রসিদ্ধ বীরভদ্রও খড়দহ কেন্দ্রকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে-ছিলেন। বীরভদ্র নিত্যানন্দের যোগ্য পুত্র ছিলেন, তিনিও বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় সম্মানিত হয়ে নানা সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্ম প্রচারণায় তাঁর খুব নিষ্ঠা ছিল। উদার ধর্মমতের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবসমাজে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়েও তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। অবধূত নিত্যানন্দ জাতি-পাঁতির বড়ো একটা ভেদ মানতেন না। এমন কি এ নিয়ে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গেও তাঁর বাদানুবাদ হত। পুত্র বীরভদ্রও সেই আদর্শে দীক্ষিত হয়ে হীন পতিতকে কোল দিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, খেতুরী উৎসবে সর্বজনসমক্ষে কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা এবং 'নেড়ানেড়ী' নামে অপখ্যাত কদাচারী সহজিয়াদের বৈষ্ণবসমাজে স্থান দান। এ দুটোই বৈষ্ণবসমাজের বৈপ্লবিক সংস্কার বলে গৃহীত হতে পারে। নরোত্তমের কথা পূর্বে আমরা বলেছি। সহজিয়া সম্বন্ধে এখানে দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

বহু পূর্বে বৌদ্ধ সহজিয়াগণ বিচিত্র আচার-আচরণ এবং দুজ্ঞেয় অধ্যাত্ম মতবাদ বাংলার সমাজে প্রচার করেছিলেন। কালক্রমে হিন্দুধর্মের চাপে পড়ে এঁরা অনেকেই আত্মগোপন করেন এবং সমাজের গহনে মুখ লুকিয়ে থাকেন। ক্রমে ক্রমে এঁদের গোপনীয় ধর্মসাধনায় বহু অনাচার প্রবেশ করে। ফলে এই সমস্ত মুণ্ডিত-মস্তক স্ত্রী-পুরুষ সহজিয়াদের হিন্দুসমাজে 'নেড়ানেড়ী' বলে ঘৃণা করা হত। দয়াল বীরভদ্র দেখলেন, হীন পতিতকে উদ্ধার করবার জন্যই

চৈতন্য-নিত্যানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল। সুতরাং সামাজিক দিক থেকে হেয় উক্ত সহজিয়া নেড়ানেড়ীদেরও বৈষ্ণবমণ্ডলে গ্রহণ করা কর্তব্য। ত'ারই কৃপায় সহস্রাধিক নেড়া ও ততোধিক নেড়ী ত'ার প্রভাবিত বৈষ্ণবসঙ্ঘে স্থান পায়। তবে এর একটা সুফলও ফলেছিল। সহজিয়া নেড়ানেড়ীরা বৈষ্ণবসমাজে স্থান পেলেও নিজ নিজ গোপনীয় ও রহস্যময় ধর্মাচার ছাড়তে পারেননি। এ'রাই পরে বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে একটি উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করেন—এ'দের নাম বৈষ্ণব সহজিয়া। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণ শিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে এ'দের বিশেষ প্রভাব ছিল। এ'রা অনেক উৎকৃষ্ট পদ লিখেছিলেন। সহজিয়া চণ্ডীদাসের বহু পদ এখনও প্রচলিত আছে। তবে এ'দের আচার-আচরণ কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শের মূলে গভীর গহ্বর সৃষ্টি করেছিল এবং বৈষ্ণব আদর্শের অধোগতির মূলে এ'দের প্রভাবই বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। সে যাই হোক, বীরভদ্র মানসিক ঔদার্য ও বৈপ্লবিক আদর্শের বশে এ'দের বৈষ্ণবসমাজে স্থান দিয়ে আশ্চর্য সামাজিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। ত'ার উদার মতের জন্য মুসলমান শাসনকর্তা ত'াকে মান্য করতেন। আধুনিক কালে যে সমাজ-সংস্কারের জন্য আমরা কলকণ্ঠ, তিন শতাব্দী আগে বৈষ্ণব বীরভদ্র তারাই এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন—যদিও সর্বত্র তার ফল ভালো হয়নি। কারণ সহজিয়ারাই বৈষ্ণবসমাজে শিথিল নৈতিক জীবনের হানিকর আদর্শ ছড়িয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবদের আরও কয়েকটি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। বনবিষ্ণুপুর (শ্রীনিবাস আচার্য), খেতুরী (নরোত্তম ঠাকুর), উৎকল (শ্যামানন্দ) এবং খড়দহকে (বীরভদ্র ও জাহ্নবাদেবী) কেন্দ্র করে যেমন এই যুগে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তেমনি শান্তিপুর ও শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করেও বৈষ্ণবসমাজ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। অদ্বৈত প্রভুর জীবিতকালেই শান্তিপুর চৈতন্যধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ত'ার তিরোধানের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের নেতৃত্বে অদ্বৈত-অনুচর ও পরিকরগণ শান্তিপুরকেও নানা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য দিয়েছিলেন। অচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন, কিছুকাল পুরীধামে ত'ার সান্নিধ্যে বাসও করেছিলেন। নানা তথ্য থেকে মনে হচ্ছে শান্তিপুর-গোষ্ঠীর সঙ্গে খড়দহ-গোষ্ঠীর মতাদর্শ নিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বীরভদ্র

শান্তিপুরে গিয়ে দীক্ষা নেবেন সিদ্ধান্ত করলে খড়দহ-গোষ্ঠী তাঁকে বিশেষভাবে বাধা দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বিমাতা জাহ্নবাদেবীর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ড বা বৈদ্যখণ্ড গ্রাম মহাপ্রভুর সমকালেই বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। চৈতন্যের সমসাময়িক ও সেবক নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের জীবিতকালেই এই গ্রামের বৈষ্ণব-সমাজে মহাপ্রভু-কেন্দ্রিক একপ্রকার আদিরসাত্মক সাধনা, কাব্য ও পদাবলীর সৃষ্টি করেন। এর নাম নাগরীভাব বা গৌরনাগর সাধন। এর সরলার্থ হল —গৌরাঙ্গ যেন শ্রীকৃষ্ণের মতো নাগর এবং গৌরাঙ্গভক্তেরা যেন নাগরী। অনেকটা ভাগবতের কৃষ্ণ-গোপীলালার আদর্শে নরহরি এবং তাঁর ভক্ত অনুচর লোচন দাস (ত্রিলোচন দাস—যিনি চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন) নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর আদিরসাত্মক পদ লিখেছিলেন। নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ স্বয়ং নরহরি এবং মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন—এঁরাই শ্রীখণ্ডকে বৈষ্ণব নাগরীভাবের কেন্দ্রে পরিণত করেন। এঁরা আবার গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি উপাসনারও ব্যবস্থা করেছিলেন। ঈষৎ পরবর্তী কালে নরহরির ভ্রাতু-ষ্পুত্র রঘুনন্দন এই কেন্দ্রের প্রধান আচার্য হয়েছিলেন—তাঁর অনেক শিষ্য তাঁর কাছে গোপালমন্ত্রের স্থলে গৌরমন্ত্র নিয়েছিলেন। এঁরা নাগরীভাবের সাধনায় গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে দেখে যে কাব্যধারা ও সাধনধারা সৃষ্টি করেছিলেন তার সাত্ত্বিকতা ও নৈষ্ঠিকভাব নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু পরবর্তী কালে অনধিকারীর হাতে পড়ে গৌরনাগর-ভাবের পদে ও সাধনায় নানা বিকৃতি প্রবেশ করে। বৈষ্ণব সহজিয়ারাও এঁদের আদর্শ কিছু নিয়েছিলেন, কিন্তু সাধনায় সাত্ত্বিকতার স্থলে আদিরসের অনাচার প্রবল হয়ে এই সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও পবিত্র রসসাধনাকে নষ্ট করে দেয়। সে যাই হোক, শ্রীখণ্ড গ্রাম এখনও বৈষ্ণব সাধনপীঠ বলে পূর্বগৌরব রক্ষা করছে।

এবার বৈষ্ণব সহজিয়া সম্পর্কে দু'চার কথা বলে এ প্রস্তাব সমাপ্ত করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণবসমাজের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি উপ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে তিনি সহজিয়া বৈষ্ণব সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। সেই তথ্যে তথ্যগত দু'চারটি ভ্রান্তি থাকলেও

তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষ থেকে এই রহস্যবাদী সম্প্রদায় সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন। আমরা জানি, বহু পূর্বে বৌদ্ধ সহজিয়ারা বাংলাদেশে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু সেন বংশের প্রবলতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ফলে এই বৌদ্ধ সম্প্রদায় অতি দ্রুত যবনিকার অন্তরালে চলে যায়, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এদেরই ভগ্নাবশেষ স্ত্রী-পুরুষ 'নেড়ানেড়ী' নামে পরিচিত হয়েছিল। পরে বীরভদ্র এঁদের নিজ গোষ্ঠীতে স্থান দিলে এঁরা নিমাই-নিতাইয়ের ভজনা করলেও নিজেদের সহজিয়া সংস্কার ছাড়তে পারলেন না, বৈষ্ণবসমাজের মধ্যেই বৈষ্ণব সহজিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন। এঁদের কতকগুলি গোপনীয় সাধন-ভজন ছিল, যাতে স্ত্রী-পুরুষের অসামাজিক মেলামেশার অবাধ সুযোগ ছিল। এঁদের খুব গভীর অধ্যাত্মমার্গের সাধন-ভজন প্রণালী আছে। অনেক বৈষ্ণব কবি এঁদের কৃত্য গ্রহণ না করেও এই ভাবাদর্শ অবলম্বনে অনেক উৎকৃষ্ট সহজিয়া পদ লিখে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চণ্ডীদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে অন্যত্র চণ্ডীদাস-সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আরও অনেক কবি ও সাধক সহজিয়া মতের পদ ও সাধন-ভজন-সংক্রান্ত পুঁথি লিখেছিলেন—তার মধ্যে দু-চারখানি পুঁথি গদ্যে লেখা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত এই সহজিয়া গদ্য বেশ সহজ।

এদের সম্বন্ধে ইদানীং ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এডোয়ার্ড ডিমক সাহেব খুব মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। বাংলাদেশে যাঁরা বাউল সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরাও সহজিয়া সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য উদ্ধার করেছেন। বাউলদের কেউ কেউ সহজিয়া ধরনের সাধন-ভজনে বিশ্বাসী ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ শ' পুঁথি পাওয়া গেছে, তাতে সাধন-ভজনের নির্দেশ এবং ঐ সাধন-সংক্রান্ত প্রহেলিকা ভাষায় লেখা 'রাগাত্মিকা' পদ পাওয়া গেছে। বহু পূর্বে বৌদ্ধ আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও বৈষ্ণব সহজিয়ারা কিন্তু কোথাও বৌদ্ধ মত ব্যক্ত করেননি, বরং শাক্ততন্ত্র ও শৈবতন্ত্রের দিকে তাদের ঝোঁক ছিল বেশী। অবশ্য বৈষ্ণব সহজিয়াদের সহজরস এবং বৌদ্ধ সহজিয়াদের নির্বাণ অনেকটা একরকম। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মূল লক্ষ্য পিণ্ডদেহকে আরোপ-সিদ্ধির দ্বারা রাধাকৃষ্ণের ভাগবতী তনুতে পরিণত করে বিশুদ্ধ প্রেমরস উপলব্ধি।

বৌদ্ধ সহজিয়াদেরও শেষ লক্ষ্য নির্বাণ—যা সর্বদা মহাসুখময় ও আনন্দস্বরূপ। অবশ্য বৈষ্ণব সহজিয়ারা দীর্ঘকালের ব্যবধানে নিজেদের পূর্বরূপ অর্থাৎ বৌদ্ধভাব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। এই সম্প্রদায় এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বাংলার বাউলসমাজ ও অন্যান্য নানা উপসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এঁরা এখনও জীবিত আছেন। তবে কালগতিকে এঁদের সংখ্যা ও প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আমাদের মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের প্রধান সম্পর্ক রাগাত্মিকা পদ। এই পদগুলি গোপনীয় ও দুরূহ সাধন-ভজন-সংক্রান্ত হলেও এর কোন কোন অংশে অতি আশ্চর্য কাব্যধর্ম ও গীতিরস উপলব্ধি করা যাবে। সেইজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে পদগুলির কথা কিঞ্চিৎ আলোচনার যোগ্য।

৩. বৈষ্ণব পদাবলী

ইতিপূর্বে আমরা আভাসে বলেছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মমত ও সমাজের অভূতপূর্ব শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের তাদৃশ উৎকর্ষ দেখা যায়নি। মহাজন ও আচার্যেরা সাম্প্রদায়িক সংহতি ও প্রচারের দিকে এতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, গভীর ভাববহ পদসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির দিকে ততটা দৃষ্টি দিতে পারেননি। উপরন্তু তখন বৈষ্ণবসমাজের মন বাইরের দিকে প্রসার লাভ করেছে। অন্তরের কথা এই রকম পরিবেশে কিছু দুর্বল হবেই। যাই হোক এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকজন পদকর্তার পরিচয় দিচ্ছি।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ ॥ সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজে এবং সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা ও উৎকলে এঁদের কী ধরনের প্রভাব ছিল তা আমরা এর আগে বলেছি। এঁরা তিনজনেই কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে এঁদের কিছু কিছু পদও পাওয়া গেছে। ব্রজবুলিতে লেখা শ্রীনিবাসের দু-চারটি পদের ধ্বনিঝঙ্কার, রূপকল্প ও অলঙ্কার সন্নিবেশ বেশ চমৎকার। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ কীর্তনগায়ক ছিলেন, 'মনোহরসাহী' ঘরানার কীর্তনের তিনিই প্রবর্তক। তবে কবিত্ব বিচারে নরোত্তম ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—কারণ তিনি প্রকৃতই কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রার্থনাবিষয়ক পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে অতুলনীয়। ভক্তির গভীরতা ও অন্তরের আর্তিতে

পদগুলির সাত্ত্বিকভাব এখনও পাঠক-শ্রোতার অন্তর বিগলিত করে দেয়। তবে তাঁর কবিখ্যাতির জন্য অনেক বাজে পদ ও পুস্তিকা তাঁর নামে চলে গেছে যেগুলির কোনটাই বোধহয় তাঁর রচিত নয়। তাঁর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলিও সহজ সুরে চিত্তাকর্ষী হয়ে দেখা দেয়। শ্যামানন্দের ভণিতাযুক্ত দু-একটি পদ 'পদ-কল্পতরু' নামক বৃহত্তম বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে—এর ভাষা বেশ সুললিত, ভাবও সুগভীর। তবে নরোত্তমের যেমন একটা স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা ছিল, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের প্রতিভা ঠিক সে জাতীয় নয়, তা যেন অনেকটা চেষ্টাকৃত।

গোবিন্দ আচার্য ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ॥ এর আগে আমরা গোবিন্দদাস কবিরাজের পরিচয় দিয়েছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাসের মতোই অনেকগুলি গোবিন্দ ছিলেন। কেউ কেউ নিজ উপাধিসহ ভণিতা দিয়েছেন, কেউ-বা বৈষ্ণবীয় দীনতাবশত নামের সঙ্গে 'দাস' জুড়ে দিয়ে ছোট মাপের গোবিন্দদাস-সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজের পদগুলি চিনে নেওয়া দুরূহ নয়। বাক্‌নির্মিতি ও ভক্তিরসই তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দ আচার্য ও গোবিন্দ চক্রবর্তী নামে দু'জন পদকর্তা কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদ লিখে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজের অনেক আগে গোবিন্দ ঘোষ নামে এক কবি চৈতন্যলীলাবিষয়ক কিছু পদ লিখেছিলেন। তাঁর দুটি ছোট ভাই মাধব ঘোষ ও বাসু (বাসুদেব) ঘোষও পদকর্তা হিসেবে সুপরিচিত। তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বাসু ঘোষের চৈতন্যসন্ন্যাসবিষয়ক পদগুলি করুণরসের নিঝ'ররূপে গণনীয়। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ 'গোবিন্দ' ভণিতা ব্যবহার করতেন বলে গোবিন্দদাস-সংক্রান্ত পদের মধ্যে একটু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

গোবিন্দ আচার্য নামে এক পদকর্তা চৈতন্যদেবের সময় বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর চৈতন্যলীলাবিষয়ক পদে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো অভিজ্ঞতার চিহ্ন আছে। তাঁর পদগুলি বেশ সরল এবং তিনিও গোবিন্দদাস ভণিতা দিয়েছেন। ফলে গোবিন্দদাস কবিরাজের বাংলা পদের সঙ্গে গোবিন্দ আচার্যের পদের কিছু মিশ্রণ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। মনে হয় গোবিন্দ আচার্যের পদের কিছু কিছু গোবিন্দদাস কবিরাজের নামে চলে গেছে।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদগুলি গোবিন্দ আচার্যের চেয়ে অধিকতর পরিচিত। তাঁর পদে গোবিন্দদাস কবিরাজের মতোই অপূর্ব ধ্বনিঝঙ্কার শোনা যাবে।

তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের গুরুভাই, কারণ তাঁরা দুজনেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং গুরুভাইয়ের রচনারীতির দ্বারা তিনি কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তিনি একজন ভালো কীর্তনগায়কও ছিলেন। তাঁর বাংলা পদে কোন কোন সময়ে নদীয়ানাগর গৌরাঙ্গদেবের আদিরসাত্মক বর্ণনা যেন একটু অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে শ্রীখণ্ড-গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্রজবুলিতে লেখা তাঁর কয়েকটি পদ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

রায়শেখর ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে ছোট-বড়ো-মাঝারি অনেক পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল, অবশ্য বড়ো পদকর্তার সংখ্যা স্বতই অল্প। এ'দের মধ্যে রায়শেখরের কিছু কিছু পদ মাঝারিত্বের সীমা ছাড়াতে পেরেছে। অবশ্য তাঁর ভণিতা নিয়েও নানা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে। তিনি বৈচিত্র্য-প্রয়াসী হয়ে নিজ নামকে নানাভাবে ব্যবহার করতেন। যেমন—রায়শেখর, কবি শেখর রায়, কবিশেখর, শেখর কবি, শেখর রায় ইত্যাদি। শেখর ভণিতাযুক্ত আরও কবি ছিলেন। সুতরাং এই ধরনের গণ্ডগোল অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যা হোক তাঁর সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য সে তথ্যেও নানা গোলমাল আছে। তিনি গোবিন্দদাসের ঈষৎ পরবর্তী কালে তাঁরই আদর্শে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। আবার ওদিকে স্বয়ং বিদ্যাপতির ভণিতাতেও 'কবিশেখর' ভণিতা আছে। সুতরাং শেখর, রায়শেখর ও কবিশেখর এই তিনজন পৃথক কবি হবেন বলেই অনুমান। রায়শেখর বিচিত্র প্রতিভাধর পদকর্তা ছিলেন। গোবিন্দদাসের মতো ব্রজবুলি, সরল বাংলা এবং লোচনদাসের ধামালির মতো চটুলছন্দে তিনপ্রকার পদ রচনাতে তাঁর কিছু কিছু কৃতিত্ব দেখা যায়। তাঁর—

> গগনে অবঘন মেহ দারুণ
> সঘনে দামিনী ঝলকই।
> কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
> পবন খরতর বলগই ॥

প্রভৃতি পদ গোবিন্দদাসের অনুকরণজাত হলেও অতি চমৎকার হয়েছে। কোন কোন বাংলা পদ—

> সখি কেমনে দেখাব মুখ।
> গোপত পিরিত বেকত করয়ে
> এ বড় মরম দুখ ॥

চণ্ডীদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর ভণিতায় 'দণ্ডাত্মিকা', পদগুলি (অর্থাৎ প্রতি দণ্ডে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ) গতানুগতিক। কবিশেখরের 'গোপাল-বিজয়' কিন্তু অন্য কোন কবির রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক খণ্ডকাব্য—অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো। পরিমিত ক্ষেত্রে রায়শেখর বেশ উল্লেখযোগ্য পদকারের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা স্বীকার করতে হবে।

রায়বসন্ত ॥ গোবিন্দদাসের বন্ধু ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রায়বসন্ত বা বসন্তরায় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ'কে কেউ কেউ রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্তরায় বলে মনে করেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। 'ভক্তিরত্নাকরে' এ'র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই তাঁর পদাবলীর সর্বপ্রথম সুচারু ব্যাখ্যা করেন এবং সাহিত্যরসিক-মহলে কবিকে পরিচায়িত করেন। রায়বসন্ত কিছু কিছু পদ ব্রজবুলিতেও রচনা করেছিলেন। তাঁর পদগুলি বড়ো সহজ, সরল এবং সরস। চণ্ডীদাসের নিরাভরণ পদের সঙ্গে তাঁর পদের তুলনা চলতে পারে। দু-একটা পদের গভীর ব্যঞ্জনা আধুনিক কালের পাঠককেও বিস্মিত করবে। তবে রবীন্দ্রনাথ রায়বসন্তের পদ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় যে বলেছেন—তাঁর পদ বিদ্যাপতিকেও ম্লান করেছে, তা বোধহয় একটু অতিশয়োক্তি হয়ে গেছে। তাঁর কোন কোন পদ চিত্তাকর্ষক হলেও তিনি বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়ে গেছেন, তা বলা যায় না।

কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতি ॥ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 'কবিরঞ্জন' ভণিতাটি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বিদ্যাপতি 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় পদ লিখতেন। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদ বিদ্যাপতির রচনা। কবিরঞ্জনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের রসতত্ত্ব আলাপ-বিষয়ক কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই কবিরঞ্জন হলেন মিথিলার বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস হলেন প্রাক্‌চৈতন্য যুগের সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা। কিন্তু সে আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্বকথাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বৈষ্ণবসমাজে সহজিয়া তত্ত্বকথা ছাড়পত্র পায়নি। সুতরাং উক্ত কবিরঞ্জন এবং চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি নন—উত্তর-চৈতন্যযুগেই বর্তমান ছিলেন। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একটি চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করেছেন। তিনি রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' ও 'শাখানির্ণয়' থেকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন

যে, এই কবিরঞ্জন হলেন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য। ইনি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বা 'ছোট বিদ্যাপতি' বলে খ্যাত। বিদ্যাপতি ভণিতার সরল বাংলা পদগুলি এঁর রচিত। কবিরঞ্জনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের সহজিয়া তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার রহস্যও এই ব্যাপারের পর অনেকটা সরল হবে। উত্তর-চৈতন্যযুগের কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতি এবং সহজিয়া চণ্ডীদাসের মধ্যে তত্ত্বকথা নিয়ে আলাপাদি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এখানে এই সিদ্ধান্ত করা গেল যে, বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত (বা কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত) বাংলা পদগুলি মৈথিলী বিদ্যাপতির রচিত নয়—ইনি পরবর্তী কালে শ্রীখণ্ড কেন্দ্রের আচার্য রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন। ইনি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করতেন বলে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলে তৎকালীন সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন।

কয়েকজন অপ্রধান পদকর্তা ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও অনেক পদকর্তা নানা ধরনের পদ রচনা করেছিলেন, পদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। এতে পূর্বতন মহাজনের অক্ষম অনুকরণ ভিন্ন আর বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্য এখানে আরও কয়েকজন পদকর্তার নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে।

'পদকল্পতরু' নামে বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগ্রন্থে কবিবল্লভ, বল্লভদাস, বিদ্যাবল্লভ ভণিতায় কিছু পদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কবিবল্লভ ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে—"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।" এটি কিন্তু বিদ্যাপতির ভণিতাতেই বেশী মিলেছে। হয় তো কবিবল্লভ বিদ্যাপতির আর একটি ভণিতা। পদটিকে কেউ কবিবল্লভ নামে একজন পৃথক কবির রচনা বলতে চান। আমরা কিন্তু সে মত সমর্থন করি না। আমরা অন্যত্র তার কারণ আলোচনা করেছি—কৌতূহলী পাঠক দেখে নেবেন।* বল্লভ ও বিদ্যাবল্লভ ভণিতায় যে পদগুলি সঙ্কলনগ্রন্থে গৃহীত হয়েছে গুণগত উৎকর্ষে সেগুলি নিতান্তই মধ্যম শ্রেণীর রচনা। গোপালদাস বা রামগোপালদাস 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' বা সংক্ষেপে 'রসকল্পবল্লী' নামক পদসঙ্কলনে স্বরচিত অনেকগুলি পদ সংযোজিত করেছেন। ইনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। এঁর পুত্র পীতাম্বর দাস 'রসমঞ্জরী' নামে যে বৈষ্ণব তত্ত্ববিষয়ক পুস্তিকা সঙ্কলন করেন, তাতেও পিতার পদ উদ্ধৃত করেছেন। এই 'রসমঞ্জরী'তে পীতাম্বর চণ্ডীদাসের কয়েকটি বিখ্যাত পদকে পিতার ভণিতায় চালিয়ে দিয়েছেন। এতে পিতৃভক্তি প্রকাশিত হলেও সুবিবেচনা প্রমাণিত হয়নি। গোবিন্দদাসেরও

---

* এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র (৩য় খণ্ড, ৬৩৮-৬৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কয়েকটি সুবিখ্যাত পদ এই সঙ্কলনে গোপালদাসের ভণিতায় উল্লিখিত হয়েছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম দাস অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদ রচনা করেছিলেন পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অবশ্য পদগুলির বাহ্যিক ঝঙ্কার অনেকটা গোবিন্দদাসের মতো হলেও অন্তরের দিক থেকে অনেক নিম্নস্তরের। 'ভক্তিরত্নাকর' নামক বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থের লেখক কবি নরহরি চক্রবর্তীও ঘনশ্যাম ভণিতায় পদ লিখেছিলেন। ফলে দু'জনের পদের মধ্যে কিছু গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। তবে যে-ব্রজবুলির পদ কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাসের রচনা বলে মনে হয়। চম্পতি বলে আর এক পদকর্তার দু-একটি পদ পাওয়া গেছে। কেউ বলেন, ইনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী ছিলেন। কারও-বা মতে স্বয়ং বিদ্যাপতিই 'কবি চম্পতি ভাণ' বলে ভণিতা দিতেন। কেউ কেউ তাঁকে বাঙালী বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। সে যাই হোক, চম্পতি ও বিদ্যাপতি এক কবি নন। কবি চম্পতি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি, নাম বোধ হয় চম্পতি, আর বিদ্যাপতি বোধ হয় উপাধি। তিনি বিদ্যাপতির ঢঙে কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন। জগদানন্দ নামেও একজন পদকর্তা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, দু'জন জগদানন্দ ছিলেন। একজন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আর একজন অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এদিকে আবার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নামও জগদানন্দ। বৈষ্ণব পদাবলী-সংগ্রহে একাধিক জগদানন্দের পদ নানা গোলমাল সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভণিতায় চৈতন্যবিষয়ক কয়েকটি ভালো পদ পাওয়া গেছে। সে পদগুলি বাৎসল্য রসে এবং স্নিগ্ধ স্নেহরসে অতি চমৎকার হয়েছে। তাঁর ভণিতায় হেঁয়ালি ধরনের বিচিত্র পদ পাওয়া গেছে। তাতেও কবি অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে শব্দ সংযোজনার কেরামতি দেখিয়েছেন। তবে তাতে বুদ্ধির খেলা যতটা ফুটেছে কবিত্ব ততটা ফোটেনি। শ্রীনিবাস আচার্যের অনেক শিষ্য (যথা—প্রসাদদাস, রাধাবল্লভদাস, শ্যামদাস প্রভৃতি) কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দও কয়েকটি বাংলা পদ লিখেছিলেন। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র সঙ্কলক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও গুটিকয়েক পদ লিখেছিলেন। পদসঙ্কলন খুঁজলে আরও অনেক পদকারের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু এঁদের অনেকেই শুধু প্রথা পালনের জন্য কলম ধরেছিলেন, তাঁদের পদে অন্তরের প্রেরণা থাকলেও কবিত্ব

ততটা ছিল না। কাজেই এই সমস্ত পদ শুধু পদসঙ্কলনেই বন্দী হয়ে রইল, বাঙালীর কণ্ঠে অমর হয়ে থাকতে পারল না।

৪. বৈষ্ণব জীবনী ও ইতিহাস-কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদশাখায় খুব একটা উৎকর্ষ দেখা না গেলেও বৈষ্ণব আচার্য-ভক্তদের দু-একটি জীবনী-কাব্য ও সমাজ-ইতিহাসবিষয়ক রচনা ইতিহাসের খাতিরে উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈত আচার্য ও তাঁর জ্যেষ্ঠাপত্নী সীতাদেবীর কয়েকখানি জীবনীকাব্য এই শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এ পর্যন্ত চারখানি অদ্বৈত-জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে—(১) লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের সংস্কৃতে রচিত কাব্য 'বাল্য-লীলা-সূত্রম্', (২) ঈশাননাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', (৩) হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' এবং (৪) নরহরিদাসের 'অদ্বৈতবিলাস'। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলাসূত্র' সংস্কৃতে রচিত। এতে অদ্বৈতের প্রথম-জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর প্রামাণিকতায় কিন্তু কিছু সন্দেহ আছে। এর মধ্যে ঈশাননাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অধিকতর প্রসিদ্ধ। এতে অদ্বৈত জীবনীর অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এর সন-তারিখ ও প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়। হরিচরণ ও নরহরিদাসের অদ্বৈত জীবনীগুলি আকারে ক্ষুদ্র, ঈশাননাগরের রচনার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবীর দু'খানি জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে। তিনিও শান্তিপুরগোষ্ঠীর অতিশয় মান্যা নেত্রী ছিলেন। তাঁরও কিছু কিছু দীক্ষিত শিষ্য ছিল। লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' এবং বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্বে' সীতাদেবী ও তাঁর পুত্রদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—কাব্য দুটির ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন ও সহজ—মনে হয় অনেক পরবর্তী কালের রচনা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এমন কিছু কিছু বৈষ্ণব নিবন্ধ রচিত হয়েছিল যার ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ—যদিও কাব্যমূল্য ঠিক সেই পরিমাণেই অল্প। নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস', যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ', মনোহরদাসের 'অনুরাগবল্লী' প্রভৃতি কাব্যে নীরস ঘটনাবিবৃতি থাকলেও তার মধ্যেই বৈষ্ণব সমাজ-সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। শ্রীখণ্ডের বলরামদাস জাহ্নবাদেবীর শিষ্য হয়েছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় নিত্যানন্দদাস। তিনি ২০ বিলাসে 'প্রেমবিলাস' সমাপ্ত করেন। 'প্রেমবিলাসে'র পূর্বে তিনি বোধ হ বীরচন্দ্রকে অবলম্বন করে কোন কাব্য রচনা করে থাকবেন—কারণ 'প্রেমবিলাসে' সে

ধরনের ইঙ্গিত আছে। এঁর পুঁথিগুলি নানা বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ, কোনটিতেই অধ্যায়সংখ্যার সমতা নেই। এতে প্রধানত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের কাহিনী বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে বৈষ্ণব সমাজ ও আচার্য সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য আছে যে, ইতিহাসের দিক দিয়ে এর বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। কাটোয়ার বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন যদুনন্দন। তিনি শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য হয়েছিলেন। এই গ্রন্থেও বৈষ্ণব সমাজ, কুল ও শাখার খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে। মূলত শ্রীনিবাস আচার্যের কাহিনী এতে বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থও বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদের হাতটি চমৎকার, কোথাও কৃত্রিম বলে মনে হয় না। মনোহরদাসের 'অনুরাগবল্লী' গোপীজনবল্লভদাসের 'রসিকমঙ্গল' এবং বৈষ্ণবদের 'শাখানির্ণয়' জাতীয় গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত বর্ণনা বৈষ্ণব আচার্য ও সমাজের ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান—যদিও কবিত্বের দিক থেকে বিশেষ কোন গুণের অধিকারী নয়। সে যাই হোক, সপ্তদশ শতাব্দী বিশুদ্ধ বৈষ্ণব কাব্যে ততটা ঐশ্বর্যশালী না হলেও বৈষ্ণব সমাজ, আচার্য, কুলকথা ও গুরুশিষ্যের পরিচয়ের জন্য এই শতাব্দীর সমাজনিবন্ধগুলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যযুগের মুসলমান কবি

১. বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি

বাংলায় মুসলমান-অভিযান, ধর্মান্তরীকরণ ও ইসলামী 'তমদ্দুনের' (অর্থাৎ নাগরিক সংস্কৃতি) সম্প্রসারণ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এই ইসলামের ভাবধারার দ্বারা বাঙালীর হিন্দুমানস ও বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র পরিবর্তন সেই ঐতিহাসিক ঘটনার ফলশ্রুতি। দেখা যাচ্ছে, খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে প্রাচ্য-ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকলেও গোটা বাংলা দেশে এর ফলবান প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হতে আরও দু-এক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছিল। পাঠান ও মুঘলযুগে গৌড়ে এবং বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) কোন কোন অঞ্চলে ধর্মান্তরীকরণের দ্বারা মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দৃঢ়মূল হলেও এ সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম-ভারত থেকে চোলাই-হয়ে-আসা হিন্দী-হিন্দুস্তানীর সংমিশ্রণে গঠিত এক মিশ্র ইসলামী 'তমদ্দুন'। তাকে ঠিক বিশুদ্ধ ও খানদানী ইসলামী ঐতিহ্য বলা যায় না—কারণ দু-তিন শতকের মধ্যে উত্তর-ভারতে আগন্তুক ইসলামের কিছু কিছু রূপান্তর হয়েছিল এবং সেই মিশ্র সংস্কৃতি পাঠান ও মুঘলযুগে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের ধর্মান্তরীকৃত মুসলমান সমাজে প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বাংলায় মুসলমান অভিযানের পর থেকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে খাঁটি আরবীয় ও ইরানীয় মুসলিম ঐতিহ্য স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যপ্রবাহই চট্টগ্রাম ও আরাকানকে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করে। তাই আজকাল কোন কোন মুসলিম ঐতিহাসিক বলছেন যে, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের মিশ্র-ইসলামী সংস্কৃতির চেয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকানের বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি অনেক বেশী গ্রহণীয়। সে যাই হোক, মধ্যযুগে চট্টগ্রাম ও আরাকানের ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যে যে বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যই চট্টগ্রাম ও আরাকানের মুসলমান কবিদের কাব্যচর্চা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

একদা ইসলাম এসেছিল রণোন্মত্ত হুঙ্কার দিয়ে, শাণিত অস্ত্র আস্ফালন করে, দুর্মদ অভিযানের অগ্নিজ্বালা ছড়িয়ে। পরে ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী গোটা

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ধর্মান্তরীকরণের চণ্ডলীলা বয়ে চলল। কেউ প্রাণভয়ে, কেউ বা রাজপ্রসাদ লাভ করবার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। হিন্দু সমাজে যারা অস্পৃশ্য ও সঙ্কীর্ণ শূদ্র বলে নিন্দিত হয়েছিল, তারা ইসলামের উদার ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনল এবং গলিত, জীর্ণ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে দলে দলে ইসলামের অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ পতাকার তলে সমবেত হল। এইভাবে হিন্দুসমাজের একটা বড়ো অংশ সামাজিক অনাচারের প্রতিক্রিয়ায় পরধর্ম গ্রহণ করে পর হয়ে গেল। অবশ্য ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ সবসময়ে গায়ের জোরে সম্ভব হয়নি, অস্ত্র ঘুরিয়ে কখনই একটা জাতির অর্ধেকেরও বেশী লোককে স্বধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা যায় না। বাংলায় ইসলাম প্রাধান্যের মূলে যেমন প্রাণভয়, রাজভয় ও ঐহিক লোভ কার্যকরী হয়েছে, তেমনি আরও অনেক ঐতিহাসিক কারণ আছে। হিন্দুসমাজের অভিজাত তন্ত্রের যে-ক'টি লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনীয়—যাঁরা করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই সুলতান-সুবাদারের অত্যাচারে ধর্মের বিনিময়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। কেউ-বা খেতাব-খেলাতের লোভে আরব মরুপ্রান্তরের মোহম্মদীয় আচরণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের বহু লোক যে পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অন্য আদর্শ গ্রহণ করল এর অন্য কারণ আছে।

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর-ভারত থেকে উলেমা, পীর-ফকির, গাজি-শহিদ, মুরশিদ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যাত্মবাদীরা আসতে থাকেন। ইরান থেকে বিতাড়িত সুফী ও সিয়াসম্প্রদায়ও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাংলায় এসে হাজির হন। ওদিকে চট্টগ্রাম বন্দর এবং সেখান থেকে আরাকানে ক্রমে ক্রমে আরব বণিকদের বাণিজ্যের বিকিকিনির সঙ্গে কিছু কিছু খানদানী আরবি পীর-ফকিরও ঐ অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করেন। এইভাবে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এবং চট্টগ্রামে ও আরাকানে ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। শেষোক্ত দুই অংশের অধিবাসীরা অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, তাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম অতিসহজেই প্রবেশ-পথ পেল। বৌদ্ধধর্ম তখন শতখণ্ডে ভেঙে গেছে, 'সদ্ধর্মী'রা (অর্থাৎ বৌদ্ধ) হিন্দুসমাজে পাষণ্ডী ও নাস্তিক বলে শুধু ঘৃণাই লাভ করেছে। এরকম অবস্থায় ইসলামের দল ভারী হওয়াই স্বাভাবিক, এবং হলও তাই। আর একটা কারণ, মুসলমান উলেমা ও পীর-ফকিরদের 'কেরামত' বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য অনুন্নত হিন্দুসম্প্রদায়ের একটা

বড়ো অংশ তাঁদের প্রতি ভক্তিবশত আকৃষ্ট হল। এখনও বাংলাদেশে পীরের 'থানে' বা দরগায় হিন্দুরা (উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও তার অন্তর্ভুক্ত) প্রদীপ জ্বালিয়ে, মানত করে, ভক্তি দেখিয়ে থাকে। তার ওপর এই সমস্ত পীর-ফকিরের দল প্রয়োজন হলে রাজ-সাহায্যও পেতেন। এর ফলে এদেশে ধীরে ধীরে মুসলমান আধিপত্য ও ঐতিহ্যের প্রসার হতে থাকে।

অবশ্য বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে অনেকগুলি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতি ততটা দৃঢ়মূল হতে পারেনি—এদেশের মুসলমানের সংখ্যাল্পতাই তার প্রমাণ দেবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানেরা উত্তরাপথের মিশ্র ইসলামী সংস্কৃতিকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং উর্দু জবান, বোলচাল, পোশাক-পরিচ্ছদ সব ব্যাপারে উত্তরাপথের মোগলাই ধারা অনুসরণ করতেন, ঘরের মধ্যে প্রায়ই উর্দু ব্যবহার করে খানদানী মুসলমান বলে গর্ব করতেন। তাঁদের দেখাদেখি ঈষৎ অনগ্রসর মুসলমানসমাজেও উর্দুর কদর বাড়ল। বাংলা ভাষায় অনর্থক, অনাবশ্যক ও হানিকর ফারসী-উর্দুর ফোড়ন মিশিয়ে যে ইসলামী বাংলার ('এছলামী বাংলা') উদ্ভব হল, তা শুধু মুসলমান সমাজের মধ্যেই সঙ্কীর্ণ খাতে বইতে লাগল। তাঁরা মনে করলেন, সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলাভাষা তাঁদের পক্ষে 'না-পাক'। ফলে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে, খানিকটা ইংরেজ শাসকের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এবং সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের প্রচেষ্টায় মুসলমান সমাজের জন্য ইসলামী বাংলা নামে একটা জগাখিচুড়ি ভাষার উদ্ভব হল। ঠিক এই ব্যাপার আসামের মুসলমানদের মধ্যে হয়েছিল। তাঁরাও উর্দু ও অসমীয়া ভাষা এবং লিপির একটি বিচিত্র রূপ নির্মাণ করেছিলেন। যাই হোক পশ্চিমবাংলার ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য তথাকথিত ইসলামী বাংলায় নির্বাহ হতে লাগল, কেউ কেউ সেমিটিক রীতিতে উল্টো করে (অর্থাৎ ডান থেকে বাম দিকে) বাংলা বই ছাপাতে লাগলেন। কলকাতায় এই ধরনের অসংখ্য ছাপাখানা গজিয়ে উঠল। এখান থেকে কদর্য কাগজে কদর্যতর ছাপায় আরবী-ফারসী কিস্‌সা (অর্থাৎ গল্প), লয়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, আলফা-লায়লা (অর্থাৎ আরব্য উপন্যাস) এবং ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মাচার সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। ছাপার রীতিতে মুসলমানী ঢং অনুসৃত হল, ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল —ফলে এ-সব বই হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হয়ে রইল, এবং বৃহত্তর বাংলা

সাহিত্যের সঙ্গে এর কোন যোগই রইল না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক শিক্ষিত মুসলমান লেখক নিজ নিজ প্রতিভার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু আমরা সাধারণ মুসলমানসমাজ সম্বন্ধেই আলোচনা করছি।

চট্টগ্রাম ও আরাকান বহুদিন থেকে ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ইসলামী 'তমদ্দুনে'র অধিকারী আরাকানি ও চট্টগ্রামি মুসলমানেরা (এঁরাও ধর্মান্তরিত) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নিজের প্রাণের ভাষা ও হৃদয়ের ধাত্রী বলে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মমতে তাঁরা বিশুদ্ধ মুসলমান হয়েও হিন্দুর স্মৃতি-পুরাণ-কাব্য এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। এই অঞ্চলে আবির্ভূত অধিকাংশ মুসলমান কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের রচিত কাব্যেও হিন্দু প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। তাঁদের ভাষাতেও কোন কোন স্থলে আরবী-ফারসী শব্দ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা শুধু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত পুঁথিতেই কিছু বেশী ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। গল্প-কাহিনী-কাব্যে তাঁদের ভাষা হিন্দু কবির মতোই পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃত-গন্ধী। তাই মধ্যযুগের চট্টগ্রামের ও আরাকানের মুসলমান কবিদের অনেকগুলি কাব্য সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর হিন্দুসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই পটভূমিকায় আমরা মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

২. পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি দৌলত কাজী, আলাওল এবং মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের গবেষকগণ নানা সূত্র ও পুঁথিপত্র থেকে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও একাধিক মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়েছিল। চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্যামোদী মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ (অধুনা স্বর্গত) মহাশয় বহু পূর্ব থেকে মুসলমান কবিদের কাব্যাদি ও পরিচয় সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। এর জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে খুব উৎসাহিত করেছিলেন, তিনিও সুকঠোর পরিশ্রম ও অত্যন্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম থেকে মুসলমান কবিদের অনেক পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন, সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণে' করিম

সাহেব-সংগৃহীত মুসলমান কবিদের কাব্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হয়। তা ছাড়াও করিম সাহেব আরও অনেক মুসলমান কবির কাব্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু সেগুলি তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন, সাহিত্য পরিষদে দান করেননি, বা আর কোথাও তার বিবরণ প্রকাশ করেননি। ইতিমধ্যে পাকিস্তান হয়ে গেল, দেশের মাটি বিভক্ত হল। করিম সাহেব পাকিস্তানের অনেকের দ্বারস্থ হলেন সে সমস্ত পুঁথি ও বিবরণী প্রকাশের জন্য। কিন্তু কোন স্থানেই তিনি বিশেষ আশার আলো দেখতে পেলেন না। এইভাবে তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হল। পরে অবশ্য তাঁর সংগৃহীত ও তালিকাকৃত যাবতীয় পুঁথি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 'পুঁথি-পরিচিতি' নাম দিয়ে সেই পুঁথির তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেও মুসলমান কবিরা নানা ধরনের কাব্য রচনা করেছিলেন। আজকাল বাংলাদেশের গবেষকগণ অনেক নতুন পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি নাকি অতি পুরাতন। এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে মত দিতে আমরা অক্ষম। কারণ দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর এবং সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় গোটা বাংলাদেশ থেকে বহু পুঁথি সংগৃহীত হয়। স্যর আশুতোষের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক পুঁথি ক্রয় করেন। আবদুল করিম সাহেব তখন থেকেই পুঁথি সংগ্রহ করছেন। অথচ তিনি তথাকথিত পুরাতন পুঁথি (মুসলমান কবি রচিত) সম্বন্ধে পাকিস্তান হবার আগে কোথাও কিছু বলেননি, আর পাকিস্তান হয়ে যাবার পর বাংলা-দেশ থেকে যদি এত প্রাচীন মুসলমান কবির আবির্ভাব হয় তাহলে তো সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। কারণ ইতিপূর্বে পুঁথি নিয়ে বাংলাদেশে অনেক গোলমাল হয়েছে। সে যাই হোক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত এবং অধুনা বাংলাদেশের গবেষকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত মুসলমান কবিদের প্রাচীন পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা কোন দায়িত্ব নিতে চাই না। শুধু তাঁদের পরিবেশিত তথ্য থেকে তাঁদের প্রচারিত কয়েকজন প্রাচীন মুসলমান কবি সম্বন্ধে এখানে যৎসামান্য বিবরণ দিচ্ছি।

খ্রীঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জৌনপুরের শাসক হুসেন শাহ্ শর্কী পরাভূত হয়ে দলবল নিয়ে বাংলাদেশে এসে সুলতান হুসেন শাহের (দু'জনের একই নাম) কাছে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু অভিজাত

ব্যক্তি ও কবি-সাধকও এসেছিলেন। এ'র সঙ্গে ছিলেন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি কুতুবন, যিনি হিন্দী ভাষায় হিন্দু রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে 'মৃগাবতী' শীর্ষক কাব্য রচনা করেন। গৌড়ে কোন মুসলমান কবি এ'র আগে কোন কাব্য রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না—অবশ্য কাব্যটি হিন্দী ভাষায় লিখিত এবং কবি বাঙালী ছিলেন না। তবে এ সময়ে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এ কাব্য বোধ হয় কিছু জনপ্রিয় হয়েছিল—কারণ পরবর্তী যুগে কোন কোন বাঙালী মুসলমান কবি এ ধরনের হিন্দু বিষয় নিয়ে কাব্য লিখেছিলেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্তত তিনজন মুসলমান কবি কাব্য রচনা করেছিলেন—(১) শাহ্ মুহম্মদ সগির, (২) জৈনুদ্দিন, (৩) মোজাম্মিল। অবশ্য মোজাম্মিলকে ষোড়শ শতাব্দীর কবিও বলা হয়েছে। এ'দের মধ্যে মহম্মদ সগিরের 'য়ুসুফ-জুলেখা', জৈনুদ্দিনের 'রসুলবিজয়' এবং মোজাম্মিলর নীতিশাস্ত্র, 'সয়ৎনামা' ও 'খঞ্জনচরিত্র' উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সূফী মতের রূপককাব্য 'য়ুসুফ-জুলেখা' মোটামুটি মন্দ নয়, 'রসুলবিজয়' মুসলমান সমাজের কাহিনী। মোজাম্মিলের কাব্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এক বিষয়ে আমরা গভীর সংশয় প্রকাশ করছি। এ কাব্যগুলির ভাষা এত আধুনিক যে, এদের পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে মেনে নেওয়া সুকঠিন। ষোড়শ শতাব্দীর আরও কয়েকজন কবির পরিচয় পূর্ব-বাংলায় প্রচারিত হয়েছে। এ'রা হলেন—সা বিরিদ খাঁ, দোনাগাজী, শেখ ফয়জুল্লা, দৌলত উজীর, মুহম্মদ কবীর এবং আরও কয়েকজন বৈষ্ণবভাবাপন্ন ও চৈতন্যভক্ত মুসলমান পদকর্তা। এ'দের মধ্যে সা বিরিদ খাঁ, দোনাগাজী, শেখ ফয়জুল্লা—পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। সা বিরিদের বিদ্যাসুন্দর এবং ইসলামী গল্পকাহিনী-বিষয়ক কাব্য, দোনাগাজীর 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জমাল', দৌলত উজীরের 'লায়লা-মজনু' এবং মহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' (হিন্দু আখ্যান) উল্লেখযোগ্য। এ'রা অধিকাংশ স্থলেই ইসলামী গল্পকাহিনী, মহম্মদের মহিমা ও নিজ নিজ ধর্মের আচার-আচরণ-সংক্রান্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন—মুসলমান সমাজের বাইরে তাই এসব কাব্যের বিশেষ প্রচার হয়নি। আমরা এর অধিকাংশ পুঁথিই চাক্ষুষ করিনি—সুতরাং নিঃসংশয় হয়ে এই সব কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর বলা যায় কিনা সন্দেহ। এ কাব্যের ভাষা হচ্ছে প্রাচীনতার প্রধান বাধা। কারণ এতে প্রায় আধুনিক কালের ভাষা অনুসৃত হয়েছে।

ষোড়শ শতকের কবি বলে প্রচারিত এঁদের অনেকের কাব্যের অবলম্বিত বিষয় ইসলামী রোমান্টিক প্রেমের গল্প, কিন্তু তার পিছনে আছে সূফীসাধনার ইঙ্গিত। সূফীরা মানবীয় প্রেমের আধারে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে সূফী প্রভাব ছিল বলে এই ধরনের কাব্য একদা এই সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কেউ কেউ ইসলাম ধর্মের আচার-বিচার, তত্ত্বকথা ও অমুসলমান রাজ্যে ও সমাজে মহম্মদের জয়যাত্রা সম্বন্ধে কাব্য লিখেছিলেন, কাব্য হিসেবে সেগুলির বিশেষ কোন দাম নেই। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রোমান্টিক মানবীয় প্রেমের আখ্যান রচনার প্রথম কৃতিত্ব মুসলমান কবিদের প্রাপ্য—যদিও তার অন্তরালে সূফী সাধনার ধারা বহমান ছিল। হিন্দু কবিরা প্রায় সবসময়ে দেবতা বা দেবকৃপাধীন মানুষের কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এদিক দিয়ে মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

৩. সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত মুসলমান কবি চিরস্মরণীয় হয়েছেন, যাঁদের প্রতিভায় বাংলা কাব্যে অভিনব বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁদের প্রায় সকলেই সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগ্রাম ও আরাকানে বাস করতেন। সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান, হাজি মহম্মদ—এঁরা সকলেই সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সৈয়দ সুলতান আটখানি কাব্য লিখেছিলেন, তাঁর নামে গানের সংগ্রহ পাওয়া গেছে। কিছু ইসলামী বিষয়, কিছু সূফীসাধনা, কিছু-বা হিন্দু যোগতন্ত্রঘেঁষা পুস্তিকা লিখে তিনি মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মহম্মদ খান বেশ শক্তিশালী কবি ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কাব্য ইসলামধর্মের গৌরববিষয়ক। কেবল 'সত্যকলি-বিবাদসংবাদ' কাব্যটি রূপকধর্মী এবং হিন্দুধরনের। রূপককাব্য হিসেবে 'সত্যকলি-বিবাদসংবাদ' বেশ নতুন ধরনের রচনা—যদিও কবিত্ব কিছু কম। বলাই বাহুল্য, এ সমস্ত কাব্য মুসলমান সমাজেই প্রচলিত ছিল, বিষয়বস্তুর জন্য বৃহত্তর হিন্দুসমাজে এদের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না। কিন্তু এই শতাব্দীতে আবির্ভূত এমন দু-একজন মুসলমান কবি কাব্য লিখেছিলেন, যাঁদের প্রভাব শুধু মুসলমান সমাজে নয়, হিন্দুসমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরা যথার্থই বাঙালীর কবি,

শুধু মুসলমান সমাজের কবি নন। তাঁরা হলেন দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। এ'দের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাচ্ছে।

দৌলত কাজী ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কবি দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' রোমান্টিক আখ্যানকাব্য হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি নানা বিদ্যা অর্জন করেন। আরাকান-রাজ থিরি-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) রাজসভায় তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হন এবং আরাকানের সমরসচিব আশারফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উপদেশে ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন-এক সময়ে হিন্দী কাব্য অবলম্বনে 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' রচনা করেন। এর বেশী কবি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় দেননি। কিন্তু কাব্যটির প্রায় দু-তৃতীয়াংশ রচনার পর অকালে তাঁর লোকান্তর হয়। পরে প্রসিদ্ধ কবি সৈয়দ আলাওল আরাকানরাজ সান্দ-থু-ধম্মার (চন্দ্র সুধর্মা) প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের নির্দেশে ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে এ-কাব্যের বাকী এক-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করেন।

মিয়াসাধন নামে এক হিন্দীভাষী কবি ঠেট-গোহারী (গ্রাম্য-হিন্দী) ভাষায় পূর্বে সতীময়নার কাহিনী লিখেছিলেন। কিন্তু সে ভাষা বাঙালীর বোধগম্য নয় বলে আরাকানের আশরফ খান ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজকর্মচারীর অনুরোধে দৌলত কাজী সাধনের কাব্যকে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে রূপান্তরিত করেন। সম্প্রতি লোরচন্দ্রানীর মূল উৎস সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সতীময়নার নানা গল্প-কাহিনী এখনও লোক-সমাজে প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এর উল্লেখ আছে। বিহারে প্রচলিত লোরিকমন্ত্রের গল্পটি সতীময়নারই আখ্যান। মুল্লা দাউদ নামে আর-এক হিন্দী কবি ঐ একই কাহিনী নিয়ে 'চন্দায়ন' কাব্য রচনা করেছিলেন। হায়দ্রাবাদে সালারজঙ্গ মিউজিয়ামে দক্ষিণী-ভাষায় লেখা এর একখানি পুঁথি আছে। এ ছাড়া ছত্রিসগড়ী উপকথাতেও এই গল্পের জড় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সমস্ত লোকগাথার সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, মিয়াসাধনের 'মৈনা কো সত্' কাব্যও প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, সতীময়নার গল্প সারা ভারতেই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। মুল্লা দাউদ ও মিয়াসাধন সেই লোককাহিনী অবলম্বনে পুরো কাব্য লেখেন এবং জনসাধারণ

সৃষ্টি করেছিল লোকগাথা-গীতি। দৌলত কাজী মিয়াসাধনের 'মৈনা কো সত্' কাব্য থেকেই তাঁর 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী'র উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

এই গল্পটি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আকার লাভ করলেও কেন্দ্রীয় আখ্যান মোটামুটি একপ্রকার। লোর ও চন্দ্রানীর প্রেমের আখ্যান আর তার সঙ্গে লোরের প্রথমা পত্নী ময়নার সতীত্ব কাহিনী ও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হবার পর তাঁর করুণ বিলাপ বর্ণনাই এই আখ্যানটির প্রধান গল্প। এখানে সংক্ষেপে দৌলত কাজীর অবলম্বিত আখ্যানের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। গোহারী দেশের রাজা মোহরার সুন্দরী কন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে এক নপুংসক বামনের বিবাহ হয়। মহাবীর লোরকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর চন্দ্রানী এঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, লোরকও তাতে সাড়া দেন। তাঁর প্রথমা পত্নী সতী-সধ্বী ময়নামতীকে পরিত্যাগ করে চন্দ্রানীকে নিয়ে পলায়ন করেন এবং পথিমধ্যে চন্দ্রানীর নপুংসক স্বামী বামনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাকে বধ করেন। পরে রাজা মোহরার অনুরোধে চন্দ্রানীকে বিবাহ করে তিনি সে দেশের রাজা হয়ে বসেন। এদিকে সতী ময়নামতী পতিবিরহে অতি দুঃখে কাল কাটাতে লাগলেন। এক লম্পট রাজকুমার তাঁকে প্রলুব্ধ করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। এর পরে কাব্য অসমাপ্ত রেখে দৌলত কাজী লোকান্তরিত হন। বাকি অংশ সৈয়দ আলাওল সমাপ্ত করেন। সেটুকু হল এই: যে কুটনী ময়নাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল, ক্রুদ্ধ ময়না তাকে মেরে দূর করে দিলেন। তখন তাঁর দুঃখ ও বিরহযন্ত্রণা দূর করবার জন্য তাঁর এক সখী একটি দীর্ঘ উপকথার অবতারণা করল। ধর্মবতী নগরীর রাজা উপেন্দ্রদেব তাঁর গর্ভবতী পত্নীকে কোন কারণে পরিত্যাগ করেন—এঁর নাম রতনকলিকা। এক ব্রাহ্মণের নিবাসে রতনকলিকার আনন্দ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কালক্রমে এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বহু আপদ-বিপদের পর পিতার সাক্ষাৎলাভ করল, পরিশেষে দীর্ঘ অদর্শনের পর রতনকলিকা পুনরায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই গল্প শোনার পর সতীময়না বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক ব্রাহ্মণকে দূত করে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বহুকাল পরে লোরক চন্দ্রানীসহ ময়নামতীর কাছে ফিরে এলেন, অতঃপর দুই সতীনে স্বামী সেবা করে মহানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। আলাওল যেটুকু সমাপ্ত করেন তার কাব্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর, গল্পের বাঁধুনি শিথিল, অনাবশ্যক-অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে ভারাক্রান্ত।

আলাওল কাব্যটি সমাপ্ত করেছেন বটে, কিন্তু দৌলত কাজীর কবিত্ব ও মেজাজের ধারা অনুসরণ করতে পারেননি। যাই হোক সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু কবিরা যখন দেবদেবীর কথা নিয়ে মত্ত, তখন আরাকানবাসী দৌলত কাজী নরনারীর বিরহ-মিলনের কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক আখ্যান লিখেছিলেন—এ অল্প প্রশংসার বিষয় নয়।

দৌলত কাজী সতীময়নার যেটুকু লিখেছেন তার কাহিনী খুব সংযত এবং পরিচ্ছন্ন। ময়নার সতীত্ব, প্রলোভনের সামনে অবিচল নিষ্ঠা, পলাতক স্বামীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়সমূহ কবি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু সতীময়নার আদর্শ চরিত্রের চেয়ে চন্দ্রানীর রোমান্টিক নায়িকার চরিত্র আরও বেশী প্রাণবন্ত হয়েছে। কবি ময়নার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও অন্তরের প্রীতি বর্ষণ করেছেন চন্দ্রানীর ওপর। কিন্তু সৈয়দ আলাওল যে শেষাংশ সম্পূর্ণ করেন তার কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি কিছুই দৌলত কাজীর সমতুল্য হয়নি। আলাওল অধিকতর বিখ্যাত ও বিচিত্র প্রতিভাধর কবি হলেও প্রকৃত কবিত্বে দৌলত কাজী অনেক শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। এঁর পরিচ্ছন্ন ভাষা, নিপুণ ছন্দ জ্ঞান, সংস্কৃত সাহিত্য-পুরাণে অবাধ বিচরণ, জীবনের অভিজ্ঞতা অতি উৎকৃষ্ট। 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে এক অভিনব আদর্শের পথ খুলে দিয়েছে—কিন্তু হিন্দু কবিরা এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ মুসলমান কবিদের কাব্য, বিশেষত যাতে দেবদেবীর কথার চেয়ে মানুষের কথা বেশী থাকত, সে যুগের হিন্দুসমাজে তার বিশেষ প্রভাব ছিল না। তাই এই উৎকৃষ্ট কাব্যখানি সে যুগে ততটা প্রচারিত হয়নি। কিন্তু আধুনিক কালের রসিক পাঠক কবি দৌলত কাজীকে যথার্থ কবিপ্রতিভার অধিকারী বলে শ্রদ্ধা করবেন।

সৈয়দ আলাওল ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলাওল সর্বাধিক প্রচারিত। তাঁকে কেউ কেউ মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি বলে মনে করেন। আলাওল নানা বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করে তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতার পরিচয় দিয়েছেন—অবশ্য তাঁর কবিত্ব যে খুব উচ্চস্তরের তা মনে হয় না।

সৈয়দ আলাওলের বিচিত্র কাব্যবিষয়ের মতো তাঁর জীবনও বৈচিত্র্যময়। দৌলত কাজী নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি, কিন্তু আলাওল সে দিক

দিয়ে আমাদের কোন খেদ রাখেননি। 'সেকেন্দারনামা' ও 'সয়ফুলমুলুকে' কবির বিস্তারিত পরিচয় আছে। এই আত্মপরিচয়ে দেখা যাচ্ছে, ফতোয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য-পুত্র আলাওল চট্টগ্রামে (মতান্তরে ফরিদপুরে) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তরিত হন। ভাগ্যের বিপর্যয়ে পিতৃহীন কবি জীবিকার জন্য মগরাজের সেনাবাহিনীতে চাকুরী নিতে বাধ্য হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আরাকানের অভিজাত মুসলমান সমাজে তাঁর কবিত্ব, সঙ্গীত-পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণের কথা প্রচারিত হয়। আরাকানের মুসলমান শাসনকর্তাদের উৎসাহে তিনি আরবী-ফারসী ও হিন্দী কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। কিছুকাল তাঁকে আরাকানের কারাগৃহে বিনা দোষে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল, তখন তিনি দারুণ যন্ত্রণা ও অপমান ভোগ করেছিলেন। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যে উচ্চ রাজকর্মচারীদের আনুকূল্যে তিনি আবার পূর্বমর্যাদা ফিরে পান। আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মসুদ শাহ এবং আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন। তাঁর মৌলিক রচনা যৎসামান্য—একমাত্র দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ সমাপ্ত করা ছাড়া তিনি আর কোন স্বাধীন রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি।

মুসলমান সমাজে তাঁর অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণ—তিনি ইসলামী কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বের নানাগ্রন্থ মূল আরবী ও ফারসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। এ-গুলির তালিকা—(১) সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল (১৬৫৮-৭০ খ্রীঃ অঃ), (২) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), (৩) তোহ্‌ফা (১৬৬৩-৬৯), (৪) সেকান্দার নামা (১৬৭২)। এ-গুলির সমস্তই ইসলামী বিষয় অবলম্বনে মুসলমান সমাজের জন্য লেখা—তাই এই কাব্যগুলি হিন্দুসমাজে আদৌ প্রচার লাভ করেনি। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ অনুবাদ কাব্য 'পদ্মাবতী' (আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীঃ)* হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ কাব্য নানাসময়ে মুদ্রিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঢাকা থেকে 'পদ্মাবতী'র নতুন

---

* তাঁর কাব্যের সংখ্যা: (১) পদ্মাবতী (১৬৪৬), (২) লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ (১৬৫৯), (৩) সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল (১৬৫৮-৭০), (৪) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), (৫) তোহ্‌ফা (১৬৬৩-৬৯), (৬) সেকান্দার নামা (১৬৭২)। এ ছাড়াও তাঁর নামে আরও কিছু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে।

সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন। বস্তুত আলাওল বাংলা সাহিত্যে বেঁচে আছেন তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য। অবশ্য এটিও তাঁর মৌলিক রচনা নয়, প্রসিদ্ধ হিন্দী-কবি মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

চিতোরের রাণী পদ্মিনী ও সুলতান আলাউদ্দিন সম্বন্ধে অনেক গল্প কাহিনী রাজস্থানে প্রচলিত আছে। চিতোর-রাজ রত্নসেনের রাণী পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর রূপ-গুণের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই শুনে দিল্লীর পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খলজী চিতোর আক্রমণ করে পদ্মাবতীকে বলপূর্বক কেড়ে নিতে আসেন। যুদ্ধে রত্নসেন ও তাঁর অনুচরেরা প্রাণ দেন, পদ্মাবতী নিজ নারীধর্ম রক্ষা করার জন্য সখীদের সঙ্গে অগ্নিশিখায় আত্মহত্যা করেন। এ কাহিনী রাজস্থানের গায়কসম্প্রদায় রাজস্থানী উপভাষায় এখনও গান করে থাকেন। কিন্তু পদ্মাবতী (পদ্মিনী)-আলাউদ্দিনঘটিত কাহিনীটি ঐতিহাসিক কিনা তা নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে প্রাচীন মুসলমান লেখক ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর জয় এবং রাজা রত্নসেনের নিধন ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও রাণী পদ্মিনী বা পদ্মাবতী-সংক্রান্ত ঘটনার কোনও প্রকার ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মুসলমান সুলতানেরা রূপমুগ্ধ হয়ে অনেক সময় হিন্দু রমণীদের বলপূর্বক বিবাহ করতেন—ভারত-ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে। আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানের সঙ্গে সেই ধরনের কোন কাল্পনিক ঘটনা জুড়ে গেছে। পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি ও সূফীসাধক মুহম্মদ জায়সী পদ্মাবতী-রত্নসেন-আলাউদ্দিনের লোক-কাহিনী অবলম্বনে ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে শেরশাহের রাজত্বকালে হিন্দীভাষায় 'পদুমাবৎ' কাব্য রচনা করেন। অবশ্য কাব্যটিতে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার প্রাধান্যই অধিক, এবং সূফী কবি জায়সী এই রোমান্টিক কাব্যটিকে আসলে সূফী সাধনার জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। আলাওল এই 'পদুমাবৎ' অবলম্বনেই 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। ইনিও সূফী মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে তিনি জায়সীর রূপকরীতি গ্রহণ করেননি। তাঁর 'পদ্মাবতী' প্রকৃতই রোমান্টিক-ঐতিহাসিক কাব্য, যদিও ইতিহাসের উপাদান সামান্যই। এর সঙ্গে কোন ধর্মীয় ভাব বা রূপক-তাৎপর্য জড়িয়ে নেই।

আলাওল কাহিনী ও চরিত্রের দিক থেকে জায়সীকে মোটামুটি অনুসরণ করেছেন। অনেক স্থান প্রায় ভাষান্তরের মতো। কিন্তু মূল 'পদুমাবতে'র সঙ্গে আলাওলের

'পদ্মাবতী'র কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনাঘটিত যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, কোন কোন স্থানে বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। কাব্যটির রচনারীতি দৌলত কাজীর মতো ততটা উৎকৃষ্ট না হলেও পয়ার-ত্রিপদীগুলি অনেক সময় বেশ নিখুঁত হয়েছে। আলাওলের অধিকাংশ রচনা অনুবাদমূলক বলে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা সম্বন্ধে হয়তো উচ্চতম প্রশংসাবাণী বর্ষণ করা যাবে না, কিন্তু প্রতিভার ব্যাপকতায় তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়েছেন, তার জন্য তাঁর 'পদ্মাবতী'ই দায়ী।

পদ্মাবতীর কাহিনী ও কাব্যগুণের জন্য হিন্দু-মুসলমান সমাজে অনেক দিন ধরে এ কাব্য জনপ্রিয়তা রক্ষা করে আসছে। কিন্তু তাঁর আরও কয়েকটি রচনা আছে যেগুলির প্রচার অধিকাংশ স্থলে মুসলমান-সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ সে গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ইসলামধর্ম ও মুসলিম সমাজঘেঁষা এবং আরবী-ফারসী থেকে অনূদিত অথবা উক্ত উৎস থেকে সে সমস্ত রচনার উপাদান সংগৃহীত। ফলে হিন্দুসমাজ এ সমস্ত রচনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ রাখত না। তাঁর 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' ১৬৫৮-৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ইসলামী রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী জড়িত। এক কাব্য রচনার সময়েই তিনি বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করেছিলেন। এই প্রেমের গল্পের উৎস কোন মতে আরব্য উপন্যাস ('আলফা-লায়লা'), কেউ বা বলেন এর মূল হচ্ছে ফারসী গল্প। সে যাই হোক, এর আখ্যান তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। নায়ক সয়ফুলমুলুক এবং নায়িকা বদিউজ্জমালের প্রেমকাহিনীই এর মূল উপজীব্য এবং সে প্রেম মর্ত্য-প্রেমেরই এক পবিত্র আদর্শ থেকে গৃহীত। মানবিকতার জন্য কাব্যটি একদা মুসলমানসমাজে খুব জনপ্রিয় ছিল, এর অনেক পুঁথিও পাওয়া গেছে। 'হপ্ত (সপ্ত) পয়কর' ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। এতে আরবের রাজকুমার বাহ্‌রামের যুদ্ধ-জয় ও সপ্ত পত্নীর গল্প বর্ণিত হয়েছে—অনেকটা আরব্য উপন্যাসের মতো। এর কাহিনীও তাঁর নিজস্ব নয়, এক ইরানী কবি, নেজামি সমরকন্দীর ফারসী-ভাষায় লেখা আখ্যানই কবির মূল অবলম্বন। 'তোহ্‌ফা' ঠিক বিশুদ্ধ কাব্য নয়—এটি ইসলামী শাস্ত্রসংহিতার উপদেশে পূর্ণ নীতিগ্রন্থ—১৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত। এরও মূল হচ্ছে সেখ য়ুসুফের 'তুহ্‌ফাতুন্নসা' নামে এক ফারসী নীতিকাব্য। মুসলমান সমাজে এর বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হলেও কাব্য

হিসেবে এর স্থান এমন কিছু গৌরবময় নয়। তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'সেকান্দার নামা' ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে ফারসী কবি নেজামি সমরকন্দীর ফারসী কাব্য 'ইসকান্দারনামা'র সরল অনুবাদ। আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনীকে এতে অনেকটা মুসলমানী ঢঙে ঢেলে সাজা হয়েছে। এতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ, রূপকথার মতো অদ্ভুত গল্পকথা আছে, যা কৌতূহলজনক হলেও কাব্যের দিক থেকে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। এ ছাড়াও আলাওলের নামে আরও কিছু কিছু আখ্যান ও তত্ত্বকথা-সংবলিত পুঁথি পাওয়া গেছে বলে বাংলাদেশের গবেষকেরা জানিয়েছেন। তবে তার যেটুকু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সেগুলি আলাওলের নামের আড়ালে অন্য কোন ব্যক্তির রচনা বলে সন্দেহ হয়। আলাওলের নাম ও খ্যাতি বিশেষভাবে প্রচারিত হলে কোন কোন কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি যে নিজেদের অক্ষম রচনা বিখ্যাত কবির নামে চালিয়ে দেবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

আলাওল মধ্যযুগীয় মুসলিম বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের যে একজন বিশ্রুতকীর্তি কবি তাতে সন্দেহ নেই; তাঁর একখানি কাব্য ('পদ্মাবতী') সম্প্রদায়ের সীমা লঙ্ঘন করে বাংলাভাষী সমাজের বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অনুবাদ কর্মে, তা সে সংস্কৃত-হিন্দী থেকেই হোক, বা আরবী-ফারসী থেকেই হোক, এতে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রতিভা যতই ব্যাপক হোক না কেন, দৌলত কাজীর মতো গভীর নয়। রচনাশক্তি ও মনস্বিতায় 'লোরচন্দ্রানী'র কবিই অধিকতর কৃতিত্বের অধিকারী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও অনেক মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা আলাওলের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে না পারলেও মুসলমান সমাজে তাঁদের পুঁথিপত্র বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান কবিদের যে গ্রন্থ তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে অনেক নতুন মুসলমান কবির নাম ও কাব্যপরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁদের কোন উল্লেখ ছিল না। অনেকে ইসলামী রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে 'চন্দ্রাবতী' (মাগনঠাকুরের নামে প্রচারিত), 'ইউসুফ-জুলেখা' (আবদুল হাকিম), 'গুলেবকাওলী' (নওয়াজিস খান), 'মুক্তাল-হোসেন' (মোহম্মদ খান) প্রভৃতি কাব্য লিখেছিলেন—যার অধিকাংশই মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হয়েছিল এবং যার বিষয়বস্তুও ইসলামী 'তমদ্দ্‌নের (সংস্কৃতি) অনুকূল। ফলে এ সমস্ত কাব্য হিন্দুসমাজে

প্রচারিত হয়নি। সৈয়দ মোহম্মদ নামে এক কবি 'জেবলমুলুক-শামারোখ' শীর্ষক একখানা রোমান্টিক কাব্যে অত্যন্ত উদার অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয় দিয়েছেন —হিন্দুর অবতার ও মুসলমানের নবিকে তিনি এক দৃষ্টিতে দেখেছেন। সৈয়দ সুলতানের 'নবিবংশে' ইসলামী মহাপুরুষ-কাহিনী আছে। মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদসংবাদে'ও কিছু কিছু কাব্যলক্ষণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে শেষোক্ত কাব্যটি পুরোপুরি রূপককাব্য—এর পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। সত্যের সঙ্গে কলির বিবাদ অর্থাৎ পুণ্যের সঙ্গে পাপের সংঘর্ষ, পরিশেষে সত্যের জয়লাভ, এই হল কবির প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। এবার আমরা মুসলমান কবিদের আর একটি বিচিত্র শাখার পরিচয় দেব। সেটা হল মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব ভাবের পদ।

৪. মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

ইসলামধর্মাবলম্বী কবিরা হিন্দু বৈষ্ণব কবিদের মতোই ভক্তি-নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন—এ-একটা অভূতপূর্ব সংবাদ বটে—এবং বাহ্যত কিঞ্চিৎ বিরোধী ব্যাপারও বটে। কারণ একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম অন্য কোন ধর্মমতকে সত্যধর্ম বলে স্বীকৃতি দেয় না, অপর মতের সঙ্গে কোনও প্রকার আপসরফা করে চলতেও রাজী নয়। সুতরাং হিন্দুধর্মের কোন একটি শাখার মত, আদর্শ ও কাব্যধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ইসলামধর্মাবলম্বীর পক্ষে ধর্মচ্যুতির মতোই একটা সাংঘাতিক 'না-পাক' (অপবিত্র) ব্যাপার। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মধ্যযুগে এমন কয়েক জন ইসলামধর্মাবলম্বী কবির পরিচয় পাওয়া গেছে যাঁরা ইসলামধর্মে বাস করেও চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী অবলম্বনে অনেক উৎকৃষ্ট পদ লিখেছিলেন, কেউ কেউ অসংশয়চিত্তে রাই-কানুর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করতেও কুণ্ঠিত হননি, শ্রীচৈতন্যের প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করেছেন। এই ব্যাপারে আধুনিক কালের মুসলমান সমালোচকগণ কিছু বিস্মিত হয়েছেন, কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁদের মতে ইসলামধর্মে-বিশ্বাসী ব্যক্তি অন্যধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন—একথা মানা যায় না। তাঁদের মতে, বোধহয় উক্ত কবিরা কবিতা বা পদের উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যই রাধা-কৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করেছেন। কেউ-বা সূফীসাধনার প্রভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক হিসেবে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন—যেমন তাঁরা লায়লা-মজনু, য়ুসুফ-জুলেখা, শিরী-ফরহাদ ইত্যাদি মর্ত্য-

প্রেমিক-প্রেমিকার অ্যাখ্যানকে সূফীসাধনার সঙ্কেত হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল এই: বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ থেকেই প্রায় অধিকাংশ মুসলমান উদ্ভূত হয়েছিলেন—ধর্মান্তরীকরণের প্রভাবে বা চাপে; ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের মজ্জাগত হিন্দুসংস্কার সহজে দূর হয়নি। সুতরাং রাধা-কৃষ্ণঘটিত ব্যাপারের প্রতি তাঁদের প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যপ্রভাবিত রাগানুগাবৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্লাবনে 'নদে-শান্তিপুর' তো ভেসে গিয়েছিলই, এমন কি বাংলার চতুঃসীমা ও প্রান্তীয় অঞ্চলেও এই সর্বগ্রাসী আবেগধর্মের প্রবল স্রোতোধারা প্রবেশ করেছিল। কোন কোন মুসলমান কবি, যাঁদের মন পূর্ব থেকে ভক্তিরাগে (সূফীমতের প্রভাবে) আর্দ্র হয়েছিল, এবং যাঁদের মনের অন্তরালে তাঁদের অজ্ঞাতসারেই হিন্দুর ধর্মসংস্কারের ছিটেফোঁটা লুকিয়ে ছিল, তাঁরাও সেই প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সূফীধর্মের প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ ব্যাপারকে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলে পদ লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের অনেক পদে প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আকবরের

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচে আপন রসে ভোরা॥

কিংবা লালন ফকিরের

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা॥

অথবা লাল মামুদের

সোনার মানুষ নদে এলরে।
ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে।

পদগুলিতে বিশুদ্ধ চৈতন্যভক্তির ভাব ফুটে ওঠেনি কি? সৈয়দ মর্তুজা যখন ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেন:

সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

তখন এই আর্তিকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্তের ব্যাকুল আত্মনিবেদন বলে মনে হয়। অবশ্য কোন কোন কবি সুফীমতের দৃষ্টিকোণ থেকে রাধা-কৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলেও গ্রহণ করেছেন ঃ

> হিন্দুরা বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।
> রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লামুন্সিতে দেয় বাধা॥ (বাসন উদাস)

রাধাভাবে ভগবানকে কামনা করা হিন্দু আদর্শ নয়, মুসলমান সূফী আদর্শেরই অনুকূল। কারণ ঐ মতে 'আশিক' অর্থাৎ প্রেমিকা হলেন ভগবান, আর মানুষ হল 'মাশুক' বা প্রেমিক। প্রেমিকাকে পাবার জন্য প্রেমিক যেমন ব্যাকুল হয়, সেই রকম ব্যাকুলতা নিয়ে নিজেকে পুরুষ বা নায়ক এবং ভগবানকে প্রেমিকা বা নায়িকা রূপে সাধনা করা সূফীমতের মূল রহস্য। কোন কোন মুসলমান পদকর্তা সেইভাবে রাধাকৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোন পদকর্তা অদ্বৈত ভূমানন্দের বশে বলেছেন, 'আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিবশঙ্করী" (বাসন উদাস)। কিন্তু কবি যখন বলেন ঃ

> শুন রাধা ঠাকুরাণী
> ধনি ধনি তোমার জীবন।
> ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁরে ভাবে নিরন্তর
> সে তোমার কেবল শরণ॥ (সৈয়দ মর্তুজা)

তখন তাঁকে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বলতে বাধা কোথায়? অবশ্য একথা ঠিক, এই সমস্ত বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি কোন দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেননি। আসল কথা—এই সমস্ত ভক্তকবির দল সাম্প্রদায়িক ধর্মমত নিয়ে কোন দিনই ব্যস্ত ছিলেন না। অধুনা সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীচেতনা আমাদের মনে প্রবল বলে এই সমস্ত কবি ও সাধকের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মতের প্রতি আমরা স্বতই সংশয়ী। ভক্তির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সারল্য বিচার করলে এঁদের বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি বলতেই হবে—যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে এঁরা মুসলমান ছিলেন। এবার কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির উল্লেখ করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

দৌলত কাজী ও আলাওলের প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এঁরা হিন্দু আদর্শ ধরে যে দু'খানি আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন, তার নানা স্থানে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। অবশ্য এগুলি ঠিক বৈষ্ণব পদের সমগোত্র নয়। তবে এঁরাও

রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গকে পরিত্যাগ করেননি এটুকু লক্ষণীয়। অবশ্য যথার্থ বৈষ্ণবকবি বলতে হলে সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ ও আলীরাজার নাম উল্লেখ করতে হয়। বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির সংখ্যা শতখানেক হবে, তাঁদের মধ্যে উল্লিখিত কবিত্রয়ের পদ বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে সুপরিচিত। মর্তুজা ভণিতায় মোট ২৮টি পদ পাওয়া গেছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলনে তাঁর কয়েকটি পদও স্থান পেয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মর্তুজা মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলমান ভক্তসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ধর্মমতে তিনি বোধ হয় বাউল ও ফকিরসাধক ছিলেন। মুসলমান হয়েও তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব ও হিন্দুতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও ছিলেন। তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট পদ এখনও গ্রাম্য গায়কদের কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে মর্তুজা নামে আরেক কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। জনপ্রিয়তার জন্য একই মর্তুজার পদ বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়েছিল বলে বোধহয় সাধারণে একাধিক মর্তুজার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। রাধার জবানীতে উক্ত তাঁর এই পদটি বাংলা পদসাহিত্যে সুপরিচিত ঃ

শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥

এ তো চিরকালের কাব্য, চণ্ডীদাসের প্রাণের বাণী। মর্তুজার কয়েকটি কবিতা উৎকর্ষ বিচারে যে-কোন প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব পদের সমকক্ষ।

নসির মামুদেরও দুটি-একটি পদ বৈষ্ণব পদসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলাবিষয়ক একটি পদে তিনি বলরাম দাসের মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভণিতাতেও কবির ভক্তিনত মনটি চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে ঃ

আগম-নিগম বেদ সার,
লীলায় করত গোঠ বিহার,
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানবি ॥

আলিরাজা শুধু পদকর্তা হিসেবে নয়, তাত্ত্বিক সাধকরূপেও একযুগে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের কোন-এক গ্রামে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি দরবেশ শাখাভুক্ত হলেও হিন্দুর তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এইজন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর শিষ্য হয়েছিল। তাঁর প'াচখানি গ্রন্থে ('জ্ঞানসাগর', 'সিরাজকুলুপ,' 'ধ্যানমালা', 'যোগকালান্দর', 'ষট্চক্রভেদ') হিন্দু ও মুসলমান সাধনার যুক্তবেণী রচিত হয়েছে। এর মধ্যে 'জ্ঞানসাগর' অধ্যাত্মবাদী গ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত। এতে ইসলামী সূফী ও হিন্দুর যোগতন্ত্রাদির সমন্বয় করার চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু আলিরাজার জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি নির্ভর করছে তাঁর বৈষ্ণব পদের জন্য। তাঁর ভণিতায় কয়েকটি শাক্ত পদও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে আলীরাজাকে এক অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে। এরকম অসাম্প্রদায়িক, উদার ও অধ্যাত্ম-মার্গের কবি ও সাধক মধ্যযুগের মুসলমান সমাজে খুব সুলভ নয়। যেমন :—

এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর।
এক তন এক মন আছে একেশ্বর॥
ত্রিজগত এক কায়া এক করতার।
এক প্রভু সেবে জপে সব জীবধর॥

হিন্দুর যোগদর্শন ও মুসলমানের সূফীদর্শনকে মিলিয়ে আলীরাজা এমন সমস্ত পদ লিখেছিলেন যার তত্ত্বমূল্য ও কাব্যমূল্য উভয়েই বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রেমানন্দ সিংহাসন প্রেমরস বৃন্দাবন
প্রেমানন্দ অমৃতলহর।
প্রেমানন্দ তরুমূল প্রেমানন্দ ফলফুল
প্রেমানন্দ রস মধুকর॥

এ সব রচনা নিষ্ঠাবান্ সহজিয়া বৈষ্ণবের বলে মনে হচ্ছে। বৈষ্ণবদের স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব কবি বেশ ভালোভাবেই জানতেন এবং পরকীয়া রসের পক্ষপাতী ছিলেন, তা এই দুই ছত্র থেকে বোঝা যায় :

স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস॥

তাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচনার দিক থেকে অধিকতর প্রশংসনীয়। এই পংক্তিগুলি কি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবির রচনা বলে মনে হয় না?

বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন।
তোমার প্রেমের ঘায় দগধে জীবন যায়
নিত্য রাধা মদন অধীন॥

কিংবা রাধার আক্ষেপোক্তি :

কি খেনে আসিলাম ঘাটে।
নন্দের নন্দন ভুবন মোহন
দেখিয়া মরম ফাটে॥

আলীরাজা কিছু কিছু শাক্তপদও রচনা করেছিলেন। আরও কয়েকজন বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদ কবিত্ব ও ভক্তির দিক থেকে প্রশংসার যোগ্য। চম্পাগাজী, মুহম্মদ কাসিম, কমর আলী, ওয়াহব প্রভৃতি পদকর্তার কয়েকটি পদ মধ্যযুগের পদসাহিত্যে উল্লেখের দাবি করতে পারে। আলীমিঞা চণ্ডীদাসের অনুকরণে লিখেছেলেন :

গাছের উপরে লতার বসতি
লতার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কানু-এ মজাই জাতিকুল॥

কুঞ্জভঙ্গে নিদ্রিত কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার ব্যাকুল মিনতি কবি ওয়াহব যে-কোন প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব কবির মতোই ফুটিয়ে তুলেছেন :

রাত্রি পোহাইয়া যায় কোকিল পঞ্চমে গায়
নিদ্রাতে পাইয়াছ বড় সুখ।
অভাগিনী বলিয়া রে নিশি গোঞাইলুম
উঠ এবে দেখি চান্দমুখ॥
আমার মাথাটি খাও উঠ এবে ঘরে যাও
কাকুতি করিয়া বলি তোরে।
রাত্রি প্রত্যুষ হৈলে লোকে দেখিবে তোরে
কলঙ্কনী করিবে আমারে॥

মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে আমরা বাংলা সাহিত্যের সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস সমাপ্ত করলাম। অবশ্য কোন কোন প্রসঙ্গের জের সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল বলে এই পর্বের অষ্টাদশ শতাব্দীরও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করতে হয়েছে। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর

প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের কিছু পরিচয় নিলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা সমাপ্ত হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কিছু পরে বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নতুন ভাবপ্রভাবের বন্যা নেমে আসে—যার ফলে বাঙালীর চিত্তধর্মের প্রায় আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। সে কথা যথাস্থানে বলব। বর্তমান প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যের পরিচয় দেবার পর পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর হব।

———

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও নতুনের ইঙ্গিত

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভূমিকা ॥

ইতিপূর্বে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখেছি, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ হয়ে এল। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের উদ্দাম জোয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাঁটার টানে মন্থরগতি হয়ে পড়ার কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমিক অবক্ষয়। সেই অবক্ষয় মারীবীজের আকার লাভ করল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আলমগীর বাদশাহ দেহরক্ষা করলেন, তারপর মুঘল তকৃত্ অধিকার করার জন্য দিল্লী থেকে আগ্রা পর্যন্ত অঞ্চলে মুঘল শাহ্‌জাদা ও আমীর-ওমরাহের মধ্যে শবমাংসভুক পশুর মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর মধ্যযুগের জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অপঘাত ঘনিয়ে এল, মুঘল রংমহালে যবনিকা নামল—আর আসন্ন অন্ধকারের ছায়াপটে দূরদ্বীপবাসী শ্বেতবণিকের দল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘোরাফেরা করতে লাগল। এই অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি—সমস্তই শঙ্কাতুর প্রহর গণনা করছিল—চারদিকে শাঠ্য ষড়যন্ত্রের লীলাখেলা, লোভাতুর স্বার্থের সর্পজিহ্বা বিস্তার, আর তারই সঙ্গে বাংলার মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবসানের ঘণ্টাধ্বনি। তাই এই অর্ধশতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মৌলিক অবদান প্রায় শূন্যে পর্যবসিত হতে চলেছিল। ভারতচন্দ্রের মণিমাণিক্যদীপ্ত নাগরিক শব্দ-বিলাস এবং রামপ্রসাদের ব্যাকুল আর্তিমূলক শাক্তপদ ছেড়ে দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছুই থাকে না। অবশ্য তাই বলে পুঁথি-পত্রের সংখ্যা কিছু কমেনি, পুরাতনের ক্লান্তিকর রোমন্থনের মতো এ যুগের কবিরা অধিকাংশ স্থলে অর্থহীন অনুকরণে নিজেদের প্রতিভাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে তখন গ্রহণ লেগেছে, চারদিকে কি-হয় কি-হয় ভাব। জীবনে নিরাপত্তা নেই, মনে শান্তি নেই, সমাজে নির্মল আদর্শ নেই—এ রকম পটভূমিকায় মৌলিক সাহিত্য আশা করা যায় না। অবশ্য পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে শাক্ত পদাবলী, বাউলগান, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ও অন্যান্য

লোকসাহিত্যের মধ্যে কিছু কিছু নতুন ভাব ও প্রকাশরীতি দেখা গেছে। তাই আমরা এই অধ্যায়ে প্রথমে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি এবং পরে নতুনের ইঙ্গিত—এই দুই উপচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হব। সকলের আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাষ্ট্র-ইতিহাস বাংলাদেশে যে ঘৃণ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ সন্ধানের জন্য বেশী দূরে যেতে হবে না—এযুগের রাজতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সুবাদারী থেকে বাংলার শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে নতুন দিকে দিকপরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাবে। ঔরংজেব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাংলাদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। আলমগীর বাদশাহের দেহান্তের (১৭০৭) দশ বছর পরে ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদারী লাভ করেন। বাংলার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই মুর্শিদকুলি খাঁ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, কিন্তু অতি বাল্যবয়সে তাঁকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তাঁর মতো বিচক্ষণ শাসনকর্তা বাংলাদেশে খুব কমই নজরে পড়ে। রাজস্ব, হিসাব-নিকাশ, শাসন, সমরবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা বিশেষ-ভাবে প্রশংসনীয়। তিনি অনাদায়ী রাজস্বের অপরাধে হিন্দুজমিদারের ওপর মাঝে মাঝে মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার করলেও রাজস্ব ও হিসাব-নিকাশে দক্ষ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগেও বিচক্ষণতা দেখিয়ে গেছেন। ১৭২৭ খ্রী অব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জামাতা সুজা উদ্দীন বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন—কারণ মুর্শিদকুলির কোন পুত্র ছিল না। সুজা উদ্দীন প্রথম দিকে শ্বশুরের দৃষ্টান্তে বেশ বুদ্ধি-বিবেচনা সহ রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, মুর্শিদাবাদে অনেক বাগবাগিচা, কোঠা-বালাখানা তৈরী করলেন। হিন্দু কর্মচারীদের সঙ্গেও তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। কিন্তু মুঘল আমীর-ওমরাহের মতো তিনি শেষজীবনে বিলাসী ও উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েন। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র, ঢাকার শাসনকর্তা, সরফরাজ পিতার আসনে বসলেন। তিনিও কিছুকাল বুদ্ধি-বিবেচনা মতো দেশ শাসন করবার পর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উচ্ছৃংখলতায় মত্ত হয়ে উঠলেন। এই অবকাশে জমিদার, ওমরাহ, দেশী বণিক ও বিদেশী শ্বেত-বণিকের দল দেশের মধ্যে প্রভুত বিস্তার করতে লাগল। তাঁর প্রধান

কর্মচারী আলীবর্দি খাঁ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না। আলীবর্দির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে সরফরাজ যুদ্ধে নিহত হলেন। অতঃপর আলীবর্দি খাঁ বাংলার মসনদ অধিকার করলেন এবং প্রচুর উৎকোচ দিয়ে এবং সহৃদয় ব্যবহার দেখিয়ে সরফরাজ-পক্ষীয়দের নিজের দলে টেনে নিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রভুপুত্রকে হত্যা করলেও আলীবর্দি বাংলার নবাব হয়ে রাজ্যশাসন ও প্রজানুরঞ্জনের প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই বৃদ্ধ নবাব বেশীদিন সুশাসনজনিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেননি। শেষ-জীবনে রাজনৈতিক শাসন-সংক্রান্ত ও পারিবারিক ব্যাপারে তিনি বড়োই অশান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। বর্গী অর্থাৎ মারাঠা অশ্বারোহী সেনাবাহিনী ভাস্করপণ্ডিতের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অত্যাচার চালিয়ে, লুঠতরাজ করে, নারীর ওপর ঘৃণ্য অত্যাচার করে নবাবের কাছ থেকে বলপূর্বক রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ (চৌথ) আদায় করে দেশটাকে শ্মশান করে চলে গেল। কিন্তু পরবৎসর দ্বিগুণ বলে বাংলা আক্রমণ করল, অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর মারাঠা বর্গীরা পুনঃপুনঃ এই দেশ লুঠ করে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং নির্মম অত্যাচার চালিয়ে পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ বয়সে আলীবর্দি যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, মেয়েরা একে একে বিধবা হতে লাগল—সেই সুযোগে সেনাবিভাগের প্রধান ব্যক্তিরা ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টা করল, ইংরেজ বণিক পুরোদমে বাণিজ্য চালাতে লাগল এবং বাণিজ্য সংরক্ষণের অজুহাতে দেশের মাটির ওপরে অধিকার স্থাপনের জন্য গোপন অভিসন্ধিতে শাণ দিতে শুরু করল। আসন্ন বিপদের পটভূমিকায় ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে আলীবর্দি খাঁয়ের দেহাবসান হল। তাঁর পুত্র ছিল না, সুতরাং মসনদে উপবেশন করলেন তাঁর অতি আদরের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা, ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে। তার ঠিক পনের মাস পরে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে নবীন যুবক, সুবে-বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃদ্ধ আলীবর্দির নয়নমণি এবং ইংরেজ বণিকের চক্ষুশূল সিরাজউদ্দৌলা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। বাংলার নবাবী লীলায়ও যবনিকা পতন হল। তারপরেও দু-একজন নবাবী করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা ইংরেজ বণিকের কটাক্ষেই ওঠবস করতেন, নিজেদের কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল না।

তরুণ বয়সে অপরিমিত আদর পেয়ে সিরাজ কিছু বখে গিয়েছিলেন, মদ্যাসক্তি, চরিত্রদুষ্টি, হঠকারিতা, অহঙ্কার—মুঘল রাজকুমারদের দোষগুলি কৈশোরকাল থেকেই তাঁর বেশ আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। যৌবনে পদার্পণ করে অজস্র ধনসম্পদ এবং প্রভুত্ব হাতে পেয়ে তা আরও বেড়ে গেল। তিনি এই সঙ্কটের সময়ে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি, দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ মারাঠা বর্গীর হাঙ্গামায় তখন দেশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে, এবং আলীবর্দির আমলের পক্বকেশ প্রবীণ কর্মচারীর দল এই উদ্ধত যুবার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল পাতবার উদ্যোগ করছিলেন। অপরদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী সিরাজবিরোধিতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তলে তলে কাজ গোছাবার মতলব আঁটছিল। সিরাজবিরোধী রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বিদেশী বণিকের গোপন সলাপরামর্শ চলতে লাগল—কি করে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। সিরাজ মাত্র বছর খানেক নবাবী করেছিলেন, তাও অধিকাংশ সময় কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহে। সিরাজের জন্ম হয়েছিল ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে। সিংহাসনে বসার সময় তাঁর বয়স বড় জোর তেইশ বছর। সিংহাসনে বসেই তিনি কলকাতার উদ্ধত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শাস্তি দিতে ছুটলেন (১৭৫৬ জুন)। এই সময়ে তথাকথিত 'অন্ধকূপ' হত্যার ব্যাপারটি হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে সাহেবদের এই সংক্রান্ত বিবরণ অধিকাংশই নির্জলা মিথ্যা, দু-একজনের গালগল্প সত্যের বিকৃতি অথবা অতিরঞ্জন। অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড ঘটলেও তার জন্য সিরাজ কোন দিক দিয়েই দায়ী ছিলেন না।

কলকাতা জয়ের পরই তিনি সৌকৎজঙ্গকে (মাসতুতো ভাই) আক্রমণ করে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচালেন। এরপর তিনি কয়েকমাস বেশ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে কাটালেন। কিন্তু পলাতক ইংরেজ আবার কলকাতা অধিকার করে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৭৫৭, জানুয়ারী)। এই যুদ্ধে সিরাজ বেকায়দায় পড়ে ইংরেজের ইচ্ছানুরূপ সন্ধিসর্ত স্বীকার করে নিয়ে নিজের অধঃপাতের পথ পরিষ্কার করলেন—ইংরেজ বণিকের রবরবা খুব বেড়ে গেল, আর সিরাজ কিছু ম্রিয়মাণ চিত্তে মুর্শিদাবাদ ফিরে গেলেন। ইংরেজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ক্রমেই বেড়ে উঠল। গোড়া থেকেই তিনি অসাধু ইংরেজ বণিক ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। এই সব কারণে ইংরেজ বণিক তাঁকে অতি শীঘ্র

সিংহাসন থেকে সরাতে চাইল। মীরজাফরাদি সিরাজের বিরোধী রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের গোপন পরামর্শ হল, ইংরেজদের নেতা ছিলেন ক্লাইভ। পূর্বষড়যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে ক্লাইভ সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতি দ্রুতবেগে কাটোয়া পার হয়ে পলাশীর প্রান্তরে ছাউনি ফেললেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে ২৩শে জুন ইংরেজ ও মুর্শিদাবাদের অসাধু কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনা হল। গভীর রাতে কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পশুপ্রকৃতির পুত্র মীরন সিরাজকে ঘাতকের সাহায্যে নির্মমভাবে হত্যা করে—অবশ্য এ ব্যাপারে ইংরেজ বণিকের কোন হাত ছিল না। সিরাজের বিনাশের পর আরও কিছুকাল মিরজাফর ও তাঁর বংশ নবাবী লীলার সাধ মিটিয়েছে বটে, তবে তা হল দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো। ক্লাইভ মীরজাফর ও তাঁর বংশধরদের হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং দরকার হলে কান ধরে নামিয়েও দিয়েছেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে বাংলার স্বাধীন নবাববংশের অবসান হল, সেদিন অপরাহ্নে পলাশীপ্রান্তরের অদূরে ভাগীরথী নীরে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্যও অস্ত গেল। তার পরের কাহিনী ঘৃণ্যতম অনাচারের কাহিনী—পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইংরেজ বণিক ও দেশীয় ব্যক্তিবর্গের লোভ-লোলুপতা বাঙালীর চরিত্রকে হীনতর পঙ্কস্তরে নামিয়ে এনেছিল। পরবর্তী উনবিংশ শতক থেকে বাঙালীর জীবন ও বাংলা সাহিত্যে নবজীবন ও জাগরণ শুরু হল—তারই নাম বাঙালীর উনিশ শতকী রেনেসাঁস। এর পরের পর্বে আমরা সেকথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন কোন স্মারকচিহ্ন নেই যা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মুসলমান শাসন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে বাঙালী হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কার কিয়দংশে অধোগামী হয়েছিল। শাঠ্যষড়যন্ত্রের দূষিত আবহাওয়া গোটা সমাজশরীরকে যে বিষাক্ত করবে তাতে আর সন্দেহ কি? মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দি মোটামুটি সুশাসক ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁরা শুদ্ধাচার মেনে চলতেন। তবু তাঁদের আদর্শ মুসলিম সমাজকে তো অনুপ্রাণিত করেইনি, হিন্দুসমাজও তা থেকে লাভবান হয়নি। তবে রাজস্ব ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ বিভাগ ও পদে মধ্যবিত্ত হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই হিন্দু সমাজে

চাকুরীজীবী, নিশ্চিন্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়—পরবর্তীকালে যারা বাংলার আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতিকে লালনপালন করেছে।

এই শতাব্দীতেই ইংরেজ বণিকের লোভ-লোলুপতা চূড়ান্ত আকার লাভ করে—এদেশবাসীকে মেরে শ্বেতবণিকের বড়ো হবার প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। নবাবকে দেয় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এরা কোম্পানীর নিশান উড়িয়ে কোম্পানীর বকলমে গোপনে নিজেরা বাণিজ্য করত। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল। বড় বড় জমিদার নিঃস্ব হয়ে গেল, জমিজমা নিলামে উঠল, আর কোম্পানীর মুৎসুদ্দিরা অল্প টাকায় সেই সমস্ত জমিজমা কিনে নিয়ে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসল। পুরাতন জমিদার বংশ হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষণের প্রতি সতর্ক ছিলেন—টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচুর সাহায্য দিয়ে, পণ্ডিত-আচার্যদের ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর জমি দান করে তাঁরা পুরাতন ধরনের দেশীয় শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন মুৎসুদ্দি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা জমিদার হবার পরে সে চিরাচরিত শিক্ষার ধারাও বিনষ্ট হল। এই সময়ে মুসলমান শাসকের অত্যাচারে, ধর্মান্তরীকরণের ভয়ে এবং রুজিরোজগারের সন্ধানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পীঠস্থান কলকাতাকে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান এবং আরমানী, পর্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিক ইন্দ্রপুরী করে তুলল। পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে থেকেই কলকাতা নামক 'অজ পাড়াগাঁ' আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের স্পর্শে যেন অমরাবতীতে পরিণত হল—গ্রাম হল শহর, লোকজন বাড়ল, আইন-আদালত স্থাপিত হল, হাট-বাজার-গঞ্জ গড়ে উঠল, বহু লোকে এখানে জমি কিনে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগল, মুর্শিদাবাদের হর্ম্যচূড়া থেকে সূর্যরশ্মি অপসৃত হল, কলকাতায় নতুন ভাবের নতুন সূর্য উঠল।

এই অর্ধশতাব্দীর বিশৃঙ্খল, তরল, অশান্ত আবহাওয়ায় নতুন সাহিত্যের রচনা কদাচিৎ সম্ভব হয়। এই যুগেও দু-চারটি ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি—যদিও পুরাতন ধারার প্রচুর নকল হয়েছে। এখানে আমরা দু'টি অনুচ্ছেদে—'পুরাতনের অনুবৃত্তি' এবং 'নতুনের ইঙ্গিত' এই নামে অর্ধশতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করব।

প্রথম উপচ্ছেদ ঃ পুরাতনের অনুবৃত্তি

ইতিপূর্বে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও সমাজের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এবং সেই প্রসঙ্গে একথা বলেছি যে, এই সময় মৌলিক সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কয়েকজন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হলেও যাতে সমগ্র জাতি সমানভাবে সাড়া দেয়, এই যুগে এমন সাহিত্যের সত্যিকারের অভাব হয়েছিল। সমাজ, রাষ্ট্র ও মনে যদি শান্তি না থাকে, নিরাপত্তাবোধ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, তা হলে সাহিত্যে নবজীবনের বন্যা আসবে কি করে? তাই বহু কবি শুধু পুরাতন বর্ণনার চর্বিত-চর্বণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কেবল পুরাতন পুঁথির নকল ও তস্য নকলে চণ্ডীমণ্ডপ ভরে উঠেছিল। এখানে আমরা সেই পুরাতনের নকলযুগের কিছু পরিচয় দেব।

১. মঙ্গলকাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কবি হিসেবে একমাত্র ভারতচন্দ্রের যা-কিছু গৌরব স্বীকৃত হয়ে থাকে। এছাড়া আর যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে, তার অধিকাংশই পুরাতনের অক্ষম অনুকরণ। বিষয়বস্তুতে এবং চরিত্ররূপায়ণে এ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিকে অতিশয় দীন বলে মনে হয়। কারণ যুগটা মঙ্গল-কাব্যের উপযোগী ছিল না। পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ অনেকটা ছিল দেবকৃপানির্ভর। তখন মঙ্গলকাব্যের দেবীদের কাছে প্রসাদ প্রার্থনা ছিল অতি স্বাভাবিক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজ ও সংস্কৃতির বনিয়াদ ভেঙে পড়ল, মুসলিম আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধিকেও ক্ষুণ্ণ করে ফেলল, নিষ্ঠাহীন নাগরিক জীবনের কালিমা সমগ্র জাতির ভালে ধূমাঙ্কিত তিলকচিহ্ন এঁকে দিল —এরূপ অবস্থায় মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর প্রতি আস্থা কমতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাই পুরাতন বিশ্বাসের স্থলে দেবদেবীদের লঘু হাস্যপরিহাস ও রঙ্গব্যঙ্গ অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে, স্বাভাবিকতার স্থলে কৃত্রিম বচনবিন্যাস হয়েছে জনগণের চিত্তাকর্ষী—কৃত্রিম নাগরিক জীবনে তাই হওয়াই সম্ভব। সে যাই হোক, এখানে সংক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গল-কাব্যের উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মনসামঙ্গল কাব্য ॥ অষ্টাদশ, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কেউ কেউ পুরাতন ধাঁচের মঙ্গলকাব্য লিখতে চেষ্টা করেছিলেন—যার কোনপ্রকার কাব্যমূল্য

নেই। জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, দ্বিজ রসিক, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বাণেশ্বর রায়, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজ কবিচন্দ্র, রাধানাথ প্রভৃতি কয়েকজন কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে (এর মধ্যে কেউ কেউ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন) মনসামঙ্গলের জের টেনে চলেছিলেন। বলাই বাহুল্য এগুলির বিশেষ কোন কাব্যমূল্য নেই। এ'দের মধ্যে কেবল জীবনকৃষ্ণ মৈত্র কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

জীবকৃষ্ণ মৈত্রের কাব্যের যে দু' একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে তা থেকে তাঁর মোটামুটি কুলপরিচয় জানা যায়। বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে প্রতাপবাজু পরগণার অন্তর্ভুক্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণপ্রধান অঞ্চল লাহিড়ীপাড়া গ্রামে কবির জন্ম হয়। রাণী ভবানীর জমিদারীতে কায়ক্লেশে তাঁর দিন চলত। অবশ্য তাঁর পূর্বপুরুষ বেশ সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন। রাণী ভবানীর উল্লেখ থেকে মনে হয়, জীবন মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পয়ার থেকে ১১৫১ বঙ্গাব্দ (১৭৪৪ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাচ্ছে। কাব্যটির আকার বেশ বড়ো, কাহিনী প্রায় গতানুগতিক, শুধু দু'একটি নামধামে কিছু নতুনত্ব আছে। কবির ভাষা বেশ মার্জিত, করুণ-রসেও তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলার বিলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে। অবশ্য দু'এক স্থলে আদিরসের নির্বাধ বর্ণনা আধুনিক রুচিকে পীড়িত করবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। জীবনকৃষ্ণ উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেমন জগজ্জীবন আর একজন কবি, তন্ত্রবিভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন (পূর্বে তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন-সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র মনসামঙ্গলের শেষ পর্যায়ের কাব্যধারায় কিছু কবিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে বাদ দিলে আরও কয়েকজন মনসামঙ্গলের কবির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, ইতিহাসের ক্রম রাখবার জন্যই শুধু এখানে তাঁদের যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হল। বর্ধমান জেলার অধিবাসী দ্বিজ রসিক, চট্টগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বাণেশ্বর—এ'রাও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল ফেঁদেছিলেন প্রাচীন আদর্শে, কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তার লাভ করলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে মনসার ভাসান গান হয়, সেই উপলক্ষে মনসামঙ্গল কাব্য পড়াও হয়। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যখন কলকাতা শিক্ষা-সভ্যতার

পাদপীঠে পরিণত হয়েছে, তখনও একজন দুঃসাহসী কবি মনসামঙ্গল রচনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। এ'র নাম জগমোহন মিত্র—১৮৪৪ সালে ইনি মনসামঙ্গল রচনা করেন। ক্রমে আধুনিক যুগ বাঙালীর মনে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা এনে দিল, মনসার সেবক নাগ-নাগিনীর দল রইল বটে, কিন্তু মনসার বরাভয়ের স্থলে আধুনিক ভিষকেরা আশ্বাসের বাণী বয়ে নিয়ে এলেন। মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর ও শিক্ষিত সমাজ থেকে এই সমস্ত লোকযান প্রায় উন্মূল হয়ে গেল।

চণ্ডী-দুর্গা-ভবানীমঙ্গল ॥ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কালকেতু ও ধনপতিকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে চণ্ডী-ভবানী-অভয়ামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও তার কিঞ্চিৎ জের চলেছিল। কেউ কেউ আবার লোক-যানের অন্তর্ভুক্ত কালকেতু-ধনপতি-সংক্রান্ত কাহিনী পরিত্যাগ করে সংস্কৃতে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা সপ্তশতী অবলম্বনে পুরাণঘেঁষা মঙ্গল-কাব্য রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর আখ্যানকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিকে যেভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, পরবর্তী দু' শতাব্দী ধরে চণ্ডীমঙ্গলের অধিকাংশ কবি সেই পথ ধরে চলেছিলেন। বাঁধা-পথে চলা অনেক নিরাপদ, তাতে কোন মৌলিক প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। মুক্তারাম সেন ১২৭৮ সনে (১৮৭২ খ্রীঃ অঃ) 'সারদামঙ্গল' রচনা করেছিলেন দ্বিজমাধবের আদর্শে, যদিও সে আদর্শ অনুকরণের মতো সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কাব্য হিসেবে 'সারদা-মঙ্গলে'র বিশেষ কোন মূল্য নেই। তবে এই প্রসঙ্গে ভবানীশঙ্করের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা' উল্লেখ করা কর্তব্য। কারণ চিরাচরিত কাব্যের প্রথাসর্বস্বতার মধ্যেও তিনি কিছু কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চট্টগ্রামের এই কবি ১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২ খ্রীঃ অঃ) মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা রচনা করেন। এর কাহিনীও কালকেতু-ধনপতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ কবি কোন কোন স্থলে পুরাণের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবির রচনাশক্তি বেশ প্রশংসনীয় তা স্বীকার করতেই হবে। তিনি এর মধ্যে বৈষ্ণবপদের অনুরূপ কয়েকটি পদ লিখেছিলেন, এতে আন্তরিকতার সুরটি চমৎকার ফুটেছে। এককথায় পুরাতন সংস্কৃতগন্ধী রচনা ও তার সঙ্গে সরল মনের বাণী প্রকাশে কবি বেশ খানিকটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কবি মুকুন্দ বা দ্বিজমুকুন্দের রচিত 'বাসুলীমঙ্গল' নামে কাব্যখানি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। কবি কিন্তু নিজের কাব্যকে 'বিশাললোচনীর

গীত' বলেছেন। পুঁথিতে যে কালজ্ঞাপক পয়ার আছে তা থেকে ১৪২৯ শক বা ১৫০৭ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিমা দেখে কবিকে এত প্রাচীন বলে মনে হয় না। পুঁথি নকলের তারিখ ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দ। মনে হয় কবিও এই সময়ের কাছাকাছি হবেন। এই কবি মুকুন্দরামের ধারা অনুসরণ করলেও নামধামগুলি বদলে দিয়ে নিজের অধমর্ণত্ব গোপন করতে চেয়েছেন—এ'র কবিত্ব অকিঞ্চিৎকর। এ'রা ছাড়াও আরও দু' একজন কবি এই শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামঙ্গল রচনার চেষ্টা করেছিলেন। তবে এ'রা প্রায় কেউ-ই মুকুন্দরামের প্রভাব এড়াতে পারেননি। কৃষ্ণজীবনের 'অভয়ামঙ্গল', লালা জয়নারায়ণ সেনের 'চণ্ডীমঙ্গল', দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের 'ভবানীমঙ্গল', পাকুড়ের জমিদার পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' প্রভৃতি অষ্টাদশ, এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা—মুকুন্দরামেরই নকল। কেউ কেউ আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে প্রাচীন পুরাণের আদর্শে দু' একখানি দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু কোন দিক দিয়েই তা উল্লেখযোগ্য নয়।

২. শিবায়ন কাব্য

ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আমরা শিবায়ন প্রসঙ্গে বাংলাদেশে লৌকিক শিব-কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত শিবায়ন-কবির পরিচয় দিয়েছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশে প্রাগার্য অস্ট্রিক সংস্কৃতির প্রাচীন ধারায় যে কৃষি-দেবতার উদ্ভব হয়েছিল, পরবর্তী কালে তার সঙ্গে পৌরাণিক হর-পার্বতী কাহিনীর সমন্বয় হওয়াতে শাক্ত মঙ্গলকাব্যে এবং শিবায়ন কাব্যে এই মিশ্র শিবসাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে। 'মিশ্র'—কেন না এই সমস্ত শিবকাহিনীতে পুরাণোক্ত কৈলাসেশ্বর শিবপ্রমথেশ এবং তাঁর ভার্যা উমা-দুর্গা-পার্বতী-চণ্ডীর সঙ্গে বাংলা-দেশের কৃষক শিব-পার্বতীর গ্রাম্য কাহিনীর বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে। এই ধরনের লৌকিক কাহিনী একদা জনচিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল—তার প্রমাণ সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকখানি বিখ্যাত শিবায়ন কাব্য। অবশ্য শিবচতুর্দশী ব্রত-সংক্রান্ত বিশুদ্ধ পুরাণকেন্দ্রিক মার্জিত কাহিনী নিয়েও কয়েকখানি শিবকাহিনী ('মৃগলুব্ধ') রচিত হয়েছিল—যার জনপ্রিয়তা ও প্রচার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ভাঙড় ভোলার নেশাখুরি বর্ণনা, মুখরা স্ত্রীর সঙ্গে 'হাড়াই-

ডোমাই' কলহ, রাগ করে শিবের চাষে মন দেওয়া, বিরহিণী দুর্গার বাগ্‌দিনীর বেশ ধরে বৃদ্ধ মহাদেবকে কামকটাক্ষে নাস্তানাবুদ করা প্রভৃতি অমার্জিত গ্রাম্য-কাহিনী শিবায়নকাব্যগুলিকে বেশ একটা কৌতুকজনক রসপরিণতি দান করেছে—এবং বাংলাদেশ যে আদ্যন্ত কৃষিজীবী ও মৎস্যগতপ্রাণ—তা এই কাহিনী থেকেই জানা যায়। এখানে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত ও শক্তিমান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের (চক্রবর্তী) শিবায়ন কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

শিবায়ন শাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে তাঁর কাব্যে যে যৎসামান্য উল্লেখ আছে তা থেকে তাঁর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়—তিনি ভারতচন্দ্রের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। গবেষকগণ নানা তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ১৬৭৭ খ্রীঃ অব্দে রামেশ্বরের জন্ম হয়। কিন্তু কোন কারণবশত তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করে কর্ণগড় নামে আর একটি গ্রামের জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বসবাস করেছিলেন। কবির পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী রাজা যশোমন্তসিংহের সময়ে শিবায়নকাব্য রচিত হয়। গবেষকগণ মনে করেন, ১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দে কবির দেহান্ত হয়। কর্ণগড় মন্দির-প্রাঙ্গণে এখনও কবি-সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর বেশী তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

রামেশ্বরের ভণিতায় মোট চারখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে—(১) শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন, (২) সত্যপীরের ব্রতকথা, (৩) শীতলামঙ্গল বা মগপূজা পালা এবং (৪) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা আখেটী পালা। এর মধ্যে, শেষোক্ত দু'খানি কাব্য তাঁর রচনা নয় বলে মনে হয়। বোধ হয় তাঁর নামের আর কোন কবি কাব্য দু'খানি লিখে থাকবেন। এখানে তাই সত্যপীরের ব্রতকথা ও শিব-সঙ্কীর্তনকেই শুধু আলোচনায় গ্রহণ করা হচ্ছে। সত্যপীরের ব্রতকথার দেবতা সত্যপীর হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ নামে পূজা লাভ করে আসছেন। ইনি হচ্ছেন হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের দেবতা। অবশ্য অনেক অর্বাচীন পুরাণে সত্যনারায়ণের কাহিনীর উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে বিবদমান হিন্দু-মুসলমানকে নিরস্ত করার জন্য এবং মুসলমান শাসনকর্তার নেকনজরের জন্য মুসলমানী আদবকায়দাদুরস্ত সত্যপীরের পূজার্চনা ও শীর্নি' বাঁটা হিন্দু সমাজেও প্রচলিত হয়েছিল। রামেশ্বর এই ব্রতকথায় প্রচলিত সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের গল্পটি

গ্রহণ করেছেন। গল্পটির আখ্যানগত গুরুত্ব সামান্যই, উপরন্তু কবি এতে মুকুন্দরামের ধনপতিসদাগরের (চণ্ডীমঙ্গল—২য়) কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সুতরাং এতে মৌলিকতা দেখাবার অবকাশ অল্প। কবি শিবসঙ্কীর্তন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী—যাই লিখুন না কেন, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ আনুগত্য ছিল, কারণ এই ব্রতকথায় বৈষ্ণব আদর্শের অনুকূল অনেক পংক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কাব্য হিসেবে এর বিশেষ কোন মর্যাদা স্বীকার করা যায় না।

'শিবসঙ্কীর্তন' বা শিবায়নের জন্যই রামেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি বলে পরিচিত হয়েছেন। ছাপার অক্ষরেও এ কাব্য বহু দিন থেকে পাঠকসমাজে প্রচার লাভ করে আসছে। পালার গল্পটি মৌলিক না হলেও চরিত্রসৃষ্টি ও রচনাকৌশলে তিনি যে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম দুটি পালায় মোটামুটি পৌরাণিক শিবকাহিনী অনুসৃত হলেও চতুর্থ পালার কিয়দংশ থেকে শিবের লৌকিক কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে—অবশ্য মাঝে মাঝে পৌরাণিক কাহিনীরও মিশাল আছে। সপ্তম ও জাগরণ মোট আট পালায় কাব্যের সমাপ্তি। প্রধান কাহিনী—শিবের দারিদ্র্যপীড়িত গার্হস্থ্য-জীবন, কৃষিকার্য অবলম্বন, দেবীর বাগ্‌দিনী বেশে মহাদেবকে ছলনা, পরে শাঁখা পরবার জন্য দেবীর অভিলাষ, মহাদেবের অসামর্থ্য জ্ঞাপন, তাতে ক্রুদ্ধ দেবীর পিত্রালয়ে প্রস্থান, শিবের শাঁখারীর ছদ্মবেশে দেবীর পিছনে ধাওয়া করা, পরে ছদ্মবেশী শিব কর্তৃক দেবীকে শাঁখা পরান, পুনর্মিলন—ইত্যাদি। এই লৌকিক কাহিনীর জড় অনেক প্রাচীন, এই শিব আদিযুগের কৃষিনির্ভর সমাজের উপাস্য দেবতা। এঁর মুখরা তরুণী ভার্যা। তাঁর সঙ্গে এঁর সর্বদা কলহ চলে, নিজের অবস্থাও শোচনীয়, দেবতা হয়েও হীন বৃত্তি (কৃষিকার্য) অবলম্বন, পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি ইত্যাদি বর্ণনা থেকে মনে হয়, লৌকিক শিবকাহিনীতে নীতি ও আদর্শের পালিশ পড়ার অবকাশ ঘটেনি। রামেশ্বর এ কাব্যে শিবের দরিদ্র-জীবনের বর্ণনায় যে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন, মুকুন্দরামকে ছেড়ে দিলে মধ্যযুগের আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। সরস হাস্যকৌতুক, অনুপ্রাসের ঝকমকি, ছন্দের দোলন ইত্যাদির তুলনাস্থল একমাত্র রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। অবশ্য রায়গুণাকর অধিকতর শক্তিশালী কবি। তবে 'কৃষ্ণনাগরিক' ভারতচন্দ্রও তাঁর অর্ধশতাব্দী পূর্ববর্তী এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কবির কাছ থেকে কিছু কিছু উপাদান ও বাক্‌রীতি গ্রহণ করেছিলেন। কৃষিজীবনের সঙ্গেও রামেশ্বরের নিগূঢ় পরিচয় ছিল। বিশেষত রাঢ়ের ধান-চাল

সম্বন্ধে সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসেবে তাঁর বিবরণী অমূল্য ইতিহাসের খনি বলে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। তাঁর দু'চারটি উক্তি প্রায় ভারতচন্দ্রের মতোই উজ্জ্বল চমৎকারিত্বে পূর্ণ। যেমন—"দিনে হও ব্রহ্মচারী, রাত্রে গলাকাটা", "জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা", "নামের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে", "পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল", "পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে" ইত্যাদি। অনুপ্রাসে তাঁর আসক্তি প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন—"চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর। ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।" "মটরের মর্দনে মসুর গেল উড়্যা", "ঠাকুরাণীর ঠোঁকতে ঠাকুর ঠেক্যা হন", "খস্যা গেলে পস্যা যাত্য ঘসিবার নয়।" এসব অনুপ্রাস অনেক স্থলেই কর্ণ-পীড়াকর হয়েছে। ভারতচন্দ্র এসব বিষয়ে অনেক বেশী শিল্পের সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সে যাই হোক, রামেশ্বর উচ্চতর চরিত্র মহত্তর আদর্শ প্রভৃতি সৃষ্টি করতে না পারলেও শিবদুর্গার চরিত্রগুলিকে বেশ স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কিত করেছেন, তাঁদের দৈব মহিমা মানববোধের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অষ্টাদশ শতকের যুগপ্রভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা স্বর্গ-লোক ছেড়ে বাংলার পথে-প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন থেকেই বোঝা যাবে। শিবায়নের আর-এক কবি রামকৃষ্ণ রায় (সপ্তদশ শতাব্দী—পূর্বে আলোচিত) ক্লাসিক, সুরুচিসঙ্গত ও মার্জিত ভাবের দিক থেকে রামেশ্বর থেকে শ্রেষ্ঠতর হলেও সহজ-সরস-স্বাভাবিক বর্ণনার জন্য রামেশ্বরের কাব্য রামকৃষ্ণের কাব্যকে অতিক্রম করে গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিবদুর্গা-সংক্রান্ত আরও কিছু কিছু কাহিনী পাওয়া গেছে—ঊনিশ শতকেও কেউ কেউ এই জাতীয় পুরাতন কাব্যধারার অনুবর্তন করেছিলেন। তবে অনেকে এই ধরনের কাব্যে পৌরাণিক ভাব একটু বেশী যোগ করে দিয়েছিলেন। যেমন দ্বিজ কালিদাসের 'কালিকাবিলাস'—এঁর কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রভাব আছে দেখে এঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি বলে মনে হয়। কবি সংস্কৃত পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য রুচির দিক থেকে তিনি অতি নিকৃষ্ট মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজ রামচন্দ্র, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী—এঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি, কিন্তু রচনাবস্তু ও মনোভঙ্গীর দিক থেকে মধ্যযুগের শিবায়ন পালার সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত। যাই হোক, শিবায়ন পালার মধ্যে যেগুলিতে কিছু কাব্যগুণ আছে, সেগুলি অধিকাংশ স্থলে লৌকিক শিবকাহিনীকেই অবলম্বন

করেছে। এই সমস্ত কাব্যে উচ্চতর কলাকৃতি বা চরিত্রমাহাত্ম্য না থাকলেও এই যুগের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এদের প্রয়োজনীয়তা ইতিহাসবিদ্ অস্বীকার করতে পারবেন না।

৩. ধর্মমঙ্গল কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম—অবশ্য এই শতাব্দীর রাঢ় অঞ্চলে আরও কয়েকজন কবি ধর্মঠাকুরের মহিমাবিষয়ক কাব্য লিখেছিলেন। কাব্যের দিক থেকে তার বিশেষ কোন মূল্য না থাকলে ধর্মঠাকুরের পূজা-প্রণালী ও ধর্ম-'কাল্ট' সম্বন্ধে তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। একদা ধর্মঠাকুর ডোম ও অন্যান্য অন্তেবাসীদের দ্বারাই পূজিত হতেন, ডোমের পুরোহিত ভাঙা-ভাঙা সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা মিশিয়ে ধর্মের মন্ত্র তৈরী করতেন। তার পর কালক্রমে অন্ত্যজের দেবতা ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজেও ছাড়পত্র পেলেন, ব্রাহ্মণ-কবিও মহানন্দে ধর্ম-ঠাকুরের পূজাপ্রণালী রচনা করলেন, ধর্মের আশ্রিত লাউসেনের কীর্তিকাহিনী নিয়ে গান বাঁধতে লাগলেন। অবশ্য অন্য মঙ্গল কাব্যের তুলনায় ধর্মমঙ্গল সর্বকনিষ্ঠ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের যা কিছু বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর কাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করেছিল বলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজে তিনি গত শতাব্দীতেই প্রচার লাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যৎসামান্য আছে। ধর্মমঙ্গলের সব কবি বেশ বড়ো মাপে আত্মপরিচয় দিতেন। কিন্তু ঘনরাম আত্মপ্রচারে একেবারে উদাসীন ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ তাঁর কাব্য থেকে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্প্রতি একটি পুঁথিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে দীর্ঘকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, আমাদের মতে সেটি জাল; অন্য কোন কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি এটি রচনা করে ঘনরামের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ তাঁর কাব্যে আছে, তাই মনে হয় কবি উক্ত রাজার কিছু পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত, মায়ের নাম সীতা। তাঁর চার পুত্র। কবি ধর্মঠাকুরের মহিমা রচনা করলেও কাব্যের মধ্যে বহু স্থলে রামভক্তির পরিচয় দিয়েছেন; চার ছেলের নামও রেখে-ছিলেন রামের নাম দিয়ে, যথা—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ।

এ কাব্যে রামায়ণ ও ভাগবতের নানা কাহিনীর বিশেষ প্রভাব আছে। কবি কাব্যসমাপ্তির প্রাক্‌মুহূর্তে যে সনতারিখের উল্লেখ করেছেন, তা থেকে ১৬৩৩ শক বা ১৭১১ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘনরামের আগে অন্তত দু'শ বছর ধরে রাঢ়ে এবং রাঢ়সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা-উপাসনা যেমন চলে আসছিল, তেমনি তাঁর বিষয়ে একাধিক কাব্যও রচিত হয়েছিল। ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত দুটি কাহিনী (অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনী এবং লাউসেনের কাহিনী) অবলম্বন করে ঐ বিশালকায় কাব্য রচনা করেছিলেন। এ কাব্যের বাইরের আকার প্রায় মহাকাব্যের মতো, কিন্তু মনোভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীতে কবি পাঁচালীর স্থূল আদর্শকে ছাড়তে পারেননি। এর মূল কথা—ধর্মের কৃপায় লাউসেনের অসাধ্যসাধন। তার জন্য এর মধ্যে বহু অনৈসর্গিক কাহিনী স্থান পেয়েছে, প্রায় সর্বত্র বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা মুছে গেছে। তবু এর মধ্যে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও নারীধর্মের যে উচ্চ আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকারের যোগ্য। বিশেষত তিনি বীরশ্রেষ্ঠ লাউসেনের অনমনীয় পৌরুষ, অদম্য বীরত্বের সঙ্গে সুপবিত্র নৈতিক আচরণকে মিলিয়ে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী সাহিত্যাদর্শের স্থলে একটা বলিষ্ঠ, প্রাণবান ও শুদ্ধ জীবনকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন এবং আংশিকভাবে সফল হয়েছেন। তাঁর রচনা-ভঙ্গিমা সংস্কৃতপ্রধান ও মার্জিত, বক্তব্য বিষয়ে স্থূল রুচির স্পর্শ দু'এক জায়গায় থাকলেও গ্রাম্য ইতরতা নেই, তির্যক বাণীভঙ্গিমাও বেশ চিত্তাকর্ষী হয়েছে। সর্বোপরি এতে একযুগের রাঢ়ের সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হয়েছে—সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে এ গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের মতো তাঁর কাব্যও কৃত্রিমতার বাঁধন ছিঁড়তে পারেনি, এবং তিনি মহৎ বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, এবং সেজন্য খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

মাণিক গাঙ্গুলি এ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি। অবশ্য তাঁর সময় নিয়ে প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কেউ তাঁকে আরও পূর্ববর্তী বলতে চান। তাঁর পুঁথিতে সন-তারিখজ্ঞাপক ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু নকলনবিশদের অজ্ঞতার ফলে তা থেকে কোন বিশ্বাসযোগ্য সন উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া তাঁর প্রামাণিক পুঁথিও সুলভ নয়। কেউ কেউ উক্ত সন-তারিখ

থেকে মনে করেন, এ কাব্য ১৪৬৯ শক বা ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কিন্তু কাব্যের ভাষা এত আধুনিক যে, একে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যামোদী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এ বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করে ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ পেয়েছিলেন। কারও মতে এই তারিখ হবে ১৭৮৭ খ্রীঃ অঃ। যাই হোক, ভাষা ইত্যাদি থেকে ত'াকে বিশেষ প্রাচীন বলে মনে হচ্ছে না। আপাতত ত'াকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের কবি বলে সিদ্ধান্ত করা গেল।

কবি খুব ফলাও করে নিজের ব্যক্তিগত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, অবশ্য তা অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং পুরাতন ধারার অনুকরণ মাত্র। বারো পালায় সমাপ্ত এ কাব্য কাহিনীর দিক থেকে সেই চিরাচরিত পর্যুসিত আদর্শই অবলম্বন করেছে। ঘনরামের পর এ কাব্যের স্বাদ বড় 'জলো' মনে হয়। মাণিক গাঙ্গুলি ধর্মঠাকুরকে প্রায় পুরোপুরি পৌরাণিক দেবতা বানাতে চেয়েছেন। এর আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এতে রাঢ়ের ধর্ম-পূজানুষ্ঠানের খু'টিনাটি বর্ণনা আছে। ঘনরামের চেয়ে তাঁর কাব্য নিকৃষ্ট হলেও সাধারণ চরিত্রাঙ্কনে কবি কিঞ্চিৎ সফল হয়েছেন তা স্বীকার করতে হবে। তাঁর ভণিতায় 'শীতলামঙ্গল' নামে আর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গেছে।

উল্লিখিত দু'জন কবিকে বাদ দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও দু'এক জন ধর্মমঙ্গলের কবির আবির্ভাব হয়েছিল। দ্বিজ রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা, সহদেব চক্রবর্তী ও হৃদয়রাম সাউ ধর্মমঙ্গলে হস্তক্ষেপ করে মাঝারি ধরনের তিনখানি কাব্য লিখেছেন। এ'রা সবাই অর্বাচীন কালের কবি, কাজেই এ'দের রচনা বেশ মার্জিত, ভাষা তীক্ষ্ণ ও আধুনিক। রামচন্দ্রের কাব্য ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে, সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ' ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দে এবং হৃদয়রাম সাউয়ের কাব্য ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। এর মধ্যে 'অনিলপুরাণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে প্রাচীন জ্ঞানবিশ্বাস, কৃষক-শিবসংস্কৃতি প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটার জন্য এর ধর্মতত্ত্ব একটু রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কবি ধর্মঠাকুরের কথা লিখলেও শাক্তভাব ছাড়াতে পারেননি। প্রসিদ্ধ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' এর মধ্যেও পাওয়া গেছে। 'নিরঞ্জন রুষ্মা' শীর্ষক রহস্যময় ছড়াটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্মৃত ইতিহাসকেই ফুটিয়ে তুলেছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন অল্প শক্তিশালী কবি ধর্মমঙ্গলে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এখনও ধর্মপূজা রাঢ়ের জনপ্রিয় উৎসব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণকে অবলম্বন করে বহু ব্রতকথা ধরনের পাঁচালী রচিত হয়েছিল—সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দু-মুসলমানদের এই মিশ্রদেবতার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও এই অহিন্দু কাহিনী হিন্দুর বেশ পরিধান করে আবির্ভূত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই ধরনের বহু সত্যনারাণ-সত্যপীর পাঁচালী পাওয়া গেছে—যার কাব্যমূল্য নিতান্তই অল্প। ইতিপূর্বে আমরা রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাঁচালীর উল্লেখ করেছি। এমন কি ভারতচন্দ্রও প্রথম যৌবনে দু'খানি অতিক্ষুদ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছিলেন।

৪. অন্নদামঙ্গল ও ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একজন প্রথম শ্রেণীর মার্জিত-রুচি ও বিদগ্ধ সারস্বত সাধক। তাঁর রচনার কোন কোন অংশ আধুনিক রুচির নিকট কিছু আপত্তিকর হলেও কবি অসাধারণ শব্দমন্ত্রে, তির্যক বাগভঙ্গিমায়, সরস হাস্যপরিহাসে এবং অভ্রান্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যে বিচিত্র নাগরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যাপার। তিনি অবশ্য মধ্যযুগীয় ধারা অনুসরণ করে মঙ্গলকাব্যেরই অনুবর্তন করেছেন, তবু তার মধ্যে গ্রামীণ স্থূলতার চেয়ে নাগরিক সূক্ষ্মতার অধিক পরিচয় মেলে—যা অনেকটা আধুনিক যুগলক্ষণাক্রান্ত। তিনি সজ্ঞানে সচেতনভাবে আধুনিকতার সূত্রপাত করেননি, তবু তাঁর থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আভাস-ইঙ্গিত ফুটে উঠতে আরম্ভ করে।

তিনি উচ্চ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও দুর্ভাগ্যবশত ভূস্বামীর মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিত্তবান পিতার সন্তান হয়েও দারিদ্র্যের দ্বারা সারা-জীবন পীড়িত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ সত্ত্বেও সরস মনের সজীব ধর্ম সর্বদা বজায় রেখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন যুগের আলোক সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, এখনও সে জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। কবি তাঁর কাব্যে কিছু কিছু আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত কবির প্রতি অনুরাগবশত তাঁর সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তার থেকে কবির জীবনেতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি সংবাদ জানা যায়। হাওড়া-হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত পেঁড়ো গ্রামে জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা বিখ্যাত জমিদার নরেন্দ্র রায়। পিতার

সর্বকনিষ্ঠ সন্তান জমিদারনন্দন ভারতচন্দ্র বাল্যেই দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েন। তাঁর পিতা বর্ধমানরাজের দ্বারা সর্বস্বান্ত হলে বালক-কবি বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তিনি চোদ্দ-পনের বৎসর বয়সেই সংস্কৃতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে ফারসী ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার স্থাপিত হয়। এই সময়ে পরাশ্রয়ে গিয়ে তিনি দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত হন, উপরন্তু পিতা ও স্বজনদের অনুমতির অপেক্ষা না করে নিজ-মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করাতে প্রায় সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তবু অধ্যবসায় ও আশাবাদ তাঁকে সমস্ত দুর্ভাগ্যের ওপরে মাথা তুলে থাকতে উৎসাহিত করেছিল। তাঁর এমন দুর্ভাগ্য যে, অগ্রজের কথামতো বর্ধমানরাজের কাছে আর্জি নিয়ে গেলে বিনাদোষে তিনি কারারুদ্ধ হন। সেখান থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে পুরীধামে উপস্থিত হন এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে বাস করতে থাকেন। পরে বৈষ্ণব বৈরাগীর দলে মিশে বাংলাদেশে উপস্থিত হলে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়েরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার গৃহবাসী করেন। পরে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তিনি কৃষ্ণনগরাধিপ গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টিপথে পড়েন এবং মহারাজের সভাকবি নিযুক্ত হন। এরপর কিছুদিন তাঁর অন্নবস্ত্রের কষ্ট ঘুচে যায়। মহারাজ-প্রদত্ত মূলাজোড় গ্রামে তিনি বেশ কিছুদিন নিরুদ্বেগে বাস করেন। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্য তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। জমিদারের কোন কর্মচারীর অত্যাচারে ও কারসাজিতে তিনি এই ভিটাটুকুও ছাড়বার উদ্যোগ করেন। শেষ পর্যন্ত এ গ্রাম তাঁকে ছেড়ে যেতে হয়নি। মনে হয় ১৭০৫-১১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম হয় এবং ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক তিন বৎসর পরে বহুমূত্র রোগে তাঁর জীবনাবসান হয়।

এবার তাঁর কাব্যের পরিচয় নেওয়া যাক। প্রথম জীবনে, নিতান্তই কিশোর বয়সে তিনি সত্যপীরের মাহাত্ম্য-বিষয়ক দু'খানি অতি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করে সভামধ্যে পাঠ করেন। এর মধ্যে একখানি পুঁথি ১৭৩৭-৩৮ সালে রচিত, আর পুঁথিখানির রচনাকাল জানা যায় না। কবি অর্বাচীন বয়সে প্রথার অনুবর্তন করে যে পুঁথি দুটি লেখেন, রচনার কিছু কৌশল ভিন্ন তার আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। এ ছাড়াও তিনি নানা সময়ে বিবিধ বিষয় নিয়ে অনেক ছোট ছোট কবিতা লিখেছিলেন—যেগুলি কাব্যগুণের দিক থেকে ততটা না হলেও বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্য

কথা বলতে কি, ভারতচন্দ্র এই ছোট ছোট কবিতাগুলির দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কার পরিত্যাগ করে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছেন। মধ্যযুগে দেবদেবী ছাড়া কাব্য হত না। মানুষের কথা ছিল বটে, কিন্তু সে মানুষ বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়—তারাও শাপভ্রষ্ট দেবকুমার-কুমারী অথবা দেবকৃপাধীন ভক্ত। কিন্তু বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ, রঙ্গরহস্য, আলো-আঁধার ভারতচন্দ্রের টুকরো কবিতাগুলোর মধ্যে একটা বিচিত্র 'ধুপছায়া' আলো নিক্ষেপ করেছে। এই বর্ণনাটুকু এখানে আমরা উল্লেখ করি ঃ

কখনও দারুণ ঝড়, শাখী উড়ে পাখী জড়, ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়,
নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে, মেঘ স্থির হতে নারে, হুলুস্থুল পারাবারে
প্রলয়ের দাওয়া ॥

এখানে বাস্তব জীবনের ছবি চমৎকার ফুটেছে। এ ছাড়াও তিনি হিন্দী-ফারসী মিশ্রিত ভাষায় দু' একটি কবিতা লিখেছিলেন। এ সমস্ত কবিতায় রুচির স্বাদবৈচিত্র্যই লক্ষণীয়, কবি ভারতচন্দ্রের বিশেষ কোন স্পর্শ এতে পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র অমর হয়েছেন তাঁর 'অন্নদামঙ্গলের কাব্যে'র গুণে। "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে"—সে গুণ হল অন্নদামঙ্গল অন্তর্ভুক্ত পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত তিনখানি কাব্য—(১) অন্নদামঙ্গল, (২) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ এবং (৩) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। অন্নদামঙ্গল পুরোপুরি পৌরাণিক ছাঁদের মঙ্গলকাব্য হলেও এতে বাস্তব বাংলাদেশের সমাজ ও মানুষের ছবি চমৎকার ফুটেছে। প্রারম্ভে ও পরিশেষে বাংলার ঐতিহাসিক পরিবেশের চিত্র আছে। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর পুরোপুরি কাল্পনিক প্রেমের কাহিনী এবং 'মানসিংহ' ঐতিহাসিক কাহিনী হলেও অনৈতিহাসিক ঘটনাতে পূর্ণ।

'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথমে আলিবর্দি কর্তৃক ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাকক্ষে নিক্ষেপ এবং কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা করে বিপদ থেকে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনারও কিছু প্রসঙ্গ আছে। অতঃপর কবি সংস্কৃত 'কাশীখণ্ড' এবং অন্যান্য শিবপুরাণ অবলম্বনে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় গৃহে উমারূপে জন্ম এবং শঙ্কর-উমার বিবাহের বর্ণনার পর কাশীধামে অন্নপূর্ণার অধিকারের বর্ণনা করেছেন। তারপরে ব্যাস-প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। বুদ্ধিহত বুড়ো ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ

করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন, খুব চমৎকার রসিকতার সঙ্গে কবি তার বিবরণ দিয়েছেন। কাশীধামে দেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠার পর তিনি মর্ত্যের অন্যস্থানে শিবপূজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন এবং কুবেরের অনুচরকে শাপ দিয়ে হরিহোড় নাম নিয়ে এক দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। হরিহোড় মর্ত্যে জন্ম নিয়ে দেবীর কৃপায় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার করলেন। কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছে নির্বুদ্ধিতাবশত তিনি তরুণী ভার্যাকে ঘরে এনে মহা অশান্তি সৃষ্টি করলেন। দেবী তখন হরিহোড়কে ছেড়ে অন্য কাউকে কৃপা করতে মনস্থ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি কুবেরের পুত্র নলকুবেরকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন। ইনিই ভবানন্দ মজুমদার—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। ভবানন্দ সাধুসজ্জন ছিলেন, মুঘলের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন। হরিহোড়ের আবাস ছেড়ে দেবী পরম ধার্মিক ভবানন্দের গৃহে গিয়ে অচলা হলেন। এই হল অন্নদামঙ্গলের প্রথম অংশের কাহিনী। কাহিনীটি এমন কিছু চিত্তাকর্ষী নয়, মৌলিকও নয়—ভবানন্দ প্রসঙ্গ ছাড়া সবই প্রায় সংস্কৃত অর্বাচীন পুরাণ থেকে নেওয়া। তবে চরিত্র ও মনোভঙ্গী অনুসারে তাঁর এই মঙ্গলকাব্য একখানি বিচিত্র কাব্য বলে পরিগণিত হতে পারে। এতে বাহ্যত মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসৃত হলেও (এক শাপভ্রষ্ট দেবকুমারের দ্বারা মর্ত্যধামে দেবীর পূজা প্রচার) এর চরিত্রগুলি বাস্তব বাংলাদেশের পাঁচাপাঁচি জীবন থেকে উত্থিত হয়েছে, দেবদেবীরা যেন স্বর্গীয় মহিমা এবং স্বর্গলোক ত্যাগ করে বাংলাদেশের নরনারীর রূপ ধরে পথেঘাটে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দেবতারা তাই ততটা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয়ের পাত্র না হয়ে কৌতুক-রসাসিঞ্চিত হয়ে বাস্তব মানুষের সঙ্গী হয়েছেন। মহাদেব, অন্নপূর্ণা, ব্যাসদেব—এঁদের চরিত্রে পূর্বতন ক্লাসিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্য কিছুমাত্র রক্ষিত হয়নি। তাঁদের নিয়ে ভাঁড়ামি, রঙ্গরহস্য করে কবি দেবতাদের আমাদের কাছাকাছি এনে ফেলেছেন। যুগধর্মানুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্বতন দেবদেবীর চরিত্রে এইরূপ বাস্তবানুকরণ ঘটেছিল—এর আগে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবসংকীর্তনেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল।

ভারতচন্দ্র চরিত্র-পরিকল্পনায় কোন মহৎ বৃহৎ আদর্শ সৃষ্টি করতে না পারলেও দেবতাকে মানব করে যে অভিনব আদর্শের সূচনা করেন তাই হচ্ছে

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভসূচনা—যদিও এ ব্যাপার তাঁর অজ্ঞাতসারেই ঘটে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম-প্রভাবিত অবক্ষয়ী বাঙালী সমাজের অধঃপতনের দিনে এরকম ঘটাই স্বাভাবিক। অবশ্য এর জন্য সব সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দী ও ভারতচন্দ্রের ওপর দোষারোপ করে লাভ নেই। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের পতনের দিনে অর্বাচীন পুরাণসমূহেও দেবমাহাত্ম্য রক্ষিত হয়নি—ভারতচন্দ্রের আদর্শ ছিল ঐ সমস্ত অপদার্থ অর্বাচীন পুরাণ। তা হলেও তাঁর মনোভঙ্গী ঠিক ভক্তিনত আবেগের অনুকূল ছিল না। বুদ্ধিমান, রুচিবান, কৃষ্ণনগরের রাজার বয়স্য, এবং নাগরিক সভ্যতায় বিবর্ধিত রায়গুণাকর সরস বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনা ও রচনার যে অসাধারণ কুশলতা অর্জন করেছিলেন, অন্নদা-মঙ্গলের মঙ্গলকাব্য ধরনের কাহিনী ও চরিত্রেও তার বিশেষ প্রভাব আছে।

দ্বিতীয় আখ্যান কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। এতেও তাঁর বিশেষ মৌলিকতা নেই। তাঁর পূর্বে অনেক কবি বিদ্যাসুন্দর-সংক্রান্ত এবং কালিকার মাহাত্ম্যবিষয়ক মঙ্গলকাব্য লিখেছিলেন। তীব্র আদিরস ও অখণ্ড বাস্তব চিত্রের জন্য কালিকামঙ্গল সাধারণত 'বিদ্যাসুন্দর' নামেই পরিচিত হয়েছে। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামে উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় আখ্যান কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। গোড়াতে অবশ্য তিনি ভবানন্দ মজুমদার ও মানসিংহের কথোপকথন দিয়ে খানিকটা ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কাব্যের অভ্যন্তরে কিছু দূর অগ্রসর হলে দেখা যাবে, এর সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের কোন যোগ নেই। রাজকুমারী বিদ্যা ও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক সুন্দর-চোর ধরা, শিরশ্ছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া, কালিকার প্রসাদে ভক্ত সুন্দরের রক্ষা পাওয়া, পরিশেষে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ, প্রভৃতি বহু-প্রচলিত কাহিনীই তাঁর অবলম্বন। চরিত্রের দিক থেকেও তিনি একটি-দুটি ভিন্ন আর কোথাও বিশেষ মৌলিকতা দাবি করতে পারবেন না। বিশেষত নায়ক-নায়িকার চরিত্রে কোন মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু হীরামালিনী, বিদ্যার মাতা, নগরপাল-কোটাল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি অধিকতর সুচিত্রিত হয়েছে। এ কাব্যের বহুস্থলে অনাবৃত, আপত্তিকর বর্ণনা আছে, তাই ইদানীং ভারতচন্দ্র অশ্লীল কবি বলে কুখ্যাতি লাভ করেছেন। কুখ্যাতি বা সুখ্যাতি—যাই হোক না কেন, 'বিদ্যাসুন্দর'-এর জন্য রায়গুণাকর বাংলা সাহিত্যে আজও

স্মরণীয় হয়ে আছেন। এতে আদিরসের নির্বাধ বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু তা ঘৃণাব্যঞ্জক নয়। অন্যান্য কবি আদিরসকে ঘুলিয়ে তুলেছেন, আর ভারতচন্দ্র সেই ফেনিলতাকে শিল্পের দ্বারা সংযত করেছেন—এজন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। ভাষার মধ্যে তিনি যে তির্যকতার যাদুমন্ত্র সঞ্চার করেছেন, তার ফলে স্থূল বর্ণনাও লোভনীয় হয়েছে। বিদ্যাসুন্দরের দুটি-একটি পালা বাদ দিলে এটি ঐ শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে। রামপ্রসাদও একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন। তাঁর উক্ত কাব্যে অনেক প্রশংসনীয় গুণ থাকলেও তার শিল্পলক্ষণ নখাগ্রে গণনীয়।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশ 'মানসিংহ' বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিনটি খণ্ডের মধ্যে শেষোক্ত খণ্ডটি সবদিক থেকে নিকৃষ্ট। এতে ইতিহাস ও উদ্ভট ব্যাপার একসঙ্গে মিশে গিয়ে জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় মানসিংহ যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করে তাঁকে খাঁচায় ভরে নিয়ে চললেন জাহাঙ্গীর বাদশাহ্কে উপহার দেবার জন্য। ভবানন্দকে মানসিংহ খুব প্রশংসা করলেন এবং তাঁকেও সঙ্গে করে দিল্লী নিয়ে চললেন। অন্নদার ভক্ত ভবানন্দের সহায়তা এবং দেবীর কৃপা না পেলে মুঘলবাহিনী প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে কিছুতেই দাঁড়াতে পারত না। খাঁচায় বন্দী প্রতাপাদিত্যকে জীবন্ত অবস্থায় আর দিল্লী নিয়ে যাওয়া গেল না, বাংলার বীর প্রায়োপবেশনে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করলেন। মানসিংহ তখন প্রতাপের মৃতদেহ ঘৃতে ভেজে শুষ্ক করে নিয়ে চললেন—জীবিত বা মৃত শত্রুর দেহ বাদশাহ্কে উপঢৌকন দিতেই হবে। বাদশাহ্ খুশি হলেন বটে, কিন্তু যখন শুনলেন যে অন্নপূর্ণার কৃপাপুষ্ট ভবানন্দ মজুমদার নামক ব্রাহ্মণের দৈব ক্ষমতায় এই জয় সমাধা হয়েছে, তখন তিনি ধর্মীয় অনুদারতাবশত অন্নপূর্ণার উদ্দেশে অতি জঘন্য উক্তি করতে লাগলেন। ভবানন্দ তার প্রতিবাদ করলে তাঁকে নিকৃষ্ট কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হল। মানসিংহ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অপমানিত ও দুঃখিতচিত্তে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনিই ভবানন্দকে খেলাত-খেতাব দেবার জন্য দিল্লীতে সঙ্গে করে এনেছিলেন—কিন্তু জাহাঙ্গীরের অবিবেচনা ও অনুদারতাপ্রসূত ঔদ্ধত্যের ফলে অন্নদার বরপুত্র ভবানন্দ কয়েদ হলেন। কিন্তু তারপর গোটা দিল্লী শহরে মুসলমান আমীর-ওমরাহ এবং খোদ জাহাঙ্গীর বড়োই বিপদে পড়লেন। যে হিন্দুর দেবীকে তিনি অপমান করেছিলেন, সেই দেবীর অনুচর ভূত-প্রেতেরা দিল্লী শহর ভেঙে তছনছ করে দিল, মুসলমানদের মারধোর করে ব্যতিব্যস্ত করে

তুলল। তখন বাধ্য হয়ে জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে প্রচুর খেলাত ও জমিদারী দিয়ে এবং সপারিষদ অন্নদার পূজা করে বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। রাজা উপাধি, বিস্তৃত জমিদারী ও নানা উপহার ইত্যাদি নিয়ে ভবানন্দ দেশে ফিরলেন এবং দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগলেন। যথাকালে খুব ঘটা করে তিনি অন্নপূর্ণা-পূজা প্রচার করলেন। পরে কাল পূর্ণ হলে সস্ত্রীক ভবানন্দ মজুমদার স্বর্গারোহণ করে স্বর্গের অধিবাসী স্বর্গে ফিরে গেলেন। তাঁরই বংশধর হলেন কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—কবি ভারতচন্দ্র তাঁর সভাকবি ছিলেন। পৃষ্ঠপোষকের আদিপুরুষের গৌরব বাড়াবার জন্য কবি সত্য-মিথ্যা ও অতিরঞ্জন মিশিয়ে 'মানসিংহ' রচনা করেছেন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন, তাঁর দুঃখজনক মৃত্যু বর্ণনাতেও কবির লেখনী কুণ্ঠিত হয়নি। অবশ্য একাব্যের অতিরঞ্জন ও ইতিহাসবিকৃতি বাদ দিলে ছোট ছোট চরিত্রে তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভবানন্দের দুই পত্নী, তাঁদের খাস চাকরাণী, ভবানন্দের সঙ্গে যারা দিল্লী গিয়েছিল, মানসিংহের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী এসেছিল তাদের কৌতুকজনক বর্ণনায় তিনি অসাধারণ কুশলতা দেখিয়েছেন। অতিরঞ্জন ও অনৈতিহাসিক বর্ণনার জন্য কিন্তু মূল কাহিনী একেবারে মাটি হয়ে গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও সংস্কৃতির প্রতীকপুরুষ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে যাওয়া কিছু বিপজ্জনক বটে। তাঁর রচনা, *motif* বা উপাদান ও মনোভঙ্গী আদৌ 'সীরিয়স' বা গভীর ভাবোদ্যোতক ছিল না, তিনি কখনোই বিশাল কিছু সৃষ্টি করতে চাননি, সে সামর্থ্যও ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহ্যহীন কলুষিত অবক্ষয়ী সমাজে তাঁর আবির্ভাব; ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু দুঃখ-কষ্ট ও অভাব অনটনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন—তখন দেবদেবীর প্রতি অচলা-ভক্তি উচ্চ সমাজ থেকে ক্রমেই হ্রাস পেয়ে যাচ্ছিল। এর কারণ এ যুগে মুসলিম কুশাসনই সমাজ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছিল, ঐশ্বর্যের সমারোহ অলস-বিলাসজর্জ্জর নাগরিক বিলাসবিভ্রম উচ্চ বর্ণদের অবকাশ অপহরণ করে নিয়েছিল, ফারসী ভাষা হিন্দু সমাজেও রুজি-রোজগারের বাহন হয়ে উঠেছিল, আর ফারসী আদিরসের কিস্‌সা-কাহিনী ধনিসমাজে অম্লান্ত মুখরোচক আস্বাদ সৃষ্টি করেছিল। ভারতচন্দ্রের মনের আকাশ এই ধরনের ধুপছায়ার আলো-আঁধারে বিচিত্র রেখাময়। কাজেই রঙ্গব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাসে তাঁর লেখনী ক্ষুরধার হয়েছে, বাক্‌চাতুরী তাঁর স্বভাবধর্মকে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। জীবনের বেদনা, করুণা, গভীরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের চেয়ে

তার লঘু দিকটি তাঁকে অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র—তিনজনেই নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ; রাজা, ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন—কাজেই তাঁদের রচনার কোন কোন অংশে নাগরিক জীবনের ভালোমন্দ—দুই-ই প্রতিফলিত হয়েছে। এর জন্য তাঁদের রুচিকে দুষে লাভ নেই। যুগধর্ম ও পরিবেশকে ভারতচন্দ্র ছাড়িয়ে উঠবেন কি করে ? বরং তিনি অসাধারণ প্রতিভার গুণে স্থূলকে যথাসম্ভব শিল্পের রূপ দান করেছেন, সাধারণ শব্দ-পরম্পরাকে মণিখচিত স্বর্ণাভরণের মতো সহস্র দ্যুতি দিয়েছেন, গ্রামীণ ও আবেগবহুল বাংলা ভাষাকে নাগরিক ও মনঃপ্রধান করে তুলেছেন, ভাবাবেগে-আর্দ্র উচ্ছ্বাসের স্থলে হাস্যপরিহাসের উজ্জ্বল ও আতপ্ত অনুভূতি এনে দিয়েছেন—ফারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দভাণ্ডার থেকে যথেচ্ছ আহরণ করে বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন—এজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই বাক্যগুলির চমৎকারিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি কী অসাধারণ!—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন', 'খুন হয়েছিনু বাছা চূণ চেয়ে চেয়ে', 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর', 'মিছা কথা সি'চা জল কতক্ষণ রয়', 'এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ ক'ব কার', 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী', 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী' প্রভৃতি উক্তিগুলি বাংলার নিত্যব্যবহার্য প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আবার দু' এক স্থলে তিনি দুটি চারিটি চমৎকার লীরিক পংক্তি রচনা করেছেন, যা সহজেই উনিশ শতকী গীতিকাব্যের পূর্বজ বলে গৃহীত হতে পারে।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও যে ॥

এতে যেন মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র সুর ধ্বনিত হচ্ছে, এবং সত্যই মাইকেল 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' ভারতচন্দ্রের এই ধরনের ছন্দ ও বাক্‌রীতি গ্রহণ করেছিলেন।

অন্নদামঙ্গল ছাড়া তাঁর 'রসমঞ্জরী' পদ্মস্তিকায় প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের নজিরে সরসভাবে নায়ক-নায়িকার সংজ্ঞা ও বর্ণনা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি মিশ্রভাষায় 'চণ্ডীনাটক' লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এতে বাংলা, হিন্দী, ফারসী ও সংস্কৃত শব্দের বিচিত্র মিলন লক্ষ্য করা যাবে, যা শব্দকুশলী

কবি ছাড়া আর কেউ পারেন না। নাটকটির যৎসামান্য লিখেই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, সমাপ্ত করতে পারলে তিনি একখানি অভিনব গ্রন্থের রচনাকার বলে খ্যাতিলাভ করতে পারতেন। অসাধারণ শব্দকুশলী রায়-গুণাকর চরিত্র ও কাহিনী সম্পর্কে অনেক স্থলে উদাসীন ছিলেন, জীবনের বেদনা ও বঞ্চনা নিজে ভোগ করলেও কাব্যে তার চিহ্নমাত্র রাখেননি। এ বিষয়ে বরং কবিকঙ্কণ অধিকতর কৃতিত্বের অধিকারী। কিন্তু শব্দমন্ত্রে, মণ্ডনকলায়, ছন্দপ্রকরণে এবং হাস্যপরিহাসের তীক্ষ্ণতায় মধ্যযুগের কোন কবি ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নন। আর্দ্রভূমির দেশে তিনি রৌদ্রতপ্ত উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে প্রতিভার মৌলিকতাই প্রমাণিত করেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে তাঁর মতো সফল-কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। গোটা উনিশ শতাব্দীতেই তাঁর প্রভাব প্রায় অনতিক্রমণীয় হয়েছিল। ইংরেজীশিক্ষিত তরুণের দল, যাঁরা সদাই 'সীরিয়স' ভাবে ভাবিত থাকতে ভালোবাসতেন, সেই ধরনের কতিপয় 'ডিলাটেন্ট্' বা সখের রসবিলাসীকে বাদ দিলে এখনও ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয়তা প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি—"রাজ-সভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" অনেক অরসিক ব্যক্তি মণিমালার অর্থ না বুঝে রুচি-শুচি-শ্লীল-অশ্লীল প্রভৃতি অনেক ভারী ভারী তত্ত্বকথার ধূম্রজালে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার অগ্নিকে ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু ধোঁয়া আবার কবে বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে আচ্ছন্ন করতে পারে? তাই বিশ শতকে ভারতচন্দ্রের প্রতিভাকে নতুন করে ভেবে দেখবার ও বিচার করবার চেষ্টা চলেছে, অনেক গবেষক শুচিবাতিক ছেড়ে দিয়ে শুধু সৌন্দর্যবোধের ও রসের দ্বারা ভারতচন্দ্রকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্য ও ভারতচন্দ্রকে বুঝবার পক্ষে এ একটা সুলক্ষণ সন্দেহ নেই।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ॥ প্রসিদ্ধ ভক্ত ও সাধক-কবি হালিশহরের রামপ্রসাদ সেন, যিনি কালীভক্ত ও শ্যামাসঙ্গীতকার হিসেবে বাংলাদেশের অন্তরে এখনও বেঁচে আছেন, তিনিও একদা (বোধহয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য) কালিকামঙ্গলের মোড়কে আদিরসপ্রধান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। তাঁর বিষয়ে সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তই বহু পরিশ্রম করে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাধক-কবির শাক্ত গান শুনতে

ভালোবাসতেন এবং এজন্য তাঁকে নাকি 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন। অবশ্য এটা ঈশ্বর গুপ্তের অনুমান মাত্র। রামপ্রসাদকে প্রদত্ত জমির দলিল থেকে মনে হয়, তাঁর বিদ্যাসুন্দর ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পর রচিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দ।

রামপ্রসাদ তাঁর বিদ্যাসুন্দরে সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরের কবি কৃষ্ণরামদাসকে (পূর্ব-আলোচনা দ্রষ্টব্য) অনুসরণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সমসাময়িক কবি, উপরন্তু দু'জনে একই ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এই সব কারণেই বোধহয় তাঁরা কেউ কাউকে বড়ো একটা অনুসরণ করেননি। ভক্তকবি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কিছু উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দরের অসাধারণ জনপ্রিয়তা জেনেও নতুন করে এ কাহিনীর কাব্যরূপ দিতে সাহসী হয়েছিলেন। কাহিনী ছেড়ে দিলে চরিত্র পরিকল্পনায় রামপ্রসাদের কিছু কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। অবশ্য ভারতচন্দ্রের মতো কবিত্ব ও রচনাকৌশল তাঁর ছিল না। তাই নানা গুণপণা সত্ত্বেও এ কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। ভক্তকবি কিন্তু দু'এক স্থলে অশ্লীল বর্ণনায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। ভারতচন্দ্র অশ্লীলতাকে শিল্পের দ্বারা অর্ধ-আবৃত করে তাকে সংযত করেছিলেন, কিন্তু ভক্তকবি রামপ্রসাদ তা পারেননি বলেই এ কাব্য রচনায় আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কালীভক্ত কবি যত্রতত্র কালীসাধনার উল্লেখ করে এই আদিরসের কাব্যের জাত মেরেছেন। বিশেষত ভারতচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি যে ধরনের উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, ঘোর শাক্ত কবি রামপ্রসাদ ততটা ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারেননি, প্রকাশ্যেই বৈষ্ণবদের তীব্র নিন্দামন্দ করেছেন। সে যাই হোক, যুগধর্ম ও রাজপৃষ্ঠপোষকতা রামপ্রসাদের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এই ভক্তকবি বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের কামকূপে ডুবতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করেননি।

রামপ্রসাদ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর (এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও) আরও দু-একজন কবি বিদ্যাসুন্দর রচনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্র (কলিকাতাবাসী) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে "নৌতুনমঙ্গল" শোনাবার জন্য বিদ্যাসুন্দরে হস্তক্ষেপ করেন। এ কাব্যের নাম 'শ্যামার সঙ্গীত'। রাঢ়ের আর এক কবি মধুসূদন চক্রবর্তী আর একখানি কালিকা-মঙ্গল (১৮শ শতাব্দী)

রচনা করেন। এ ছাড়াও স্থানীয় লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর (যেমন— সূর্য, পঞ্চানন, গঙ্গা, সারদা, লক্ষ্মী, শনি) লীলা অবলম্বনে কোন কোন কবি ব্রতকথা ধরনের প্স্তিকা লিখেছিলেন—যার কিছুমাত্র কাব্যমূল্য নেই। সেইজন্য এখানে এ সব অসার্থক রচনার বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের রূপরেখা এখানে সমাপ্ত করা গেল। মধ্যযুগের অবসান হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার পল্লী অঞ্চলে আরও অনেক অজ্ঞাতপরিচয় কবি নানা ধরনের মঙ্গলকাব্য লিখে প্রথা পালন করেছিলেন। ত'াদের না ছিল প্রতিভা, না ছিল ভক্তি—এর ফলে শুধু তুলোট কাগজের জঞ্জাল বেড়েছে। তারপর এল উনিশ শতকের বন্যা—তার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গ্রামীণ বাংলার অনেক কিছু ভেসে গেল। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা এবং ত'াদের ভক্তের দল কোনও প্রকারে ভাঙা মন্দির আর গাছতলা আশ্রয় করে বেঁচে রইলেন, কেউ-বা হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলতলে। এখন সাহিত্যের ইতিহাসকার ও গবেষকেরা সেই সমস্ত লুপ্ত রত্নোদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অবশ্য তাকে রত্ন বলা যায় কিনা সন্দেহ।

২. অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের বিশেষ কোন মৌলিক অনুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই ভাঙাচোরা শতাব্দীতে কোন পরিশ্রম-সাধ্য সাহিত্যকর্ম সম্পাদিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এই শতাব্দীতে দু-একখানি অকিঞ্চিৎকর অনুবাদগ্রন্থ পাওয়া গেছে। তবে পূর্বতন কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও মালাধর বসুর রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের ('শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়') বহু পুঁথি এই যুগে প্রচুর নকল হয়েছিল। এই যুগ মূলত কৃত্রিম কাব্যকলা ও নকলের যুগ। ভারতচন্দ্রাদি কবি কৃত্রিম কলাকৃতি অনুসরণ করেছিলেন, আর কেউ কেউ প্রাতন অনুবাদ-সাহিত্যের শুধু নকল করেছিলেন। মহাভারত ও ভাগবতের কোন নতুন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এ যুগে একেবারেই পাওয়া যায় না। তবে সৌভাগ্যবশত রামায়ণের তিনখানি অনুবাদ পুঁথির আশ্রয় লাভ করেছিল, এখানে যার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শঙ্কর কবিচন্দ্র, জগদ্রাম-রামপ্রসাদ (পিতা-পুত্র) এবং রহস্যজনক ব্যক্তি রামানন্দ ঘোষ বা রামানন্দ যতির রামচরিতকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে

সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শঙ্কর কবিচন্দ্র নিতান্ত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের অনুগ্রহভাজন শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেশ প্রচার লাভ করেছিল। তিনি আরও অনেক কাব্যে হাত দিয়েছিলেন। ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে শঙ্কর চক্রবর্তী (কবিচন্দ্র তাঁর উপাধি) বাল্মীকি রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে 'রামলীলা' বা 'শ্রীরামমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। অবশ্য তাঁর গোটা কাব্যের একখানা পুঁথি পাওয়া যায়নি—কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পালা পাওয়া গেছে মাত্র। কৃত্তিবাসের পাশে এ কাব্য নিতান্তই সাধারণ স্তরের রচনা, কোথাও-বা জলো স্বাদ। দু'একটি স্থলে কিছু কবিত্বের চিহ্ন ভিন্ন কবি অন্যত্র বিশেষ কোন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি।

পিতা জগদ্রাম ও পুত্র রামপ্রসাদ যে রামায়ণ-কাহিনী রচনা করেছিলেন এখানে তার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এই পিতা-পুত্র আরও দু'এক-খানি কাব্য লিখে কবিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। বর্ধমানের ভুলুই গ্রামে জগদ্রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি। ১৭১২ শক বা ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে জগদ্রাম পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় রামায়ণ রচনা করেন। অবশ্য এই সন-তারিখ একেবারে অভ্রান্ত নয়, তবে এরই কাছা-কাছি সময়ে রামায়ণ রচিত হয়। তাঁর 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' শীর্ষক রামায়ণ-সংক্রান্ত কাহিনী রচিত হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে। কলকাতায় যখন ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, ছাপাখানা থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিলাম ইস্তাহার ছাপা হচ্ছে, সেই যুগে জগদ্রাম পুরাতন ধাঁচের রামায়ণ রচনায় অগ্রসর হন। জগদ্রামের প্রধান অবলম্বন সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ—তার সঙ্গে কিছু কিছু অধ্যাত্ম রামায়ণেরও প্রভাব আছে। মনে হয় তিনি রামায়ণের প্রায় সবটাই নিজে লিখে শুধু লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড রচনায় (বাল্মীকির অনুসরণে) পুত্র রামপ্রসাদকে নিয়োগ করেন। এ কাব্যের পুরো নাম 'শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ'। জগদ্রাম দেখেছিলেন সমাজে তখন বাল্মীকির আদর্শে লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণের জয়-জয়কার। ও পথ ধরলে পাঠকসমাজে নতুন করে পসার জমানো সহজ হবে না। তাই তিনি বাল্মীকির পথ পরিত্যাগ করে অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের আদর্শ নিয়েছিলেন। অবশ্য কাব্যের পূর্ণতার জন্য শেষ দুই কাণ্ডে বাল্মীকির আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল এবং ঐ দুটি কাণ্ড তাঁর ছেলে রামপ্রসাদের রচনা। কবি জগদ্রাম রামায়ণ লিখলেও অধ্যাত্মমার্গের সাধক ছিলেন এবং সে মার্গ হল বৈষ্ণব সহজিয়াদের

রসের সাধনা। তাই এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'রামরাসে' পুরোপুরি বৈষ্ণব সহজিয়া রসতত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কৌতূহলোদ্দীক কথার উল্লেখ করি। এই রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার কাহিনী, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা ও নিধনের পর শোকযাত্রা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কোন কোন বর্ণনার প্রায় হুবহু মিল আছে। এ মিল কেন এবং কি করে ঘটল তা বলা যায় না। আধুনিক কালের ইংরেজিয়ানার কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর পূর্ববর্তী শতাব্দীর বর্ধমানের এক অজ্ঞাতপরিচয় গ্রাম্য কবির পুঁথি পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। যাই হোক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পিতা-পুত্র দু'জনেই খানিকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' রামায়ণ-সংক্রান্ত কাহিনী হলেও নানা ধরনের রহস্যময় সাধনভজনের সঙ্কেতে পূর্ণ।

এবার আর একজন বিচিত্র ব্যক্তির বিচিত্রতর রামায়ণের উল্লেখ করা যাক। ইনি নিজেকে কলিযুগের 'বুদ্ধ অবতার' বলে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। 'বুদ্ধ-অবতার' রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিবিভাগে আছে। আবার রামানন্দ যতি বলে এক কবির মস্ত বড়ো একখানি রামায়ণ পুঁথি পাওয়া গেছে। মনে হয় রামানন্দ ঘোষ ও রামানন্দ যতি একই ব্যক্তি। কাব্যের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা নিজেদের যে ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁদের একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু বিচিত্র তির্যক মনোভাবের জন্যই এখানে তাঁর কাব্যের উল্লেখ করা হল। ঘোষপুত্র মনে করতেন, তিনি পূর্বে ছিলেন শাক্যকুলপতি সিদ্ধার্থ বুদ্ধ। কিন্তু মা কালীর অভিশাপে কলিযুগে মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন। কাব্যের বহু জায়গায় নিজেকে তিনি সরাসরি বুদ্ধ-অবতার বলেছেন। পুরীধামের জগন্নাথদেবের লীলা বাড়াবার জন্য (জগন্নাথবিগ্রহও নাকি বৌদ্ধ 'ত্রিশরণেরই' হিন্দুরূপান্তর) ম্লেচ্ছের হাত থেকে দেশ উদ্ধার করতে এই নববুদ্ধের আবির্ভাব। কিন্তু দেবার্চনা করে তাঁর কোন লাভ হল না, শুধু সাংসারিক ক্ষতি বাড়ল, স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি হল। পরিশেষে আধুনিক যুগের বুদ্ধ-অবতার রামানন্দ ঘোষ সক্ষোভে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলেছেন, দেবপূজা করে না পাওয়া গেল স্বাচ্ছন্দ্য, না পাওয়া গেল যশ। "দারাসুত-সুতা আর বন্ধু কেহ নাই।" তাই কবি সংশয়বাদীর মতো বলেছেন ঃ

> দারুব্রহ্মে সেবা করি জেরবার হৈল।
> বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥

স্থলে পুরাতনের চর্বিত-চর্বণ চলেছে, কচিৎ দু-একজন কিছু মৌলিক কাব্য লিখেছিলেন—যার মূল্য কোন দিক দিয়েই প্রশংসনীয় নয়। অনুবাদসাহিত্য সম্বন্ধে এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না।

৩. অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য

এই শতাব্দীতে কিছু বৈষ্ণব পদ, বৈষ্ণব পদসঙ্কলন, বৈষ্ণব সমাজ ও সমাজনেতার পরিচয়-সংক্রান্ত কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে, যাদের সাহিত্যের দিক থেকে খুব বেশী মূল্য না থাকলেও ইতিহাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত পদসঙ্কলনগুলি না পেলে আমরা অনেক বৈষ্ণব কবির পদ তো দূরের কথা, নামও জানতে পারতাম না। প্রথমে আমরা কয়েকজন আচার্যের জীবনীর কথা উল্লেখ করি। কবি প্রেমদাস (আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র) চৈতন্যদেব-সংক্রান্ত দুখানি পুঁথি লিখেছিলেন—'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' এবং 'বংশীশিক্ষা'। এতে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' কোন মৌলিক কাব্য নয়, কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অবশ্য অনুবাদ হলেও এতে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ আছে। 'বংশীশিক্ষা'য় সহজিয়া ধরনের তত্ত্বোপদেশ আছে, আর আছে, বৈষ্ণব কেন্দ্র খড়দহ ও বাঘনাপাড়ার বর্ণনা। কবি নিজে যাকে 'রসোরাজোপাসনা' বলেছেন, তা সহজিয়াদের গূঢ় রসসাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। বাঘনাপাড়ার কেন্দ্রের আর একজন ভক্তশিষ্য অকিঞ্চনদাস 'বিবর্তবিলাস' নামে এই শ্রেণীর একখানি পুঁথি লিখেছিলেন। এতেও বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে কিছু নতুন সংবাদ আছে, তত্ত্বকথাও বর্ণিত হয়েছে। এতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত রাগানুগা তত্ত্ব গৃহীত হলেও, তার সঙ্গে সহজিয়া তত্ত্বসাধনা মিশে গেছে। মনে হচ্ছে সহজিয়া বৈষ্ণবেরা নিষ্ঠাবান ও পুরাতনপন্থী বৈষ্ণবসমাজেও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আরও কয়েকজন বৈষ্ণব লেখক চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত ও মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু কিছু পুঁথি লিখেছিলেন যার কাব্যমূল্য নিতান্তই সাধারণ স্তরের। অবশ্য নরহরি চক্রবর্তীর (ঘনশ্যামদাস নামে পদ লিখতেন) 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দু'খানি গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজ ও সম্প্রদায়ের দর্পণস্বরূপ। নানাশাস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যায় অতিশয় অভিজ্ঞ নরহরি এই দু'খানি

সহজিয়া সাধকেরা এই যুগে সাধনভজনসংক্রান্ত যে সমস্ত পুঁথি লিখেছিলেন, তাতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পদ আছে—যদিও তার গূঢ় অর্থ থেকে কাব্যরস ছেঁকে নেওয়া সহজ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগেও পুরাতন বৈষ্ণব পদের নকলের ধারা পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৈষ্ণব বংশের সন্তান। তাঁর প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্র ও পিতা জনমেজয় মিত্র বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে কয়েকটি ভালো পদ লিখেছিলেন। পিতা একখানি সঙ্কলনগ্রন্থও ('সঙ্গীতরসার্ণব') প্রকাশ করেছিলেন। জনমেজয় মিত্র 'সঙ্কর্ষণদাস' ভণিতায় পদ লিখতেন। নবীনের অগ্রদূত মধুসূদনও বৈষ্ণব পদের ভক্ত ছিলেন, রাধাবিরহ অবলম্বনে লেখা তাঁর 'ব্রজাঙ্গনাকাব্যে' সেই প্রীতির চিহ্ন আছে—যদিও 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' ও বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। রবীন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে ব্রজবুলির অনুকরণে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' লিখে পাঠকমহলে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। কবি রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদ সেনও নিজের অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ 'পদচিন্তামণিমালা' শীর্ষক সঙ্কলনে প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য নব্যতন্ত্রের ধাক্কায় ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব পদানুশীলনের রীতি লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু তা বলে গত চার শ' বছর ধরে পুরাতন ঐতিহ্যে লালিত হয়ে যত বৈষ্ণব পদ রচিত হয়েছে, তার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। বরং পুরাতন সাহিত্যের প্রতি রসিক ও পণ্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার পর শিক্ষিতমহলে বৈষ্ণব পদের গুণগ্রাহিতা বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয় উপচ্ছেদ ঃ নতুন বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত

ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে (প্রথম উপচ্ছেদ) আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন সাহিত্যের ধারাবাহিকতা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সে আলোচনায় দেখা গেছে, ভারতচন্দ্র ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে বাদ দিলে এই যুগে পুরাতন আদর্শে রচিত কাব্যাদিতে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন নেই—অধিকাংশ স্থলে পুরাতনের অনুবৃত্তি হয়েছে। অতীতের চর্বিত চর্বণ মানসিক অস্বাস্থ্যেরই সূচনা করে। এর কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামগ্রিক অবক্ষয়—যার বিষাক্ত নিশ্বাসে সমসাময়িক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়েছে। অবশ্য এ শতাব্দীতেও কিছু কিছু নতুন কাব্যশাখার উদ্বোধন হয়েছিল যাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এখানে সেই ধরনের নতুন কবিকর্মের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে ঃ এই উপচ্ছেদে আমরা (১) শাক্ত পদাবলী, (২) বাউল গান এবং (৩) গাথা ও গীতিকা সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১. শাক্ত পদাবলী

সূচনা ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর যদি কোন উল্লেখযোগ্য কাব্যবৈচিত্র্য থাকে তবে তা হল শাক্ত পদাবলী। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীই শাক্ত পদাবলীর উৎসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, প্রভাবিত করেছে। উপরন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর পিছনে রয়েছে চার শ' বছরের ঐতিহ্য, আর শাক্ত পদাবলীর উৎপত্তি ও বিকাশ এক শতাব্দীর মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। অবশ্য শাক্ত ভাব ও ভাবনা শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যাপার নয়, বহুকাল থেকে বাঙালীর শিরায় শিরায় শাক্ত ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে বয়ে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে এদেশ তন্ত্রপ্রধান মাতৃকাপূজার পীঠস্থান, উপরন্তু প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষেই আদ্যাশক্তির কোন-না-কোন প্রকার পূজা-উপাসনা চলে এসেছে।

সমগ্র বিশ্ববিধানের অন্তরালে একটি সর্বশক্তিময়ী মাতৃকাবোধের প্রভাব অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতায় স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। আমাদের ঋগ্‌বেদের সূক্তেও এই আদ্যাশক্তির উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে ইনিই চণ্ডিকা নাম নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী-ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে এই দেবীর আখ্যান নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আদিতে তাঁর সঙ্গে মহাদেবের কোন যোগ ছিল না,

অসুর বধের জন্য দেবতারাই দেবীকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং নানা আয়ুধে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পরে তিনি উমা-পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে যান।

বাংলাদেশে একই সঙ্গে পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান প্রচলিত ছিল, অবশ্য লৌকিক চণ্ডীকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীমঙ্গল-অভয়ামঙ্গল রচিত হয়—যেগুলি মধ্যযুগে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বন করে দুর্গামঙ্গল, মৃগলুব্ধ, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সংস্কৃতঘেঁষা কাব্য রচিত হয়েছিল—তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সুপ্রসিদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের শাক্ত দেবীদের (বিশেষত মনসা ও চণ্ডী) যে বর্ণনা আছে তাতে ভক্তি ও বাৎসল্য বেশী প্রকাশিত হতে পারেনি, মনসার মধ্যে তো কিছুমাত্র মানবিক গুণ (অর্থাৎ মাতৃভাব) নেই, বরং চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্নেহবাৎসল্যের প্রকাশ দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের ভক্তেরা দেবীর কাছে ধনজন-ঐশ্বর্য প্রার্থনা করেছেন, নিরাপত্তার বর চেয়েছেন। তাঁর কৃপায় ব্যাধও রাজা বনে যায়। আবার যার ওপর তাঁর ক্রোধ সঞ্চারিত হয়, বিনা কারণে তিনি তার সর্বনাশ করে ছাড়েন। ভক্ত তাঁর কাছ থেকে আশাতীত ধনৈশ্বর্য পায়। কিন্তু যে তাঁকে অসম্মান করে, পূজা প্রচারে বাধা দেয়, তাকে তিনি ধনেপ্রাণে নষ্ট করেন। মঙ্গলকাব্যে ভক্তেরা স্বার্থের বশে অনেক সময় দেবীকে ভক্তি করে, দেবীও নিজ স্বার্থের খাতিরেই ভক্তদের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হন। সে স্বার্থ হল সমাজে ভক্তদের দ্বারা দেবীর মহিমা ও পূজা প্রচার। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে, বিশেষত শাক্ত মঙ্গলকাব্যে বল, প্রতাপ, অনাচার-অত্যাচারই প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শাক্ত সাহিত্যের এক অভিনব রূপান্তর হয়। বাংলাদেশে সর্বশক্তিময়ী আদ্যা শক্তিকে দুর্গারূপে ভক্তিবাৎসল্যের দৃষ্টিতে দেখে একপ্রকার অতি চমৎকার পদ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। একে 'শাক্ত পদ' বলা হয়ে থাকে। অবশ্য শাক্তপদের উমা-পার্বতী-দুর্গা পুরাণ থেকেই সংগৃহীত, এই শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলের কাহিনী বা তত্ত্বের দিক থেকে কোন সম্পর্ক নেই। তন্ত্রের দেশ বাংলায় শাক্ত পদের সঙ্গে তন্ত্র-সাধনারও গূঢ় যোগাযোগ আছে, অনেক পদকর্তাই তন্ত্রানুমোদিত কালীসাধক ছিলেন।

বাংলাদেশের শাক্ত পদে প্রকাশিত বাৎসল্যরস ও স্নেহভক্তির একনিষ্ঠ আবেগ যে গীতিশাখার সৃষ্টি করে, তা একাধারে গীতি, রোমান্টিক কবিতা ও সাধনায়ুধ। কবিগণ তাই যুগপৎ সাধক ও কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাক্তপদের

কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনেক ভক্ত শাক্ত পদ লিখেছিলেন। এঁদের কেউ ভক্তগৃহী, কেউ ত্যাগী, কেউ-বা রাজা-মহারাজা-মন্ত্রী-দেওয়ান। কিন্তু তাঁদের সামাজিক অবস্থার মধ্যে ব্যবধান থাকলেও ভক্তির দিক থেকে তাঁরা সকলেই শ্যামা মায়ের কোলের ছেলে। ষড়ৈশ্বর্যময়ী আদ্যাশক্তিকে তাঁরা মা বলে তাঁর অঞ্চল আশ্রয় করেছেন; মহাকালিকার কোলে উঠে মহাকালকে তুচ্ছ করেছেন, লেলিহজিহ্বা, দিগ্‌বসনাত্মিকা আদ্যাশক্তির উদ্যত খড়্গের সামনে নিজেদের সঁপে দিয়ে তাঁরা মৃত্যুভয় জয় করেছেন, সংসারে সংসারী থেকেও ভক্তেরা 'ভবদারা'র প্রসাদ পেয়েছেন। স্নেহ-মিশ্রিত এই যে বাৎসল্যরস—এর মাধুর্য বড়ই স্বাদু। এর সঙ্গে মিশিয়ে আছে মানুষের শৈশব-সংস্কার। অসহায় শিশু একমাত্র মা ছাড়া আর কাউকে জানে না, ভয় পেলে মায়ের কোলেই কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, কখনও কখনও পাষাণী মাকে সে খুব কটু কথা শুনিয়ে দেয়, অভিমান করে মায়ের ডাকে সাড়া দেয় না। তেমনি এই সমস্ত সাধকের দলও শৈশবজীবনের অসহায় বালকের বেশে শ্যামাজননীকে আশ্রয় করেছেন, আবার কখনও স্ফুরিতাধরে মায়ের দিক থেকে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে এসে তাঁদের সেই মায়ের অঞ্চলেই আশ্রয় নিতে হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীর মধ্যে কিছু গান উমার বাল্যলীলা এবং হরপার্বতীর কাহিনী নিয়ে রচিত। এর শ্রেষ্ঠ অংশের নাম 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান। এই আগমনী ও বিজয়া বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। দুর্গাপূজা উপলক্ষ করে এই সমস্ত গান রচিত হয়েছিল, এখনও তার কিছু কিছু শারদীয়া পূজাতে পথ-ভিখারীর কণ্ঠে শোনা যায়। এই গানে বাঙালী মায়ের প্রবাসিনী কন্যার জন্য আকুল কামনা ব্যক্ত হয়েছে। কন্যা উমা বৎসর পরে আবার হিমালয় গৃহে আসবেন, মায়ে-ঝিয়ে মিলন হবে, মেনকার এই আকাঙ্ক্ষাটি আগমনী গানে ব্যক্ত হয়েছে। উমা পিত্রালয়ে আসার পর তিনদিন ধরে আনন্দের হাট বসে গেল, কিন্তু নবমীর নিশি অতিক্রান্ত হতে না হতেই ভোলামহেশ্বর শ্বশুর-ভবনে উপনীত হয়ে গণেশজননীকে আহ্বান করলেন। মা মেনকাকে চোখের জলে আবার এক বছরের জন্য উমাকে ছেড়ে দিতে হল। এই বেদনাদায়ক স্মৃতি অবলম্বনে বিজয়ার করুণরসের গানগুলি লেখা হয়েছে। এই গানের মধ্যে দেবীকে মানবী মাতার কন্যারূপে উপস্থিত করা হয়েছে, আগমনী-বিজয়াতে বাস্তব মাতৃহৃদয়ের

ব্যাকুল বেদনা চমৎকার ফুটেছে। শাক্তপদকারগণ মাটির মাকে সামনে রেখে এ গানগুলি লিখেছিলেন, তৎকালীন বাংলাদেশের মায়েদের বেদনার কথাই এতে ফুটে উঠেছে। তাই বৈষ্ণব পদের চেয়ে শাক্তপদ মানবরসের বিচারে স্বাদুতর হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী ভাববৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের সূক্ষ্মরসোত্তীর্ণ প্রেমগীতিকা, আর শাক্ত পদাবলী বাস্তব বাংলাদেশের বাস্তব মায়ের বেদনার গান। একটি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে, আর একটি মর্ত্য থেকে স্বর্গের দিকে হাত বাড়িয়েছে। একটির (বৈষ্ণব) মূলরস আদিরস—তাই-ই ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, আর একটির (অর্থাৎ শাক্তপদ) মূলরস বাৎসল্য রস—তাও ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বহু প্রথমশ্রেণীর পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল, তাই অসংখ্য বৈষ্ণবপদে অতি উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ পাওয়া যায়, ভাষা-ছন্দ-ভাব-অলঙ্কার-ব্যঞ্জনা প্রথম শ্রেণীকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে ঠিক সেই পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয়নি। পদগুলির গানের সুর বাদ দিলে এর শিল্পলক্ষণ অনেক সময় নিতান্তই সাধারণ স্তরের। বৈষ্ণব পদাবলীর সাধনভজনের অতিরিক্ত একটি সুষম সৌন্দর্যবোধ আছে, যা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকেও সৌন্দর্যরসে মুগ্ধ করবে; কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে গীতিরসের অতিরিক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ-জাত কাব্যলক্ষণ অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। বৈষ্ণব পদাবলী আদিরসকে ভিত্তি করেছিল বলে কালক্রমে অনধিকারীর হাতে পড়ে সে 'উজ্জ্বলরস' অমেধ্য কটু পানীয়ে পরিণত হয়েছিল, শৃঙ্গার রসের নালা বেয়ে অতি সহজেই কামপুষ্প ভেসে এসেছিল। ফলে শুদ্ধ বৈষ্ণব পদসাহিত্য বিকৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর মূলরস বাৎসল্যভাব, মা ও সন্তানের সম্পর্ক। এর তো কোন বিকার নেই, মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে নিত্যকালের সম্পর্ক। তাই শাক্ত পদাবলীর মধ্যে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ না থাকলেও বৈষ্ণব পদাবলী ও সমাজের (সহজিয়া) মতো শাক্ত পদসাহিত্য ও শাক্ত ভক্তের মধ্যে কোনও প্রকার অশুচিতা প্রবেশ করে মা-সন্তানের স্নেহ-ভক্তিকে কলুষিত করেনি। অবশ্য শাক্তপদকারেরা অনেক সময়ে বৈষ্ণব পদের দ্বারা, বিশেষত বৈষ্ণব পদসন্নিবেশের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো শ্রেণীগত পৃথক মনোভাব ছিল না। ঔদার্যের বশে শাক্ত কবিরা কালী ও কৃষ্ণকে অভেদ কল্পনা করেছেন। গোষ্ঠলীলার আদর্শে রামপ্রসাদ উমার গোচারণের পদ লিখেছিলেন। বৈষ্ণবগণ

এ ধরনের ঔদার্যের বিশেষ পরিচয় দিতে পারেননি, তাঁরা শাক্তসম্প্রদায় ও শাক্ত আচার-আচরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

তন্ত্রের সঙ্গে শাক্তপদ ও পদকারের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা আগেই বলা হয়েছে। তন্ত্র আদ্যাশক্তির উপাসনা করে এবং বিশেষ বিশেষ কৃত্যের সাহায্যে নরদেহেই মোক্ষনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে। শাক্ত কবিদের অধিকাংশই তান্ত্রিক ছিলেন এবং তন্ত্রের কৃত্যগুলিকে নানা রূপকে, উপমায়, ব্যঞ্জনায়, গানে ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ নিছক সাধনভজনের তত্ত্বকথাকে রূপক প্রতীকের ছদ্মবেশে বর্ণনা করেছেন। এগুলির মধ্যে যে-গানে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ফুটেছে সেগুলি শুধু কবিতা বা গান পদবাচ্য হয়েছে—আর যাতে কেবল তত্ত্ব ও সাধনার কথা প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে আমরা আর যাই বলি না কেন, পদ বা কবিতা বলতে পারব না। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে শাক্তপদের আর একটা বড়ো তফাৎ, শাক্তপদকারেরা স্থূল বাস্তবজীবন থেকে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ফলে, অধ্যাত্মকথাও অনেক স্থলে বাস্তব সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র রসরূপ লাভ করেছে। কোন কোন পদকর্তা ছিলেন হৃতসর্বস্ব জমিদার বা দেওয়ান, কেউ ছিলেন রাজকুমার। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এঁদের অনেকেই ইংরেজ রাজত্বের কুশাসনের ফলে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। সেইজন্য তাঁদের অনেক পদে ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্ভাবনা বড়ো রকমের ছায়াপাত করেছে—এ পদগুলির পশ্চাতে একটা দেশ ও কালের ছবি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার বাতাবরণ বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক ও নিঃশ্রেয়স্ ভক্তিকেই অবলম্বন করেছে বলে তা' থেকে সমসাময়িক দেশ ও কাল এবং পদকর্তাদের জীবনে তার প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এবার আমরা কয়েকজন প্রসিদ্ধ শাক্তপদকর্তা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

রামপ্রসাদ সেন ॥ ইতিপূর্বে আমরা বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের কথা বলেছি। রামপ্রসাদের ঈষৎ পূর্বে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি শাক্ত গীতিকার না হলেও শাক্তমতের কবি ছিলেন এবং দেবী অন্নদার প্রতি তাঁর মনোভাব শাক্ত কবিদের মতোই একনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু শাক্ত পদাবলীকে কবিত্বের উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরে তাতে একপ্রকার সুগভীর সুর সংযোজনা করে এবং কবিত্বের সঙ্গে সাধনার ধারা সন্নিবিষ্ট করে সাধককবি রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম কক্ষে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছিলেন।

'কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে' রামপ্রসাদ যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রামপ্রসাদের ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে চেষ্টা করে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ধার করেন। এ পর্যন্ত যাঁরাই রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই ঈশ্বর গুপ্তের তথ্য ব্যবহার করেছেন। বৈদ্য-বংশোদ্ভূত রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ খুব প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্যানুসারে মনে হয়, আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রীস্টাব্দে রামপ্রসাদ হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। রামপ্রসাদ পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। রামপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা—রামদুলাল, রামমোহন, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। কবি কলকাতার কোন ধনাঢ্য জমিদারের বাড়ীতে মুহুরিগিরি করতেন। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, কবি জমিদারী সেরেস্তার খাতায় 'আমায় দাও মা তবিলদারী' গানটি লিখে উপরিতন কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু সহৃদয় জমিদার কবিকে কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিশ্চিন্তে সাধনভজন করবার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন ভূস্বামী নির্লোভ কবিকে জমিজমা ও বৃত্তি দিয়েছিলেন। আপনভোলা কবি অর্থের ব্যাপারে চিরকাল উদাসীন ছিলেন। ফলে তাঁর দরিদ্র-দশা কোন দিন ঘোচেনি। তিনি শুধু সাধক ও কবি ছিলেন না, একজন ভালো গায়কও ছিলেন। নিজের গানে তিনি যে সহজ সাদামাঠা সুর দিতেন, তাই 'প্রসাদী সুর' নামে প্রচলিত। এখনও সেই প্রাণগলানো সুর পথ-ভিখারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও রামপ্রসাদী গান এখনও পর্যন্ত জন-প্রিয়তা রক্ষা করছে। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গান শোনবার জন্যই কবির গ্রামের নিকটে নিজের কাছারী বাড়ীতে অবস্থান করতেন। উপযুক্ত বয়সে সাধক-কবি শ্যামাপূজার বিসর্জনের সায়াহ্নে ভাগীরথীনীরে সজ্ঞানে তনুত্যাগ করেন।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে আর একজন শাক্ত কবি ও সাধক রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও অনেক চমৎকার পদ লিখেছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সে-যুগে পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লাদের পরম ভক্তিভরে দ্বিজ রামপ্রসাদের গান গাইতে শুনেছিলেন। এখন রামপ্রসাদের পদাবলী নামে যে সঙ্গীত-সংগ্রহ ছাপা

হয়ে থাকে, তাতে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ স্থান পেয়েছে তা অবিকল রামপ্রসাদ সেনের গানের মতোই। কাজেই শুধু ভাষা দেখে কোন্‌টি রামপ্রসাদ সেনের আর কোন্‌টি দ্বিজ রামপ্রসাদের তা নির্ণয় করা যায় না। অনেক সময় পুঁথির লিপিকার এবং গায়কেরাও দুই কবির ভণিতা গোলমাল করে ফেলেছেন। রামপ্রসাদ চক্রবর্তী বলে আর একজন আধুনিক কালের কবিওয়ালা অনেক পদ লিখেছিলেন এবং শুধু 'রামপ্রসাদ' ভণিতা ব্যবহার করেছিলেন। ফলে এতে গোলমালের কারণ বেড়েই গেছে। যে সমস্ত পদে আধুনিক ধরনের শব্দবিন্যাস আছে সেগুলি যে কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা তাতে সন্দেহ নেই।

আজু গোঁসাই নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত-কবি রামপ্রসাদের গ্রামেই বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদের বেশ কৌতুকাবহ কবিতার লড়াই হত। একজন ছিলেন বৈষ্ণব আর একজন শাক্ত; সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের মধ্যে কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ বাক্য বিনিময় হত। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণ বাক্য-বিনিময় গানের আকারে এখনও প্রচলিত আছে।

রামপ্রসাদ কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন নামে দু'খানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেছিলেন, তার মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের যৎসামান্য পাওয়া গেছে। কিন্তু কালীকীর্তনের পুঁথি দুর্লভ নয়। এতে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁদে উমার বাল্য ও গোষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলতেই হবে যে, কালীকীর্তনে রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ পায়নি। উমা কৃষ্ণের মতো মাঠে গিয়ে গোরু চরাচ্ছেন, বাঁশী বাজিয়ে গোরুকে ডাক দিচ্ছেন—এ বর্ণনা অনেক স্থলেই হাস্যকর। এই বিসদৃশ বর্ণনাকে ব্যঙ্গ করে আজু গোঁসাই নামে তাঁর সেই প্রতিবেশী বলেছিলেন—"কাঁঠালের আমসত্ত্ব।" কালীকর্তনের ওপর রামপ্রসাদের কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি—তাঁর যা কিছু খ্যাতি, তা তাঁর শাক্ত গানের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে মুদ্রিত রামপ্রসাদের পদাবলীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক শ'। এখন তা বেড়ে বেড়ে প্রায় তিন শয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটা সুর লক্ষ্য করা যায়—(১) উমা বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), (২) সাধনাবিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), (৩) দেবীর বিরাট স্বরূপ-বিষয়ক, (৪) তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক। এর মধ্যে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদের সংখ্যাও অল্প, গুণগত উৎকর্ষও অল্প। সাধন-বিষয়ক পদে কবি নানা উপমারূপকের মধ্য দিয়ে নিজের সাধনার কথা আভাসে ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব ও নীতির বিষয়ে তিনি যে সমস্ত

হয়েছিল। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা গ্রাম। বাল্যবয়সে তিনি সংস্কৃত টোলে পাঠ করে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি বর্ধমানে (খানা জংসনের নিকট) চান্নাগ্রামে মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং এখানে প্রতিপালিত হন। তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান-রাজেরা তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন, তাঁকে সভাপণ্ডিতও করেছিলেন। কোন কোন রাজকুমার তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুই বিবাহ হয়েছিল। স্থানীয় মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসন বানিয়ে তিনি সাধনভজন করতেন, টোল খুলে সংস্কৃত বিদ্যাদান করতেন এবং অবসর সময়ে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন। তিনি একখানি ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত কাব্য লেখেন, তার নাম 'সাধকরঞ্জন', সে কথা পূর্বেই বলেছি। এটি তন্ত্র-সাধনা-বিষয়ক কাব্য হলেও এতে অনেক স্থলে চমৎকার কবিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনকথা অধ্যাত্মঘটনার মোড়কে পরিবেশিত হয়ে এখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিকা নাকি বাগ্‌দিনী বেশে তাঁর কাছে এসে মাছ জুগিয়েছিলেন। দস্যুর দল তাঁকে মেরে ধরে টাকা-কড়ি কেড়ে নিতে এসে তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে শরণ নিয়েছিল। রামপ্রসাদের মতোই তাঁর জীবন নানা অলৌকিক গালগল্পে পূর্ণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার কথা হয়, তখন মুমূর্ষু কবি ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন যে, গঙ্গা তাঁর জননী দুর্গার সতীন, তাহলে তিনি হলেন কবির সৎ-মা। সৎ-মার তীরে তিনি কেন যাবেন—"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব? আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব?" বাস্তবিক তিনি গঙ্গার তীরে যেতে চাননি। তাঁর জীবনের সন-তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন, শুধু এইটুকু মাত্র জানা যায়।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিন শ' পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি অতি চমৎকার, রামপ্রসাদের চেয়েও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। মেনকার দুঃখবেদনা কবি অপরূপ কৌশলে ফুটিয়েছেন। মেনকা পাষাণহৃদয় স্বামী হিমালয়ের কাছে অনুযোগ করেন, কেন তিনি কন্যাকে পিত্রালয়ে আনছেন না। অবশেষে গিরিরাজ উমাকে এনে দিলেন মেনকার কাছে :

গিরিরাণী, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবনধন॥

মা মেনকা তখন কন্যা উমাকে নিয়ে কত আদর-যত্ন করলেন। কিন্তু নবমীর নিশি অবসান হতে না হতেই হর এসে উমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তখন মেনকা আর কি করবেন, শুধু ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন :

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।
এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও মা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।

বাঙালী মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনা গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করেছে। এ ছাড়াও কালিকার স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা-সংক্রান্ত কয়েকটি গান রামপ্রসাদের থেকে কোন দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়, বরং কবিত্ব বিচারে উৎকৃষ্ট। যেমন :

১. সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি ॥
২. তাই শ্যামরূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী ॥
৩. শুকনো তরু মঞ্জুরে না ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
তরু পবনতলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে ॥
৪. মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে ॥

এ সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ। বরং রামপ্রসাদের ভাষা কিছু শিথিল ধরনের। কবির মনোভাবও খুব উদার ছিল। শ্যাম ও শ্যামাকে একীভূত করে তিনি গেয়েছেন :

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥

আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির এরকম সুষ্ঠু সমন্বয় রামপ্রসাদকে ছেড়ে

দিলে আর কোন শাক্তপদকারের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কবি কিছু কিছু বৈষ্ণব পদও লিখেছিলেন, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তার দাম বেশী নয়।

উল্লিখিত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ছাড়াও আরও অনেক পদকর্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মধ্যে কিছু কিছু শাক্তপদ লিখেছিলেন। বিশেষত ভূমিহীন ভূস্বামী ও তাঁদের কর্মচারীদের অনেকেই শ্যামার সেবক ছিলেন এবং বেশ কিছু প্রশংসনীয় শাক্তপদ লিখেছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন, তাঁর নামে দু' একটি পদও পাওয়া যায়। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ শাক্তপদ লিখে খ্যাত হয়েছেন। তাঁর পুত্র শম্ভুচন্দ্রের 'চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?' কুমার নরচন্দ্রের (নবদ্বীপের রাজকুমার) 'যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই' এবং 'মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই' প্রভৃতি গানগুলি এখনও শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা রক্ষা করছে। দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি', নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'কালীপদ আকাশেতে মনঘুড়িখানা উড়তেছিল', এবং রামদুলালের 'শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি' গানগুলির সরল কবিত্ব ও একনিষ্ঠ ভক্তি প্রশংসার যোগ্য। ঊনবিংশ—এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও কেউ কেউ শাক্তগান লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী করতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, শাক্ত পদ বৈষ্ণব পদের মতো কাব্যগুণে ততটা অলঙ্কৃত না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অধঃপতনের দিনে এর ভাব, ভাষা ও ভক্তি শুভ-আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। এক যুগের হতাশ বাঙালীর প্রাণে এই গানগুলি যে দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছিল, বিশ্বজননীকে ঘরের মায়ে পরিণত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২. বাউল গান ও বাউল সাধনা

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর একদল রহস্যবাদী সাধক, যাঁরা বাউল নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঐ নামে একটি উপসম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীর পক্ষে কিছু অভিনব মনে হতে পারে। আধুনিক কালেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি

এই গানের বিশেষ ভক্ত, কেউ কেউ গ্রাম্য বাউলের আদর্শে গান বেঁধেছেন। হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬), যিনি 'কাঙাল হরিনাথ' বা 'ফিকিরচাঁদ বাউল' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম বাউলগানের প্রতি আকৃষ্ট হন, নিজেও অনেকগুলি প্রশংসনীয় বাউল গান লিখেছিলেন। তাঁর চরিত্রাদর্শে মুগ্ধ হয়ে তরুণের দলও ঐ বাউলদলে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনের ব্যাপারে কিছুকাল শিলাইদহে অবস্থান করার সময় লালন ফকিরের বাউল গানের সংস্পর্শে আসেন এবং বাউল গানের ভাব-ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজে ঐ গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। নিজের কাব্যরুচি ও সাধনাকেও তিনি কিয়দংশে উক্ত বাউল গান ও বাউল সাধনার অধ্যাত্মমার্গের দ্বারা অনুরঞ্জিত করেন। তাঁর কতকগুলি গান যেন পুরাতন বাউল গানেরই আধুনিক মার্জিত রূপ বলে মনে হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবও (ঢাকা) অনেক বাউল গান প্রকাশ করেছেন। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বাউল গান সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করে এই গান ও তত্ত্বাদর্শ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক তথ্য উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আধুনিককালে এদেশে এবং বিদেশে বাউল গানকে জনপ্রিয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সে-যুগে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ও বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তিকে বাউল বলত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই অর্থে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থানুসারে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং চৈতন্যদেবও নিজেকে বাউল বলেছেন। বাতুল বা ব্যাকুল থেকে 'বাউল' নিষ্পন্ন হতে পারে—অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেমে যারা পাগল। অথবা আউল (আরবী) বা বাউর (হিন্দি—যার মানে বায়ুরোগগ্রস্ত) থেকেও এ শব্দ আসতে পারে। আরবী শব্দটির অর্থ—যাঁরা ঈশ্বরের একান্ত সেবক। যেদিক থেকেই হোক না কেন, ঈশ্বরপ্রেমিক, স্বাধীনচিত্ত, জাতিসম্প্রদায়ের চিহ্নহীন একদল ভক্ত বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমে বিশ্বাসী হয়ে বাউল নামে পরিচিত হয়েছিলেন প্রায় চারশ বছর আগে থেকে। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়ারা সমাজে প্রাধান্য অর্জন করলে এঁরা বাউল-সম্প্রদায়কে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত করেন, এঁদের কেউ কেউ বাউল নামেই পরিচিত ছিলেন। মনে হয় বাউলসম্প্রদায় এঁদের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, এদের মধ্য থেকেই উত্থিত হয়। অবশ্য যে সমস্ত মুসলমান সুফীসাধক ও ফকিরগণ ইসলামের বাঁধাবাঁধি নিয়ম না মানার জন্য মুসলমানসমাজে 'বে-শরা পন্থী' বলে

কিছু নিন্দিত হয়েছিলেন, তাঁরাও বাউলদলে যোগ দিয়েছিলেন। বাউলসম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই বলে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীরা সহজেই এই মত গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য বাউলসম্প্রদায়ের কেউ কেউ সূফীসাধনার ইসলামী শব্দ বাউল গান ও সাধনায় ব্যবহার করে থাকেন। হিন্দু বাউলেরা চৈতন্য-দেবকে অত্যন্ত ভক্তি করেন এবং যোগতন্ত্রাদির পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন। গান ও ভিক্ষাই এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেউ কেউ অন্য জীবিকাও গ্রহণ করেছেন। জয়দেবের পীঠস্থান অজয়নদের তীরে অবস্থিত কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে জয়দেব মেলা উপলক্ষে এখনও বাউলদের বিরাট সম্মেলন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় লালন ফকিরের সমাধিতেও শ্রদ্ধা জানাতে বহু হিন্দু-মুসলমাল বাউল আজও সমবেত হন। এখন অবশ্য এঁদের সম্প্রদায়গত সংখ্যা কমে আসছে।

বাউলরা শুধু গানের জন্য গান বাঁধেননি, তাঁদের গান সাধনারই ইঙ্গিত বহন করে, সাধনারই অঙ্গীভূত। তাঁরা মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 'অধর চাঁদ', 'মনের মানুষ' আছেন। তাঁকে আবিষ্কার এবং জীবদেহে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলে সাধকের মোক্ষ-নির্বাণ-মুক্তি,—'আলেখ নূরে'র (পরম জ্যোতি) আসঙ্গ লাভ হয়। তখন তাঁদের পার্থিব সত্তা (সূফী মতে 'ফানা') ধ্বংস হয়ে গিয়ে সাধক ঈশ্বর-সাযুজ্য (সূফী মতে 'বাকা') লাভ করেন। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাশ করে দেহে ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠা বাউল-সাধনার মূল কথা। তাঁরা 'মনের মানুষে'র সন্ধান করেন, সুতরাং পূজার্চনা, রোজানমাজ, মন্দির-মসজিদ, কাশী-কাবা সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন—এমন কি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে স্বাভাবিক ধর্মীয় ভেদ আছে, তাঁরা তাও মানেন না। হিন্দু বাউল স্বচ্ছন্দে সূফী সাধনার পরিভাষা ব্যবহার করেন, সূফী বাউলও নির্দ্বিধায় যোগতন্ত্রের শব্দানুশীলন করেন। রাধাকৃষ্ণের রূপক ব্যবহার করে বলে ওঠেন :

> ওগো রাইসাগরে নামল শ্যাম রায়।
> তোরা ধর গো হরি ভেসে যায়॥

কোন বাউল মন্দির-মসজিদকে তুচ্ছ করে বলেছেন :

> তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।
> তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
> রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

তাই তাঁরা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ("মন রে, আত্মতত্ত্ব না জানিলে সাধন হবে না")। তাঁরা নির্জনে বসে বসে শুধু মনের মানুষেরই সন্ধান করেন ঃ

আছে হেথায় মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চ স্বরে কোন্ পাগেলা॥

এই সমস্ত গান থেকে দেখা যাচ্ছে, বাউলগণ তাঁদের মর্ত্যসত্তার মধ্যেই 'সাঁই' অর্থাৎ স্বামী বা ভগবানকে উপলব্ধি করতে চান। তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেই বাউলের সীমাবদ্ধ সত্তার বিনাশ হয়, তিনি অসীমের সঙ্গ লাভ করেন। এই তত্ত্বকথাটি বাউলগানে নানা উপমারূপক ও আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে বলা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি গূঢ় রহস্যবাদী ও দুর্জ্ঞেয় সাধনার কথা বলা দরকার।

বাউলগণ যে অধ্যাত্ম সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাকে যেমন বিশুদ্ধ মনোমার্গে উপলব্ধি করতেন, তেমনি আবার স্থূল দেহমার্গেও রহস্যময় অনুশীলনের দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে আনতে চাইতেন। সেই প্রক্রিয়াটি কিছু তন্ত্র, কিছু যোগ, কিছু হঠযোগের ধারা অনুসরণ ক'রে, প্রাণায়ামের সাহায্যে দেহের মধ্যে মুক্তি সন্ধান করত। এর আরও একটা গূঢ় গোপন সাধনপদ্ধতি আছে, যার কথা অ-বাউলের জানা নিষেধ। নর-নারীর দেহই সে সাধনার যজ্ঞবেদী, নানা রহস্যময় প্রতীকের সাহায্যে সেই কথার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বাইরের লোকে তার অর্থ বুঝবেন না। যথা ঃ

ত্রিবেণীর তীর ধারে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে।
উথলে সুধাসিন্ধু সুধারে সুধাবিন্দু
সুখময় সিন্ধুজলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে।

ত্রিবেণীর তীরে বসে বিশেষ মুহূর্তে মাছ ধরতে হবে, জোয়ারের জলে সেই মাছ ভেসে আসে। জোয়ারের 'গোন' চলে গেলে আর সে মাছ ধরা যাবে না। বলা বাহুল্য এসব গূঢ় সঙ্কেত শুধু ঐ পথের পথিকরাই জানেন, আমাদের জেনে দরকার নেই। আমরা শুধু বাউল গানের কাব্যমূল্য আলোচনা করব।

এই বাউলেরা নিগূঢ় তত্ত্বকথাকে সুন্দর সুন্দর উপমারূপকে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালের বাউলেরা আবার আধুনিক কালের রূপক ব্যবহার করেছেন—যেমন আইন-আদালত, রেলগাড়ী, হাসপাতাল, ইলেকট্রিক আলো, ব্যাঙ্কের লেনদেন, বাইসাইকেল ইত্যাদি। এখানে এইরূপ একটি বিচিত্র রূপকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী।
তোরা দেখসে আয় তাড়াতাড়ি ॥
* * *
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার,
এবার তবে ভাবনা কিরে আর
মুখে হরি হরি গৌরহরি
করবেন টিকিট মাষ্টারি ॥

অথবা

মন যদি চড়বি রে সাইকেল ॥
আগে দে কপিন এঁটে অকপটে সাচ্চা কর দেল ॥
ফুটপিনে দিয়ে পা হপিং করে এগিয়ে যা
পিনের পরে উঠে দাঁড়া বেদবিধি হবি ছাড়া
সামনে কর নজর চড়া আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে আধুনিক কালের বাউল গূঢ়তত্ত্বের প্রতীক হিসেবে আধুনিক শব্দই ব্যবহার করেছেন। হয় তো এতো তত্ত্বকথা আরও পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু কবিত্বগুণের দিক থেকে এ গান হাস্য উদ্রেক করে থাকে। যাই হোক এখন আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ও গবেষকের দল যেভাবে অনুসন্ধিৎসার কলম উঁচিয়ে বাউলদলের আখড়ায় হানা দিচ্ছেন, তাতে এই রহস্যবাদী সম্প্রদায় আর কতদিন যে আড়ালে থাকতে পারবেন জানি না। এবার কয়েকজন বাউলের পরিচয় দেওয়া যাক।

বাংলার অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউলদের পরিচয় বড়ো একটা পাওয়া যায় না। এঁরা একটু গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলতেন, তাই অধিকাংশ বাউলের শুধু ভণিতা ছাড়া বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর তা ছাড়া যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, তাঁদের কথা প্রাচীন যুগে আলোচিত হওয়া উচিত নয়। যাই হোক এখানে দু'জন প্রধান বাউলের উল্লেখ করা যাচ্ছে।

প্রথমে লালন ফকিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। অবশ্য তাঁর আগে এবং পরেও অনেক বাউল এসেছিলেন ও পদ লিখে গিয়েছিলেন, কিন্তু লালনের কবিত্ব, ভক্তি ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য সর্বাগ্রে তাঁর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউলগানের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হন, প্রধানত তাঁর জন্যই লালনশাহ ফকিরের নাম বাউল-সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে প্রচার লাভ করেছে, তাঁর গানগুলি নানাজনে সংগ্রহ করেছেন। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এঁর একখানি প্রামাণিক সঙ্কলন সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেও লালনশাহের একাধিক প্রামাণিক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেখানে তাঁর উপরে নানাধরনের গবেষণা হচ্ছে। অবশ্য এই লোক-বিশ্রুত ফকিরের সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য কিছু দুর্লভ। কুষ্টিয়ার সেঁউড়িয়া গ্রামে এখনও বৎসরে একবার করে বাউলদের মেলা বসে, এখানেই লালনের আশ্রম ছিল, সে আশ্রম এখনও আছে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্পকাহিনী জনশ্রুতির আকারে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কুষ্টিয়ার কুমারখালি গ্রামের নিকট ভাঁড়রা গ্রামে হিন্দু কায়স্থ বংশেই তাঁর জন্ম হয়। বিবাহের পর তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হন। পরে এক নিষ্ঠাবান মুসলমান দম্পতি তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন। দেশে ফিরলে তাঁর সামনে হিন্দু সমাজের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করে লালনশাহ ফকির নামে পরিচিত হন। মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর শিষ্য হয়েছিল। তিনি উক্ত মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করে সেঁউড়িয়া গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করে বাউল ও ফকিরী সাধনভজন করতে থাকেন। তাঁর অনেক হিন্দু শিষ্য ছিল। তিনি রীতি-পদ্ধতি অনুসারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ বরাবর তিনি জাতিপাঁতিহীন বাউল ও ফকিরী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর গানে যেমন হিন্দু মনোভাবদ্যোতক অনেক শব্দ ব্যবহৃত রয়েছে, তেমনি সূফী ধর্মানুমোদিত পারিভাষিক শব্দও প্রচুর পাওয়া যাবে। কোথাও তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভাবের বশে রাধাকৃষ্ণের কথা লিখেছেন, কোথাও-বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গানে আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই পদগুলি ভাব ও ভাষার দিক থেকে অতি চমৎকার। যেমন ঃ

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা।
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা॥

কখনও-বা সূফী ভক্তির বশে বলেছেন :

নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়॥

কোথাও-বা নানা উপমারূপকের ইঙ্গিত দিয়ে বাউল সাধনার আভাস দিয়েছেন :

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারা তারাই নদীর ধারা চিনে॥

সীমা-অসীম বা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কও তিনি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষা স্নিগ্ধ গীতিমূর্চ্ছনায় পূর্ণ; উপমারূপক, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা এবং ভাবের গভীরতা এযুগেও বিস্ময়কর। মূলত তিনি বাউলসাধনার সঙ্কেত দিয়ে গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তত্ত্বকথাও তাঁর ভাষায় বিচিত্র কাব্যশ্রী লাভ করেছে। সর্বোপরি আধুনিক মনের সঙ্গে তাঁর গানগুলির কেমন যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন (যদিও তাঁদের দেখাশুনা হয়নি) এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

লালনের তিরোধানের পর আর একজন মুসলমান বাউল অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ'র নাম পঞ্জ শাহ্। এ'র গানেও যে ভক্তি, অধ্যাত্মসম্পদ ও কাব্যগুণ উপলব্ধি করা যায় বাংলা গীতিশাখার মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান সহজেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। পঞ্জ শাহ্ মুসলমান বংশে জন্মালেও ধর্মমতে কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্নই মেনে চলতেন না—অন্তরের আলোকই ছিল তাঁর সাধনমার্গের একমাত্র দিশারী। অবশ্য ইসলামী অধ্যাত্ম শাস্ত্রেও তিনি খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তার ওপর আবার হিন্দুর যোগতন্ত্রাদিও তাঁর অজানা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতি শুদ্ধাচার মেনে চলতেন—তাঁর আচার-আচরণ খানিকটা হিন্দু সন্ন্যাস-জীবনের অনুকূল ছিল বলে মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন না। তা হলেও বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁর গানগুলি অধ্যাত্মচেতনা ও কাব্যসম্পদের দিক থেকে লালন ফকিরের গানের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। বরং কোন কোন গানের কাব্যরস ও তত্ত্বরস

যে-কোন সাধক-কবিকে অতিক্রম করে যাবে। এখানে তাঁর একটি উৎকৃষ্ট গানের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে :

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষমলীলা ত্রিজগতে করছে খেলা॥
কত জনে জপে মালা তুলসীতলা,
হাতে ঝোলে জপের ঝোলা,
আর কতজন হরি বলে মারে তালি, নেচে গায় হয় মাতেলা॥
কত জন হয় উদাসী তীর্থবাসী মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা॥
স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপদেশে বোবায় কালায় নিত্যলীলা।
স্বরূপের ভাবনা জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা॥

এই গানে বাউল গানের মূল তত্ত্বটি অতি চমৎকারভাবে বলা হয়েছে। শাস্ত্র-পুরাণ, কোরান-হাদিস মিলিয়ে গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান ঈশ্বরের আরাধনা করে, কত নিয়মকানুন মেনে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে চলে। কিন্তু স্বরূপ মানুষ বা মনের মানুষের কথা তো এভাবে জানা যায় না। তাঁর কথা ব্যাখ্যান করে বোঝান যায় না, গুরু-পুরোহিত-গাজী-মুর্শিদের বচন শুনেও বোঝা যায় না—সে যে 'বোবায় কালায় নিত্যলীলা'। পঞ্জ শাহ্ সম্বন্ধে এখনও ভালো করে সন্ধান হয়নি। আমরা লালন ফকিরের কবিত্ব ও অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে যত কৌতূহলী পঞ্জ শাহ্ সম্বন্ধে সেরকম নই। তাই তাঁর মহিমা সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু পঞ্জ শাহ্ যে বাউল ও অধ্যাত্মমার্গের একজন অগ্রচারী সাধক এবং স্বভাবকবি ছিলেন, তা আজ প্রচারের দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক হিন্দু-মুসলমান বাউল গান রচনা করেছিলেন, অনেক বাউলের কণ্ঠে সে গান এখনও শোনা যায়। এমন কি আজও বাউল সম্প্রদায়ের অনেকে গান রচনা করে চলেছেন। কেঁদুলি, প্রেমতলী, বনচারীর বাগান এবং বর্ধমান ও বীরভূমের বাউল-আখড়ায় এই সমস্ত আধুনিক বাউল গান গীত হয়। কেঁদুলিতে জয়দেব উৎসবে বার্ষিক বাউল-সম্মেলনে যাঁরা যোগদান করে থাকেন, তাঁরা এই সমস্ত নতুন বাউল গান শুনে থাকেন। হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, চণ্ডীদাস গোঁসাই, এরফান শাহ্ প্রভৃতি বাউল সাধকগণ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও ভক্তসমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অবশ্য আমাদের এই বিবরণীতে আধুনিক বাউল সঙ্গীত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৩. গাথা ও গীতিকা

ঐতিহাসিক ছড়া ও কাব্য ॥ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমরা পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ আধুনিক যুগে প্রবেশ করব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা বড়ো একটা প্রত্যক্ষ করা যায় না—যদিও দেশের মধ্যে প্রায়শই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম লেগে থাকত। তবু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় বা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কিছু কিছু ছড়া-প‍াঁচালী মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে—যা মূলত লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং যার কাব্যমূল্য নগণ্য। তবু ঐতিহাসিক ক্রম বজায় রাখার জন্য তার কিছু কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে'র কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই সময় থেকে বাংলার মসনদ নিয়ে শাসকশক্তির উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বর্গীর হাঙ্গামা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীর কুশাসন ও শোষণে দেশের দুরবস্থা প্রভৃতি বাস্তব ব্যাপারের প্রতি জনসাধারণ আর উদাসীন হয়ে থাকতে পারল না। স্থানীয় লোককবিরাও এই সমস্ত উত্তেজক ঘটনা নিয়ে অনেক ছড়া-পাঁচালী লিখেছিলেন, তার কিছু কিছু লোকমুখে রক্ষিত হয়েছে। শায়েস্তা খাঁ ও মুর্শিদকুলি খাঁ বাকি খাজনার দায়ে জমিদারদের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করতেন, সে বিষয়ে অনেক ছড়া পাওয়া গেছে। সিরাজের ও মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই, বিশেষত পলাশীযুদ্ধের পরিণাম ও স্বরূপ নিয়ে কোন কোন সময়ে এখনও মাঝিমাল্লার কণ্ঠে সিরাজের শোকাবহ শোচনীয় পরিণতির করুণ গান শোনা যায়ঃ

> কি হল রে জান।
> পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল প্রাণ॥
>
> *　　　*　　　*
>
> তুখে খোয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান।
> মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ॥
> ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি।
> চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটী॥

সাঁওতাল হাঙ্গামা, কৃষকবিদ্রোহ, মুসলমান পীরফকীরের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, দামোদরের বন্যা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রজাকে বেগার খাটানো প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যে সব ছড়া রচিত হয়েছিল এখনও তার কিছু

ভগ্নাবশেষ লোককণ্ঠে রক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে তিতুমীরের ছড়াগুলি কিছু উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে চব্বিশ পরগণায় তিতু নামে এক ধর্মান্ধ মুসলমান সারা দেশে ইসলাম ধর্ম ও শাসন প্রচারের অভিপ্রায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের নারিকেলবেড়ে (যশোহর) গ্রামে এক বাঁশের কেল্লার মধ্যে জড় করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ও হিন্দু জমিদারের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তার আন্দোলন শীঘ্রই হিন্দুবিদ্বেষে পরিণত হল—তিতুর চেলা-চামুণ্ডারা হিন্দু জমিদার ও উচ্চ শ্বেতাঙ্গকর্মচারীকে মেরে ফেলল, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনায় ত্রাসের রাজত্ব চলতে লাগল। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। ধর্মান্তরী-করণ ও নারীহরণও চলল প্রচণ্ডভাবে। তখন বাধ্য হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৈন্য পাঠিয়ে এই ধর্মান্ধ 'ওয়াহবী' সম্প্রদায়ভুক্ত অশিক্ষিত তিতুমীরকে গুলি করে মেরে ফেলল, তার বাঁশের কেল্লা ধূলিসাৎ হল, অনুচরেরা হয় মারা পড়ল, নয় ফাঁসি গেল, কেউ কেউ কালাপানির পরপারে দ্বীপান্তরে গেল। তিতুমীরের আমীর বনবার স্বপ্ন শোচনীয়রূপে ভেঙে গেলে হিন্দুরা অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে তিতু ও তার দলবলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অনেক ছড়া রচনা করেছিল। বলা বাহুল্য তাতে ধর্মবিদ্বেষ থাকবেই, কারণ তিতুও ধর্মবিদ্বেষকেই মূলধন করেছিল। তার না ছিল শিক্ষা, না ছিল বুদ্ধি। লাঠিয়াল শ্রেণীর এই লোকটি কলকাতার কাছেই যেরকম গোলমাল সৃষ্টি করেছিল তাতে সে যুগের কোম্পানীর দুর্বল শাসন স্পষ্টই ধরা পড়েছে। যাই হোক সম্প্রতি যাঁরা বাঁশের কেল্লাপতি লাঠিয়াল তিতুকে স্বদেশপ্রেমের উচ্চ মঞ্চে স্থাপন করে তাকে শহীদ ইত্যাদি ভূষণে অলঙ্কৃত করতে চান, তাঁরা স্থানীয় প্রবাদ, কাহিনী ও তথ্য সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নন।

এই প্রসঙ্গে আরও দু'খানি ঐতিহাসিক কাব্যের কথা উল্লেখ করি। ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে 'রাজমালা' নামে যে ঐতিহাসিক ও রাজবংশ-কাহিনী রচিত হয়েছিল তার কাব্যমূল্য যাই হোক, এতে স্থানীয় রাজ-বংশের ইতিহাস, সমসাময়িক ত্রিপুরার সমাজজীবন এবং আরও অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এ কাব্যের কয়েকখানি পুঁথিও পাওয়া গেছে। নানা সময়ে রাজাদের উজীর ও কর্মচারীরা এ কাব্য রচনা করেন বলে এতে সব সময়ে সন-তারিখ ও ঐতিহাসিক তথ্যের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়নি। এ কাব্য প্রাচীন

হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা মহারাজদের কর্মচারীরা এতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন, কেউ-বা কাহিনীর আদ্যন্ত পাল্টিয়ে ফেলেছেন। তাই ছাপা গ্রন্থ, যা বাজারে চলে, তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় আছে—রচনা-কাল সম্বন্ধেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাচীন 'রাজমালা'তেও অনেক বিশৃঙ্খলা ছিল। গত শতাব্দীতে এটি সংশোধিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। সংশোধনের পর একে আর পুরাতন গ্রন্থ বলা যায় না। ত্রিপুরারাজদের সঙ্গে পাঠান ও মুঘলদের বিরোধ এবং সিংহাসন নিয়ে 'মাণিক্য' পরিবারের নানা বিরোধ ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী এর অন্যতম প্রধান ঘটনা। কিছুদিন আগে 'চম্পকবিজয়' নামে ত্রিপুরা রাজবংশ সম্বন্ধে আর একখানি কাব্য পাওয়া গেছে। পারিবারিক বিরোধ এরও প্রধান আখ্যান। এই ধরনের কাব্য থেকে জানা যাচ্ছে, ত্রিপুরারাজ্যে মাঝে মাঝে অশান্তি ঘনালেও এখানে হিন্দু-মুসলমান প্রজা অত্যন্ত প্রীতির আবহাওয়ায় বাস করত, রাজাদের অনেক সুহৃদ কর্মচারী ছিলেন মুসলমান। অবশ্য এই পার্বত্য অঞ্চলে কোন কোন সময়ে নৈতিক অধঃপতন ঘটত। মদ্যাসক্তি এখানকার একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল, ফলে চারিত্রদুষ্টি ও অন্যান্য অনাচারও ঘটত প্রচুর পরিমাণে।

ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বলতে গেলে এই একখানি মাত্র ঐতিহাসিক কাব্য মধ্যযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক ফসল। 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামা উপলক্ষ করে পূর্ববঙ্গের কবি গঙ্গারাম এই কাব্য রচনা করেন। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধরীশ্বর গ্রামে কায়স্থ দেববংশে গঙ্গারামের জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি স্থানীয় মুসলমান জমিদারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং রাজকার্যাদির অনুরোধে মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে আসতেন। মারাঠা বর্গীদের অত্যাচারের অব্যবহিত পরে তিনি এ কাব্য রচনা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন বলে উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ১৬৭২ শকাব্দ বা ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচনা সমাপ্ত করেন। অবশ্য এটিকে তিনি 'প্রথম কাণ্ড ভাস্কর পরাভব' এই নাম দিয়েছিলেন। মনে হয় ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডের পর বর্গীর পরবর্তী হাঙ্গামা সম্বন্ধে তিনি আরও কাণ্ড লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুধু প্রথম কাণ্ডটি পাওয়া গেছে—অন্য কোন কাণ্ড লিখেছিলেন বলে মনে হয় না।

গঙ্গারাম সমসাময়িক রীতি অনুসারে প্রাণ ও মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে এই ঐতিহাসিক কাব্য আরম্ভ করেছেন, সমাপ্তিও কতকটা সেই রকম। কিন্তু কাব্যের মধ্যে নিছক ঐতিহাসিক তথ্যই আছে, অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব কম। মারাঠা নেতা সাহুর অনুচর ভাস্কর পণ্ডিত বার তিনেক বাংলাদেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে হানা দিয়েছিলেন। সেই অমানুষিক অত্যাচারের নির্মম বর্ণনা এই কাব্যে পাওয়া যাবে। মোটাম্টি ইতিহাসের ঘটনাকে অনুসরণ করে গঙ্গারাম এই কাব্য রচনা করেছিলেন। আধ্নিককালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানেও কবির কাহিনী খুব বেশী ত্রুটিজনক বলে মনে হবে না। তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলমান ক্শাসনের প্রতিবিধানের জন্যই নাকি মহাদেবের নির্দেশে ভাস্কর পণ্ডিত বাংলায় প্রেরিত হন—এই ধরনের একটা লোকরঞ্জক অনৈতিহাসিক পৌরাণিক গল্পের বর্ণনা থাকলেও সে সময়ে হিন্দুরা যে কোন কোন দিক দিয়ে গোপনে মুসলমান শাসনের বিরোধিতা করত এবং গোড়ার দিকে মারাঠাদের অভিযানকে বোধ হয় সমর্থনই করেছিল তার সম্বন্ধে দু-একটা ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়—কবিও সমকালীন ঐতিহাসিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তবে তিনি মারাঠাদের বর্বর অত্যাচার বর্ণনায় কিছুমাত্র ক্ণ্ঠিত হননি, মারাঠারা হিন্দ্ বলে তিনি তাদের অত্যাচারকে ঢাকা দেবার চেষ্টাও করেননি। যাই হোক মধ্যযুগের বিরল ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। অবশ্য কাব্য হিসেবে এর বিশেষ কোন প্রশংসনীয় গুণ উপলব্ধি করা যায় না—নিতান্তই সাদাসিধে শব্দবিন্যাসের দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনা অনুসৃত হয়েছে। কবিত্বের পালিশ পড়েনি বলে এর কাব্যমূল্য নগণ্য মাত্র।

লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গগীতিকা ॥ দীনেশচন্দ্র সেন প্রচারিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হবার আগে বাংলার শিক্ষিত সমাজ লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হননি, যদিও শতাব্দীকাল আগে থেকেই রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ইত্যাদি নানাজনে রূপকথা সংগ্রহ ও অনুবাদ করে প্রকাশ করার পর বাংলার লোকসাহিত্যের প্রধান অংশ যে রূপকথা, তা একপ্রকার বোঝা গিয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও অনুশীলনের জন্য অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু যথার্থ লোকসাহিত্য সংগ্রহের চেষ্টা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। এখনও এদেশে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য অতি অল্প স্থলেই বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেকটাই লোকসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। নাথসাহিত্য পুঁথির আশ্রয় পেলেও এর উৎসভূমি লোকসাহিত্যেরই প্রাঙ্গণ। মঙ্গলকাব্যের গোড়ার দিকটা ব্রতকথা-ছড়া-পাঁচালী ধরনের লোকসাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে চৈতন্য-প্রভাবে ও সংস্কৃত ঐতিহ্য অনুসরণের ফলে বাংলা সাহিত্যে পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত ভাবের সমাবেশ হয় প্রচুর পরিমাণে। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকে তখনও নানা গল্পকাহিনী, নীতি-উপদেশ, প্রণয়ানুরাগ প্রভৃতি নিয়ে গান বাঁধত নিশ্চয়, কিন্তু সে সব উপাদান এখন খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। পরবর্তী কালে এই সমস্ত লোকসাহিত্য—ছড়া, গাথা-গীতিকা, রূপকথা, প্রবাদ, স্থানীয় ঘটনা, ধাঁধা প্রভৃতির আকারে জনসমাজে রক্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি কোন কোন উৎসাহী গবেষক (ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য) এগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছেন—এর অনেকটা মুদ্রিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামান্তরে এখনও কত লোকসাহিত্য অবহেলাভরে অনাদরে পড়ে আছে। লোকসাহিত্যের সবটুকু মৌখিক ব্যাপার হলেও এর পিছনে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির এমন সমস্ত পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে যা হয়তো তথাকথিত সমাজ ইতিহাস-সংক্রান্ত মোটা মোটা কেতাবে লেখা নেই। সেইজন্য এগুলির আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। কিছুকাল ধরে কয়েকটি লোকসাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রবর্তনায় ও পণ্ডিত-গবেষকদের অক্লান্ত-চেষ্টায় যে সমস্ত লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির নমুনা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে, তার যৎসামান্য পরিচয় নিতে হলেও এ পুঁথির কলেবর বেড়ে যাবে। সুতরাং বাংলাদেশের সম্প্রতিকালে-আবিষ্কৃত আধুনিক লোকসাহিত্যের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলব না। শুধু লোকসাহিত্যের যে অংশ নিয়ে একদা প্রচুর আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল, এবং লোককাব্যের আদর্শে যেগুলি দেশ-বিদেশে সমাদর লাভ করেছে, এখানে সংক্ষেপে তার কথা উল্লেখ করব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে এবং দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনা ও ভূমিকাসহ 'ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র যে চারিটি খণ্ড প্রকাশিত হয় লোকসাহিত্যের দিক থেকে সেই সংগ্রহগুলি সর্বপ্রথম শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীনেশচন্দ্র ইংরেজীতে এগুলির অনুবাদ প্রকাশ করলে ময়মনসিংহের লোকগাথাগুলির অপরূপ কাব্যমাধুর্য

সম্বন্ধে বিদেশী সাহিত্যিক ও সমালোচকগণও অবহিত হলেন। যে লোকগাথা একদা ময়মনসিংহের নদ-নদী-হাওড়ে, জলে-জঙ্গলে অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, দীনেশচন্দ্রের উদ্যোগে ও উৎসাহে সেগুলি বিশ্বের নানাস্থানে প্রচার লাভ করল। লোকসাহিত্যের এই গৌরব দীনেশচন্দ্রের সুমহৎ কীর্তির অন্যতম।

ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে নামক একজন লোকসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কয়েকটি লোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। ১৯১৩ সাল থেকেই চন্দ্রকুমার ঐ ধরনের দু'চারটি লোকগাথা প্রকাশ করতে থাকেন। দীনেশচন্দ্র সেগুলি পড়ে কৌতূহলী হয়ে লেখক ও সংগ্রহকার চন্দ্রকুমার দে-কে খুঁজে বার করেন এবং তাঁর সাহায্যে ময়মনসিংহ ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দরিদ্র কৃষকদের (অধিকাংশ স্থলে মুসলমান) মুখ থেকে অনেক গাথা সংগ্রহ করেন। সেগুলিকে সুসম্পাদিত করে প্রকাশের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। বাংলাসাহিত্যের একান্ত অনুরাগী আশুতোষ এবিষয়ে সাহায্য করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অর্থদানে সম্মত হন। তখন দীনেশচন্দ্র, চন্দ্রকুমার দে, কবি জসিমুদ্দিন এবং আরও অনেক সংগ্রহকারদের বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। এঁদের চেষ্টায় ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানা ধরনের পালা সংগৃহীত হয়। পালাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। এতে মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, কমলা, কঙ্ক ও লীলা, মদিনা, কেনারাম, ভেলুয়া সুন্দরী প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট পালা প্রকাশিত হয়। এরপর আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে। দীনেশচন্দ্র পালাগুলিকে বাংলার বাইরে জনপ্রিয় করবার জন্য সর্বপ্রথম এর ইংরেজী অনুবাদ (*Eastern Bengal Ballads*) প্রকাশ করে অল্প পরেই বাংলা পালাগুলি মুদ্রিত করেন। এধরনের সংগৃহীত পালার সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী। অবশ্য 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র (অর্থাৎ 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডটি) অন্তর্ভুক্ত পালাগুলিই উৎকৃষ্ট পালাগীতিকার লক্ষণাক্রান্ত, অন্যখণ্ডে প্রকাশিত পালায় সব সময়ে উৎকৃষ্ট কাব্যধর্ম ও গাথার লক্ষণ পাওয়া যায় না।

গাথা হল কবিতায় বা গানে বিবৃত লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। এ কাহিনীর মূলে ক্বচিৎ কদাচিৎ ঐতিহাসিক তথ্যের একটু-আধটু ইঙ্গিত থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত

লোককবিগণ (প্রায়ই কৃষক, পাটনী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির জনসাধারণ) কোন প্রণয়ঘটিত রোমান্টিক আখ্যান, বা জমিদারদের দলাদলি বা লোকজীবনের অন্য কোন কৌতূহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া-পাঁচালীর ঢঙে মুখে-মুখে আখ্যানকাব্য রচনা করতেন, গায়েনের দল তাতে সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত। পূর্ববঙ্গে এর নানা দল-উপদল ছিল, যাদের ব্যবসাই ছিল পালাগান গেয়ে বেড়ান। সংগৃহীত পালাগানের মধ্যে যেগুলিতে বাস্তব প্রেম-প্রণয়ের গল্প বলা হয়েছে, কাব্যের দিক থেকে সেগুলি উৎকৃষ্ট—যেমন মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি। শুধু প্রেমের জন্য জাতিপাঁতি বিলিয়ে দেওয়া, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের কন্যাকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া, এমন কি বেদিয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণপুত্রের বিবাহ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও প্রেমের চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ঘটনা অশিক্ষিত কবিরা বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর রচনার সরল আবেগ, উচ্চতম প্রেমের আদর্শ, প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ প্রভৃতি গ্রাম্য কাহিনী কৃত্রিম সাহিত্যের মধ্যে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছে। বিশেষত এতে যে-রকম জাতি-সম্প্রদায়হীন মানবপ্রেমের মহিমা বর্ণিত হয়েছে, তাতে এই কৃষককবিরা পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করবেন। বিদেশের পণ্ডিত ও রসিকেরাও এই সমস্ত পালার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। গাথাকেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের মধ্যে এই গীতিকাগুলির স্থান খুব উচ্চে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য গাথার চেয়ে এই বাংলা গাথাগুলি উচ্চতর আবেগ, পবিত্রতা, ত্যাগ ও রচনার সরলতার দিক থেকে অধিকতর প্রশংসনীয়—সেকথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেছেন। অবশ্য এই বিপুল সংগ্রহের মধ্যে এমন অনেক পালা আছে যার কাব্যগুণ নগণ্য মাত্র। হাতী ধরা, জমিদারদের বিরোধ, তীর্থস্থান নিয়ে কলহ—এই ধরনের পালাগুলির মধ্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গুণ নেই। সেদিক থেকে প্রণয়ঘটিত গাথাগুলি অতি উৎকৃষ্ট, এবং সেগুলির মধ্যে আবার মহুয়ার পালাটি তুলনাহীন। এ পালায় মহুয়া বলে বেদের প্রতিপালিত এক কন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদ নামে এক উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকুমারের প্রেমের গল্প এবং তার শোকাবহ শোচনীয় পরিণামের আখ্যান বেদনামধুর লীরিক আবেগে কম্পমান। এই লোকগাথাটি সহজেই বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ গাথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তথাকথিত ভদ্র সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র এবং উদার অসাম্প্রদায়িক মিলনের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভদ্রসাহিত্যে অনেক কারুকর্ম আছে, পাণ্ডিত্য আছে—কিন্তু গাথার

অনাবৃত সৌন্দর্য ও নিরাভরণ ঐশ্বর্য মধ্যযুগের পুঁথিজীবী সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। চন্দ্রকুমার দে শুভক্ষণে 'সৌরভ' পত্রিকায় এগুলির সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যেরও পরম সৌভাগ্য, দৈবক্রমে সে লেখাগুলি দীনেশচন্দ্রের নজরে পড়েছিল—যার ফলে আমরা এক বিপুল গ্রামীণ ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি।

উপসংহারে, ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ ও মতান্তরের কথা উল্লেখ করি, তা না হলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পালাগুলির ইংরেজী-অনুবাদ বিদেশে প্রচারিত হলে পাশ্চাত্যের সমালোচক দল এ সম্বন্ধে প্রশংসায় যতটা কলকণ্ঠ হয়েছিলেন, এদেশে কিন্তু তখন সে ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ততটা শোনা যায়নি। বাংলাদেশের সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা এই পালা পড়ে ও আলোচনা করে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ আনলেন। এর ভাষা এত মার্জিত, পশ্চিমবঙ্গ-ঘেঁষা ও আধুনিক যে, এদের পূর্ববঙ্গের প্রাচীন গ্রাম্য রচনা বলা যায় না। কেউ কেউ চন্দ্রকুমার দে-মহাশয়ের সততায় কিছু সন্দিহান হলেন। দে-মহাশয় নিজে একজন সুলেখক ছিলেন, চাষীদের অমার্জিত-কথায়-রচিত কাহিনীর ভাষাকে কলকাতার ভদ্রজনের ড্রয়িংরুমে পরিবেশন করবার অভিপ্রায় তিনি এর ওপর হস্তক্ষেপ করেননি তো? অনেকেই দৃঢ়ভাবে সেই সংশয় ব্যক্ত করতে লাগলেন—এবং তথ্যাদি দেখে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকার ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র-পরিবেশিত তথ্য থেকে মনে হচ্ছে, চন্দ্রকুমার পালাগুলি যেমন শুনতেন ঠিক যথাযথ সেইভাবে লিখে পাঠাতেন না—মার্জিত করবার ঝোঁকে একটু-আধটু অদল-বদল করে পাঠাতেন। দীনেশচন্দ্র ছাপাবার সময় তাতে আবার কিছু হস্তক্ষেপ করে পালাগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করে নিতেন। এইভাবে দু হাত-ফেরতা হয়ে এই পালাগুলির গ্রাম্যরূপ যে অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর একটা গুরুতর প্রমাণ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। মমমনসিংহ-নিবাসী আর এক প্রাচীন সাহিত্যামোদী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩৫১ সালে নিজ-সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গান' শীর্ষক একটি লোকগাথা মুদ্রিত করেন।*

* সম্প্রতি ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় কোম্পানী থেকে নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় পূর্ববঙ্গ গীতিকার যে পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত করেছেন তাতে এ সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড, ১৯৭০)—ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত।

তাতে তিনি অভিযোগ করলেন, চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত মহুয়ার পালা এবং পূর্ণচন্দ্র সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গান' একই কাহিনী। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্ণচন্দ্র গ্রাম্য পালাগায়কের কাছে যেমনটি শুনেছিলেন, ঠিক তেমনটি লিখে নিয়েছিলেন, কিন্তু চন্দ্রকুমার সে ভাষাকে বহু স্থলে ইচ্ছেমতো পালটে—এমনকি নাম ধাম বদলে পালাটির বিশুদ্ধ রূপ নষ্ট করে ফেলেছেন। 'বাদ্যানীর গান' এবং 'মহুয়ার পালা' মিলিয়ে পড়লে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিযোগ সত্য বলেই মেনে নিতে হবে। কেউ কেউ আবার গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁদের ঘোর সংশয়—অধিকাংশ পালা, বিশেষত যেগুলিতে উৎকৃষ্ট কবিত্ব আছে, সেগুলি কোন গ্রাম্য গাথাকারের রচনা নয়, চন্দ্রকুমারেরই লেখনী-প্রসূত। দীনেশচন্দ্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলে এই কারচুপি ধরতে পারেননি। অন্যতম পালাসংগ্রহকারী কবি জসিমুদ্দিন সাহেবও ঐ ধরনের অভিযোগ এনেছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই। পাঠক-পাঠিকা অন্যত্র সে আলোচনা দেখে নেবেন।* এখানে শুধু সিদ্ধান্তটুকু জ্ঞাপন করা যেতে পারে।

যাঁরা বলেন, পালাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া চন্দ্রকুমার দে-র রচনা, বাহবা নেবার জন্য তিনি প্রাচীন গাথার ছাপ দিয়ে, এখানে-ওখানে দুটো-চারটে গ্রাম্য শব্দ জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ কৃত্রিম আধুনিক রচনার সাহায্যে সরল-প্রাণ দীনেশবাবুকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন—তাঁদের একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গান' থেকে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ থেকেও দেখা যাচ্ছে ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে এই ধরনের পালা প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান হবার আগে ঐ অঞ্চলে অনেকেই ঐ গান শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন—এমন সাক্ষ্যপ্রমাণও আছে। সুতরাং এসমস্ত পালা চন্দ্রকুমার দে বা অন্য কোন সংগ্রহকারীর লেখনী-প্রসূত নয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ অভিযোগে আমি বিশ্বাসী যে, পালাগুলিকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করা হয়নি। এর জন্য যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ থাকা দরকার, তার বিশেষ কোন ব্যবস্থা দীনেশচন্দ্র আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে করতে পারেননি, সেযুগে সেরকম সম্ভাবনাও ছিল না। সংগ্রহকারীরা যে নিজ নিজ

* এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (৩য় খণ্ড) ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

'কেরামতি' দেখাবার জন্য অথবা কাব্যকণ্ডূয়ন নিবারণ করবার জন্য সংগৃহীত পালায় হস্তক্ষেপ করেননি একথা হলফ করে বলা যায় না। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য-গাথাকে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজ কীভাবে গ্রহণ করবেন, সংগ্রহকারীদের এরকম দুর্ভাবনাও ছিল। সুতরাং আমাদের অনুমান, অনেকগুলি পালাতে (বিশেষত যেগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগুণময়) সংগ্রহকারীরা অযথা হস্তক্ষেপ করেছিলেন, এমন কি সে দোষ থেকে স্বয়ং দীনেশচন্দ্রও পুরোপুরি রেহাই পেতে পারেন না। কারণ প্রাপ্ত পালাগুলির ওপর তিনিও যে কলম চালাতেন, সেকথা তিনি উক্ত সংগ্রহের ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং কিছু অপ্রীতিকর হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই সমস্ত পালাগানে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির বেশ কিছু হস্তক্ষেপ ঘটেছে এবং তার ফলে লোকসাহিত্যের বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এখানে আমরা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য থেকে বিদায় নিলাম। অতঃপর তুলোট কাগজের পুঁথি-সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় জীবনের অবসান হল। এবার আরম্ভ হবে মুদ্রণের যুগের কথা, আধুনিক ঐতিহ্যের বিচিত্র রূপ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-মানসের বিস্ময়কর রূপান্তরের ইতিহাস—যা মূলত বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। পরবর্তী পর্বের অধ্যায়সমূহে তারই কথা আলোচিত হবে।

আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

১. পটভূমিকা

ইতিপূর্বে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে এ জাতির মন-প্রাণের স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে পলাশীর আমবাগানের অদূরে ভাগীরথী তীরে বাঙালীর স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত গেল, তার কয়েকদিন পরে বৃদ্ধ মিরজাফর ক্লাইভের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসলেন (১৭৫৭, ২৯শে জুন)। তার অল্পদিন পরে পলাতক সিরাজ ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নীত হলেন এবং নির্মম-ভাবে নিহত হলেন—বাংলার স্বাধীন নবাব বংশে ছেদ পড়ল। এর পরেও কিছুকাল বাংলার মসনদে কেউ কেউ বসেছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ বণিকের অঙ্গুলি-সঙ্কেতেই তাঁরা চলতেন, উঠতেন, বসতেন। মিরজাফরকে তো লোকে প্রকাশ্যেই 'ক্লাইভের বুড়ো গাধা' (Jack-ass of Clive) বলত। তাঁর জামাই মির কাশিম আলি খাঁ শ্বশুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ইংরেজ বণিকের আনুকূল্যে সিংহাসন লাভ করেও ইংরেজ প্রাধান্য স্বীকার না করে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখাতে গিয়েছিলেন, ফলে তাঁকে ইংরেজ বণিকের হাতে ধনে-প্রাণে মারা পড়তে হয়েছিল।

মিরকাশিম নবাব হবার পর (১৭৬০) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম পেয়ে গেল এবং তার সঙ্গে প্রচুর টাকা পেল। কিন্তু বণিকের সঙ্গে মিরকাশিম তাল মিলিয়ে চলতে পারলেন না, মন কষাকষির পর যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দ) তিনি পরাজিত হলেন। বৃদ্ধ, নেশাখোর, অব্যবস্থিতচিত্ত মিরজাফরকে আবার সিংহাসনে বসান হল বটে, কিন্তু ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাঁর ছেলে নাজমউদ্দৌলা বহু টাকা উপঢৌকন দিয়ে সিংহাসন পেলেন। এক দিকে ইংরেজ বণিকের শোষণ, আর এক দিকে এই সমস্ত নামেমাত্র-নবাব শাসকদের আর্থিক লোভ-লালসা—এর ফলে তখন বাংলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ক্লাইভ ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানী পেলেন, এবং প্রচুর অর্থ দেওয়ানী বাবদ আদায় করতে লাগলেন। এদিকে দেশশাসনের ভার রইল নবাবের ওপর। এই দ্বৈতনীতির ফলে বাঙালীর

অবস্থা হল শোচনীয়। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দের দিকে অনাবৃষ্টির ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল—কিন্তু দেওয়ান ইংরেজের রাজস্ব আদায় পুরোদমে চলতে লাগল। সময় বুঝে তারা আবার রাজস্বের হার কিছু বাড়িয়ে দিল। দেশের বিত্তবান, সাধারণ কৃষক, জমিদার—সকলেই এই দারুণ মন্বন্তরের অপঘাতে মারা পড়ল—প্রায় এক কোটি লোকের জীবনান্ত হল। এই দারুণ দুর্ঘটনা বাঙালীর স্মৃতিতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ সাল) নামে বেঁচে আছে।

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে একে একে ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, স্যর জন শোর, ওয়েলেসলি প্রভৃতি গভর্ণর জেনারেলরা এদেশের ওপর দিয়ে শাসনের নামে অবিচার-অনাচার-অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ অভিজাত মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়ে গেল (১৭৭৫)—দেশীয় লোকেরা সভয়ে শ্বেত বণিকের প্রচণ্ড শাসননীতির দিকে চেয়ে রইল। কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানীর ধনভাণ্ডার স্ফীত হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু বাঙালীর দুঃখের সীমা-পরিসীমা রইল না। কর্ণওয়ালিস বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণ্য ধারণা পোষণ করতেন, উপরন্তু তিনি বাঙালী কর্ম-চারীদের সরিয়ে সেখানে ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ করতে লাগলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে প্রধানত কৃষকসমাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কর্ণওয়ালিসের এই নীতির ফলে মধ্যবিত্ত সমাজেও তার আঘাত লাগল। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী মন নিয়ে। দেশে তখন মুসলমান শাসনশক্তি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ভারতের অন্যান্য রাজশক্তিও শূন্যে পর্যবসিত হতে চলেছে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর মুঘল বাদশাহ তখন মারাঠাদের করকবলিত। সেই বিশৃঙ্খল তরল অবস্থার সুযোগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ও বাংলার বাইরে ইংরেজশাসন ধীরে ধীরে দৃঢ়মূল হতে লাগল, তাদের লোলুপ বাসনাও ক্রমে প্রচণ্ড আকার ধারণ করল।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি গড়ে ওঠবার সময়ে সারা দেশে যে চারিত্রিক অধঃপতন, মনুষ্যত্বের অপমান, অন্যায়, অবিচার ও অনাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল, সারা ভারতের ইতিহাসে সে রকম যুগসঙ্কট কদাচিৎ দেখা গেছে। শোষক ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর শুধু শোষণের সম্পর্কই ছিল। আগে জমিদার ও রাজামহারাজারা টোল-চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে সাহায্য করে যে শিক্ষার ধারা বজায় রেখেছিলেন, ইংরেজ রাজত্বের

গোড়ার দিকে সেই সমস্ত প্রাচীন ভূস্বামিবংশ ধ্বংস হয়ে গেলে দেশের সেই গ্রামীণ শিক্ষার ধারাও লোপ পেয়ে গেল। অবশ্য ইংরেজ বণিকের সঙ্গে কারবার, লেনদেন ও চাক্‌রী করতে গিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাঙালীদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু কিছু ইংরেজী শিখেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর সমাজ, রাষ্ট্রশাসন ও সংস্কৃতির আদর্শ মুসলমান আমলের চেয়েও নীচে নেমে গিয়েছিল। শিক্ষাদীক্ষার সাধারণ ধারা ক্রমেই ক্ষীণপ্রায় হয়ে এল, প্রাচীন জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক আদর্শেও ভাঙন ধরল। নাগরিক কলকাতা বাণিজ্য-বিত্ত-বঞ্চনার রাজধানী হয়ে এক প্রকার স্থূল ধরনের জীবনরস গাঁজিয়ে তুলল। কোম্পানীর সদর-দেওয়ানী-নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কলকাতায় বহু দেশীবিদেশী লোকের আনাগোনা চলেছে, মুর্শিদাবাদের পূর্ণচন্দ্রে অনেক পূর্বেই গ্রহণ লেগেছিল। অতঃপর কলকাতার শীর্ষদেশে বিত্তকৌলীন্যের শত সূর্যশশীর উদয় হল। তখন কলকাতায় কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিল না। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নাভিশ্বাস উঠেছে প্রায় অর্ধশতাব্দীর পূর্বে। অবশ্য পুরাতনপন্থী কবিরা তখনও চামর দুলিয়ে পাঁচালী গাইছেন, রামায়ণ-মহাভারতের অজস্র নকল করছেন, কেউ-বা ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে আদিরসের ভিয়েন বসিয়েছেন। এরই মধ্যে আবার শূন্য দিগন্তে আশার মেঘ দেখা যাচ্ছে। ১৭৭৪ (বা ১৭৭২) খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায়ের জন্ম হল, ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা শিখবার সুবিধার জন্য ঐ কোম্পানীর কর্মচারী হ্যালহেড সাহেব *The Grammar of the Bengal Language* লিখলেন, যাতে এদেশে ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম বাংলা বর্ণ ব্যবহৃত হল। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে স্বনামধন্য উইলিয়ম কেরী সাহেব বাংলাদেশে উপস্থিত হলেন, ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মার্শম্যান, গ্র্যান্ট প্রভৃতি মিশনারী সম্প্রদায়। এই সময়ে বাঙালী মধ্যবিত্তেরা কোম্পানীর কারবারে মুৎসুদ্দি হল, কেউ শিপ-সরকারের কাজকর্ম চালাতে লাগল, কেউ-বা কোম্পানীর রেশমকুঠীর কেরাণীগিরি করে দিনগুজরান করতে লাগল। ফলে বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী ভাষা শেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয়, ফিরিঙ্গী, আরমানীয় ব্যক্তি নিজ নিজ আস্তানায় ইংরেজী শেখাবার পাঠশালা খুলে শুধু শব্দের মানে শিখিয়ে বাঙালীর কাছ থেকে অনেক সিক্কা টাকা দক্ষিণা নিতে লাগলেন। কেউ কেউ আবার ইংরেজী-বাংলা 'ওয়ার্ডবুক' এবং অভিধান

ছাপিয়ে কেরাণী বাঙালীর মোটামুটি 'ইয়েস নো' ইংরেজী জ্ঞান লাভের কিছু সুযোগ করে দিলেন। আপজোন সাহেবের 'ইংরেজী ও বাঙালী বোকেবিলরী' (১৭৯৩), মিলারের *The Tutor* বা 'শিক্ষ্যা-গুরু' (১৭৯৭) এবং ফরস্টার সাহেবের দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ *Vocabulary* (1799-1802) অর্থাৎ ইংরেজী-বাংলা অভিধানের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতার সঙ্গতিসম্পন্ন বাঙালী, যাঁরা কোম্পানীর চাকরী করতে চাইতেন, তাঁরা খানিকটা সুবিধে করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ফরস্টার সাহেবের *Vocabulary* বহু দিন বাঙালীর অভিধানের চাহিদা মিটিয়েছিল। এই তো গেল নতুন সম্ভাবনার ঈষৎ ইঙ্গিত। এখন দেখা যাক পুরাতন কাব্যধারা এই অর্ধশতকে একেবারে মরে গিয়েছিল, না তখনও বেঁচে ছিল।

২. পুরাতন কাব্যধারার অনুবর্তন

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে পুরাতনের অপদার্থ অনুকরণ সম্বন্ধে দেখিয়েছি যে, এযুগে সমাজ ও সংস্কৃতি যেমন ভেঙে পড়েছিল তেমনি সাহিত্যেও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। কেউ-ই কোন নতুন পথের সন্ধান দিতে সচেষ্ট হননি, পুরাতনের তলানি নিয়েই সকলে খুশি ছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্র-রামেশ্বর প্রভৃতি শক্তিশালী কবিরা কাব্যের বহিরঙ্গে প্রতিভার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু শাক্তপদ, বাউল-গান এবং পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু গীতিকা বাদ দিলে এযুগে সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার অভাব বড়ো প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও শেষের দিকে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল।

পুরাতন মঙ্গলকাব্যের অক্ষম অনুকরণ এবং সত্যপীর-সত্যনারায়ণের তৃতীয় শ্রেণীর পাঁচালী এই শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়েছিল—অবশ্য সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, পূজার্চনা ও শীনি' বাঁটা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু হলেও এ বিষয়ে পাঁচালী-ব্রতকথার পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই বেশী পাওয়া গেছে। এই জাতীয় পাঁচালীতে কিছু ধর্মকথা, কিছু-বা রোমান্টিক প্রণয়-আখ্যায়িকা থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবণতা অনুসারে এই সমস্ত আদিরসের গল্পের খুব চাহিদা ছিল। মদনসুন্দরের পালা, লালমোনের কথা, মালঞ্চ পালা, মছলন্দী পীরের কাহিনী, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ত্রৈলোক্যপীরের কাহিনী, ইত্যাদি

পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক পুঁথিগুলির হিন্দু ও মুসলমান সমাজে খুব চাহিদা দেখা দিয়েছিল। এই পীরসাহিত্যগুলির কাব্যমূল্য নগণ্য হলেও এর মধ্যে বাস্তব জীবন ও মর্ত্যরসের যে চিহ্ন রয়েছে তা কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে স্থানীয় ঘটনা অবলম্বনে অনেক ছড়া মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল—যেমন ভূমিকম্পের ছড়া, বানের ছড়া, সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া প্রভৃতি। সাময়িক ও স্থানীয় ব্যাপারের জন্য এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর ছড়ার উল্লেখ করা গেল। তখনও বৈষ্ণবের আখড়ায় পদরচনা চলছিল, কীর্তন চলছিল, পদের সঙ্কলন চেষ্টা অব্যাহত ছিল। বৈষ্ণব সহজিয়ারাও নিজেদের রহস্যময় সাধনার বিষয়ে রহস্যময় ইঙ্গিতের সাহায্যেই অনেক গদ্য পুস্তিকা এবং পদ রচনা করেছিলেন। তবে দেখা যাচ্ছে, সমাজে মুসলমানী আদিরসের কাহিনী (অর্থাৎ 'কিস্‌সা' বা 'কেচ্ছা') বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এই ধরনের আদিরসের উত্তপ্ত কেচ্ছা অনেক লেখা হয়েছিল, কিছু কিছু ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীর পুরাতন জীবনধারা যেমন মন্থর হয়েছিল, তেমনি পুরাতন কাব্যধারাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে কলকতা ও নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে কবি, আখড়াই, টপ্‌পা প্রভৃতি যে সমস্ত নাগরিক লৌকিক গীতি-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, এখানে সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

৩. কবিগান ইত্যাদি গান ও নাগরিক ঐতিহ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী নাগরিক কেন্দ্র থেকে সদ্য-গঠিত কলকাতার বিত্তবান সমাজে একপ্রকার লঘু ধরনের গীতবাদ্য, যাত্রাপাঁচালী প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। তখন পুরাতন ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে, নতুন শিক্ষাসভ্যতার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়নি, অথচ নাগরিক সমাজের অনেকের হাতে কাঁচা টাকা জমেছে প্রচুর। সেই বিকৃতিরুচির নাগরিকদের রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য একপ্রকার নাগরিক লোকগীতি, অভিনয় ও কাব্যকলার অনুশীলন হয়েছিল। একে এক-কথায় কবিসঙ্গীত ও উক্ত গায়কদের কবিওয়ালা বলা হলেও এর মধ্যে অনেক ভাগ-উপবিভাগ আছে। মোটামুটি কবিগান, আখড়াই, টপ্পা, যাত্রা ও পাঁচালী—এই ক' শাখায় এই নাগরিক সাহিত্যের শ্রেণী বিন্যস্ত হতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর

বা তার পূর্ব থেকেই মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি ঈষৎ অগ্রসর ও নাগরিক অঞ্চলে হালকা চালের ও স্থূলরসের গীতিসাহিত্য বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এরই নিকৃষ্ট রূপ খেউড় গানে ফুটে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' দেখা যাচ্ছে, সুন্দরকে শ্বশুরবাড়ীতে ধরে রাখবার জন্য বিদ্যা তাকে প্রলুব্ধ করেছে খেউড় গানের উল্লেখ করে—"নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।" যাই হোক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কবিগান কলকাতা ও তার চারপাশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল—সেই জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর মাইকেল প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের কবিদের উদয় হলে এই নাগরিক লোকগীতিধারা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে গেল।

একদল কবি ও গায়ক—যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ না থাকলেও ঈশ্বরদত্ত শক্তির বলে সভায় দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে গান রচনা করে তাতে সুর সংযোগ করে গাইতে পারতেন, তাঁদের কবিওয়ালা বলা হয়। 'ওয়ালা' যুক্ত হওয়াতে কবির জাত গেছে। 'কবিওয়ালা' শব্দ—অনেকটা ইংরেজী poetaster শব্দের মতো। ফিরিওয়ালা মাথায় করে জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়ায়; এই কবিওয়ালারা ঠিক তেমনিভাবে কবিতা বা গান ফিরি না করলেও তাঁরা সরস্বতীর সাধনাকে জীবিকার কাজে লাগিয়েছিলেন। জমিদার, মুৎসুদ্দি এবং 'ঠনঠনের হঠাৎ অবতার' (হুতোম)-দের স্থূলরুচি মেটাবার জন্য এই কবিওয়ালারা আসরে দাঁড়িয়ে গান গাইতেন, দু'দলে বিভক্ত হয়ে কবির লড়াইয়ে মত্ত হতেন। সেই কবিযুদ্ধে রুচি, শ্লীলতা ও ভদ্রতার মুখ রক্ষা না করাই ছিল সাধারণ রীতি। পুরাতন কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের মহারাজ নবকৃষ্ণ এই সমস্ত কুরুচি-পূর্ণ গীতিশাখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; মহারাজ সদলবলে পরমানন্দে কবির লড়াই উপভোগ করতেন। দু'দলে প্রথমে ঠাকুর দেবতার গান দিয়ে শুরু করতেন, ক্রমে রাত বাড়ত, চাঁদোয়ার তলে রেড়ির তেলের প্রদীপশিখা ম্লান হয়ে আসত, কবিওয়ালাদের সুর দুন থেকে চৌদুনে পৌঁছাত, ঠাকুরদেবতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তখন তাঁরা নিজমূর্তি ধারণ করতেন, অনুপ্রাস যমকের চমক লাগিয়ে পরস্পরকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতেন, প্রকাশ্য আসরে অশ্লীল প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন, সরস্বতীপ্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ শক্তিকে চরম অশ্লীল ও অশিষ্টতায় ব্যবহার করতেন। শ্রোতাদেরও নেশা লেগে যেত, চূড়ান্ত অশ্লীল জায়গায় এসে ঢোল-কাঁশি তারস্বরে চীৎকার করে উঠত, পৃষ্ঠপোষক ধনী ভূস্বামী বাহবা দিয়ে

জয়ী পক্ষকে প্রচুর খেলাত দিতেন। শাল-দোশালার তো কথাই নেই, দরিদ্র কবিওয়ালাদের ভাগ্যে বহু টাকাকড়িও জুটে যেত। প্রতিভায় এ'রা যে স্তরেরই হোক না কেন, উপস্থিত বুদ্ধি, পুরাণের জ্ঞান, ভাষা, ছন্দ ও সঙ্গীতে অসাধারণ দখলের জন্য এ'রা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণের যোগ্য। উচ্চতর শিক্ষাবর্জিত ছিলেন বলে এবং জীবিকার জন্য গীত ও কবিতাকে বেছে নেওয়ার জন্য তাঁরা সাহিত্যসমাজে অপাংক্তেয় হয়ে আছেন। যদিও লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে কবিওয়ালারা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "অত্যন্ত লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারি জোড়া ঢোল, চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশে বিদীর্ণ" করতে পিছপাও হননি, তবু তার সব অপরাধ তাঁদের নয়—সে যুগের কাঞ্চন-কৌলীন্যে স্ফীত, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় প্রায়-বর্বর সমাজপতি এবং অশিক্ষিত শ্রোতার চাহিদা মেটাবার জন্য কবিওয়ালারা মোটা সুরে গান ধরেছিলেন। একথা অবশ্যই যথার্থ —"ইংরেজদের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।...তখন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্য চাহিত না" (রবীন্দ্রনাথ—'লোক-সাহিত্য')। ফলে আমোদের উত্তেজনায় সুর চড়াবার জন্য দাঁড়া-কবি, হাফ-আখড়াই, তর্জা প্রভৃতির আবির্ভাব হল। ভাষা হল অশিষ্ট, গ্রাম্য ও কুরুচি-পূর্ণ। ব্যাকরণ ও ছন্দের শাসনও শিথিল হয়ে পড়ল।

নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা, ভোলা ময়রা, জগন্নাথ বেনে, কেষ্টা মুচি, গুরো দুম্বো, ভীমদাস মালাকার, বলরামদাস কপালী, মতি পসারী, অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী ইত্যাদি কবিওয়ালারা আভিজাত্যে যেমন উচ্চ বৃক্ষারূঢ় ছিলেন না, তেমনি শিক্ষাদীক্ষা প্রায় কারও ছিল না। অবশ্য রাম বসু, হরুঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ—এ'রা কিছু অভিজাত কবিওয়ালা ছিলেন এবং মাঝে মাঝে 'শকার-বকারে' লিপ্ত হলেও আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে উমা-হৈমবতীর প্রসঙ্গে বাঙালী মায়ের মনোভাব সুখদুঃখের রসে সিঞ্চিত করে প্রকাশ করতে পারতেন। বিশেষত রাম বসুর সখীসংবাদ ও বিরহসঙ্গীত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর নায়িকা-সংক্রান্ত গানগুলিতে আধুনিক মনের ও গীতিমূর্চ্ছনার আবেশ লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর নায়িকার সেই ব্যাকুল বেদনা ঃ

দিয়েছিল। কবিগান, মেয়েকবি (শুধু স্ত্রীলোকদের দ্বারা গঠিত), খেউড় গান প্রভৃতিতে এই ব্যাপার চরমে উঠে গায়ক ও শ্রোতার রুচিকে একেবারে কলুষিত করে ফেলেছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নতুনের জোয়ার এলে এসব অবাঞ্ছিত আবর্জনা বিস্মৃতির পারে ভেসে গেল।

যাত্রা, পাঁচালী, তর্জাও এযুগে জনসাধারণের মধ্যে কম জনপ্রিয় ছিল না। কালীয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রা, শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, চৈতন্যমঙ্গল—এসবও এই সময়ে বেশ বিকাশলাভ করেছিল। পূজাপার্বণে দেবমন্দিরে চণ্ডীমণ্ডপে যাত্রার অনুষ্ঠানে বহু লোক জমায়েত হয়ে পৌরাণিক ঘটনা উপভোগ করত। অবশ্য তাতেও কালুয়া-ভুলুয়া কেশো-বেশো, মেথর-মেথরানী প্রভৃতি রঙ্গকৌতুকের চরিত্রের স্থূল-ধরণের বাড়াবাড়ি সাধারণে বেশী ভালোবাসত। পাঁচালীও এই সময়ে খুব খ্যাতি-লাভ করেছিল। দাশরথি রায় বা দাশু রায় আধুনিক ধরনের পাঁচালী রচনা করে ও গেয়ে কলকতা অঞ্চলে একসময়ে খুব নাম কিনেছিলেন। অবশ্য মধ্যযুগীয় বিবৃতমূলক কাব্যকাহিনীকে 'পাঁচালী প্রবন্ধ' বলা হত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ পাঁচালী, বলেই পরিচিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর দাশুরায়-সম্প্রদায়ের পাঁচালী একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। পূর্বতন পাঁচালীর মূল সুর পৌরাণিক, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভক্তি ও বিশ্বাস। কিন্তু দাশু রায় প্রমুখ আধুনিক পাঁচালীকারেরা দেবদেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও আধুনিক-সম্পর্কিত ঘটনা ও রঙ্গব্যঙ্গের দিকেই তাঁদের বেশী ঝোঁক ছিল। দাশরথির 'নলিনী ভ্রমরোক্তি' পাঁচালী অনেক স্থলে অপাঠ্য। অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয়ী সমাজাদর্শ পূর্বতন ধর্ম ও ভক্তিপ্রধান পাঁচালীকে একেবারে জাতিচ্যুত ও ভ্রষ্টাচার করে ফেলেছিল। এ সমস্ত নাগরিক লোকসাহিত্যের বিশেষ কোন সাহিত্যমূল্য নেই; আমোদের উত্তেজনা, রঙ্গরস, রুচিহীন বিষয়বস্তু ও শব্দের আস্ফালন দ্বারা অশিক্ষিত, অমার্জিত জনচিত্ত আকর্ষণ করাই ছিল এই যুগের এই ধরনের রচনা ও গীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ধরনের আলোচনার ছেদরেখা টানার আগে আর একটি গীতিশাখার উল্লেখ করতে চাই—এ হচ্ছে টপ্পা গান।

এই যুগে নাগরিক কলকাতার নানা অঞ্চলে মার্গসঙ্গীতের অনুশীলন হত, বৈঠক বসত। অনেকে বহু যত্ন করে উত্তর-ভারতীয় ওস্তাদী গান শিখতেন, কেউ-বা কলাবত (কালোয়াতী) রাগরাগিণীতে গাওয়া হিন্দী গানকে ভেঙে

বাংলা গান তৈরি করে গাইতেন। এরই নাম বৈঠকী সঙ্গীত বা আখড়াই গান। বৈঠক বা আখড়া—অর্থাৎ কারও বৈঠকখানায় বা আটচালার আখড়া এই ধরনের গানের কেন্দ্র ছিল। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু বৈঠকী গানের একজন বড়ো ওস্তাদ ছিলেন। বাংলার বাইরে কর্মব্যপদেশে বাস করে তিনি সেখান থেকে হিন্দী টপ্পা গান শিখে আসেন। টপ্পা শব্দের অর্থ হালকা চালের মার্গসঙ্গীত। লক্ষ্ণৌয়ের সরি মিঞা ছিলেন হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রধান উদ্ভাবক। বাংলাদেশে নিধুবাবুই বাংলা টপ্পা গানের প্রচলন করেন। তাঁর দেখাদেখি শ্রীধর কথক, কালী মির্জা (চট্টোপাধ্যায়), পরবর্তী কালের শিবচন্দ্র সরকার, আনন্দনারায়ণ ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ—অনেকে টপ্পা গান রচনা করেন। বিশুদ্ধ মানবীয় প্রণয় টপ্পা গানের প্রধান উপাদান। অবশ্য টপ্পার ঢঙে অনেক গায়ক ভক্তিমূলক গানও গাইতেন। একদা এই টপ্পা গানের খুব কদর ছিল। প্রথমত, এই সমস্ত গানে বিশেষ কোন কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার থাকত না, দ্বিতীয়ত, এর প্রণয়ঘটিত বর্ণনা ও আবেগ বিশুদ্ধ লীরিকের পূর্বাভাস বলে গৃহীত হয়েছিল। তৃতীয়ত, এতে মার্গরীতি ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত বলে, ঈষৎ অভিজাত শ্রেণীর ও মার্জিতরুচির বিলাসীসম্প্রদায় এর খুব অনুরাগী ছিলেন। আখড়াই গানে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী তালমান অনুসৃত হত, মার্গরীতি পদে পদে অনুসরণ করা হত, নানাপ্রকার জটিল বাদ্যযন্ত্রের কৌশলও এ গানকে দুঃসাধ্য করে তুলেছিল। তখন এই আখড়াই গানকে কিছু সহজসাধ্য করে, মার্গরীতিকে কিছু লঘুচপল করে এবং বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ কমিয়ে ফেলে 'হাফ আখড়াই' গানের উৎপত্তি হল। যাঁরা হাফ আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষক ও উপভোক্তা ছিলেন তাঁরাই টপ্পা গানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিলেন। টপ্পা গানের সুরতাল ও রাগরাগিণী এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু নিধুবাবু, কালী মির্জা. শ্রীধর কথকের টপ্পা গানগুলি যে শুধু গান নয়, বিশুদ্ধ লীরিক কবিতার সূচনা হিসেবে প্রশংসার যোগ্য, তা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

টপ্পা গান ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯), শ্রীধর কথক (জন্ম-১৮১৬), কালী মির্জা (মৃত্যু-১৮২৫)—এঁরা অনেক গান ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রচনা করেছিলেন, ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সকলেই জীবিত ছিলেন। তার মধ্যে নিধুবাবুর অনেক গান তাঁর জীবিতকালেই 'গীতরত্ন গ্রন্থ' (১৮৩৭-৩৮) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

টপ্পা গানের বিষয়বস্তু ও সুর পুরোপুরি 'সেক্যুলর' (secular) বা মর্ত্যকেন্দ্রিক। মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও নিধুবাবু ও তাঁর সাগরেদেরা মানব-মানবীর প্রেমের হাসিকান্নাকেই হালকা চালের মার্গগীতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই একে বিশুদ্ধ লীরিক কবিতার পূর্বাভাস বলা যায়। নিধুবাবুর 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে', 'নয়নের দোষ কেন', 'তোমারি তুলনা প্রাণ এ মহীমণ্ডলে' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গান একসময় বিশুদ্ধ প্রণয়সঙ্গীত ও লীরিক কবিতার তৃষ্ণা মেটাত। তাঁর ঃ

না হতে পতন তরু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুখতৃণ দিয়ে
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে।
আমার মনোবেদনা কভু জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়॥
না বাসে না বাসে ভাল ভাল থাকে সেই ভাল
শুনিলে মঙ্গল তার তবুও প্রাণ জুড়ায়॥

প্রভৃতি গানে মর্ত্য জীবনে প্রেমবাসনা বিশুদ্ধ কামনার রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী কালের গীতিকবিতার এই হল যথার্থ সূচনা। মানবিকতাই হচ্ছে নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পা-গায়কদের গানের মূল প্রেরণা। অবশ্য এই টপ্পা গান তখনও বিশুদ্ধ লীরিক হয়ে উঠতে পারেনি, কেননা সুরতালের সাহায্য না পেলে এ গানের অনেকটা খর্ব হয়ে যায়—এ যেন অনেকটা আদি লীরিকের মতো। প্রাচীন লীরিক প্রধানত গীত হত, পরে তার থেকে সুরের ডালপালা খসে যায়। শুধু পাঠ বা আবৃত্তির দ্বারাই পরবর্তী লীরিক কবিতা গড়ে উঠেছে। টপ্পা আসলে গান, শুধু পড়তে গেলে এর অনেক অংশ কবিত্ববর্জিত মনে হবে। গান হত বলে রচনাকারেরা ভাষা ও ছন্দে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেননি, তখন গীতিকবিতার ছন্দও গড়ে ওঠেনি। তাই টপ্পাগানকে আধুনিক গাওয়া কবিতার আদর্শে পুরোপুরি বিচার করা যাবে না। কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে সুপ্ত একক প্রাণের উত্তপ্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস এখনও শ্রোতার মনকে স্পর্শ করে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত মর্মানুভূতি এখনও আমাদের মনকে উদাসী অপরাহ্নের বৈরাগ্যে ভরিয়ে দেয়, বিরহিণী প্রিয়ার ব্যাকুল মিনতিভরা ছলো-ছলো দৃষ্টি কেমন একটা অব্যক্ত ব্যথা সঞ্চার করে। তাই

পরবর্তী কালের বাংলা গীতিকাব্যের চন্দ্র-সূর্যের তুলনায় নিধুবাবু ও অন্যান্য রচনাকারের টপ্পাগানকে প্রভাতশর্বরীর শুকতারা বলা যেতে পারে।

কলকাতা শহরের নাগরিক লোকসাহিত্যের আলোচনা করে দেখা গেল, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত নাগরিক রুচির তোষণের জন্য যে সমস্ত গান রচিত হয়েছিল, তার অনেকটাই বাজে খরচ হয়ে গেছে। সেই রেড়ির তেলের ধূমাঙ্কিত জীবন ও ধূলিমলিন কলকাতার বিত্তবান আস্ফালন, স্থূল রুচি ও রীতি নিয়ে অনেক গান ফুটে উঠেছিল, যার না ছিল কাব্যমূল্য, আর না ছিল গানের মূল্য। তবে সেযুগের সমাজ ও ঐতিহ্যের তলানিটুকুর পরিমাপ করতে হলে এই সমস্ত কবিগান, তর্জা, যাত্রা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতি নাগরিক গীতি-শাখার পরিচয় নেওয়া কর্তব্য। সেই পরিচয় নিলে দেখা যাবে, টপ্পা গান—বিশেষত নিধুবাবুর টপ্পায় যথার্থ কবিত্ব ও আবেগ মানবীয় রসে অপূর্বতা লাভ করেছে, যার সঙ্গে আমাদের কালের মানুষেরও স্বচ্ছন্দে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

৪. ঊনবিংশ শতাব্দীর ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, দেবলীলাই ছিল উক্ত যুগের বাংলা সাহিত্যের উপাদান। বৌদ্ধ ও হিন্দু পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য) নিজ নিজ ধর্মসাধনাকে প্রকাশ করবার জন্যই গীতি বা পাঁচালীর আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং দেবচেতনা তথা অধ্যাত্ম চেতনাই হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাণধর্ম। অবশ্য বাস্তব মানব-জীবনও উক্ত সাহিত্যে উপেক্ষিত হয়নি। কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে দেবদেবীর লীলা, শাপভ্রষ্ট দেবকুমার-দেবকুমারীর কাহিনী অথবা অবতারকল্প মহাপুরুষের অমানুষী দিব্যকথা। বিশুদ্ধ সারস্বত উপলব্ধির জন্য মধ্যযুগীয় কবিরা একছত্রও লেখেননি। কিন্তু আকস্মিক ও আশ্চর্য পরিবর্তন এল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে। ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজী ভাষার মারফতে মধ্যযুগীয় ও ঘরকুণো বাঙালীর চেতনায় ভূগোল-ইতিহাসের সীমা সহসা বেড়ে গেল। সপ্ত-দ্বীপা বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ দ্বীপ যে জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষ, তারও বাইরে রয়েছে

য়ুরোপ-আমেরিকা-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, আরও কত দ্বীপ-দেশ এবং অগাধ ও অকূল জলধি। তার পরিচয় কত বিচিত্র, তার মানুষ কত বিস্ময়কর, তার জীবনধারণপ্রণালী, সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি কত ঐশ্বর্যে ভরা! ইংরেজী ভাষার মারফতে বাঙালী সর্বপ্রথম এই বিচিত্র দুনিয়ার পরিচয় পেল, স্বাদ পেল ইংরেজী সাহিত্যের এবং ইংরেজী মারফতে সমগ্র য়ুরোপের, ক্লাসিক রোমাণ্টিক ও আধুনিক সাহিত্যের। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের জীবনবাদী প্রেরণা এবং বাস্তব ও ভূমিচারী চেতনার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর চেতনা-প্রবাহ, যে পম্বলে পর্যবসিত হয়েছিল, তা কোটালের বানে ভরে উঠল। মধ্যযুগের পদাবলী-পাঁচালী ও দেবদেবীর লীলাকীর্তন ছেড়ে বাঙালী সাহিত্যিক মাটির বুকে নামলেন, মৃত্তিকাতলচারী মানবজীবনের অপার বিস্ময় উপলব্ধি করলেন। এই মানবধর্ম, যা সমাজদর্শনে মানবতাবাদ নামে পরিচিত, য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে সে আদর্শ পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত উনিশ শতকের বাঙালী মনেপ্রাণে গ্রহণ করল। চণ্ডী, মনসা, বাসুলীর স্থলে মানুষের কথাই প্রধান হয়ে উঠল। কাব্য ও কাহিনী, উপন্যাস ও নাটক—শিল্পের প্রতিটি চত্বরে দেবতার পবিত্র চরণরেণুর স্থলে দুঃখদুর্ভর মানবজীবনের অশ্রুবেদনা ও পুলকানুভূতিপূর্ণ বাস্তব কাহিনী অধিকতর আগ্রহে স্বীকৃত হল। এইখানে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ব্যবধান ঘটে গেল।

অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে দেবদেবীরা যে দল বেঁধে বিদায় নিয়ে গেলেন, তা নয়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র—এঁদের অধিকাংশ রচনার উপাদান পৌরাণিক কাহিনী; দেবদেবীরাই তাঁদের কাব্যনাটকের প্রধান চরিত্র। কিন্তু তাঁদের চরিত্র আঁকতে গিয়ে কবিরা পুরাতন ধারা পুরোপুরি অনুসরণ করেননি, আধুনিক আলোকিত বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধানী আলো ফেলে এঁরা দেবতাদের নবরূপে গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ দেবতারাও মানুষ হয়ে দেখা দিলেন, সেই আদর্শ অনুসারে দেবদেবীরা একেবারে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন, কারও কারও চরিত্রবৈশিষ্ট্যও আমূল বদলে গেল। মধুসূদনের রাবণ ব্যর্থ মানুষের মতো হাহাকার করেছেন, তাঁর দেবদেবীরা নিজ নিজ স্বার্থসাধনে হীনকর্ম করতে কুণ্ঠিত হননি, নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ বিসমার্ক, ম্যাট্সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, কাভুরের আদর্শে এক মহাভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন ('রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'), হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র দেবতারা বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের বশে মাতৃভূমি স্বর্গধামকে

আততায়ী বৃত্রের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'কৃষ্ণচরিত্রে' কৃষ্ণকে ভক্তির দৃষ্টিতে না দেখে যুক্তি ও বাস্তব প্রত্যয়ের স্বাভাবিক পরিমণ্ডলেই মহাভারত মহানাটকের সূত্রধার বাসুদেবকে স্থাপন করেছেন। এক কথায় বাংলা সাহিত্যে দেবচরিত্র তদানীন্তন বাঙালীসমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা এমন-ভাবে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হয়েছে যে, পুরাণকার বৃদ্ধ বেদব্যাস জীবিত থাকলে এই সমস্ত কবি-সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে 'লাইবেল'-এর মামলা আনতে পারতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মনের আগল ঘুচে গেল, সে যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশাল বিশ্বের ছায়া পড়ল, বিচিত্র জীবনের কল্লোল ধ্বনিত হল, পশ্চিম সমুদ্রপার থেকে মুক্তির ঝড়ো হাওয়া এসে খাঁচার পাখীর দুর্বল পাখায় মধ্যে সাগরসঙ্গীত শুনিয়ে গেল। তারপর খাঁচার শলা ভেঙে গেল, হংসবলাকা পাখা মেলে নীল আকাশের বুকে উড়ে গেল। সামনে তখন তার প্রসারিত নীল গগনাঙ্গন, আর নিম্নে কলমন্দ্রমুখর সমুদ্রতরঙ্গ। এক কথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুধু দেবদেবীর কথা নয়, জীবনের বিশাল প্রত্যয় বিচিত্র বর্ণসুষমায় ফুটে উঠল। যাকে আমরা 'মডার্ণ' বলি, ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতার বাণী সঞ্চারিত হল, বাঙালীর জীবন থেকে মধ্যযুগ স্খলিত হয়ে পড়ল, বাংলা সাহিত্য থেকেও তার পদচিহ্ন মুছে গেল।

বড়ো রকমের পার্থক্য ঘটল আত্মপ্রকাশের বাহনে ও বিষয়বস্তুতে। গোটা পুরাতন বাংলা সাহিত্য ছন্দকে আশ্রয় করেছিল, আর আধুনিক যুগে গদ্য হয়ে উঠল প্রধান বাহন। পুরাতন যুগেও চিঠিপত্রাদিতে অল্পস্বল্প গদ্যের ব্যবহার থাকলেও, সাহিত্যে তার প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। পয়ার-লাচাড়ীর শিথিল সুরে তন্দ্রাতুর মধ্যযুগ শ্লথগতিতে চলছিল, সহসা আধুনিক কালে গদ্য এসে তাতে দিল প্রচণ্ড বেগ। যা ছিল নিছক আবেগের সাহিত্য, তাতে মনন-প্রণালীর সূক্ষ্ম যুক্তি স্থাপিত হল। বাস্তব জীবনকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হলে, বাস্তব জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাকেও গ্রহণ করতে হবে, এবং সে ভাষা হল গদ্য—প্রতিদিন তাকে আমরা অজস্রভাবে ব্যবহার করি জীবনের নানা প্রয়োজনে, অভাব-অভিযোগে। বস্তুত বাংলা গদ্যই উনিশ শতকের বাঙালীর চিন্তাধারাকে সুতীক্ষ্ণ করেছে, যৌক্তিক পারম্পর্য দান করেছে, কথাসাহিত্য ও নাটকে ভাষা জুগিয়েছে। মধ্যযুগীয় পয়ার ছন্দের ঐরাবতী চলনের স্থলে আধুনিক

কালের গদ্যে উচ্চৈঃশ্রবার উদ্দাম গতি ফুটে উঠল এবং সেই গদ্যের বাহনে বাঙালী অবলীলাক্রমে মনোবিশ্ব পরিক্রমণ করে এল।

নাটমঞ্চে নাটকাভিনয়, নাটক রচনা, কুশীলব ও প্রয়োগ-শিল্পীদের নিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি অভিনব ব্যাপার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত শেষের দিকে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যাত্রা বা লোকাভিনয় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, পুরাতন যুগে অভিনয়-মঞ্চে দৃশ্যপট সহযোগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকাভিনয় হত বটে, কিন্তু বাংলাদেশে মধ্যযুগে মঞ্চাশ্রয়ী নাটকাভিনয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইংরেজদের নাট্যমঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখে ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য তরুণের দলই প্রথমে নাটমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। তারপর সখের নাট্যাভিনয় রীতিমতো নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি করল—বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বড়ো কথা পুঁথির যুগের অবসান এবং মুদ্রণের যুগের সূচনা। মুদ্রাযন্ত্র য়ুরোপীয় রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করেছিল, বাংলাদেশেও মুদ্রণ-শিল্পের ক্রমপ্রসারের ফলে চিন্তাশ্রয়ী মানবজ্ঞান যুগপৎ গভীর ও ব্যাপক হল। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের গভীরতর সম্পর্ক স্থাপিত হল; বিশুদ্ধ সারস্বত আনন্দ যেমন লেখক ও পাঠককে প্রণোদিত করল, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যাপার সাহিত্যের মারফতে, নানা আলাপ-আলোচনার দ্বারা—বিশেষত সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে বাঙালীর জীবনধারাকে উচ্চকিত করে তুলল। য়ুরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, রেস্টোরেশন এবং আধুনিকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উনিশ শতকের বাঙালী-জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে বিকশিত হতে আরম্ভ করল। একে আমরা সাধারণত বাঙালী-জীবনের 'উনিশ শতকী রেনেসাঁস' বলি। ঐতিহাসিকের ভাষায়, "Such a Renaissance has not been seen anywhere else in the world's history." এর পরের অধ্যায়ে আমরা সেই বিচিত্র যুগ ও সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ করব।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের আদিপর্ব

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আধুনিক বাঙালীর সমস্ত ধ্যানধর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা বাংলা গদ্যের বাহনে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আশ্চর্য কুশলতা ও গতিবেগ লাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যের প্রচুর ব্যবহার আরম্ভ হলেও তারও কয়েক শত বৎসর আগে এর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই যাঁরা বলেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর দল এবং শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবেরা বাংলা গদ্যের সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দু-তিন শ' বছর আগে থেকেই বাংলা গদ্যের কিছু কিছু ব্যবহার হয়ে আসছিল—যদিচ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে—এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার কিছুমাত্র ব্যবহার ছিল না। যাই হোক এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকের ইতিবৃত্ত আলোচনা করব।

১. ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য

ঊনিশ শতকের পূর্ববর্তী যাবতীয় সাহিত্যকর্মে পয়ার জাতীয় ছন্দই ব্যবহৃত হত,—তা সে কাব্যকাহিনীই হোক, আর নীরস ঘটনাবিবৃতিই হোক। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মতো গদ্যাত্মক গ্রন্থ, যাতে দার্শনিক চিন্তাই সর্বাধিক, তাও পয়ার-ত্রিপদীতেই রচিত হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসও ছন্দে লেখা হয়েছে। এমন কি আয়ুর্বেদ গ্রন্থও বাংলা পয়ারের বন্ধন স্বীকার করেছিল। মধ্যযুগের সাধারণ সংস্কার ছিল সাহিত্যকর্মে শুধু পয়ার ও অন্যান্য ছন্দের ব্যবহার—গদ্যের ব্যবহার ছিল খিড়কীর দুয়ারপথে সঙ্কুচিতভাবে। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলা গদ্যের চেহারার সন্ধান মিলছে—যার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া আর বিশেষ কোন মূল্য নেই। সে যুগে লোকে সাহিত্যকর্ম, গম্ভীর আলোচনা —সব ব্যাপারেই 'পদ্য প্রবন্ধ' ব্যবহার করত; আর নেহাৎ দায়ে পড়ে চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, কোন লেনদেনের ডকুমেন্টে গদ্যের সাহায্য নিত। ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে লেখা কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের একখানি চিঠিই হচ্ছে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের

দৃষ্টান্ত। এর ভাষা ঠিক আধুনিক যুগের উপযোগী না হলেও একেবারে দুর্বোধ্যও নয়। "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" ষোড়শ শতাব্দীর পক্ষে এই বিশুদ্ধ গদ্যের ঠাট বিস্ময়কর বৈকি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে চিঠিপত্র ও দলিলে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক বিকাশ ঢেকে গেল ফারসী শব্দের অযথা বাহুল্যে—"আসামী মজুকরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হয়"—এই খিচুড়ি ভাষাতেই তার প্রমাণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর আদালতের ভাষা দলিল, ক্রয়-বিক্রয়পত্র প্রভৃতিতে ইসলামী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হলেও গঠনভঙ্গিমা দুর্বোধ্য নয়। "এগার রূপাইয়া পাইয়া স্ব-ইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম। তোমার পুত্র-পৌত্র আদিক্রমে আমার পুত্র-পৌত্র আদিক্রমে গোলামী করিব।" ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অন্নাভাবের দিনে আত্মবিক্রয় করে এই চুক্তিপত্র তৈরি হয়েছিল। এর ভাষা প্রায় আধুনিক কালের মতো, এর তাৎপর্যও বড় করুণ। অন্নর জন্য সগোষ্ঠী নিজেকে বংশানুক্রমে ক্রীতদাস করার এই নিষ্ঠুর ঘটনার দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সাধারণ বাঙালীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ নন্দকুমার বিপন্ন হয়ে পুত্র গুরুদাসকে লিখেছিলেন, "অদ্য চারিরোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব।...এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। নচেৎ আমার জান লোপ হইল।" এ ভাষার সুগঠিত পদবিন্যাস দেখে কি মনে হয়, মিশনারী সম্প্রদায় বাংলা গদ্য তৈরি করেছিলেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধরনের বহু চিঠিপত্র ও দলিল পাওয়া গেছে, যার গদ্যের অন্বয় একেবারে হাল আমলের মতো—শুধু কিছু ইসলামী শব্দের বাহুল্য আছে। এ সময় সহজিয়া বৈষ্ণবদের নিজ নিজ সাধনভজন-সংক্রান্ত কতকগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে—যার গদ্যপংক্তি সংলাপের ধরনে কাটা-কাটা। কিন্তু অন্বয়বন্ধন অতি পরিষ্কার। এই দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজ আসবার আগেই বাংলা গদ্যের কার্যক্ষম ও ভাব প্রকাশক চেহারা গড়ে উঠেছিল। তবে সামান্য কাজকর্ম ব্যতীত সাহিত্যকর্মে তার ব্যবহার ছিল না। এবার আর একটু বিচিত্র গদ্যের কথা বলি।

বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজ বণিক ও বোম্বেটের দল আসতে শুধু করেছিল। তাদের সন্ত্রাসের কথা এখনও ইতিহাসে দুঃস্বপ্নের মতো বেঁচে আছে। তাদের কোন কোন মিশনারী সম্প্রদায়ও (রোম্যান ক্যাথলিক) এদেশে এসে ছলে-বলে কৌশলে বাংলার গ্রামে গ্রামে গির্জাঘর বানিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের ধরে ধরে খ্রীস্টান করতে শুরু করেছিলেন। এ'রা দেখলেন যে, এদেশের ভাষা না শিখলে ধর্মান্তরীকরণ ভালোভাবে চলবে না। তাই কোন কোন ধর্মযাজক বহু পরিশ্রম করে কিছু কিছু বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। তখন বাংলা ভাষার কোন ব্যাকরণ ছিল না। এ'রা নিজেরা চেষ্টা করে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিমতো পর্তুগীজ-বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেন। তার কিছু কিছু পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে রোমান অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। কেউ কেউ হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে এবং খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য যে দু-একখানা পুস্তিকা লিখেছিলেন, তারও অল্প কিছু রোমান অক্ষরে ঐ লিসবন নগরে ছাপা হয়েছিল। রোমান অক্ষরে ছাপার কারণ, তখনও ছাপার অক্ষরে বাংলা হরফের ব্যবহার শুরু হয়নি। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী হ্যালহেডের *The Grammar of the Bengal Language*-এ সর্বপ্রথম কাঠের খোদাই বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। যাই হোক পর্তুগীজ মিশনারী, যাঁরা বাংলা ভাষা চর্চা ও তাতে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম করতে হয়—(১) মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁউ, (২) দোম আন্তোনিও দে রোজারিও। এর মধ্যে মানোএল সাহেব ছিলেন খাঁটি পর্তুগীজ পাদরী, আর দোম আন্তোনিও বাঙ্গালী ছিলেন, পরে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত হন। এই দু'জনের দু'একখানি গ্রন্থ পর্তুগীজ-প্রভাবিত বাংলা গদ্যের সার্থক উদাহরণ। তার মধ্যে দোম আন্তোনিও-র ভাষা বাংলা ভাষার অধিক অনুগ, কারণ তিনি বাঙালীরই সন্তান। কিন্তু মানোএলের ভাষায় বিদেশীসুলভ অত্যন্ত জড়তা আছে, যদিও তিনি বাংলা ব্যাকরণ-অভিধান সঙ্কলন করে এ ভাষার প্রতি কিছু গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। মনোএলের ব্যাকরণ-অভিধানখানির পর্তুগীজ নাম *Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez* (১৭৪৩) অর্থাৎ পর্তুগীজ-বাংলা ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ। এতে তিনি মোটামুটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাবলী সঙ্কলন এবং বাংলা ও পর্তুগীজ শব্দের অভিধান সংগ্রহ করেন। এ বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *Crepar Xaxtrer Orth Bhed* ('কৃপার

শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা অর্থবেদ—১৭৩৩ সালে রচিত, ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত) রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তিকা। এতে তিনি খ্রীস্টান ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 'কৃপা' অর্থাৎ ঈশ্বরকৃপার ধর্ম বলে অন্য সমস্ত ধর্মকে, বিশেষত হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এতে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব ও আচার-আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার গির্জার নেতা মনোএল পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাই শুনেছিলেন, তাই তাঁর ভাষা-ভঙ্গিমায় পূর্বকঙ্গের কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রভাব আছে। তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ নয়, অনেক স্থানে তিনি খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বের দুরূহ ব্যাপারকে বাংলা ভাষায় ভালো করে বোঝাতে পারেননি। যাই হোক মাঝে মাঝে তিনি বাংলা সাধুভাষার ঢংটি মন্দ আয়ত্ত করেননি। এখানে মূল রোমান-হরফে-ছাপা গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তার রূপান্তর করে দেখান যাচ্ছে :—

Sevilha xuhore eq Grihoxto assilo, tahar nam Cirilo ; xei Cirilo quebol aq putro jormailo ; tahare eto doea corilo, ze cono din tahare xiqhao na dilo ebang xaxtio na dilo ; xe zaha corite chahito, taha corito.

সেভিল্যা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তার নাম সিরিলো, সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জর্মাইল ; তাহারে এতো দয়া করিল যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষাও না দিল এবং শাস্তিও না দিল ; সে যাহা করিতে চাহিত, তাহা করিত।

বিদেশীর পক্ষে নিজের চেষ্টায় সাধুভাষার বয়ান এভাবে আয়ত্ত করা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নেই। সরল বিবৃতিমূলক রচনায় তাঁর ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন এবং সে ভাষা সাধুভাষা—স্থানীয় ভাষা নয়। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বাংলা গদ্যের সাধুরীতি পরবর্তী কালের মিশনারী ও সংস্কৃতজানা পণ্ডিতের দল তৈরী করেননি—সাধুভাষাই বাংলা গদ্যের মূল কাঠামো, চলতি ভাষাই বরং পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ প্রাচীন গদ্যের যত নিদর্শন পাওয়া গেছে সবই সাধুভাষায় রচিত। অতএব আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত, পয়ারছন্দ থেকে উৎপন্ন সাধু পদ্যরীতি কোনও দিক দিয়েই হাল আমলের তৈরী কৃত্রিম ভাষা নয়। বরং সেদিক দিয়ে কলকাতার যে চলতি ভাষা অধুনা সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত হয় তাকেই সাহিত্যের কৃত্রিম রীতি বা artificial literary dialect বলা যেতে পারে।

দোম আন্তোনিও বাঙালী রাজকুমার। তিনি অতি অল্প বয়সে অপহৃত

হন, তারপর খ্রীস্টান পাদ্রীদের দ্বারা মুক্ত হয়ে তাঁদের আবাসে নীত হন এবং যথাকালে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর বাঙালী নাম জানা যায় না। পর্তুগীজ মিশনারী মহলে তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছিল দোম আন্তোনিও-দো-রোজারিও। তিনি বাঙালী ছিলেন বলে অতি সহজে অশিক্ষিত বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খ্রীস্ট ভজিয়েছিলেন। তাঁর নামে একখানি গদ্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে—এর নাম 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'।* এ গ্রন্থও রোমান হরফে লেখা হয়েছিল—খুব সম্ভব ছাপা হয়নি। অবশ্য আর এক মতে এ-ও নাকি ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এর কোন মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়নি, বা মুদ্রিত হয়েছিল বলে কোন সংবাদও পাওয়া যায়নি। মনে হয় এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রচিত হয়ে থাকবে। রোমান হরফে লেখা এর পাণ্ডুলিপি এখনও পর্তুগালে আছে। ইনি বাঙালী ছিলেন বলে ভাষাভঙ্গিমা মানোএলের চেয়ে অধিকতর সুগম। দোম আন্তোনিও খ্রীস্টান হয়ে এই পুস্তিকায় কল্পিত ব্রাহ্মণ ও খ্রীস্টান আচার্যের মধ্যে বিতর্কের সাহায্যে নিজের ধর্ম প্রচার করেন। অবশ্য তর্কবিতর্কের দ্বারা হিন্দুধর্মকে হাস্যকর প্রমাণিত করে খ্রীস্টানধর্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে তিনি নিজেই হাস্যকর প্রমাণিত হয়েছেন। বাঙালী হিন্দুবংশে জন্ম হলেও তিনি হিন্দুধর্ম-সংস্কার, ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না, উক্ত গ্রন্থের যত্রতত্র তথ্যগত অনেক ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। কোন কোন সময়ে তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় হিন্দুধর্ম ও আচারকে আক্রমণ করেছেন, কৃষ্ণকে ভূতপ্রেতের সামিল বলে প্রবল অনীহা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁর ভাষাটি নিতান্ত মন্দ নয়। যেমন—

> বলি বড়ো ধর্মষ্ঠ ছিলো যে যাহারে চাহিত, তাহারে তাহা দিতো এ কারণে পরমেশ্বর ব্রাহ্মণ রূপে হইয়া একপদ দিয়া পৃথিবীতে, একপদ পাতালে, আর পদ স্বর্গে, এইরূপে বলিরাজারে ছলিলেন।

আরও দু-একজন পর্তুগীজ পাদ্রী বাংলা শিখে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় বই লিখেছিলেন—যার সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ কোন মূল্য নেই।

অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাও শাসনকার্যাদির সুবিধার জন্য বাংলা গদ্যের অনুশীলনে কিছু আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারী

---

* গ্রন্থটির পর্তুগীজ নামের বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়াবে—"জনৈক খ্রীস্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার।"

বাংলা ভাষায় দক্ষ হ্যালহেড সাহেব ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'ফিরিঙ্গানামুপকারার্থং' (অর্থাৎ সাহেবদের উপকারের জন্য) 'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং' (উক্ত ব্যাকরণের নামপত্রে উল্লিখিত শ্লোক) অর্থাৎ *The Grammar of the Bengal Language* রচনা ও মুদ্রিত করেন। গ্রন্থটি কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানর জন্য রচিত হয়েছিল। এর ভাষা ইংরেজী, দৃষ্টান্তগুলি শুধু বাংলা। এতেই সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়। হ্যালহেড বাংলা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন—আটটি অধ্যায়ে তিনি এই ব্যাকরণে বাংলা ভাষার অক্ষর ও বানান থেকে শুরু করে মোটামুটি ব্যাকরণের যাবতীয় বিভাগ (এমন কি ছন্দ পর্যন্ত) আলোচনা করেন, এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ পুঁথিপত্র থেকে বাংলা পয়ার পংক্তি উদ্ধৃত করেন, একস্থলে বাংলা গদ্যেরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বইটি মানোএলের পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর ভাষা ইংরেজী এবং শুধু কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের জন্য রচিত বলে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক নামমাত্র। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কোন বাংলা-জানা ইংরেজ কর্মচারী কোম্পানীর শাসনবিধি-সংক্রান্ত ইংরেজী আইনের বাংলা তর্জমা করে ছাপিয়েছিলেন—ভাষাতত্ত্ব ছাড়া সাহিত্যের দিক থেকে এরও বিশেষ কোন মূল্য নেই। এই সময়ে বাঙালীরা কোম্পানীর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে ইংরেজী ভাষা শিখবার প্রয়োজন বোধ করতে লাগল। তখন কোন কোন শ্বেতাঙ্গ বাংলা শিখে বাংলার মাধ্যমে কিছু কিছু 'ওয়ার্ড বুক' ধরনের পুস্তিকা ও অভিধান প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে ফরস্টার সাহেবের *Vocabulary* বা ইংরেজী-বাংলা অভিধানের দু'খণ্ড (১৭৯৯-১৮০২ সালের মধ্যে প্রকাশিত) বাঙালীর ইংরেজী শেখার প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল। এর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এ সব ছোটখাট দৃষ্টান্ত শুধু প্রত্নতত্ত্বের নজির হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে এর সংযোগ নিতান্তই অল্প। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনে রচিত গদ্য গ্রন্থগুলির ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও সাহিত্যের দিক থেকেও কিছু মূল্য আছে।

২. শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা গদ্য

শ্রীরামপুর মিশন খ্রীস্টান প্রতিষ্ঠান হলেও বাংলা গদ্যের বিবর্তনের সঙ্গে এর সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকজন

ইংরেজ মিশনারী বাংলাদেশে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁদের নির্দেশে উইলিয়ম কেরী ও টমাস নামে দুজন ব্যক্তি এদেশে প্রেরিত হন। কেরী যথার্থ মিশনারী বৃত্তি অবলম্বন করেন, কিন্তু টমাস ছিলেন জাহাজের ডাক্তার। প্রথমে এঁরা কলকাতাকে প্রচারকেন্দ্ররূপে বেছে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতিকূলতার জন্য এঁরা বাধ্য হয়ে কলকাতার অদূরে দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮০০)। এঁদের সঙ্গে এর পূর্বেই যোগ দিয়েছিলেন অন্যান্য মিশনারী। যথা ওয়াড, বার্ণসৃডন, মার্শম্যান প্রভৃতি। এই ১৮০০ খ্রীঃ অব্দেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রোটেস্টাণ্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, এর আগে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলাদেশের নানাস্থানে গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, বিদেশী-ভাষায়-লেখা বাইবেলকে দেশীয় ভাষায় লিখে বাঙালীর হাতে পৌঁছিয়ে দিলেই তারা ঘৃণ্য হিন্দুধর্ম ছেড়ে পবিত্র খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করে খ্রীস্ট ভজবে। তাঁরা এই আশাবায়ুতে মুগ্ধ হয়ে ভারতের নানা ভাষা শিখে বহু ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে বিনামূল্যে প্রচার করেছেন, অন্যান্য গ্রন্থও মুদ্রিত করেছেন। বহু কষ্ট করে অনগ্রসর ভাষা শিখে অতি পরিশ্রম ও ধৈর্য ধরে তাঁরা ব্যাকরণ-অভিধানাদি রচনা করেছেন। কিন্তু এত পরিশ্রম ও জলের মতো অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও দেশীয়সমাজে খ্রীস্টানধর্ম যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তা মনে হয় না। পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের তুলনায় খ্রীস্টান ধর্মান্তরী-করণ অতি শিথিল গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। এঁদের মতো বুদ্ধিমান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যে এরকম ভ্রান্ত পথ কেন নিলেন বোঝা যাচ্ছে না। যে হিন্দু-ধর্ম, জাতি ও সমাজ দীর্ঘকাল ধরে সুদৃঢ় ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বহু আঘাত সহ্য করেও হেলেনি, টলেনি—তাকে দু'খানা 'মথি লিখিত-সুসমাচারে'র দ্বারা ধরাশায়ী করা যাবে না, এই সহজ বাস্তব সত্যটি প্রাতঃস্মরণীয় কেরী ও তাঁর ভ্রাতৃমণ্ডলী কেন বুঝতে পারেননি, তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। সে যাই হোক, বাংলা গদ্যসাহিত্যের, বিশেষত গদ্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের এবং এই প্রতিষ্ঠানের দান স্বীকার করতেই হবে। ১৮৩৭ সালে মিশনের প্রাণ-স্বরূপ জশুয়া মার্শম্যান সাহেবের (বিখ্যাত 'সমাচার দর্পণের' সম্পাদক) মৃত্যু হলে তার কিছুদিন পরেই শ্রীরামপুর মিশন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এঁরা শুধু

বাইবেলই অনুবাদ করেননি, অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান (বোপদেবের মুগ্ধবোধ, কেরী সাহেবের *Sanskrit Grammar*, কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ প্রভৃতি) এবং পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে (কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত) ছাপার অক্ষরে প্রচার করে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করেছিলেন। এ ছাড়াও বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ, নানা শাস্ত্র, 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক এবং 'দিগ্‌দর্শন' নামে মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য এসব প্রকাশনার পশ্চাতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, অলীক-ব্যাপারে-পূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র ছাপা হলে শিক্ষিত লোকে হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে খ্রীস্টান হবার জন্য শ্রীরামপুর মিশনের দরজায় ধর্ণা দেবে। তা অবশ্য হয়নি। কিন্তু শাপে বর হয়ে গেল। পুরাতন বাংলা কাব্য, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ও তার ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হলে বাঙালীরা নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আরও সচেতন হলেন। কারণ পুঁথিপত্রাদি সব সময়ে শিক্ষিত সমাজের হাতে আসত না, আর তা ছাড়া ছাপার যুগে তুলোট কাগজের বিবর্ণ পুঁথির প্রতি অনেকের বিশেষ শ্রদ্ধাও ছিল না। কিন্তু তা-ই যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে বাজারে বিকোতে লাগল, তখন দেশীয় লোকেরা নিজেদের গ্রন্থাদি আবার শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলেন।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী-মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীদের নেতৃত্বে বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বাইবেল অনূদিত ও মুদ্রিত হয়ে সর্বত্র বিতরিত হতে লাগল। এর জন্যই এঁদের এদেশে পদার্পণ হয়েছিল। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে *Old Testament*-এর সম্পূর্ণ এবং *New Testament*-এর খানিকটা অনূদিত হয়ে ছাপা হয়। তারপর সমগ্র বাইবেল ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে 'ধর্মপুস্তক' নামে ছাপা হয়ে প্রচারিত হয়। অবশ্য ১৮০১ খ্রীঃ অব্দেরও কিছু পূর্বে কেরী *St. Matthew's Gospel*-এর বাংলা অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত এই বাইবেল নানা সংস্করণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। অন্যান্য ভাষাতেও বাইবেল অনূদিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এমন কি কেরী ও অন্যান্য মিশনারীরা সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করে সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ফল হয়েছিল হাস্যকর। সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি অত্যাসক্তি মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যে হরণ করে নেয়, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। সে যাই হোক, কেরীসাহেব বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায়

বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, অথচ তাঁর অনূদিত বাইবেলের ভাষা খটমট, অমসৃণ, দুর্বোধ্য, অনভ্যস্ত এবং বাঙালীর কানে অতি অপরিচিত বলে মনে হবে। তাঁর বাইবেলের অনেক সংস্করণ হয়েছিল, কিন্তু ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়নি। কেরী আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়েই মাটি করে ফেলেছেন। একটু দৃষ্টান্ত ঃ

> তখন ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক স্বর্গের আকাশের মধ্যে দিবারাত্রি বিভিন্ন করিতে ও তাহা হউক চিহ্ন ও কাল ও দিবস ও বৎসর নিরূপণের কারণ। তাহারাও দীপ্তি হউক স্বর্গের আকাশে উজ্জ্বল করিতে পৃথিবীর উপর। তাহাতে সেই মত হইল। তারপর ঈশ্বর নির্মাণ করিলেন দুই বড় দীপ্তি বড়তর দীপ্তি দিবসের কর্তৃত্ব করিতে ক্ষুদ্রতর দীপ্তি রজনির কৃতিত্ব করিতে তিনিও নির্মাণ করিলেন তারাগণ।

কেরীসাহেব এখানে বাংলা গদ্যের অন্বয় পর্যন্ত গোলমাল করে ফেলেছেন—কারণ তিনি ঠিক ইংরেজী বাইবেলের বাক্যগঠনের হুবহু রীতি অনুসরণ করতে গেছেন। এ ভাষার জড়তা আজ সকলেরই চোখে পড়বে। তাই অধুনা খ্রীস্টান মিশনারীগণ বাঙালীর জন্য বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তার দ্বারা উদ্দিষ্ট ফললাভ হচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু এগুলি বেশ সুখপাঠ্য তা স্বীকার করতে হবে। সে যাই হোক, কেরী সাহেবের এই বাইবেলী বাংলা এখন আমাদের কাছে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, একদা এই প্রাতঃস্মরণীয় মিশনারী বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রচার করে বাঙালী জাতির উপকারই করেছিলেন।

৩. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্য

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কিসের যোগাযোগ, প্রথমেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসে লক্ষ্য করলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম নির্বাহ করবার জন্য এবং দেশীয় শাসন চালানোর জন্য বিলেত থেকে যে সমস্ত 'আহেলা' সিভিলিয়ান কর্মচারীরা আসতেন, বয়সে তাঁরা ছিলেন অতি নবীন, প্রায় বালখিল্য বলা যেতে পারে। তাঁরা বিলেত থেকে যখন আসতেন তখন নিজেদের ভাষাও ভালো করে জানতেন না; যে দেশ শাসন করবার জন্য তাঁরা প্রেরিত হতেন, সে দেশ সম্বন্ধেও তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই সুশাসনের জন্য ওয়েলেস্‌লি মনে করলেন এদেশে এমন একটি

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যেখানে তরুণ সিভিলিয়ানেরা পড়াশুনা করে এদেশের ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, আইনকানুন প্রভৃতি শিখবেন। এর জন্য ১৮০০ সালে কলকাতা লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্য এর সঙ্গে বাঙালীর যোগ ছিল না—কিন্তু বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত গদ্যসাহিত্যের যোগ ছিল।

এই কলেজে বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক ভাষা এবং পুরাতন যুগের সংস্কৃত, উর্দু, ফারসী প্রভৃতিরও শেখার ব্যবস্থা করা হল। অন্যান্য ভাষা-বিভাগে একাধিক অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু বাংলা-সংস্কৃত-মারাঠী বিভাগের ভার নেবেন কে? এই সময়ে বাইবেলের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করে কেরী শাসকমহলে পরিচিত হয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা, মারাঠী ও সংস্কৃতের সমস্ত ভার তাঁর ওপর অর্পিত হল। তখন তিনি উক্ত তিন ভাষার বিভাগীয় প্রধান হয়ে দেশীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করতে লাগলেন। আমরা এখানে শুধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা পড়ানো এবং তার জন্য বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাসই আলোচনা করব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত চালু থাকলেও ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দের পর বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব খর্ব হতে আরম্ভ করে। কারণ এই সময়ে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে আসেন, বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন এবং নানারূপ প্রগতিশীল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। রামমোহনের প্রভাবের জন্যই ক্রমে ক্রমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের মহিমা হ্রাস পায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা পড়াতে গিয়ে বিদেশীদের সহজে বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য কেরী খুব চিন্তিত হলেন। তিনি দেখলেন সহজ বাংলায় লেখা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত না হলে বিদেশীকে বাংলা শেখানো অত্যন্ত দুরূহ। তখনও কোন গদ্যগ্রন্থের পুঁথি তাঁর হাতে আসেনি। তাই তিনি নিজে বাংলা গদ্যে বই লিখলেন, এবং বাঙালী অধ্যাপক ও অন্যান্য পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়েও নিলেন। পণ্ডিত ও লেখকদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পণ্ডিত-মুন্সীদের জন্য অনেক পুরস্কার ও অন্যান্য নানা ধরনের সহায়তা চেয়ে নিলেন। তাঁর অধীন অধ্যাপকমণ্ডলী এবং বাইরের কেউ কেউ তাঁর নির্দেশে অনেকগুলি বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন—অবশ্য প্রায় সবগুলি সংস্কৃত, ইংরেজী ও ফারসী থেকে অনূদিত এবং অধিকাংশ পুস্তিকা গল্পকাহিনীমূলক। ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত ও প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির সঙ্গে সে যুগের বাঙালীর অল্পস্বল্প পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থকে খ্রীস্টানী ব্যাপার বলে অনেকেই এর থেকে দূরে দূরে থাকতেন। রচনার দিক দিয়ে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই কিয়ৎ-পরিমাণে প্রশংসার যোগ্য। অন্য লেখকদের পুস্তিকাগুলির ভাষা এত অনভ্যস্ত ও জড়তাপূর্ণ যে সাধারণ পাঠকসমাজে এ সমস্ত পুস্তিকার বিশেষ চলন ছিল না।

কেরীসাহেব নিম্নলিখিত পণ্ডিত ও মুন্সীদের সাহায্যে অনেক গদ্য-পুস্তিকা রচনা করিয়ে নিয়েছিলেনঃ (১) গোলোকনাথ শর্মা (হিতোপদেশ—১৮০২ সালে প্রকাশিত), (২) তারিণীচরণ মিত্র (ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট—ঈশপস্ ফেবল্সের অনুবাদ—১৮০৩), (৩) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং—১৮০৫), (৪) চণ্ডীচরণ মুন্সী (তোতা ইতিহাস—তুতিনামা নামক ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—১৮০৫), (৫) রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' (১৮০৮ সালে রচিত, কিন্তু পাওয়া যায়নি), (৬) হরপ্রসাদ রায় (পুরুষপরীক্ষা, বিদ্যাপতির ঐ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ—১৮১৫), (৭) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (পদার্থ-তত্ত্বকৌমুদী—১৮২১, আত্মতত্ত্বকৌমুদী—১৮২২)। এ ছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে (৮) রামরাম বসু, (৯) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং (১০) স্বয়ং কেরী সাহেবের।

রামরাম বসু একটি বিচিত্র চরিত্র, তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। কেরী ও টমাসকে খ্রীস্টান হবার আশা দিয়ে, এমন কি কবিতায় খ্রীস্টস্তুতি লিখেও তিনি কোনদিন স্বধর্ম তাগ করেননি। কেরী সাহেবকে তিনি বাংলা শিখিয়েছিলেন, প্রায় সারা জীবন তিনি কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনের অনুগত ছিলেন। তাঁর লেখা দু'খানা গদ্যগ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২) এখানে উল্লেখযোগ্য। 'রাজা-প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যগ্রন্থ রচনার জন্য রামরামকে তাঁর পূর্বপুরুষ ধূমঘাটের রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একখানি জীবনী ও ইতিবৃত্ত লিখতে বলেন। রামরাম নানা ফারসী উপাদান থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার প্রথম লেখক হিসেবে রামরাম যথার্থই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে এর মারাত্মক ত্রুটি—গদ্যের অন্বয় অতি বিশৃঙ্খল,

এবং কারণে-অকারণে অজস্র আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ। সেকালের সমাজে ইসলামী শব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হত। তারই প্রভাবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' রামরাম এত বেশী আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেছেন যে, এখন এ পুস্তিকা পাঠকদের নিকট অতি বিকট মনে হবে। কিন্তু কেরী সাহেব সংস্কৃত ভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের জন্য বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অযথা প্রয়োগ মোটেই সমর্থন করতেন না। বোধ হয় তাঁর নির্দেশেই এ গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র এক বছর পরে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'য় ইসলামী ভাষার বাহুল্য একেবারে কমে যায়, ভাষার অন্বয়ও অনেকটা সহজ হয়ে আসে। (পরবর্তী কালেও নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন বাংলা গদ্যে আরবী-ফার্সীর ব্যবহার অত্যন্ত হ্রাস পেয়ে যায়।) গদ্যরীতির অন্যতম প্রধান লেখক রূপে রামরাম বসুর কৃতিত্ব যাই হোক, বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তাঁর কথা ভুললে চলবে না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাংলাদেশের একজন স্মরণীয় চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর প্রতিভা, চরিত্র, সমাজনেতৃত্ব প্রভৃতি এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীর দল তাঁর পায়ের কাছে বসে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন, রামমোহনের যুগে রামমোহনের প্রতিবাদ করেও তিনি কোন কোন বিষয়ে উদার ও যুক্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন—যদিও তিনি ইংরেজী জানতেন না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করে, উপযুক্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এবং নানাভাবে বিচার বিভাগকে সাহায্য করে, পুরাতন 'স্কুলের' লোক হয়েও তিনি আধুনিক কর্মকুশলতায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু সে সকল ছেড়ে দিলেও বাংলা গদ্যসাহিত্য ও রীতির বিবর্তনে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য মৃত্যুঞ্জয় 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা' (রচনাকাল—আনুমানিক ১৮১৩, মুদ্রিত ১৮৩৩)—এই ক'খানি গদ্যপুস্তিকা রচনা করেন। রামমোহনের বেদান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে লেখা পুস্তিকাও তাঁর রচনা বলে মনে হয়। 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত কাহিনীর সরল অথচ গম্ভীর রূপান্তর। 'রাজাবলি' বাঙালীর রচিত প্রথম ইতিহাস। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য়

ননাবিধ তত্ত্বকথা, ভাষারীতি, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত বলে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে যথার্থ ভাষাশিল্পী হলেন এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়। সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল; পাণ্ডিত্যের জন্য মার্শম্যান তাঁকে ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতো বিভিন্ন ধরনের বাংলা গদ্য রামমোহন কেন, বিদ্যাসাগরের পূর্বে কেউ-ই লিখতে পারেননি। ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’র কোন কোন স্থলে একটু দুরূহ সংস্কৃতবাহুল্য আছে, কিন্তু তা বাদ দিলে তাঁর গদ্যগ্রন্থে একই সঙ্গে গুরুগম্ভীর ক্লাসিক রীতি, সরল পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা এবং স্থানীয় উপভাষার প্রভাব দেখা যায়। তাঁর ক্লাসিক ও সাধুরীতিই বিদ্যাসাগরের মধ্যে অধিকতর সুষ্ঠু শিল্পরূপ লাভ করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের ‘বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২) এবং বিদ্যাসাগরের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’র (১৮৪৭) ভাষা তুলনা করলে দেখা যাবে, প্রথম সংস্করণের বেতালের তুলনায় ‘বত্রিশ সিংহাসন’ ও ‘হিতোপদেশে’র ভাষা কোন দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়। যাকে পরিচ্ছন্ন সাধু-ভাষা বলে, তার রূপনির্মিতি মৃত্যুঞ্জয়েরই সৃষ্টি। আবার তিনি যখন ইতিহাস লিখেছেন (‘রাজাবলি’) তখন প্রয়োজন স্থলে বহু আরবী-ফারসী শব্দও ব্যবহার করেছেন। স্থূল রঙ্গরসে-পূর্ণ লোকভাষারও তিনি অমর্যাদা করেননি। সে ভাষা এত বাস্তব যে, দীনবন্ধুর নাটক ভিন্ন উনিশ শতকের কোন গ্রন্থে তার অনুরূপ নিদর্শন প্যাওয়া যায় না। বাস্তব চিত্র, রঙ্গ-পরিহাস এবং সাধারণ মানুষের দুঃখের প্রতি এই ব্রাহ্মণের আশ্চর্য সহানুভূতি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি কৃষকসমাজের অমার্জিত অমসৃণ ভাষাকেও (যা আজকাল খানিকটা অশ্লীল বলে মনে হবে) কলমবন্দী করতে সংকোচ বোধ করেননি। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই হচ্ছেন যথার্থ গদ্যশিল্পী। কোন্ রীতিটি বাংলা গদ্যের আদর্শ রীতি তা নিয়ে তিনি ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই নানা রীতির পরীক্ষা করেছেন। এখানে তাঁর রচনা থেকে একটি সাধুভাষার ও একটি সহজ ভাষায় উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. সাধুভাষার দৃষ্টান্ত—এইরূপে রাজা ভর্তৃহরি বন প্রবেশ করিলে পর মালুয়াদেশ অত্যন্ত অরাজক হইল, উজ্জয়িনীর রাজধানী শ্মশান প্রায় হইল। ইহাতে অগ্নিবেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে আক্রমণ করিয়া প্রজালোকেরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে পাত্র-মন্ত্রি প্রভৃতিরা অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ অগ্নিবেতালকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত এক

নিয়ম করিলেন। সে নিয়ম এই: প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন কাজকর্ম করে, রাত্রি হইলে অগ্নিবেতাল তাহাকে ভক্ষণ করে।—রাজাবলি

২. সরল ভাষার দৃষ্টান্ত—"ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, 'তবে কি আজি খাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব?' তৎপত্নী কহিল, 'মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি-দেখি হাঁড়িকুড়ি খুদকুড়া যদি কিছু থাকে।' ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল, 'শীলটা ভাল বটে, লোড়াটা যা ইচ্ছা তা। এতে কি চিকন বাটা হয়? মরুক, যেমন হউক, বাটি ত।'—প্রবোধচন্দ্রিকা

এ ভাষাই পরবর্তী বাংলা গদ্যের জননীস্থানীয় তা স্বীকার করতে হবে।

এবার রেভাঃ উইলিয়ম কেরীর বাংলা গদ্যে স্বচ্ছন্দ পদচারণা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব; পূর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রসঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রেভাঃ কেরীর বাংলা বাইবেল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কেরী বাংলা ভাষায় কৃতবিদ্য হলেও বাইবেল অনুবাদে জড়তা কাটাতে পারেননি। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের কর্ণধার হয়ে তিনি আরও নিবিড়ভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন, পণ্ডিত-মুন্সীদের দ্বারা বাংলা গদ্যে বই লিখিয়ে নিয়ে বাংলা গদ্যের নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন। তাঁর নামে দু'খানা বাংলা বই পাওয়া যায়—'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাস মালা' (১৮১২)। চলতি বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর বরাবর আকর্ষণ ছিল। 'কথোপ-কথন' (ইংরেজী আখ্যা—'Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language'—সংক্ষেপে *Dialogue*) তাঁর চলতি ভাষায় অনুরক্তির সার্থক উদাহরণ। এতে সাহেবদের বাংলা শেখাবার জন্য সংলাপের ঢঙে এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যার নাটকীয় রস অতি চমৎকার ফুটেছে। কোন কোনটিতে তিনি এতটা ঘনিষ্ঠভাবে মেয়েদের ও সাধারণ লোকের মুখের বুলি অনুসরণ করেছেন যে, বাঙালী জীবন সম্বন্ধে সাহেবসুবোদের সেরকম ঘরোয়া অভিজ্ঞতা ও চলতি ভাষার অদ্ভুত দক্ষতা কিছু সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। নানা সন্ধানের দ্বারা দেখা গেছে 'কথোপকথনের' সবটা কেরীর রচনা নয়। মনে হয় চলতি ও লোকভাষায় অসাধারণ দক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ই এই গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কারণ কেরীর ব্যবহৃত চলতি ভাষা অনেকটা মৃত্যুঞ্জয়ের মতো। উপরন্তু কেরী যেভাবে সাধারণ বাঙালীর মেয়েলি জীবনের কথা লিখেছেন, কোন বিদেশীর পক্ষেই তা লেখা সম্ভব নয়। এখানে

তাঁর 'কথোপকথনের' "স্ত্রীলোকে ২ কথাবার্তা" অনুচ্ছেদ থেকে সেযুগে সাধারণ সমাজের স্ত্রীলোকের কথাবার্তা ও দৈনন্দিন সমস্যার ইঙ্গিত দেওয়া যাচ্ছে :

১মা—ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে বল শুনি।

২য়া—আহা, তাহার কথা কহ কেন ? এখন আর আমাদের কি আদর আছে ? নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে ?

১মা—তাহা হউক। তুই সকলের বড়, তোর ছাল্যাপিল্যা হইয়াছে।

২য়া—কালিকে ভাই দুপুরবেলা কচকচি লাগালে মাঝা বিটি তাহা কি বলিব।

১মা—কিজন্য কচকচি হইল ?

২য়া—দূর কর ভাই, তাহা কহিলে আর কি হবে, লোকে শুনিলে মন্দ বলিবে। আমার বাড়ী ভরা শত্রু, এই জন্য ভয় করি।

১৮১২ সালে প্রকাশিত কেরীর 'ইতিহাসমালা' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা কর্তব্য। এরকম সহজ সরল গদ্যরীতি মৃত্যুঞ্জয় ভিন্ন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর কোন পণ্ডিত-মুন্সী রচনা করতে পারেননি। নামে 'ইতিহাসমালা' হলেও এতে বেশীর ভাগ কাহিনী অনৈতিহাসিক গালগল্প মাত্র। এমনকি এতে চণ্ডী-মঙ্গলের লহনা-খুল্লনার গল্পও আছে। কেরী এতে যেমন ভারতীয় পুরাকথা ও গল্পকাহিনী সম্বন্ধে সরস উপাখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন, তেমনি অতি পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে এর থেকে একটু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করা গেল না :

একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সে স্থানে এক ব্যাঘ্র ঐ ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ঘটকের ক্রন্দন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক, তুমি কি কারণ কাঁদিতেছ ? ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি ঘটক, বিবাহের যোজকতা করিয়া ধনোপার্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির ভরণপোষণ করি। আমি মরিলে তাহারা কোনমতে বাঁচিবেক না। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিবেচনা করিল, আমি ব্যাঘ্রীহীন, ব্রাহ্মণ বিবাহের যোজকতা করে। পরে কহিলেক, হে ঘটক, তুমি আমার বিবাহ দেও—ব্যাঘ্রী না থাকাতে আমি বড় দুঃখে আছি। তুমি আমার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে নষ্ট করিব না।

আশা করি এই উদ্ধৃতি থেকেই পাঠক-পাঠিকা কেরী সাহেবের সরল বাংলা গদ্যলেখার নিপুণতা লক্ষ্য করতে পারবেন। মনে হয় এ যেন বিদ্যাসাগরের রচনা পড়ছি। বিয়েপাগলা বাঘ কি করে মনোমত বাঘিনীর সঙ্গে মিলিত হল,

তার সব বর্ণনাটুকু স্থানাভাবের জন্য আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারলাম না। কিন্তু কেরী সাহেবের মতো পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ মিশনারী সাহেবের মনেও যে সরস কৌতুকভাব ছিল, এটাই সকৌতূহলে লক্ষ্য করবার বিষয়। নানা ভাষায় অসাধারণ অভিজ্ঞ, বাংলা ভাষায় মাতৃভাষার মতো আসক্ত এবং বাংলা গদ্যের অন্যতম পোষ্টা ডঃ উইলিয়ম কেরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী ও কেরী সাহেবের গদ্য গ্রন্থগুলি প্রধানত লেখা হয়েছিল বিলেতি সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার জন্য। বিদেশী ছাত্রেরা কেরী ও বাঙালী অধ্যাপকদের কাছে অল্পদিনের মধ্যেই ভালো বাংলা শিখতেন, কেউ কেউ সুন্দর বাংলা বক্তৃতা করতে পারতেন—কলেজের পরীক্ষায় তাঁদের বাংলাতেই বক্তৃতা করতে হত, কেউ-বা প্রবন্ধ লিখবার মতো ভাষাজ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই পুস্তিকাগুলি নানা-কারণে জনসমাজে বেশী প্রচারিত হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে, কেরী সাহেবের সহকারীদের কেউ সংস্কৃত রীতি, কেউ ফারসী রীতি, কেউ-বা ইংরেজী ধরনের অন্বয় অনুসরণ করেছিলেন, কেউ কেউ আবার মুখের অমসৃণ কথাকেও সাহিত্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ বাংলা গদ্যের যথার্থ রীতি কি হবে, তাই নিয়ে কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা নানা ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন—কিন্তু কেউ-ই আদর্শ গদ্যরীতি নির্ধারণ করতে পারেননি। সহজাত শিল্পবোধ ছিল বলে ওরই মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় সাধু গদ্যরীতির কাঠামো অনেকটা ধরতে পেরেছিলেন। বাইবেলের অনুবাদে কেরী যতই ব্যর্থ হোন না কেন, সরল বাংলা গদ্যরীতি, বিদেশী হয়েও, তিনি যেভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনিও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে সাধুরীতির ছাঁদটি ভালোই শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা গদ্য তখনও গালগল্পের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে ছিল। চিন্তার বিশাল ক্ষেত্রে মননের সুগভীর প্রত্যয়ের দ্বারা সুগঠিত বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয় রাজা রামমোহনের রচনার মধ্যে। এবার আমরা পুণ্যশ্লোক রামমোহনের গদ্য ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর স্থান সম্পর্কে আলোচনা করব।

৪. রাজা রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য

আধুনিক বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা—যে-কোন প্রগতিশীল মনোভাবের প্রথম সূচনা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩)* বিস্ময়কর প্রভাব থেকে শুরু হয়—এতে কোন দ্বিমত নেই। বাঙালী জাতিকে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক যুগের মহাকাশে উড়তে শিখিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ (মতান্তরে ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে) সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বংশে (বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি) তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিখেছিলেন। পরে সরকারী কর্ম করবার অবকাশে উপরিতন সাহেব কর্মচারীর কাছ থেকে ইংরেজী ভাষাও বেশ ভালোই শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি মিশনারীদের তর্কে জব্দ করার জন্য হিব্রুভাষা শিখে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, জুরির বিচার, সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের অধিকার, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি ব্যাপারের তিনিই পথিকৃৎ। আবার একেশ্বরবাদী তত্ত্বের দ্বারা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদকে রূপান্তরিত করে সেই অনুসারে জনচেতনাকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা এবং আধুনিক যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনের দ্বারা বাঙালীকে নবযুগের অগ্রপথিক করে তোলার সমগ্র দায়িত্ব বিধাতা যেন তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। তাই আধুনিক ভারত-চেতনায় তাঁকে য়ুরোপের জন উইক্লিফের মতো 'Morning Star of Reformation' বলা যেতে পারে। তাঁর সেই প্রগতিশীল জীবনাদর্শের কথা আজ ভারতবাসীদের সবই জানা আছে। এখানে আমরা বাংলা গদ্যে রামমোহনের অবদানের কথাই আলোচনা করব।

১৮১৫-১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ—মোট পনের বৎসরের মধ্যেই রামমোহনের যাবতীয় বাংলা পুস্তিকা রচিত হয়েছিল, সংখ্যায় ছোটবড়ো মিলিয়ে প্রায় ত্রিশখানা। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাদশাহের উকিল হয়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন, সেখানে য়ুরোপীয় মননশীল সমাজে এই ভারতীয় ব্রাহ্মণ অসাধারণ গৌরব অর্জন করেন, তারপর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ও-দেশেই শেষবিশ্রাম লাভ করেন।

রামমোহন ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনার বশবর্তী হয়েই বাংলা গদ্যে কলম ধরেছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যরস বা শিল্পসৃষ্টি তাঁর একেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না। শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলা গদ্যে অনুবাদ ও সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে তিনি

* কারও কারও মতে রামমোহন ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের মতে—১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ।

বহুকাল-প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য দম্ভের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। প্রচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), 'উপনিষদের অনুবাদ' (১৮১৫-১৯) এবং বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৮), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'পথ্য-প্রদান,' 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৩) প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩), 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' (১৮২৮), 'সম্বাদ কৌমুদী' (পত্রিকা) প্রভৃতিও রচনা করে বিচিত্র ও ব্যাপক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজীতেও তাঁর বহু রচনা আছে, হিন্দীতেও তাঁর বিতর্কগ্রন্থ কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছিল। প্রথম যৌবনে তিনি একখানি ফারসী গ্রন্থ লিখে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন এবং কলকাতা থেকে একখানি ফারসী সময়িক পত্রও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ—হ্যালহেড ও কেরীর বাংলা ব্যাকরণের চেয়ে বিশুদ্ধতর।

রামমোহন সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুললেন। কি করে বাংলা গদ্য লিখতে-পড়তে হয় তাও তিনি যেন বাঙালী জাতির হাত ধরে শেখালেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে কাহিনী ও গালগল্প প্রকাশের বাহন করেছিলেন, আর রামমোহন তাকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুললেন। তাঁর গদ্য তাই ঋজুগতি, তীক্ষ্ণ ও যৌক্তিক পারম্পর্যে সুগঠিত। আধুনিক মনের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক ভাষা-বাহন প্রয়োজন —রামমোহন সেই আধুনিক ভাবপ্রকাশক বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টারূপে চিরদিন অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে বলেছেন, "কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।" ভাষার বিকাশের দিক থেকে তাঁর কথা যথার্থ। রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে তাঁর একজন ভক্তস্থানীয়—কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন, "দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন—তিনি রংপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল

অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এইজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।” এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য চিন্তা উদ্রেক করবে। রামমোহনের গদ্যে সাবলীলতা সরসতার একান্ত অভাব তাঁকে বিতর্কপুস্তিকার লেখকে পরিণত করেছে, প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের গৌরব দিতে পারেনি। শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর কর্মযোগী মনে ঠাঁই পায়নি, সে রকম কোন অবকাশও তাঁর ছিল না। তিনি প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের গদ্যের মতো বিতর্ক ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের রীতি অবলম্বন করেছিলেন, যাকে ঠিক আধুনিক গদ্য বলা যায় না। তাঁর গদ্যে আশু প্রয়োজন মিটলেও, ঈশ্বর গুপ্তের মতানুযায়ী, তাঁর ভাষায় ‘শব্দের পারিপাট্য’ এবং ‘মিষ্টতার’ অভাব ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর সমকালীন অনেক লেখকের গদ্য (যথা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার) তাঁর চেয়ে সুখপাঠ্য হয়েছিল। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের ‘পাষণ্ডপীড়ন’ (১৮২৩) এবং গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে’র (১৮২২) গদ্যরীতি রামমোহনের চেয়ে অনেক সরস ও সুগঠিত —যদিও কাশীনাথের রুচি অতিশয় আপত্তিকর। অবশ্য দু-এক স্থলে রামমোহনের ভাষায় বেশ সরসতার সঞ্চার হয়েছে—এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইচ্ছে করলে রামমোহন যথার্থ সাহিত্যের গদ্য লিখতে পারতেন, কিন্তু সময়াভাবে এই বিরাট পুরুষ বাংলা গদ্যে সবটা দিয়ে যেতে পারেননি—বড়োই আক্ষেপের বিষয়। এখানে তাঁর গদ্যের সাধারণ নমুনা ও সরল নমুনার দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

১. **সাধারণ রীতি**—“ন্যায় শাস্ত্র দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীব নানা। দুই অবিনাশী, ইহা ন্যায় শাস্ত্রে কহেন। আর দিক কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরের আছে। জীবের কর্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছা বিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয়, কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য-সংযোগে কর্তা হইলেন।”—ব্রাহ্মণ সেবধি

২. **সরল রীতি**—“স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?”—প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ

৫. রামমোহনের সমকালীন সাময়িক পত্র

এখানে প্রসঙ্গক্রমে রামমোহনের সমকালীন বাংলা সাময়িক পত্রে বাংলা গদ্যের বিবর্তন সম্বন্ধে দু-এক কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। বাংলা সাময়িক পত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বড়ো রকমের বিস্ময়। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজে ইংরেজী সাময়িক পত্রের চল ছিল। সুপ্রসিদ্ধ হিকি সাহেব কলকাতা থেকে 'Bengal Gazette' নামে ইংরেজীতে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করে কলকাতা সমাজের শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের কেচ্ছাকাহিনী ফাঁস করে দিতেন, কোম্পানীর অনাচার-অন্যায় বর্ণনাতেও হিকি বিষকণ্ঠ ছিলেন। ফলে স্পষ্টবক্তা ও বদমেজাজী হিকিকে কয়েদ থাকতে হয়েছে, শেষজীবনও তাঁর বড়ো দুঃখে কাটে। তাঁর পরেও কোন কোন ইংরেজ কলকাতা থেকে ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্র (সাপ্তাহিক ও মাসিক) ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে আদিযুগের সাময়িক পত্রের উল্লেখ করার কারণ, এই পত্রিকাগুলির দ্বারা যেমন বাংলা গদ্য লাভবান হয়েছে, তেমনি এর মারফৎ বাঙালীর সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিবিষয়ক আলোচনাও দানা বেঁধে উঠেছে।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে সাময়িক পত্রের সূচনা হয়। অধিকাংশই সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক। প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রের সম্পাদক স্বনামধন্য কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত; পত্রিকার নাম 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯ সালে দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়)। কেউ কেউ বলেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮), কারও মতে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই নাকি প্রথম সাময়িক (মাসিক) পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ করেন ঐ একই বৎসরে। তাঁদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' মার্শম্যানের সম্পাদনায় ও দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় ১৮১৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এতে প্রায়ই হিন্দুধর্ম ও সমাজকে অকারণে গালি-গালাজ করা হত। এর প্রতিবিধান করবার জন্য ১৮২১ সালে রাজা রামমোহন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদি' শীর্ষক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত মিশনারীদের হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেন। পরে রামমোহনের হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অতিশয় আধুনিক ও প্রগতিশীল মতের সঙ্গে কিছু রক্ষণশীল-স্বভাব ভবানীচরণ তাল মিলিয়ে

চলতে না পারার ফলে দুজনের মতভেদ ও মনোভেদ হয়ে গেল। রামমোহনের সঙ্গ এবং 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্পর্শ ত্যাগ করে ভবানীচরণ ১৮২২ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করলেন। 'সম্বাদ কৌমুদি' প্রগতি ও যুক্তিমার্গ অবলম্বন করেছিল এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' চিরাচরিত সংস্কারের পথ ধরেছিল। এছাড়াও জীবজন্তু বিষয়ক 'পশ্বাবলী' (১৮২২), 'সংবাদ তিমির নাশক' (১৮২৩), 'বঙ্গদূত' (১৮২৯, নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। হিন্দু কলেজের প্রগতিপন্থী ছাত্রেরা (যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন) ১৮৩১ সালে জ্ঞানান্বেষণ নামে একটি মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার সূত্রপাত করেন। 'বিজ্ঞান-সেবধি' পত্রেও (১৮৩২) বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। কিন্তু সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে কবি ঈশ্বর গুপ্ত আবির্ভূত হয়ে এই শাখায় নতুন প্রাণরস সঞ্চার করলেন। নিতান্ত অল্পবয়সে ১৮৩১ সালে সহায়সম্বলহীন ও ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষাবর্জিত ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করে বাংলা সাময়িক পত্রিকার নতুন পথের সন্ধান দিলেন। এতদিনে যথার্থ বাঙালীর পত্রিকা প্রকাশিত হল। তিনি সাধারণ অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, ইংরেজী কিছুই জানতেন না, অথচ কোন কোন ব্যাপারে, বিশেষত পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে বিস্ময়কর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য 'সংবাদ প্রভাকর' দ্বিসাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় ও আধুনিক শিক্ষাপ্রচারে ঈশ্বর গুপ্ত যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলা-দেশ, সমাজ, সাহিত্য-সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা তাঁর পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাই তাঁকে বাংলা বার্তাজীবীদের গুরু বলা হয়।

এ যুগের সাময়িকপত্রে ধর্ম, সমাজ ও রীতিনীতি সম্বন্ধে যে সমস্ত উত্তপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হত তা থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। ভবাণীচরণের রক্ষণশীল হিন্দু জীবনাদর্শ, রামমোহনের প্রগতিশীল ভারতসংস্কৃতিতে বিশ্বাস এবং আধুনিক 'ইয়ং বেঙ্গল'দের উগ্র মতবাদ তৎকালীন পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল—এই ত্রিধারায় তখন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন বইতে আরম্ভ করেছিল—এই মতামতের এবং দলাদলির মধ্যে সর্বশ্রেণীর বাঙালীর সুখপাঠ্য পত্রিকার প্রচলন করেন ঈশ্বর গুপ্ত, যাতে সামাজিক ও

সাময়িক আন্দোলনের খবরাখবর থাকলেও তার সঙ্গে সাহিত্যরসও ছিল প্রচুর। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত কোন কোন সময়ে স্থূল রুচির পরিচয় দিয়ে ফেলতেন, তখন অনুরূপ স্থূল রুচির পত্রিকা তাঁকে আক্রমণ করত। তাঁর রুচি থেকে অমার্জিত ভাব পুরোপুরি দূর হয়নি তা স্বীকার করতে হবে—যে অমার্জিত রুচির পরিচয় তাঁর অনেক কবিতাতেও পাওয়া যাবে। সে যাই হোক, এই উত্তপ্ত পরিবেশে ঈশ্বর গুপ্ত যে মাথা স্থির করে পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন, এর জন্য তিনি প্রশংসার্হ।

আর একদিক থেকে রামমোহনের সমকালীন সাময়িক পত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। আমরা বাংলা গদ্য-বিবর্তনের কথা বলছি। সাময়িক পত্রের আগে বা সমকালে রচিত বাংলা গদ্যের জড়তা ঘোচেনি, কিন্তু সাময়িক পত্রে ব্যবহৃত গদ্যের চাল অনেকটা স্বাভাবিক ও সহজ হয়েছিল। সাময়িক পত্রিকার পাঠক স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী; সুতরাং তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য পত্রিকার ভাষাকেও সরল ও চিত্তাকর্ষী করা হল। তার ওপর, পত্রপত্রিকায় ধর্ম ও সমাজ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হবার জন্য ভাষা খুব হাল্কা ও দ্বন্দ্বের উপযোগী হয়ে উঠল। যুদ্ধের পোষাক লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয়, বিতর্কের ভাষাও সরল হওয়া দরকার। তাই সে যুগের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দলাদলি ও গালাগালির ভাষা আশাতীত সরল হয়ে পড়েছিল। বাংলা গদ্যের সরলীকরণের প্রথম যুগের সাময়িক পত্রগুলির (১৮১৮-১৮৩৩) প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

নবম অধ্যায়

বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কাব্যে পুরাতন পালাবদলের কোন ইঙ্গিত ফুটে ওঠেনি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০) পর প্রায় শ'খানেক বছরের মধ্যেও নতুন কাব্যপ্রকরণের আবির্ভাব হয়নি—শুধু ভারতচন্দ্রীয় আদিরসের ফেনিল উচ্ছ্বাস, আর কবিওয়ালাদের উচ্চকিত উল্লাস বাংলা সাহিত্যের হাঁটুজলে ঘোলাটে বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি করেছিল। রঙ্গলাল এসে সর্বপ্রথম নতুন কাব্যবস্তুর নান্দী পাঠ করলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় আর মধুসূদন নতুন নতুন কুশীলবদের নিয়ে যে অভিনয় শুরু করলেন, পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার কোন যোগ রইল না। তবু দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত দু'জন কবি পুরাতন কাব্যধারাকে সামান্য রূপান্তরিত করে বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১. ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি ও কাব্যকবিতায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইতিপূর্বে সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিখ্যাত সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক প্রতিভা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করেছি। কিন্তু কবিতায়ই ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ পরিচয় নিহিত রয়েছে। তাঁকে একাধিক সাময়িক পত্র পরিচালনা করতে হয়েছে, সংবাদপত্রের জঠর পূর্তির জন্য বহু কবিতা লিখতে হয়েছে। তাই তাঁর কবিপ্রতিভার স্বভাবটাই হল সাংবাদিক ধরনের, সাময়িকতাই তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কলকাতার অদূরে কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর জন্ম হয়, অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় এবং যৌবনে স্ত্রীর বিশেষ কোন সাহচর্য না পাওয়ায় ঈশ্বর গুপ্তের মনের একটা দিক ধূসর হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর কাব্যে স্নেহভালোবাসার বড়ো একটা স্পর্শ পাওয়া যায় না। দরিদ্রের সন্তান ঈশ্বর গুপ্ত বাল্য বয়সে দারিদ্র্যের কশাঘাত খেয়েছিলেন। অর্থাভাবে সামান্য বাংলা লেখাপড়া শিখবার সুযোগটুকুও তিনি পাননি—ইংরেজী তো দূরের কথা। তবে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও আলাপী ছিলেন বলে প্রায় কিশোর বয়সেই তিনি কলকাতার অভিজাত ও

সংস্কৃতিবান সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর সহায়তায় নিতান্ত তরুণ বয়সে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন—এই 'সংবাদ প্রভাকরে'র মারফতে তিনি এযুগে সমগ্র বাঙালীর মনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, ইংরেজ শাসকও তাঁর পত্রিকার ও মতামতের মূল্য দিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর বিশেষ না থাকলেও জীবনের ব্যবহারিক ও বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর সাধারণ জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ ছিল। সে যুগের পক্ষে তাঁর কোন কোন অভিমত অতিশয় প্রগতিশীল মনে হবে। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধাবিশ্বাস ছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে প্রায়ই যোগদান করতেন, বেদান্ত তত্ত্বের প্রতি তাঁর অন্তরের আকর্ষণ ছিল। কেউ কেউ তাঁকে পুরাতন-পন্থী ও প্রায়-মূর্খ কবিওয়ালা বলে তাঁর কবিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করতে চেয়েছেন—একথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজী না জানলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়া থেকে দূরে ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন তিনি পছন্দ করতেন না, সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি সিপাহীদের চেয়ে ইংরেজদের বেশী গুণগান করেছিলেন এবং সিপাহীদের অরাজকতার চেয়ে ইংরেজদের শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনব্যবস্থার অধিকতর প্রশংসা করেছিলেন—একথা ঠিক বটে। কিন্তু সে যুগে বিধবাবিবাহকে অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিও তো সমর্থন করেননি, সিপাহীবিদ্রোহকেও সে যুগের রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই একবাক্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান বলে স্বীকার করতে চাননি। সুতরাং সেই একই মনোভাব পোষণ করার জন্য ঈশ্বর গুপ্তকে পুরাতনপন্থী বলা ঠিক হবে না। কবিতায় এবং 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি ইংরেজী শিক্ষা, ভারতীয় রীতিতে স্ত্রীশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রগতিশীল ব্যাপারের সর্বদা সমর্থন করেছেন। তবে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি তাঁর মনঃপূত ছিল না। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি যেমন বরদাস্ত করতে পারতেন না, তেমনি রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দলবলের পুরাতন প্রথা আঁকড়ে ধরার পাগলামিও সমর্থন করতেন না। অনেকে তাঁর কবিতা পড়েন না, বা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধ চোখে দেখেননি; তাই তাঁকে নির্জলা পুরাতনপন্থী বলে নিন্দা করেন। কোন কোন দিকে তিনি প্রাচীন রক্ষণশীল ধরনেরই ছিলেন। কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেও সব সময় তিনি ভাঁড়ামি ও স্থূল রঙ্গরসের মলিনতা

ত্যাগ করতে পারেননি—রীতিমতো শিক্ষাদীক্ষা লাভ না করার জন্য স্বভাবদত্ত কবিপ্রকৃতি আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মার্জিত হয়নি। ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের হানিকর প্রভাব তাঁর কবিত্বকে অনেক সময় মাটি করে দিয়েছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁর মৌলিকতা স্বীকার করতেই হবে। প্রায় অশিক্ষিত হয়েও আধুনিক জীবনের ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, কবিতাতে পুরাতনপন্থী হয়েও বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা, স্বাদেশিক মনোভাব ও রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি এবং নতুন পুরাতনের যুগপৎ প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া তাঁর কবিপ্রতিভা ও মানসিক প্রবণতার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। তাই একই সঙ্গে তাঁর রচনায় ভাঁড়ামি ও গম্ভীরভাব লক্ষ্য করা যাবে। ঈশ্বর গুপ্ত যুগসন্ধিক্ষণের কবি—তাই উচ্চশিক্ষিত তরুণের দল তাঁকে বিশেষ প্রশংসা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বসু—নবযুগের অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন। এবার তাঁর কবিপ্রতিভার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা, প্রবন্ধাদি লিখতেন, গুপ্তকবিকে গুরু বলেই স্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রামাণিক কবিতাসংগ্রহ সম্পাদনা তাঁর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ। এর অনেক পরে ঈশ্বর গুপ্তের ছোট ভাইয়ের নাতি (ঈশ্বর গুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন) গুপ্তকবির সর্ববৃহৎ রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এই সমস্ত কাব্যসংগ্রহ থেকে দেখা যাচ্ছে, গুপ্তকবি ঈশ্বর ও নীতি, প্রকৃতি, প্রেম, স্বদেশপ্রেম ও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে অসংখ্য কবিতা লিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করেছিলেন, যার অতি অল্পই রক্ষা পেয়েছে। যেটুকু রক্ষা পেয়েছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, জীবনের রঙ্গরসে আকণ্ঠ-মগ্ন কবি ঈশ্বর, নীতি ও প্রকৃতি বিষয়ে কয়েকটি গম্ভীর ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। স্বভাবতই ঈশ্বর ও নীতিতত্ত্ব-বিষয়ক কবিতার প্রতি আধুনিক কালের পাঠক বিরূপ হবেন। কাব্যের আলোচনা থেকে সহজেই নীতি ও নির্গুণ ঈশ্বর বিষয়ক কবিতা বাদ দেওয়া যায়। কারণ নিছক নীতি-উপদেশ কোনক্রমেই কাব্যরূপ লাভ করতে পারে না। নির্গুণ ঈশ্বরচেতনা ধার্মিকের ধ্যানধারণার বিষয়, যথার্থ কাব্যে তার স্থান স্বতঃই সঙ্কুচিত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ঈশ্বরকে পিতা রূপে দেখে বাপ-ছেলে সম্পর্ক নিয়ে যে কবিতাগুলি লিখেছেন, তার আন্তরিকতা আমরা স্বীকার করি। তাতে কবির ব্যাকুল হৃদয়ের কামনাই ধরা পড়েছে।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করে কলকাতার জীবনে বসে তিনি প্রকৃতির যে মূর্তি উপলব্ধি করেছেন, তার রঙ্গ-পরিহাস অতিশয় উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রেম-প্রণয় ঘটিত যে কবিতাগুলি লিখেছেন, সেগুলি গতানুগতিক, কৃত্রিম এবং স্থানে স্থানে হাস্যকর হয়ে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ঈশ্বর গুপ্ত যৌবনে স্ত্রীর সাহচর্য পাননি বলে প্রেম-প্রণয়ের কবিতাগুলি এতটা শূন্যগর্ভ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এ মত গ্রহণযোগ্য বটে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য, যে-কবি রোমান্টিক, আবেগপ্রবণ, আত্মসংহত—প্রেম-প্রণয় তাঁর কাছে একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং প্রবল আবেগ রূপে দেখা দেয়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত মূলত বাস্তব জীবনের কবি, রঙ্গব্যঙ্গের কবি। আবেগপ্রবণতা রঙ্গব্যঙ্গের ঘোর শত্রু। কাজেই ঈশ্বর গুপ্তের প্রেমের কবিতার নায়িকা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'বান্দরী'-তে পরিণত হয়েছে। প্রেম তাঁর কাছে হাস্যকর শিরঃপীড়া ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমের গুটি-কয়েক কবিতা সত্যিই প্রশংসা দাবি করতে পারে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেমের কবিতা ক'টি রচিত হয়েছিল—তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপক আকারে ছিল না বললেই চলে। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতারা অবশ্য পাশ্চাত্ত্য স্বাদেশিকতার আদর্শে স্ফীত হয়ে ইংরেজী বক্তৃতা ও পত্রিকায় স্বদেশপ্রেমের অগ্নিবন্যা বইয়ে দিতেন, কিন্তু জনসাধারণ এই সব ইংরেজী ব্যাপারের বড়ো একটা ধার ধারত না। তারা ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেমের কবিতা পড়েই অনুপ্রেরণা পেত। জননী ভারতভূমিকে তাঁর আগে এভাবে কেউ ডাকেনি :

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে ?

কিংবা :

মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।

অথবা বহুপ্রচলিত সেই পংক্তি কয়টি :

মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণাক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অভিনন্দিত করেন, তাই কোন কোন সময়ে কবিওয়ালাদের দোসর জেনেও নবীনের দল তাঁকে গুরু বলে বরণ করেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কবিতার ইতিহাসে যে স্মরণীয় হয়েছেন, শুধু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নয়। ওতে তাঁর স্বাদেশিক ও আদর্শবাদী মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিভা যথার্থ মুক্তি পেয়েছে তদানীন্তন সমাজজীবনকে ব্যঙ্গ করে লেখা হাস্যপরিহাস ও কৌতুকের কবিতাগুলিতে। এর মধ্যে তাঁর সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, বাস্তব চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা, অসঙ্গতির প্রতি হাস্য ও ব্যঙ্গের লবণছিটে দেওয়া, মিশনারী, ইয়ং বেঙ্গল, পুরাতনপন্থী, বিধবাবিবাহ প্রচারক, মেয়েদের উগ্র বিবিয়ানা—এসব ব্যাপার তাঁর লেখনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। এখানে সেই সমস্ত অম্লান্ত মন্তব্যের কিছু কিছু উদ্ধার করা যাচ্ছে।

খ্রীস্টান সভ্যতা ও তার অনুকারকদের ব্যঙ্গ :

ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেক' ঋষিকৃষ্ণ জয়
মেরি দাতা মেরিসুত বেরি গুডবয়॥

ইংরেজী শেখা মেয়েদের বিবিয়ানার প্রতি মন্তব্য নিক্ষেপ :

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে॥
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে॥

'ইয়ং বেঙ্গল' অর্থাৎ হিন্দু কলেজের কালাপাহাড়ী ছোকরাদের নিয়ে তামাসা :

সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কানে লাগায় ফোঁস-ফোঁসনা।
এরা না-হিঁদু না-মোসলমান ধর্মধনের ধার ধারে না॥

মেমসাহেবের বর্ণনা :

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে রাঙামুখো সাহেবদের নামে নালিশ :

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিং বাঁকানো কেবল খাব খোল-বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা।
গামলা ভাঙে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব ঘুঁসি খেলে বাঁচব না॥

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ :

অগাধ সাগর বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূল পেল না॥

* * * *

সে যে অকূল সাগর দারুণ ডাগর কালাপানি বড় লোনা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল তখনি গিয়েছে জানা॥

এ ছত্রগুলি রঙ্গব্যঙ্গের তির্যকতার জন্য এখনও বেঁচে আছে। তাঁর কোন কোন উক্তি প্রায় সূক্তির আকারে চলেছে। যেমন—'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা', 'শয্যায় ভার্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়,' 'ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে' (বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত), 'কসাই অনেক ভালো গোঁসাইয়ের চেয়ে,' 'এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা, নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়েবংশে বোকা', 'এই কালোর ভিতর আলো আছে ভালো করে দেখ জেলে,' 'বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে,' 'ধর্মতলা ধর্মহীন গোহত্যার ধাম', 'সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে দাঁস্যি ভেড়ে নস্যি কর তারে' (সিপাহী বিদ্রোহের নানাসাহেব)। এরকম তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ পংক্তি তাঁর অজস্র আছে।

ঈশ্বর গুপ্ত করুণ, গভীর স্নিগ্ধরসের কবি ছিলেন না, আবেগের ছিলেন পরম শত্রু। জীবনের নানা অসঙ্গতির প্রতি অম্লমধুর ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপে তিনি ছিলেন সব্যসাচীর মতো অব্যর্থলক্ষ্য। ভাবাবেগে-আর্দ্র বাংলা সাহিত্যে তিনি বুদ্ধির চমক এনেছেন, এলায়িত প্রেম-প্রণয়ের স্থলে সামাজিক জীবনের হাস্যকর চিত্র এঁকেছেন—এর জন্য তিনি বাংলা কাব্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ড্রাইডেন সম্বন্ধে বলা হয় *libritium invenity, marmoream peliquit*—অর্থাৎ ইটের

টুকরোকে তিনি মার্বেল পাথরে পরিণত করেছিলেন। কোন কোন দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গে উক্ত লাতিন প্রবচনটি প্রযুক্ত হতে পারে, কারণ ভারতচন্দ্র ও পোপ-ড্রাইডেনের সঙ্গে গুপ্ত-কবির মনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মাইকেল ও ঈশ্বর গুপ্ত—দু'জনে যেন দু' মেরুপ্রান্তের অধিবাসী, তবু তাঁকে সম্বোধন করে মাইকেল চতুর্দশপদী কবিতায় লিখেছিলেন ঃ

> আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে
> জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলে হরষে ;
> যমুনা হয়েছে পার, তেঁই গোপগ্রামে
> সবে কি ভুলিল তোমা ?

তাঁর মৃত্যুর পরে অনেকে তাঁকে ভুলতে বসেছিল, এইজন্যই মধুসূদন গুপ্ত-কবির স্মৃতির প্রতি খেদ প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "মনুষ্যহৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না ; সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না।" একথা ঠিক বটে, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটি মন্তব্যও অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—"যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।...ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যই ঈশ্বর গুপ্তের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।

২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)

মদনমোহন তর্কালঙ্কার পুরাতন রীতির শেষ কবি। ১৮৫৮ সালে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান হয় (১৮৫৯), আর সেই সময়ে নব-দিগন্তে নবীন মাইকেলের আবির্ভাব। এ যেন ওষধিনাথ চন্দ্র অস্ত গেলেন এবং অরুণসারথি সূর্যের উদয় হল। মদনমোহন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, অধ্যাপনা ও সরকারী চাক্‌রীতে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুচর মদনমোহন রক্ষণশীল পরিবারে জন্মেও শুধু সমাজবিপ্লবী বন্ধুর (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর) সংস্পর্শে এসে কোন কোন দিকে প্রগতিশীলতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রভাবেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েন, মেয়েদের প্রকাশ্যে স্কুলে পড়িয়ে-

ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিদ্যাসাগরের মতো তিনি ঈশ্বরসত্তায় উদাসীন ছিলেন; নিরীশ্বরবাদী ছিলেন এমন কথা বললে ভুল হবে না। মেয়েদের তিনি উচ্চশিক্ষা দিলেও ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মভাব, আচারবিচার—কিছুই শেখাননি। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের যথার্থই মনের দোসর এবং উনিশ শতকের নব আন্দোলনের পূর্বসূরী। কিন্তু বড়োই পরিতাপের বিষয়, অন্যান্য বিষয়ে এতটা প্রগতিবাদী হয়েও, তিনি কাব্যকবিতায় ভারতচন্দ্রের গলিত আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। মাঝে একবার তাঁর ভারতচন্দ্রকে ছাড়িয়ে যাবারও ইচ্ছে হয়েছিল। 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৪) এবং 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬) নামে তাঁর দুটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তখনও তিনি যৌবনে পুরোপুরি পদার্পণ করেননি। সুতরাং কাব্য দুটিতে যদি কিছু চপলতা ঘটে থাকে, তবে তিনি ক্ষমার্হ।

প্রথম যুগে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে আদিরসাশ্রিত কাব্যকবিতার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যাদর্শই তখন তাঁকে পাগল করে দিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র মদনমোহন তখন আদিরসাত্মক পুরাতন ধরনের রচনায় ভারতচন্দ্রকে গুরু করে গুরুকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'শীর্ষক আদিরসাত্মক নায়ক-নায়িকা-প্রকরণের অনুকরণে মাত্র সতের বছর বয়সে মদনমোহন 'রসতরঙ্গিণী' লিখে এবং ছাপিয়ে অকাল-পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আদিরসের ওপর নির্ভর করে পুরানো ছাঁদে কিশোর-কবি নায়ক-নায়িকার বর্ণনা দিয়ে ছোট কাব্য লিখেছিলেন।

শুধু মুখামুখি নয়নে তব
যদি যুবজনা মোহিত সব।
তবে বল দেখি কি ফল দেখে
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে॥

এটুকু প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকের ("লোচনে হরিণগর্বমোচনে মা বিভূষয় কৃষ্ণাঙ্গি কজ্জলৈঃ") কাঁচা রকমের অনুবাদ। এর দু' বছর পরে তিনি সংস্কৃত গদ্য-রোমান্সের প্রাচীন লেখক সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' অবলম্বনে অনেকটা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র অনুকরণে 'বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করেন। এর কাহিনীটিতে এমন কিছু মৌলিকতা নেই, প্রায় বিদ্যাসুন্দরের অবিকল অনুকরণ। ভাষা ও ছন্দেও উনিশ বছরের তরুণ কবি বিদ্যাসুন্দরের মোহ ছাড়তে পারেননি, এমন কি নবীন বয়সের ঔদ্ধত্যবশত তিনি মনে করেছিলেন, রচনার উৎকর্ষে ভারতচন্দ্রকেও

পরাজিত করবেন, নচেৎ আর কাব্যই লিখবেন না। সুখের বিষয় তিনি ভারতচন্দ্রকে পরাজিত করতে পারেননি, এবং প্রতিজ্ঞা মতো কাব্যরচনা পরিত্যাগ করেছিলেন—শুধু শিশুপাঠ্য দু'চারিটি কবিতা ছাড়া। যদি তিনি সফল হতেন তা হলে উৎসাহের আধিক্যে আরও কত যে অপদার্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করতেন তা ধারণা করা যায় না। ভারতচন্দ্রকে পরাজিত করা দূরে যাক, তিনি বিদ্যা-সুন্দরের ভাবভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিমার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করে 'বাসবদত্তা' লিখেছিলেন। বলাই বাহুল্য নকল কখনও আসলের সমতুল্য হতে পারে না, ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি ও রচনাকৌশল তাঁর ততটা আয়ত্ত হয়নি, শুধু হয়েছিল অনাবৃত আদিরসের বর্ণনাটুকু; তা সেটুকু তিনি মন খুলে লিখেছিলেন।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে এবং নবজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে মদনমোহন প্রথম-যৌবনে-লেখা এই সমস্ত আদিরসাত্মক রচনার জন্য লজ্জাবোধ করেছিলেন এবং এর প্রচার রহিত করে দিয়েছিলেন। প্রগতি-শীল মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি যদি পুনরায় কাব্যরচনায় অবতীর্ণ হতেন, ত হলে হয় তো তাঁর সিসৃক্ষু কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষা ও সমাজসংস্কার নিয়ে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে, কাব্যরচনার প্রবণতা তাঁর মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

এখানে আমরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পুরাতন রীতির কাব্য প্রকল্পের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা কাব্যে যথার্থ যুগান্তর শুরু হয়। সেকথা পরে আলোচনা করা যাবে।

দশম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের নবজাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্য সাময়িক পত্রিকা ও বিতর্কসঙ্কুল আন্দোলনের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল, প্রশস্ততর সাহিত্যকর্মে তখনও তার বিশেষ ডাক পড়েনি। কারণ সেটা হল সামাজিক ভাঙাগড়ার যুগ। নানা সমস্যায় সাধারণের মন তখন উদ্বিগ্ন, নানা চিন্তায় সকলে জর্জরিত। সেই সমস্যা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় এ যুগের সাময়িক পত্রের পত্র-মর্মরের মধ্যে শোনা যাবে। তবে এই পর্বেই এমন দু'জন গদ্যনিবন্ধকারের আবির্ভাব হল যাঁরা বাংলা মননশীল গদ্যসাহিত্যের দিকপাল বলে গণ্য হবার যোগ্য। তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। অবশ্য তাঁদের অধিকাংশ রচনা ও গ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ-মানসিকতার সঙ্গেই তার আন্তরিক যোগ। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তারাশঙ্কর তর্করত্নের গদ্যরচনারও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করব। কারণ একসময়ে তাঁর ঝঙ্কারমুখর গমগমে ভাষাভঙ্গী পাঠকসমাজে কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১. অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

সত্যিকথা বলতে কি, অক্ষয়কুমার দত্তকে আবেগব্যাকুল বাঙালীসমাজের ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। সারা জীবন তিনি শুষ্ক জ্ঞানের সাধনা করেছেন, বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির চর্চা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে এই জ্ঞানতাপস বুদ্ধিজীবী বাঙালী-মানসের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিবেক ছাড়া তিনি আর কারও দাসত্ব করেননি। বাল্যকালে কলকাতায় নীত হয়ে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রাথমিক পরিচয় লাভ করেন, তারও আগে গ্রাম্য পাঠশালায় অঙ্ক কষতে কষতে এই বালকের মনে এক প্রশ্ন জেগেছিল—পৃথিবীটার চৌহদ্দির পরিমাণ কত? পরবর্তী সারা জীবন ধরে তিনি স্থূল বস্তুপৃথিবী ও সূক্ষ্ম মনোলোকের চৌহদ্দি সন্ধান ও পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। জেফ্রয় নামে এক সুপণ্ডিত জার্মান শিক্ষকের কাছে প্রথম যৌবনে তিনি গণিত, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনাদি শিক্ষা করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে ব্রহ্মবাদী ঈশ্বরতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার অলৌকিকতা বর্জন করেছিলেন, এমন কি হিন্দুর একান্তমান্য বেদ-উপনিষদ্‌কেও তিনি অভ্রান্ত শাস্ত্র বলে স্বীকার করেননি। প্রথম যৌবনে তিনি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতোই একখানি আদিরসের উগ্রধরনের কাব্য ('অনঙ্গমোহন') রচনা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে লজ্জাতুর চিত্তে এমনভাবে এর প্রচার রহিত করেছেন যে, এর কোন কপি কোথাও পাওয়া যায়নি। পরে ঈশ্বর গুপ্ত ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংস্পর্শে এসে অক্ষয়কুমার সাংবাদিকসুলভ বাংলা গদ্য নিবন্ধ লিখতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে গুপ্তকবির মারফতে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পাত্র জেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকপদে নিয়োগ করেন (১৮৪৩)। এর ফলে তিনি নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সুযোগ পেলেন, সেই প্রবন্ধগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রমাণমূলক বাস্তব দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তিনি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। যা অলৌকিক ও আপ্তবাক্য, তাকে তিনি কোনও দিন মানতে পারেননি। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিৎ আলেকজাণ্ডার কুম্বের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি অশনে-বসনে ও আচার-আচরণে বিশুদ্ধ সংযম অভ্যাস করেন, এমনকি সর্বপ্রকার আমিষ ত্যাগ তাঁর জীবনের ব্রত হয়েছিল। শরীর বিকল হয়ে পড়লেও তিনি সুকঠোর সংযম পরিত্যাগ করেননি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিনত ভাবাদর্শ তিনি সব সময়ে মেনে চলতেন না, 'তত্ত্ব-বোধিনী'র প্রবর্তক মহর্ষির সমস্ত কথা তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করতেন না। মহর্ষির বেদ-উপনিষদে গভীর নিষ্ঠা তিনি মানতে পারেননি, বৈদিক সাহিত্যকে তিনি মানুষের রচিত, সুতরাং অভ্রান্ত নয়, সর্বথা গ্রহণীয়ও নয়—এরকম সাংঘাতিক কথাও বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানবাদী ঊনবিংশ শতাব্দীর সার্থক প্রতীকপুরুষ।

অক্ষয়কুমার অনেকগুলি স্কুল পাঠ্যশ্রেণীর পুস্তিকা লিখেছিলেন। যথা—'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ', (তিন খণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)। গ্রন্থগুলি মূলত বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে ছাত্রদের জন্য রচিত। সুতরাং সরলতা ভিন্ন এর আর বিশেষ কোন গুণ নেই। অবশ্য বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক নতুন

তথ্যের সমাবেশ হওয়াতে শিক্ষাবিস্তারে এগুলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৫১, ১৮৫৩) গ্রন্থটি কুম্বের *The Constitution of Man* (1828) অবলম্বনে রচিত হয়েছিল, লেখক প্রয়োজন স্থলে পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতির স্থানে ভারতীয় রীতি-নীতির প্রয়োগ করে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরবৃত্তির সংযোগ বিচার করেছেন। 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থটিও কুম্বের *Moral Philosophy* অবলম্বনে রচিত—এতে তিনি জড়জীবন ও ঈশ্বরতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন। 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) স্কুল পাঠ্যশ্রেণীর গ্রন্থ হলেও এতে বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ বেশ নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম খণ্ড—১৮৭০, দ্বিতীয়—১৮৮৩) উইলসন সাহেবের *The Religious Sects of the Hindoos* গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হলেও এতে তথ্যগত অনেক মৌলিক আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থে ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীন ও আধুনিক, শ্রদ্ধেয় ও ঘৃণ্য—যাবতীয় সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০১ সালে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রাচীন হিন্দুদিগের নৌযাত্রা' নামে প্রকাশিত হয়, তাঁর লেখা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধকে তাঁর পুত্র বর্ধিতায়তনে এই নামে প্রকাশ করেন। এতে প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব থেকে প্রাচীন হিন্দু-ভারতবর্ষের নৌযাত্রা ও নৌবাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সরলভাষায় ব্যাখ্যা-বর্ণনা করে অক্ষয়কুমার তরুণ সমাজের মহদুপকার করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অনুবাদ করলেও সে অনুবাদ সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাঁর ভাষা-ভঙ্গিমা কিছু নীরস ও গুরুভার। সংস্কৃত অভিধান থেকে আহৃত কঠিন শব্দের ব্যূহসজ্জার জন্য এ ভাষা কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। সন্ প্রত্যয়ান্ত অনেক শব্দ তিনি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এরকম শব্দ ব্যবহার তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সেই সমস্ত ভারী ভারী শব্দের অনুকরণকে পরিহাস করবার জন্য সে যুগের কলকাতার সমাজে তাঁকে 'চিড়্‌চিমিসা' বলে উল্লেখ করা হত। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে, তাঁকে এমন সমস্ত চিন্তাগ্রাহ্য ব্যাপার বাংলা ভাষায় আলোচনা করতে হয়েছিল, সে যুগের অপরিণত গদ্যে যার সুষ্ঠু প্রকাশ সহজ ছিল না। উপরন্তু নির্বস্তুক ব্যাপার (abstract) আলোচনার উপযোগী পরিভাষা তখনও বাংলা গদ্যে চালু হয়নি। কাজেই তাঁর ব্যবহৃত নতুন শব্দ কখনও কখনও

একটু উদ্ভট মনে হয়। তবু তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরি করতে গিয়ে পিছপাও হননি, সংস্কৃত মূল ধাতু ধরে যথাসম্ভব ভারতীয় ধরনের শব্দ তৈরি করেছিলেন—যার কিছু কিছু এখনও ব্যবহৃত হয়। আর একটা কথা, তাঁর প্রথম জীবনের ভাষারীতি যতটা জড়তাপূর্ণ, পরবর্তী যুগের ভাষা ততটা নয়। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র ভাষাকে আমরা মননিষ্ঠ নিবন্ধের আদর্শ ভাষা বলে মনে করি। তাঁর সরল গদ্যরীতির একটু নমুনা উদ্ধৃত করি :

> কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও যত পদবৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসা-রূপ অগ্নিশিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ-প্রকার উৎপাতে পতিত করে। তাহারা প্রচুর ধনশালী হইয়াও সতত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন-যাপন করে। সন্তোষ যে এরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ, ইহা তাহারা অবগত নহে। সন্তোষ যেমন সুখজনক, অসন্তোষ তেমনি দুঃখজনক।

এ ভাষা কোন দিক থেকেই নিন্দনীয় নয়। অবশ্য তাঁর হালকা চালের প্রসন্ন ধরনের কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি অতি চমৎকার ও সরস। অধুনা 'রম্যরচনা'র সৌখীন লেখকেরা যে-কোন চিন্তাগ্রাহ্য গুরুতর ব্যাপারের প্রতি স্বাভাবিক অনীহা বোধ করে থাকেন। বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধনিবন্ধে তাঁদের রুচি নেই। তাই কেউ কেউ অক্ষয়কুমারের গদ্যের প্রতি কিছু উন্নাসিক ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ অনুধাবন করলে তাঁকে চিন্তামার্গে'র একজন অমিত শক্তিধারী প্রাবন্ধিক বলে স্বীকার করতে হবে।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর গত শতাব্দীর একটি প্রচণ্ড বিস্ময়রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর বিচিত্র জীবনকথা, অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি—এ সমস্ত আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। মেদিনীপুরের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি বাঙালীর হৃদ্‌পদ্মে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি ইংরেজী ভাষাতে অদ্ভুত কুশলতা অর্জন করেছিলেন, তাঁর মতো শেক্‌স্‌পীয়র আবৃত্তি খুব কম লোকেই করতে পারত। ইংরেজীতে লেখা তাঁর 'এডুকেশন রিপোর্ট'গুলি যে-কোন ব্রিটনের ঈর্ষা উদ্রেক করবে। শিক্ষা, বিশেষত আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিধবাবিবাহ

প্রচার, বহুবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি যে বীর্যবান পৌরুষ ও হৃদয়বান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, গোটা বাংলাদেশে তার সমতুল্য কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। তাঁর মধ্যে পুরাতন বাঙালিয়ানা ও নবীন য়ুরোপিয়ানার যে বিস্ময়কর সমন্বয় হয়েছিল তার কথা দেশবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ রেখেছেন। ধর্মীয় আচার-বিচারে ত'ার বড়ো একটা আসক্তি ছিল না, সকলের ওপরে তিনি মানতেন মানবধর্ম। মানবতাই ত'ার জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। এদিক থেকে এই সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ অগুয়েস্ত কোঁৎ, মিল, বেন্থাম ও জেরিমি টেলরের ভাবশিষ্য। ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে উদাসীন হয়েও তিনি বাস্তব মানুষকেই দেবতা বলে মনে করতেন। বাঙালী জাতিকে তিনি মানবপ্রেমে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রেমের সঙ্গে বীর্য, আবেগের সঙ্গে পৌরুষ, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম—এর আশ্চর্য মিলন ত'ার মধ্যে সার্থক হয়েছে। বিদ্যাসাগর যেন গ্রহান্তরের কক্ষপথ থেকে ছিটকে এসে পড়েছিলেন উনিশ শতকের বাংলা দেশে। ত'ার জ্যোতির্ময় অগ্নিবলয়ের দিকে আমরা চেয়ে থাকতে পারিনি, ত'ার প্রচণ্ড পৌরুষ ও প্রশস্ত হৃদয়ের সবটা অবধারণ করবার মতো মানসিক আধার আমাদের তখন ছিল না, এখনও কি আছে? তাই ত'ার মহৎ কাজকে আমরা পদে পদে পণ্ড করতে চেয়েছি, ত'ার মানবপ্রেমের সুযোগ নিয়ে ত'াকে আমরা বঞ্চনা করেছি—নানাভাবে ত'ার কাছে উপকৃত হয়ে ত'াকে কৃতঘ্নতা উপহার দিয়েছি। তাই এই মহাপুরুষ শেষ জীবনে কিছু মানববিদ্বেষী, বিশেষত তথাকথিত ভদ্রসমাজের ভণ্ডামির ঘোর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহন বাঙালীর মন-বুদ্ধিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে এ জাতির মূঢ়তার চটকা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর এই হতভাগ্য জাতির চরিত্রে, প্রেম ও পৌরুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন—কেউ-ই পুরোপুরি সফল হননি। রামমোহন যেমন সাহিত্যের মধ্যে নিজের কিছু পরিচয় রেখে গেছেন, তেমনি বিদ্যাসাগরের গদ্য নিবন্ধাদির মধ্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় রয়ে গেছে। এখানে আমরা ত'ার সেই দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

বাংলা গদ্যের জনকত্ব নিয়ে প্রায়শই সুধীমহলে খর তর্কের ঝড়তুফান উঠে থাকে। কেউ বলেন, রামমোহন বাংলা গদ্যের জনক। কারও মতে, সে গৌরব বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য, কেউ-বা বলেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা সেই গৌরব দাবি করতে পারেন, কারণ ত'ারাই সর্বপ্রথম গদ্য গল্পকাহিনী ও ইতিহাস রচনা করেন, এবং সেইগুলিই হচ্ছে প্রথম মুদ্রিত

গদ্যসাহিত্য। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের বহু পূর্বেই বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল, চিঠিপত্রাদিতে বাংলা গদ্যের ব্যবহার সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতেই পাওয়া যাবে। সুতরাং উল্লিখিত কেউ-ই বাংলা গদ্যের জনকত্ব দাবি করতে পারেন না, বরং তাঁদের পোষ্টা বলা যেতে পারে। তবে এরই মধ্যে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক না হলেও শিল্পসম্মত গদ্যরীতির উদ্ভাবয়িতা, তা তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ-গ্রন্থগুলির ভাষা দেখলেই বোঝা যাবে। তাঁকে আবার কেউ কেউ অনুবাদক বলে কিঞ্চিৎ কৃপা করে থাকেন। এ কথাও হাস্যকর। তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থ মৌলিক সাহিত্যের মতো একপ্রকার নতুন সৃষ্টি। এ ছাড়াও তাঁর মৌলিক পুস্তিকাগুলিতে গদ্যরীতির সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। বাঙালীর গদ্যসাহিত্যের দ্রুত উন্নতি ও শিক্ষা প্রচারকল্পে মৌলিক রচনাশক্তিকে সংহরণ করে তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে অনুবাদকার্যে নিয়োগ করতে হয়েছিল। অলস সাহিত্যচিন্তা এই কর্মযোগী মহাপুরুষের আদৌ রুচিকর ছিল না। সম্ভবত তিনি 'art for art's sake' নীতিতে ততটা বিশ্বাসী ছিলেন না। জনকল্যাণ সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য—তাঁর মতো জনহিতব্রতীর এরকম অভিলাষ থাকাই সম্ভব। কাজেই নিজের আনন্দের জন্য কোন কিছু লেখার প্রেরণা তিনি চাননি—এ বিষয়ে তিনি অতিশয় pragmatic ছিলেন—বস্তুর উপযোগ দিয়ে বস্তুর মূল্য বিচার, ব্যবহারিকতাই জগতের বস্তুব্যাপার ও জ্ঞানব্যাপারের একমাত্র নিদান, উপযোগবাদের (pragmatism) ভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রও তাই মনে করতেন—নিছক সাহিত্যসৃষ্টির চেয়ে লোকহিতসাধনে সাহিত্যের ব্যবহার সমস্ত শিল্পচেতনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর এ মত ভালো হোক, মন্দ হোক —বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করে শুদ্ধ সমাজের কল্যাণের অভিমুখে নিজের সাহিত্য-চেষ্টাকে চালিত করে-ছিলেন—এজন্য তিনি সমগ্র জাতির নমস্য।

বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনা অনুবাদমূলক, সংস্কৃত, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী থেকে স্বাধীনভাবে ভাষান্তর। ১৮৪৭ থেকে ১৮৯১ সাল প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৪৭ সালেরও পূর্বে তিনি ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে 'বাসুদেব চরিত' লিখেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বই মুদ্রিত হয়নি, এর পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'

(১৮৪৭) সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে নয়, হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' থেকে অনুবাদ। তখন তিনি হিন্দী ভাষা শিখছিলেন, সেই ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা করেছেন এই অনুবাদে। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের স্বচ্ছন্দ গদ্যানুবাদ, 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), ভবভূতির 'উত্তরচরিত' এবং বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আখ্যানের অনুসরণ, 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) শেক্‌স্‌পীয়রের *Comedy of Errors*-এর গল্পাংশের অনুবাদ—অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়রীয় বিদেশী কাহিনীটিকে দেশীয় পরিচ্ছদ দেবার জন্য নাটকের পাত্র-পাত্রীর নামধাম পালটে তিনি ভারতীয় নাম দিয়েছেন; ফলে বিদেশী কাহিনী একেবারে এদেশী রূপ ধরেছে। এগুলি হল বিশুদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থের অনুবাদ। কাব্য বা নাটকের অনুবাদে তিনি কিন্তু গদ্য আখ্যানের রীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে এগুলিতে একপ্রকার নতুন স্বাদ সঞ্চারিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি কয়েকখানি পাঠ্য গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন। যথা, মার্শম্যানের *History of Bengal*-এর কয়েক অধ্যায় অবলম্বনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), চেম্বার্সের *Biographies* ও *Rudiments of Knowledge* অবলম্বনে যথাক্রমে 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) ও 'বোধোদয়' (১৮৫১) এবং ঈশপের ফেবল্‌স্‌ অবলম্বনে 'কথামালা' (১৮৫৬) রচনা করেন। এ অনুবাদগুলি যথার্থ মৌলিক গ্রন্থের মতো মর্যাদা পেয়েছে—কোন কোনটি প্রায় ক্লাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে উঠে গেছে। তিনি জানতেন, অনুবাদ ভিন্ন অতি দ্রুত গদ্যভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করা যায় না। সেই-জন্য নিছক রসচর্চা ছেড়ে দিয়ে সারস্বত প্রতিভাকে তিনি অনুবাদকর্মে নিয়োগ করেছিলেন। সাহিত্য-গ্রন্থগুলির অনুবাদ স্বাভাবিক, সরস ও মূলানুগ হয়েছে—বলতে গেলে গদ্যানুবাদে তাঁর মতো কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে অতি অল্প অনুবাদকই দেখাতে পেরেছেন।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক পুস্তিকার সংখ্যাও কিছু কম নয়। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) বাঙালীর লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম খণ্ড—১৮৫৫, ২য় খণ্ড—ঐ) এবং 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১ম—১৮৭১, ২য়—১৮৭৩) শীর্ষক পুস্তিকাগুলিতে তাঁর অভ্রান্ত যুক্তি, তথ্যের সমারোহ এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ যথার্থ প্রাবন্ধিকের প্রতিভা সুপ্রমাণিত করেছে। যাঁরা তাঁকে শুধু অনুবাদক বলে তাঁর

সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে লঘু করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা এই মৌলিক প্রবন্ধ-পুস্তিকাগুলি পড়ে দেখেননি। তাঁর স্বরচিত জীবনচরিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১), এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (আনুমানিক—১৮৬৩) বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্ম হিসাবে অতীব সুখপাঠ্য হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীটি বাংলা জীবনী-সাহিত্যের সম্পদবিশেষ। দুঃখের বিষয় নানা কাজে ব্যস্ত বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন আত্মজীবনী রচনায় মনোনিবেশ করলেন, তখন নতুন সাহিত্যকর্মে বড় একটা স্পৃহা ছিল না, সময়ও ছিল না—তাই বাল্যজীবনের কাহিনী বলতে বলতে গ্রন্থ অর্ধপথেই থেমে গেছে। গ্রন্থটি শেষ হলে বাংলা সাহিত্যে একটি দুর্লভ ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করা যেত। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তাঁর বন্ধুর বালিকাকন্যা প্রভাবতীর শোচনীয় মৃত্যুশোকের বশে রচিত। তাঁর বিপুল মনস্বিতার অন্তরালে কতখানি স্নেহকাতর হৃদয় ছিল, তা এই ছোট্ট রচনাটি পড়লে বোঝা যাবে। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিপক্ষ খাড়া হয়েছিল, যাদের একমাত্র কাজ ছিল বিদ্যাসাগরের নামে অলীক কুৎসা প্রচার করা, তিনি ছদ্মনামে খানকয়েক পুস্তিকা লিখে সরস ও ব্যঙ্গের ভাষায় সেই সমস্ত প্রতিবাদকারীর হাস্যকর অভিমত ছিন্নভিন্ন করে বিতর্কমূলক রচনায় অতি স্বাদু লঘু রসের স্পর্শ দিয়েছিলেন। 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪) তিনখানি পুস্তিকা 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর নাম না থাকলেও অন্যান্য প্রমাণের বলে এগুলি তাঁর রচনা বলেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। প্রতি-পক্ষকে হাস্যকর রঙ্গব্যঙ্গের তির্যক আক্রমণে একেবারে ধরাশায়ী করে দেওয়ার বিচিত্র বিতর্কধারা সৃষ্টি তাঁর অবদান। এতে রঙ্গব্যঙ্গ থাকলেও স্থূলতা নেই, সহজ হাস্যপরিহাস থাকলেও গভীর ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অভাব নেই। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।" এ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত।

বাংলা গদ্যে যতি সন্নিবেশ করে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দ-বিন্যাস করে বিদ্যাসাগর তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন। বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে এরকম ধ্বনিঝঙ্কার ও স্বরবিন্যাস সম্ভব, তা তাঁর আগে প্রায়

কেউ-ই জানতেন না। তাঁর পরিকল্পিত সাধুভাষাই প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বাঙালীর লেখনীর মুখে ভাষা জুগিয়েছে। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।" রসগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এমন অপূর্ব মন্তব্য আর কেই বা করতে পারেন ?

এখানে আমরা বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলাম ঃ

১. একে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা ; তাহাতে আবার ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল। আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না।—বেতাল পঞ্চবিংশতি

২. লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে। এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।—সীতার বনবাস

৩. একথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই, তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি। কি লজ্জার কথা। আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি। অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। —ভ্রান্তিবিলাস

৪. এত বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই পৃথিবীতে অনেকের বুদ্ধি আছে ; কিন্তু খুড়র মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে, খুড়র আপদ-বালাই লইয়া এই দণ্ডে মরিয়া যাই ; খুড় আমার অজর, অমর হইয়া চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময় খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক ; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে সেটা বিষম টোকো ও পোকাখেকো।—আবার অতি অল্প হইল

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকেই একথা সহজেই বোঝা যাবে যে, বাংলা গদ্যের কাঠামো-নির্মাণে যাঁরা দায়ী থাকুন না কেন, এর শ্রী ও হ্রী—বিদ্যাসাগরের দান। শতাধিক বৎসর ধরে বাঙালী জাতি তাঁর গদ্যরীতিই অবলম্বন করে আসছে। আধুনিক কালে গদ্যের অনেক বৈচিত্র্য দেখা গেছে, কিন্তু পদান্বয় ও যতিবন্ধনে এখনও আমরা বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করতে পারিনি—যদি কেউ সে রকম দুঃসাধ্য চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেও থাকেন, তবু সে রীতি এখনও জনসমর্থন লাভ করতে পারেনি—জনবল্লভতা তো দূরের কথা।

৩. তারাশঙ্কর তর্করত্ন (মৃত্যু—১৮৫৮*)

বিদ্যাসাগরের কক্ষভুক্ত আর এক পণ্ডিত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন বাংলা গদ্যসাহিত্যে একখানি গ্রন্থের দ্বারা স্মরণীয় হয়ে আছেন। তারাশঙ্কর তর্করত্ন (চট্টোপাধ্যায়) অনূদিত 'কাদম্বরী' একদা শিক্ষিত বাঙালীর বিশেষ কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন হয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিকের কর্ম করার পর তিনি সরকারী স্কুল-পরিদর্শক নিযুক্ত হন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু না হলে বাংলা গদ্যসাহিত্য তাঁর রচনার দ্বারা অধিকতর উপকৃত হতে পারত। তাঁর দু'খানি কথাগ্রন্থ একদা পাঠকমহলে প্রচারিত ছিল। একটি 'কাদম্বরী' (১৮৫৪)—এটি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি বাণভট্টের গদ্যকাব্য কাদম্বরীর ভাবানুবাদ। অপরটি 'রাসেলাস' (১৮৫৭)—এটি ইংরেজ মনীষী ডক্টর জনসনের *Rasselas* নামে উপন্যাসের মর্মানুবাদ। এ ছাড়াও তাঁর দুটি পুস্তিকা ('ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'—১৮৫০ এবং 'পশ্বাবলী'র নব সংস্করণ—১৮৫২) প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য সেগুলির বিশেষ কোন খ্যাতি ছিল না। তাঁর রাসেলাসের অনুবাদও খুব একটা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি নয়, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হিসেবেই গ্রন্থখানির একটু মূল্য আছে।

তারাশঙ্কর স্মরণীয় হয়েছেন তাঁর 'কাদম্বরী'র জন্য। বাণভট্টের কাদম্বরী সপ্তম শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত গদ্যকাব্য, এখন যাকে কাহিনী-সংবলিত গদ্য-রোমান্স বলে। অপূর্ব ভাষাভঙ্গিমা, বিচিত্র রূপনির্মিতি, অদ্ভুত অলঙ্কৃতি, ধ্বনিব্যঞ্জনাময় সমাসবদ্ধ বাক্যপরম্পরা, প্রেম ও বিরহের আবেগপূর্ণ মানবরস বাণভট্টের 'কাদম্বরী'কে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অমূল্য ও অননুকরণীয়

* জন্মকাল জানা যায় না।

সম্পদে পরিণত করেছে। এর অনুবাদ দুঃসাধ্য কর্ম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত বাক্যকে সরল বাংলায় রূপান্তরিত করা যে কত দুরূহ, তা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। তারাশঙ্কর সেই প্রায় অসাধ্য কর্মকে সরল বাংলায় যথাসাধ্য সহজভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন। বস্তুত যাঁরা মূল 'কাদম্বরী' পাঠে ও রসগ্রহণে অপারগ, তাঁরা তারাশঙ্করের বাংলা কাদম্বরী থেকে মূলের খানিকটা স্বাদ পাবেন। তবে বাণভট্টের স্বাদ তারাশঙ্করে যে পাওয়া যাবে না তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তবু তিনি সংস্কৃত দীর্ঘবিলম্বিত বাক্যের বহর কমিয়ে দিয়ে সমাস-সন্ধির জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার ক'রে সকলের বোধগম্য ভাষায় মূল কাহিনীকে পরিচ্ছন্ন বেশ দিয়েছিলেন এবং সময় ও সুযোগমতো ভাষায় মধ্যে কিছু কিছু বাণভট্টের ঝঙ্কার রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সেযুগের অনেকেই এই ক্লাসিক গম্ভীর ভাষার প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, এই গ্রন্থ প্রকাশের অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি তখনও (অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে) প্রকাশিত হয়নি। তখন বাংলা গদ্যের দুটি প্রান্ত—একপ্রান্তে তারাশঙ্করের সংস্কৃত সন্ধি-সমাসে গমগমে গালভরা ভাষা, আর একপ্রান্তে প্যারীচাঁদ মিত্রের দুল্‌কি চালের আলালী ভাষা; একে অপরের বিপরীত। বঙ্কিমচন্দ্র এসে এ দুটির বাড়াবাড়ি পরিহার করে কথাসাহিত্যের যথার্থ ভাষা সৃষ্টি করেন। তা হলেও সংস্কৃত রোমান্সের জন্য তারাশঙ্করের ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। এখনও যাঁরা প্রাচীন সংস্কৃত গল্প আখ্যানকে আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রকাশ করেন (প্রবোধেন্দু ঠাকুর, সুবোধ ঘোষ, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী), তাঁরাও ক্রিয়াপদ ইত্যাদিতে চল্‌তি রীতি অনুকরণ করলেও সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার পরিত্যাগ করেন না, বাঙালীর কান সহ্য করতে পারে, এমন ঝঙ্কারমুখর ভাষাভঙ্গিমাতেও তাঁদের অনীহা নেই। কারণ প্রাচীন ভারতীয় জীবনের ভাবরস ফোটাতে গেলে ভাষায়ও তার কিছু স্বাদ গন্ধ চাই। তারাশঙ্কর হয়তো মূল কাদম্বরীর রূপ ও রস ততটা ফোটাতে পারেননি, কিন্তু তিনিই বাণভট্টকে বাংলাদেশে পুনরুজ্জীবিত ও জনপ্রিয় করেছিলেন, তা স্বীকার করতেই হবে।
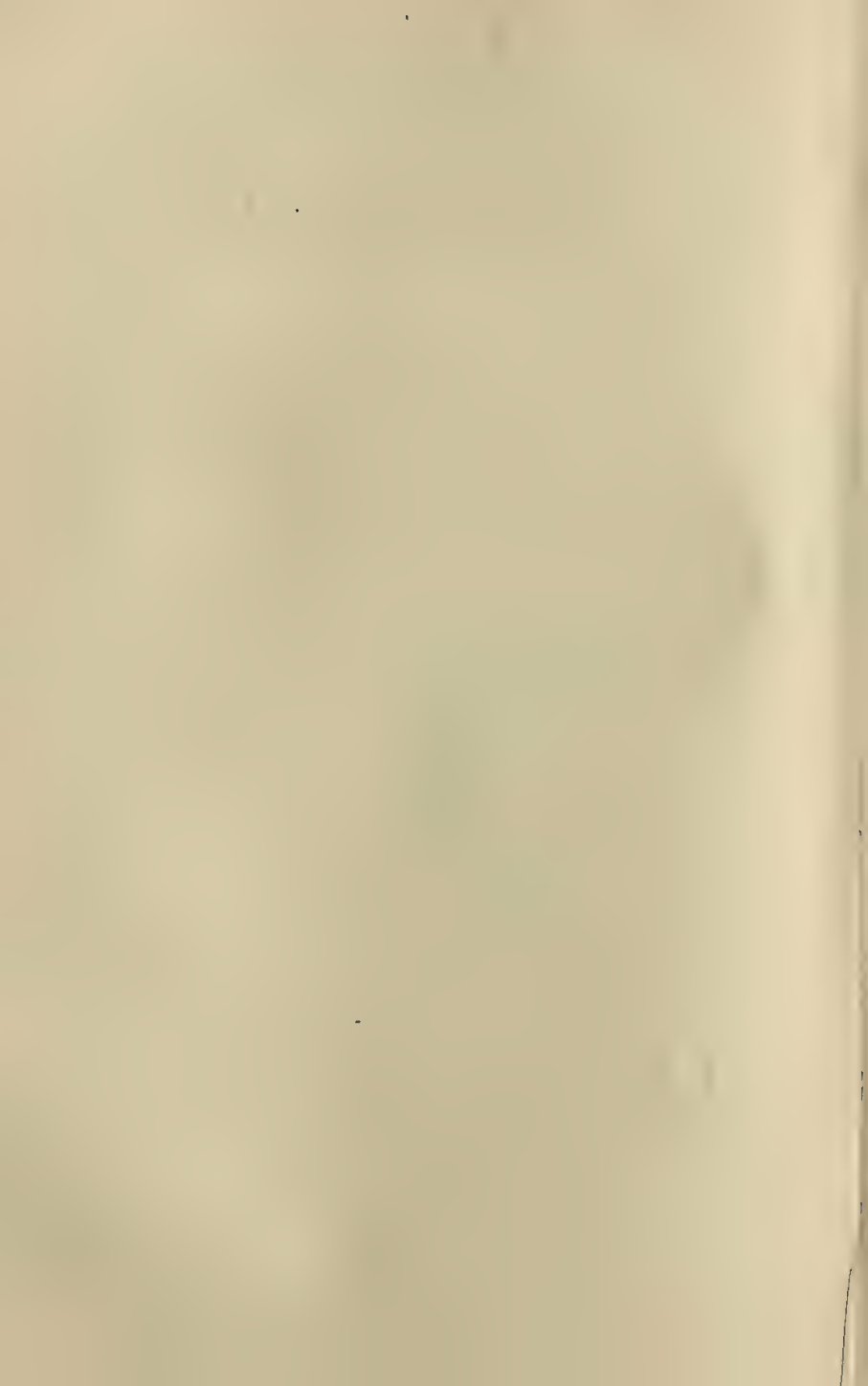
ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

একাদশ অধ্যায়

বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ

১. সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূচনা হয়। পূর্ববর্তী অর্ধে যার প্রস্তুতি ও প্রয়াস, দ্বিতীয়ার্ধে তার পূর্ণ বিকাশ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংঘাতে বাঙালীর মনে যে জাগরণ শুরু হল, তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যাপারে। বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর জীবন ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে চৈতন্যের বিস্ফোরণ অনুভূত হয়, তার সবটাই তদানীন্তন সাহিত্যে, বিশেষত গদ্যসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—রাজনৈতিক আন্দোলনের মারফতে জাতীয় জীবনের নবীন উদ্দীপনা। এই দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের প্রতি ক্রমে ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলল, শাসক ইংরেজের চণ্ডমূর্তি সিপাহী বিদ্রোহে অত্যন্ত নির্মমভাবে ধরা পড়ল, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে চব্বিশ পরগণা-যশোহর-নদীয়ার শুধু কৃষাণসমাজই নয়, কলকাতার উচ্চশিক্ষিত বাঙালী সমাজনেতা, দেশনেতা, সাময়িকপত্রের কর্ণধার—সকলেই একযোগে শ্বেতাঙ্গ বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। দেশীয় ভাষা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত সংবাদপত্র আগুন ছড়াতে লাগল। যাঁরা মনে করেছিলেন, 'সদাশয়, ইংরাজ বাহাদুর' দূর শ্বেতদ্বীপ থেকে এসে শুধু পরহিতৈষণা ও 'কালা আদমির' কল্যাণের জন্যই অতিকষ্টে রাজ্যভার বহন করে চলেছেন, অচিরে তাঁদের সে মধুর স্বপ্নের প্রাসাদ ধ্বসে পড়ল। যাঁরা বিশুদ্ধ সমাজ, অধ্যাত্মচেতনা প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরাও রাজনৈতিক উত্তেজনাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। কেশব সেনের 'ভারত সংস্কার সভা'য় (১৮৭০) গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন কামনা করা হয়েছিল, নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), মনোমোহন বসুর জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', আধুনিক যুবকদের 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' (১৮৭৬) প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনার এক নবদিগন্ত উদ্ঘাটিত হল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ('সোমপ্রকাশ'), ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সমাজনেতাদের

স্বাধীনতার আনুগত্য গ্রহণ, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগের কবিতা—সর্বত্র নবজীবনের হৃদ্‌স্পন্দন উপলব্ধি হতে লাগল।

অবশ্য তখন রাজনৈতিক জাগরণের পাশাপাশি সমাজজীবনেও নতুন উপলব্ধির বান ডেকেছে। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাস্তব সমস্যা নিয়ে আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শন'-গোষ্ঠীর হিন্দুধর্মের পুনর্জাগৃতির পরিকল্পনা —আত্মচেতনার সম্প্রসারণবোধ থেকে এ সমস্তই জন্ম লাভ করেছে। এমন কি ধর্মসম্পর্কীয় আন্দোলনও এই নবজাগ্রত চেতনারই বহিঃস্ফূরণ মাত্র। কেশবচন্দ্র প্রথমজীবনে স্ত্রীশিক্ষাদি বিষয়ক সামাজিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, পরে আবেগাপ্লুত ধর্মজিজ্ঞাসার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়কর রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিলেও শেষ জীবনে হিন্দুর নৈতিক-পৌরাণিক-তত্ত্ব এবং তার সঙ্গে ফরাসী দার্শনিক অগুস্তে কোঁত প্রবর্তিত Positivism-এর সমন্বয় সাধনে তৎপর হয়েছিলেন। তবু সমকালীন ঐতিহাসিক কালবিবর্তন, যা মূলত সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনাকে কেন্দ্র করে অগ্রবর্তী হচ্ছিল তাকে এঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতির সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতসভার অধিবেশন এবং ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গোড়ার দিকের আবেদন-নিবেদনমূলক দীনমূর্তির চেয়ে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও 'হিন্দুমেলার' কর্মাবলীতে অধিকতর স্বাদেশিক ভাব ফুটে উঠেছিল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন কলকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেসই বহু সংঘাত-সংঘর্ষের পর সমগ্র ভারতের প্রাণপ্রতীক রূপে গড়ে ওঠে।

এর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাবিত ধর্ম আন্দোলনের তাৎপর্যও স্বীকার করতে হবে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ধর্মীয় তত্ত্ব ও নেতৃত্বের অধিকার নিয়ে অল্পকালের মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে যায়, ফলে ব্রাহ্মসমাজ ও সম্প্রদায়ের সংহতি ও কর্মকুশলতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ইতিমধ্যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যচক্রের প্রভাবও ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেতে থাকে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের তিন দলই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, উপনিষদ্‌-বেদান্ত-খ্রীস্টতত্ত্বই সে একেশ্বর-

বাদের ভিত্তি। কাজেকাজেই এ'রা ছিলেন বহুদেববাদের ঘোরতর শত্রু এবং বহুদেববাদমূলক পৌরাণিক সাহিত্যের প্রতিও একান্তভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে পৌরাণিক প্রেরণার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর বিশ্বাস আবার ফিরে আসতে লাগল এবং আপ্তবাক্য ও ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির স্থলে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তিবাদ আধুনিক মনকে অধিকতর আকৃষ্ট করল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে যুক্তির ওপর শাস্ত্রসংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে জনচিত্তে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম একটি সমন্বয়ী সত্তা লাভ করল। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সামান্য পরিচয় নিলে দেখা যাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর সমগ্র সত্তা কীভাবে স্পন্দিত হয়েছিল। এখন সমকালীন গদ্যনিবন্ধাদির পরিচয় নিয়ে দেখা যাক, এই ভাবাবেগ গদ্যসাহিত্যকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল।

২. ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান স্থিতধী ভূদেব, প্রাজ্ঞ ভূদেব, ডিরোজিওর ভাবরসে বর্ধিত হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র ভূদেব—যিনি মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। বাল্যে কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। বাহ্যত প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের সঙ্গে নবীন য়ুরোপীয় জীবনবাদের প্রায় অহিনকুল সম্পর্ক। ভূদেব সমস্ত বিপরীত তরঙ্গবিক্ষোভ নিজে ধারণ করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মজীবন, লোকশ্রেয় জ্ঞান, সমাজ ও পারিবারিক আদর্শের একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানানুশীলন, সংস্কারমুক্ত আচরণ—ভূদেবের ব্যক্তিগত জীবনে এই দুই আদর্শ এক সূত্রে মিলিত হয়েছিল। এদিক থেকে তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর যথার্থ যুগনায়ক বলা যায়। এই শতাব্দীর শেষের দিকে কেউ বিকৃত ফিরিঙ্গী আদর্শ, কেউ-বা বিশুদ্ধ 'আর্যামি'র পাগলামি জীবনে গ্রহণ করতে গিয়ে ব্যর্থতার দিগন্তে ভেসে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভূদেব অসাধারণ মানসিক বলের জন্য পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের শুভ প্রভাব সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েও ভারতীয় সংস্কারের কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা করেননি। সামাজিক ও

পারিবারিক জীবনের যথার্থ সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও পরিবারের সম্বন্ধ কীভাবে শুভফলপ্রদ হতে পারে—ভূদেব নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে তার মীমাংসা করেছেন, এবং মন্ত্রদাতা গুরুঠাকুরের মতো শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ব্যক্তিগত জীবনে তার অনুশীলন করেছেন। তিনি জীবনপ্রত্যয়ের দিক থেকে বিচক্ষণ বাস্তববাদী ছিলেন। অবাস্তব ভাবাদর্শ—যা জীবনযাত্রার প্রতিকূল, তাকে তিনি বিশেষ আমল দেননি। বাঙালীকে আধুনিক জগতের সঙ্গে পরিচিত করে এবং মূল ভারতীয় বনিয়াদে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে তিনি জীবনচর্যার যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তা আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের এবং সামাজিক কল্যাণবোধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

কোন কোন বিষয়ে ভূদেবের বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ঔদার্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আজীবন তিনি শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু বাংলা নয়, বাংলার বাইরের প্রদেশেও তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত ঔদার্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তিনি বিহার প্রদেশের শিক্ষাবিভাগে কর্ম করতেন। সেখানে তিনি দেখলেন, সংখ্যাগুরু হিন্দীভাষী অঞ্চলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উর্দুভাষা প্রচলিত আছে। এই অন্যায় ব্যাপার তাঁর নিপুণ হস্তক্ষেপের ফলে উঠে গেল, বিহারে হিন্দীভাষা চালু হল। এজন্য বিহারের গ্রাম্য কবিগণ তাঁকে প্রশংসা করে কত গান লিখেছিলেন। আজ থেকে বহুদিন পূর্বে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দীভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার উপযুক্ত। তাঁর এ মত গৃহীত বা বর্জিত, যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে তাঁর মনের ঔদার্য শ্রদ্ধার যোগ্য। সে যুগের উদারমতি অথচ স্বধর্মনিষ্ঠ আদর্শচরিত্র হিসেবে ভূদেব চিরদিন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে ভূদেবের আন্তরিক সম্পর্কটি এখানে আলোচনার যোগ্য। শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এবং দীর্ঘকাল শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে ভূদেব বাংলাদেশের শিক্ষাদানের ভুলত্রুটি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে বাংলায় ভালো বই না থাকাতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বড় দুর্গতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষার সুগমতার জন্য তিনি কতকটা পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছিলেন। যথা—'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১ম-২য়, ১৮৫৮-৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার' (১৮৫৮), 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২),

'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৯০৪ সালে প্রকাশিত)—এগুলি একদা স্কুলের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক বলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ, এতে মৌলিকতা এবং অন্যান্য সাহিত্য-লক্ষণ না থাকারই সম্ভাবনা। তবু তিনি যতটা যত্ন নিয়ে লিখতেন, সমব্যবসায়ীরা সে যুগে এবং এযুগেও তার কিছুই গ্রহণ করেন না। যেখানে স্কুলপাঠ্য কেতাব অবহেলাভরে লেখাই এদেশের লেখক সম্প্রদায়ের সাধারণ রীতি, সেখানে ভূদেব যে যত্ন ও সতর্কতা নিয়ে এই পাঠ্য বইগুলি লিখেছিলেন, তাতেই তাঁর কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

'বিবিধ প্রবন্ধ' দুই খণ্ডে (১ম—১৮৯৫, ২য়—মৃত্যুর পর ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনায় ভূদেব বিচক্ষণ সাহিত্য-বিচারবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকায় সংক্ষেপে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু ভূদেব বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকার ধরে নিপুণ, বিশ্লেষমূলক ও সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'মৃচ্ছকটিকে'র আলোচনাটি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত। ভূদেবের খ্যাতি অবশ্য এই সমালোচনা গ্রন্থদ্বয়ের ওপর নির্ভর করছে না। তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) এবং 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯২)—এই তিনখানি গ্রন্থেই মনস্বী, ভূয়োদর্শী এবং সমাজ-দার্শনিক ভূদেবের সংশ্লেষণধর্মী (synthetic) প্রতিভা ও মনঃপ্রকৃতি সম্যক্‌ ধরা পড়েছে। উনিশ শতকের বন্যাপ্রবাহে যখন নব্যশিক্ষিত বাঙালীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল, যখন তার জীবনে আঁকড়ে ধরবার মতো কোন কিছু ছিল না, তখন ভূদেব উপযুক্ত সামাজিক প্রয়োজনে এই গ্রন্থত্রয় লিখে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য আচার-আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সংযত ভাষায় এই প্রবন্ধগ্রন্থে বাঙালী সংগৃহস্থের কর্তব্যপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেবকে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করেন। কিন্তু এই তিনখানি গ্রন্থ থেকে তাঁর উদার ও প্রগতিশীল মনেরই পরিচয় পাওয়া যাবে। অবশ্য এ রচনাগুলি চেস্টারফিল্ডের পত্রাবলীর মতো বড় বেশী 'কেজো' কথায় ভর্তি—যাকে নিছক কাজের উপযোগী বা 'প্র্যাগমাটিক' বলে, এগুলি সেই জাতীয়। এতে শিল্পরস নেই বললেই চলে—

লেখকের সেরকম কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। মূলত সমাজ ও পরিবারের সংরক্ষণের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন—সুতরাং সেই আদর্শেই এর গুণাগুণ বিচার্য। সমাজবিপ্লব নয়, সমাজ সংস্কারই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তার জন্য ব্যক্তির যা-যা করণীয় তিনি এতে তাই আলোচনা করেছেন।

এ তো গেল মনীষী ও প্রাবন্ধিক ভূদেবের ক্লাসিক, সংযত ও স্থিতধী ধরনের রচনার কথা। কিন্তু এই আচারনিষ্ঠ সদ্‌ব্রাহ্মণও যে রসশিল্পী হিসেবে কোন কোন রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাও এই প্রসঙ্গে আলোচিতব্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতের, বিশেষত শিখ, রাজপুত ও মারাঠা জাতির অপূর্ব বীরত্ব ও ত্যাগের ইতিকথার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর সদ্য পরিচয় ঘটেছে। বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাসের সেই সমস্ত রোমান্টিক ঐশ্বর্য ও মানব-মহিমায় পূর্ণ তথ্যাদি সিসৃক্ষু ব্যক্তিকে কাহিনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করবে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইতিহাসকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক কাহিনী, কোথাও-বা শুদ্ধ ইতিহাসের পট-ভূমিকা নিয়ে সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী রচনার ধুম পড়ে গেল। ভূদেব তখন পূর্ণ যুবক, বয়স ২৯-৩০। আজীবন তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি ঐতিহাসিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে দু'খানি কাহিকা লিখেছিলেন। (১) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৭৭৯ শকাব্দ), (২) 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, ১৮৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। কন্টারের লেখা ঐতিহাসিক গালগল্প সম্বলিত *Romance of History—India* গ্রন্থটির কোন কোন কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশিত হয়। এতে দু'টি কাহিনী আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। অবশ্য ভূদেব ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-মিশ্রিত রোমান্টিক কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। তবে ভূদেব শুধু লোষ্ট্রখণ্ড সংগ্রহ করেছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র তা দিয়ে অপূর্ব হর্ম্য নির্মাণ করেছেন। ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র আখ্যানটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক ; তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি পরাভূত না হলে ভারতের ইতিহাস কোন্ পথে চলত তারই এক কাল্পনিক ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে ঃ তবু একথা বলতে হবে, ঔপন্যাসিকের প্রতিভা ভূদেবের ছিল না, যথার্থ রসশিল্পী হবার সাধনাও তাঁর বড় অল্প। যাঁরা মনে করেন, ভূদেবই ঐতিহাসিক

উপন্যাসের আদি লেখক, ইতিহাসের দিক থেকে তা কথঞ্চিৎ স্বীকার্য ; কিন্তু যাঁরা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের কাছ থেকেই দুর্গেশনন্দিনীর উপাদান পেয়েছিলেন, তাঁরা একটু বাড়াবাড়ি করেন। পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কাহিনী ছিল বঙ্কিমের আদর্শ—ভূদেবের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার আসমান-জমিন ফারাক। ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৬৩) পুস্তিকায় গল্পের ছলে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে —এ রচনায় শিল্পগুণের চেয়ে উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে বলে সাহিত্যকর্ম হিসেবে এর বিশেষ কোন গুণ লক্ষ্য করা যায় না।

ভূদেবের ভাষা তাঁর সংযত ও আচারনিষ্ঠ চরিত্রের মতোই ঋজু, সরল, বাহুল্যবর্জিত, গম্ভীর—ভাবাতিরেকের লেশমাত্রও নেই। কেউ কেউ তাই তাঁর ভাষাকে নীরস বলে মনে করেন। রসসাহিত্যের ভাষা তাঁর নয়, তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু মননিষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য যে ধরনের সংযত ও যুক্তিপূর্ণ ভাষা প্রয়োজন, ভূদেবের ভাষা সেই রীতিকে সার্থকতার সঙ্গে অনুশীলন করেছে। এখানে সেই সংযত গদ্যরীতির একটু উদ্ধৃত হচ্ছে :

> কর্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের আদর্শ। যাহা কর্তব্য তাহা কায়-মনোবাক্যে করিবে, করার ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য কর্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।—সামাজিক প্রবন্ধ।

তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' থেকে সরল গদ্যের যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল-উত্তপ্ত করিলে পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরের তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে।

অবশেষে ভূদেব-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। এই পত্র তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হত। একদা শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এই পত্রিকার মারফতেই তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এর পূর্বেও তিনি একটি পত্রিকার ('শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার') সম্পাদনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর উত্তাল তরঙ্গ-

বিক্ষোভের মধ্যে দাঁড়িয়ে সংযত ভূদেব প্রবন্ধাদিতে সংযত ভাষায় ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-সংক্রান্ত যে-সমস্ত আলোচনা করেছিলেন, আজ প্রায় এক শতাব্দী পরে দেখছি, প্রবন্ধগুলির বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিমা এখনও আলোচনা-অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে।

৩. প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)

একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে বাঙালী-সমাজে পরিচিত হয়েছেন একখানি গ্রন্থের জন্য। সেটির নাম সুপরিচিত —'আলালের ঘরের দুলাল'। এই 'আলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস নামে পরিচিত বলে তিনিও প্রথম ঔপন্যাসিকের খ্যাতি লাভ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছেন। অবশ্য ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, তাঁর কিঞ্চিৎ পূর্বে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল। তবে জনপ্রিয়তায় তিনি এমন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস-জাতীয় রচনার সন্ধান বড়ো কেউ রাখে না। আবার, শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতম নেতা প্যারীচাঁদ শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রন্থাগার, কৃষিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে সজীব কৌতূহলের যোগ রেখেছিলেন। বাঙালী ও ইংরেজ সমাজের তিনিই ছিলেন যোগসূত্র। বিদেশের কৃষিসঙ্ঘের সঙ্গেও তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তিনি বহু প্রবন্ধে বাংলার কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তবে কৌতুকের বিষয় এই যে, একদিকে তিনি শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়, কৃষিবিদ্যার প্রবর্তক, আর একদিকে থিয়জফি নিয়ে সমানভাবেই মশগুল। আধ্যাত্মতত্ত্ব এবং প্রেততত্ত্ব নিয়ে তিনি বহু গবেষণা চালিয়েছিলেন যা আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করবে। ওলকট, মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি প্রভৃতি বিদেশী থিয়জফিস্টরা ভারতবর্ষে নীড় বেঁধেছিলেন। এঁদের সঙ্গে প্যারীচাঁদ মনের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অন্যদিকে তিনি আবার গদ্য আখ্যানে প্রচুর হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেছেন, লঘুচিত্ততার নানা পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ বন্ধু রাধানাথ সিকদারের (ভারত সরকারের জরিপ বিভাগের কর্মচারী রাধানাথই এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করেন) সহযোগিতায় স্বল্পমূল্যে 'মাসিক

পত্রিকা' নামে (১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত) একখানি হালকা ধরনের সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন—তাতে স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীসমাজের উপযোগী সরল ভাষায় অনেক গল্প-আখ্যান ছাপা হত। বস্তুত প্যারীচাঁদ লোকহিতৈষণার বশেই কলম ধরেছিলেন, স্ত্রীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে লেখা আখ্যানগুলিতে প্রায় সর্বত্রই সরসতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর সাহিত্যবোধের গুণে।

প্যারীচাঁদ বাংলাভাষা সম্পর্কে উপলব্ধি করলেন, বিদ্যাসাগরী ভাষা বড়ো বেশী সংস্কৃতঘেঁষা ; ক্লাসিক বর্মেচর্মে আবৃত হওয়ার জন্য ও ভাষায় সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছবিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে না। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় এমন সমস্ত গল্পকাহিনীর পরিকল্পনা করলেন, যার মূল লক্ষ্য অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীসমাজ হলেও তার দ্বারা সাহিত্যরসিক বাঙালী পাঠকেরাও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। তঁার রচনার কাঠামোটি মোটামুটি সাধুভাষাকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু ভাষার চালচলন অনেকটা আলাপচারী ধরনের হয়ে পড়েছে, কোথাও কোথাও লঘুভার হয়ে হালকা জীবনকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে। প্রয়োজন স্থলে তিনি কলকাতার কক্নি ভাষা (অর্থাৎ চল্‌তি বুলি) এবং আঞ্চলিক উপভাষারও সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু আগাগোড়া চলিত ভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেননি। হুতোমের 'নক্‌শা'র পূর্বে কোন বাঙালী লেখকই বিশুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহারে সাহসী হননি। সুতরাং একথা মনে রাখা দরকার যে, প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্যের হাল্‌কা চাল জনপ্রিয় করলেও মূলত তিনি সাধুভাষার লেখক। তবে সে সাধুভাষায় চলিত শব্দ ও হাল্‌কা বাক্‌রীতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে।

প্যারীচাঁদ জনহিতকর উদ্দেশ্যের বশেই এই গল্প-আখ্যানগুলি লিখেছিলেন —'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'অভেদী' (১৮৭১) এবং 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০)। এগুলির দু-একখানিতে আখ্যানের ধর্ম অনেকটা বজায় আছে, যথা—'আলালের ঘরের দুলাল', 'অভেদী' ইত্যাদি। অন্যগুলি স্কেচ্ ধরনের ; সামাজিক কল্যাণবোধই তার প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রচারমূলক ও আদর্শনিষ্ঠ রচনা হলেও এগুলির বাচনভঙ্গী বড় সরস। সামাজিক ও চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য কলম ধরলেও তঁার শিল্পীপ্রতিভা এই সমস্ত উদ্দেশ্যবহুল রচনাতেও আত্মপ্রকাশে বাধা পায়নি।

প্যারীচাঁদ সমাজ-রীতিনীতিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে চেয়েছিলেন, সেই জন্য সাহিতক্ষেত্রে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে নিজের আসল পরিচয় আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির স্বরূপ সে যুগের কৃতবিদ্য লোকের কাছে লুকানো ছিল না। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস নামে সুপরিচিত। অবশ্য 'আলাল' প্রকাশের অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে থেকে সাময়িক পত্রাদিতে সামাজিক অনাচারকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে অনেক নক্শাধরনের কাল্পনিক কাহিনী প্রকাশিত হত। ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস', নববাবুবিলাস' প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি এই ধরনের রচনা, এতেও কথাসাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ প্রভাব আছে। পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ ঐ একই উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ জনকল্যাণের জন্য) স্কেচ্‌ধর্মী কয়েকটি আখ্যান লেখেন। তার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলালে' কথঞ্চিৎ উপন্যাস-লক্ষণ আছে। কাহিনী, বাস্তবতা, চরিত্র—উপন্যাসের মূল লক্ষণগুলি এতে সহজেই চোখে পড়বে। তাই মনে হয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্শা জাতীয় রচনাগুলির চেয়ে প্যারীচাঁদের রচনা অনেক উৎকৃষ্ট। তাঁর কোন কোন রচনায়, বিশেষত 'আলালের ঘরের দুলালে' সর্বপ্রথম নক্শার স্থলে উপন্যাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই জন্য অনেকে এই আখ্যানটিকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম পুরোদস্তুর উপন্যাসের নজির বলে গ্রহণ করতে চান। অবশ্য সম্প্রতি আর একখানি উপন্যাস-ধরনের গ্রন্থের সংবাদ জানা গেছে যেটি প্যারীচাঁদের কিছু পূর্বে রচিত হয়েছিল—কিন্তু সুপ্রচারিত হয়নি বলে, এযুগে দূরের কথা, সেযুগেও বড়ো কেউ এর সংবাদ রাখত না।

এই প্রায়-অপরিচিত গ্রন্থটির নাম 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। ১৮৫২ সালে কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এ্যাণ্ড বুক সোসাইটির উদ্যোগে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স নামে উক্ত মিশনের এক ক্রিশ্চিয়ান বিদেশিনী উত্তমরূপে বাংলা শিখে দেশী খ্রীস্টানদের জন্য তাদের সমাজের ঘটনা অবলম্বনে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনা করেন। বিদেশিনীর পক্ষে এ গ্রন্থ রচনা একটি অপূর্ব বিস্ময়। প্যারীচাঁদের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কয়েক বছর পূর্বেই ফুলমণির মুদ্রণ সমাপ্ত হয়। দেশীয় খ্রীস্টান স্কুলে এটি পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচারিত হয়েছিল। এতে যে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে খ্রীস্টান পরিবার-সংক্রান্ত ঘটনাই প্রধান, সুতরাং বাঙালী পাঠকসমাজে এর বিশেষ প্রচার হয়নি। অথচ এর ভাষায়

আশ্চর্য সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যথা—"তখন আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম, করুণা তুমি যদি একটি পয়সার অভাব প্রযুক্ত পরিষ্কার কাপড় পরিতে পাও না, তবে আমি সে পয়সাটি তোমাকে দিই। তুমি ধোপার নিকটে গিয়া ধৌত শাড়ী পরিয়া শীঘ্র গীর্জায় যাও।"—'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র এ ভাষা থেকে লেখিকার আশ্চর্য বাংলা-ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু খ্রীস্টান পরিবারের কাহিনী এর মূল ঘটনা, খ্রীস্টানী ব্যাপার এর মজ্জায় মজ্জায়। তাই সে যুগের হিন্দু পাঠকসমাজে এ কাহিনীর কোন প্রচার হয়নি, এই লেখিকা সম্বন্ধেও কেউ কৌতূহলী হননি। তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, শ্রীমতী ম্যুলেন্স অতি চমৎকার বাংলাভাষা আয়ত্ত করলেও উপন্যাস বা কথাশিল্পের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এই নীরস দীর্ঘ কাহিনী কোন দিক থেকেই চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। তার তুলনায় কিছু পরে লেখা প্যারীচাঁদের আলাল সরস কাহিনী সৃষ্টিতে অনেক বেশী সার্থক হতে পেরেছে। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর স্ফুরণ হলেও তার শিল্পলক্ষণ নামমাত্র, তাই 'আলালের ঘরের দুলাল'ই প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরব শিরে ধারণ করে আছে, উপরন্তু এটি তাঁর মৌলিক রচনাও নয়, একখানি ইংরেজ গ্রন্থের মর্মানুবাদ।*

উপন্যাসের সব লক্ষণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ছ'টি বৈশিষ্ট্য—(১) কাহিনী, (২) চরিত্র, (৩) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, (৪) বাস্তবতা ও স্থানীয় পরিবেশ, (৫) সংলাপ, (৬) ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন। প্যারীচাঁদ কাহিনী গ্রন্থনে (উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) খানিকটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কলকাতার সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বর্ণনায় তিনি যে ধরনের সরস কৌতুকরীতি ব্যবহার করেছেন, তার জন্যই তিনি অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছেন। তা নইলে চরিত্র সৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—এ সবের বিশেষ কোন পরিচয় তাঁর উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় না। সুনীতি, চারিত্রিক আদর্শ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের নীতি ও আদর্শ প্রচারে তার ঝোঁক এত বেশী ছিল যে, এর কাহিনী বা চরিত্রে

---

* 'ফুলমণি' গ্রন্থটি ম্যুলেন্সের মৌলিক রচনা নয়, *The Last Day of the Week* নামে একখানি ইংরেজী আখ্যানের ছায়াবলম্বনে রচিত। শুধু চরিত্রগুলি বাঙালী। 'The Calcutta Christian Observer'-এ (১৮৫১) এবং 'The Oriental Baptist'-এ (১৮৫২)-এর উল্লেখ আছে। ডক্টর শ্রীমতী সবিতা দাশ এই তথ্যটি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

কথাসাহিত্যের লক্ষণ ফ্‌টে উঠতে পারেনি। তাঁর চরিত্রগুলো হয় পুরোপুরি সৎ, আর না হয় ষোল আনা ঠক-বঞ্চক। এ রকম একপেশে চরিত্র উপন্যাসের আবহাওয়াকে বড় কৃত্রিম করে ফেলে। নীতিমার্গীয় লেখক প্যারীচাঁদের অধিকাংশ চরিত্রের এই হল মারাত্মক ত্রুটি। কিন্তু দু'চারটি খলচরিত্র তাঁর হাতে বড় চমৎকার খুলেছে। বাবুরামবাবু, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, স্বয়ং নায়ক শ্রীমান মতিলাল—এ চরিত্রগুলি অধিকাংশ সময়ে 'টাইপ' ধরনের হলেও সরসতা ও কৌতুকের দ্বারা লেখক তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফ্‌টিয়ে তুলেছেন। আমাদের তো মনে হয়, আদর্শবাদী মহৎ চরিত্রের চেয়ে প্যারীচাঁদ বক্রচরিত্রেই অধিকতর তৃপ্তি বোধ করতেন। তাই বাস্তবতার সঙ্গে সরসতা, কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ তাঁর রচনা ও চরিত্রাঙ্কনে একটা স্থায়ী গৌরব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কলকাতা ও শহরতলীর চিত্র এই উপন্যাসে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী কাহিনীগুলিতে (যেমন 'রামারঞ্জিকা', 'আধ্যাত্মিকা,' 'অভেদী') লেখক আদর্শ, নীতি, উপদেশ, ধর্মাধর্ম এবং থিয়জফির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে ও-গুলিতে কথা-সাহিত্যের বিশেষ কোন লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' নিতান্তই স্কেচ্‌ধর্মী নিবন্ধধরনের অনুল্লেখ্য রচনা। প্যারীচাঁদের যা কিছু গৌরব, তা শুধু আলালের জন্যই। আলালের হাল্‌কা চালের, কলকাতাই ভাষা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মনে করতেন, এই চলিত-ঘেঁষা আধা-সাধুভাষা, যাতে বহু স্থলে চলিত সাধু-অসাধু উপভাষার বিচিত্র জগাখিচুড়ি প্রস্তুত হয়েছে, এ ভাষাই নাকি কথাসাহিত্যের আদর্শ ভাষা। বিদ্যাসাগরী ক্লাসিকঘেঁষা গম্ভীর বাক্‌রীতি ঠিক উপন্যাসের উপযোগী নয়, তা ঠিক বটে। কিন্তু তাই বলে প্যারীচাঁদের পাঁচমিশেলি-ভাষাও উপন্যাসের আদর্শ ভাষা নয়। বিদ্যাসাগরী পরিচ্ছন্নতা ও ক্লাসিক গাম্ভীর্য এবং আলালী সরসতার সমন্বয়ী ভাষাই কথাসাহিত্যের যথার্থ বাক্‌রীতি—বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-খনিত্র হাতে নিয়ে কথাসাহিত্যের উপল-উষর ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং খাত কেটে রসের ধারা বইয়ে দেন। তবে একথা ঠিক প্যারীচাঁদ সর্বপ্রথম সহজ মানুষের—দুষ্ট, খল চরিত্রের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতার পথ তৈরী করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটু উচ্ছ্বসিতভাবে যা বলেছেন তার উচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিলে প্যারীচাঁদের সমগ্র সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত মনে

হবে—"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

এখানে প্যারীচাঁদের ভাষারীতির কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে ঃ

> ১. বাবুরামবাবু চোঁগোঁপ্‌পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতিপরা—ফুল-পুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মতো—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন, ওরে হরে! শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুইচার পয়সায় একখানা চলতি পানসি ভাড়া কর তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে ২ বে-আদব হয়। হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেয়ে বস্তেছিনু—ডাকা-ডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি।...চল্‌তি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা? ('আলাল')
>
> ২. ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছরি খাইয়া মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগবে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমে ২ ছটকে পড়িতে লাগিল। ('মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়')

এ ভাষা পুরোপুরি চলিত নয়, মূল ঠাট-টা সাধুভাষার ছাঁদ অনুসরণ করেছে, কিন্তু লেখক নাটকীয় প্রয়োজনে ভাষাকে তির্যক ও চরিত্রানুরূপ রূপ দিয়েছেন। অবশ্য অনেক সময় চলিত ও সাধুভাষার সংমিশ্রণও করে ফেলেছেন—যেটা সেকালের বাঙালী লেখকদের প্রায় মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছিল। অন্তত রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী কথাসাহিত্যিকেরা সাধু ও চলতি রীতির বর্ণনা ও সংলাপের পার্থক্য সম্বন্ধে সব সময়ে সচেতন থাকতেন না। সে যাই হোক প্যারীচাঁদের উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুটি যে সহজ, সরল ও চলতি জীবনের উপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য প্যারীচাঁদ আবার আধুনিক আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজ ও থিয়জফির ঘোর ভক্ত ছিলেন। তাঁর কোন কোন কাহিনীর স্কন্ধে এই থিয়জফির ভূত ভর করেছিল, ফলে তাঁর উক্ত রচনা অতিশয় বিজাতীয় ধরনের ও গুরুগম্ভীর, অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। যেমন ঃ

> ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ ও দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় আত্মা ঈশ্বরেতে ধাবমান তাহা আমরা নানা প্রকারে দেখিতেছি। যখন ঘোর বিপদে বিষাদ বা শোক উপস্থিত হয়—যখন এমত অবস্থায় পতিত যে আর কোন উপায় নাই—যখন কোন নিদারুণ ক্লেশ জন্য শরীর হইতে যেন প্রাণ বিয়োগ হয় তখন পাপে এমত পরিপূর্ণ যে আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা হইতেছে যখন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব কর্মাদি স্মরণে চিত্ত দাহ্যমান হইতেছে, তখন আত্মা কাহাকে চিন্তা, কাহাকে স্মরণ করে?

বলাই বাহুল্য এ প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছেন—পরমাত্মা। তবে এ ধরনের শাস্ত্রঘটিত ও অধ্যাত্মবিদ্যার জন্য প্যারীচাঁদের খ্যাতি নয়। সরস কৌতুকের ভাষায় এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির সাহায্যে বাঙালীর সমসাময়িক বাস্তবজীবনকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন বলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে থাকবেন এবং সেই চিত্রকে জীবন্ত করবার জন্য তিনি যে বাক্‌পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাও 'আলালী ভাষা' নামে সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হবে।

৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে 'হুতোম পঁ্যাচা'

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) বাঙ্গালাদেশের এক অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুততর তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা। ধনিবংশে ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ধনিসমাজের কদাচারকে শাণিতভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন, উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও সর্বদা একটি মার্জিত পরিশীলিত ভব্য মনের অধিকারী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু না হলে কালে তিনি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের মতোই এক দিক্‌পাল ব্যক্তি হতে পারতেন। অবশ্য তরুণ বয়সেই সাহিত্য, সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি নানা প্রগতিশীল ব্যাপারে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকে ধনকুবেরের সন্তান তরুণ কালীপ্রসন্ন দেখিয়েছিলেন—লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে সব সময়েই কিছু বিবাদ হয় না।

নিতান্ত অল্প বয়সে কালীপ্রসন্ন কলকাতার নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তরুণ বয়সেই প্রবীণের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা', 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠাও তাঁর তরুণ বয়সেরই কীর্তি। এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকেই মাইকেল মধুসূদনকে সংবর্ধিত করা হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক রেভাঃ লঙ সাহেব অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন, তাঁর অর্থদণ্ডও হয়। কালীপ্রসন্ন নিজে টাকা নিয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ

গদ্যরচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র জন্য তিনি অধিকতর পরিচিত হলেও সাহিত্যের নানা বিভাগে তিনি স্বনাম মুদ্রিত করে গেছেন। তাঁর অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সীরিয়স ধরনের গদ্যেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতা 'বঙ্গেশবিজয়' নামে অসমাপ্ত উপন্যাস, গীতার অনুবাদ প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি একটু সংস্কৃতঘেঁষা গুরুভার রচনারীতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো গৌরব মূল মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ। বহু পণ্ডিতের সহায়তায় এবং বিদ্যাসাগরের সদুপদেশে এই তরুণ যুবক মহাভারত অনুবাদের মতো দুঃসাধ্য কর্মে অবতীর্ণ হন এবং বিপুল অর্থব্যয় ও অসাধারণ কর্মদক্ষতার ফলে, মহাভারতের বিশুদ্ধ গদ্য অনুবাদ, প্রকাশ ও প্রচার করেন। তাঁর মহাভারত 'কালী সিংহীর মহাভারত' নামে একদা শিক্ষিত বাঙালীদের ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। এখনও এ মহাভারত সুপ্রচারিত আছে। এ ছাড়াও সাময়িক পত্র ('বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' দৈনিকপত্র—১৮৬১) পরিচালনা করেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদকের কর্ম নির্বাহ করেন। বদান্য কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহু দানধ্যান করতেন, কেউ সুগ্রন্থ লিখলে তিনি তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতেন, কাউকে কাউকে বই ছাপাবার যাবতীয় খরচ দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, ব্রাহ্মসমাজও তাঁর বদান্যতার অংশভাগী হয়েছিলেন। এ ছাড়াও সামাজিক ও স্বাদেশিক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যুবক কালীপ্রসন্ন অসাধারণ মানসিক বলের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যু বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের নিদারুণ ক্ষতির কারণ হয়েছিল। অনেক বই লিখলেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র জন্যই তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সেযুগের কলকাতার ধনী, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সমাজ কী পরিমাণে হুজুগপ্রিয় ছিল, হুল্লোড়ের ধুলোট-উৎসবে কতটা মাখামাখি করত, উৎসব-অনুষ্ঠানে জঘন্য ব্যাপার কত অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হত,—শিক্ষিত যুবক, ঘোর ব্রাহ্ম, নাসিকাধ্বনিকারী বৈষ্ণব বাবাজী, অলিন্দবিহারিণী স্থূলাঙ্গিনী বারবধূ, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, চাকুরে বাবু, মোসাহেব-পরিবৃত মাংসের স্তূপ অর্থাৎ জমিদার, পথের ভিখারী, কেরানি, দোকানী, হাটুরে, পুরুতঠাকুর, মিশিদাঁতে রংদার জুতোপায়ে নবীন নাগর ইত্যাদি

কলকাতার সংযাত্রার নানাবিধ রংদার ব্যাপার ছদ্মনামী হুতোম আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। হুতোম কলকাতার আকাশে শ' খানেক বছর আগে যে সমস্ত নক্শা উড়িয়েছিলেন, সেগুলি এখনও আধুনিক ভব্যসভ্য কলকাতার আকাশে মহানন্দে উড্ডীয়মান। নক্শা বা টুক্‌রো-টুক্‌রো ঘটনা আর তার সঙ্গে ঝালমসল্লা মেশানো হুতোমি মন্তব্য, কলকেতাই চলতি বুলিতে (অর্থাৎ Calcutta Cockney) খুলেছে ভালো। নক্শার প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে (তখনও বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা হয়নি) এবং ১ম-২য় খণ্ড একত্রে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য এরকম তীব্র-তীক্ষ্ণ-অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণকারী কখনও স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না, কালীপ্রসন্নও করেননি—'হুতোম প্যাঁচা' এই ছদ্মনামে তিনি এক শতাব্দীর কলকাতাকে যথেচ্ছা ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন। 'কলকেতার হাটহদ্দ' এবং 'বাবুদের দুর্গোৎসব' অবিকল হুতোমের মতো বলে কেউ কেউ এ দুটিকেও হুতোমের বেনামী রচনা বলে থাকেন। অবশ্য তাঁর লিখনভঙ্গী একদা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, অনেকেই এই মুখরোচক রীতিটি গ্রহণ করে হুতোমকে নকল করেছিলেন। উল্লিখিত পুস্তিকা দু'টি হুতোমের মতো হলেও অন্য কারও রচনা হতে পারে। যাই হোক, ১৮৬২ সালে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়নি, তখন কলকাতার চলতি বুলি অবলম্বন করে এ রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পূর্ণ অতিশয় শক্তিশালী গদ্যরচনার প্রয়াস বাস্তবিক বিস্ময়কর। কালীপ্রসন্ন দেখেছিলেন, তৎকালীন কলকাতার বদ সহবত শোধরাতে গেলে এ ধরনের ঝাঁঝালো ভাষা চাই। তাই তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় অবিকল শহুরে চলতি কথা ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সময়ে অবিকল বাস্তবতার ঝোঁকে তিনি অশ্লীল-ইতর শব্দ ব্যবহারেও লজ্জিত হননি, যা পড়ে হয়তো আজকের ড্রয়িংরুমবিলাসী সাহিত্যের সৌখীন 'ডিলাটেন্ট্' আঁত্‌কে উঠবেন। সে যুগে, রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, কোন লেখকই সাধু ও চলতি রীতির মাথামাথি বর্জন করতে পারতেন না, এ দুয়ের গুরুচণ্ডালী যোগ তাঁরা ধরতেও পারতেন না। কিছু পূর্বে টেকচাঁদ (প্যারীচাঁদ) সহজ ভাষার সাহায্য নিলেও সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু যে-কালীপ্রসন্ন গম্ভীর ধরনের গদ্য রচনায় আগাগোড়া ক্লাসিক সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন, তিনিই আবার হুতোম প্যাঁচার মুখোশ পরে একেবারে চলতি বুলি, মায় উচ্চারণত্রুটি

সুদ্ধ—মহানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যেন পণ করেছিলেন, মুখের কথা, যা জিভ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা ভালো-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য-নাগরিক—যাই হোক না কেন, তাই তিনি ব্যবহার করবেন। সাহিত্যে এই মুখের বুলির যথাযথ প্রয়োগ অতি দুরূহ, মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার তফাত তো থাকবেই। হুতোম সে তফাত প্রায় ঘুচিয়ে দিয়ে চলতি বুলির এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মনে হয় নক্শাগুলির বারো আনা সাফল্য নির্ভর করছে হুতোমি ভাষার ওপর। কোন কোন সময়ে আমরা যেন ফাজিল ছোকরা হুতোমের বাঁকানো ঠোঁট ও কুঞ্চিত চোখের তির্যক দৃষ্টিও ঐ ভাষার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি। মুখের ভাষায় মুখের আদল ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। হুতোম অবলীলাক্রমে সেই কঠিন কাজ সহজ করে ফেলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক কালের চলতি ভাষার প্রবর্তক ও প্রচারক 'বীরবল' বা প্রমথ চৌধুরীর কথা উল্লেখ করতে পারি।

বিশ শতকে প্রমথ চৌধুরী মুখের কথাকে সর্ববিধ সাহিত্যকর্মে প্রয়োগ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, নিজেও চলিত ভাষায় যাবতীয় চিন্তাগ্রাহ্য রচনা নির্বাহ করেছিলেন। তাঁর মতে মুখের কথাই যথার্থ সাহিত্যের ভাষা, সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা। সাধুভাষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত গ্রাহ্য হোক, আর নাই হোক, তিনি চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও হুতোমের মতো বিশুদ্ধ মুখের কথা ব্যবহার করেননি। ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম বাদ দিলে, বীরবলের তথা-কথিত চলিত ভাষা সাধু ভাষার মতোই কৃত্রিম। হুতোমই বিশুদ্ধ মুখের বুলিকে সাহিত্যকর্মে প্রয়োগ করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরীর অর্ধশতাব্দী পূর্বে। এ ভাষার রঙ্গব্যঙ্গ ফাজলামি বাদ দিলেও খুব গম্ভীর ভাবদ্যোতক স্থানেও তিনি এই শহুরে হুজুগে ভাষাকে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন। যাঁরা বলেন, রঙ্গরহস্য ও নক্শা রচনায় হুতোমি ভাষা উপযুক্ত হলেও চিন্তাশীল গুরুতর ব্যাপারে এ ভাষাকে জ্যাঠামি বলে মনে হবে, তাঁদের একথা কিন্তু ঠিক নয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মধ্যেও কিছু কিছু সীরিয়স ধরনের রচনা আছে, যেখানে এই চলিত বুলিকে অর্বাচীন বালখিল্যদের ভাষা বলে মনে হয় না। সরস, কৌতুকতরল, শাণিত ব্যঙ্গ, উদ্ভটরস—সর্ববিধ রচনায় হুতোমি ভাষার প্রয়োগ আশ্চর্য সাবলীল ও সজীব মনে হবে। এখানে তাঁর সেই আশ্চর্য বাক্‌রীতির দু' একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

১. **সরল বিবৃতিমূলক বর্ণনা ঃ** "দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। ·মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁধে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমচেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে ব্যাচাকেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কলকেতা শহর বড়ই গুলজার। গাড়ির হররা, সহিসের পয়িস ২ শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।"

প্রায় সওয়া শতাব্দীর আগেকার 'গুলজার শহর' কলকাতার এই চিত্রধর্মী বাস্তব বর্ণনা এখনও যেন আমরা চক্ষুকর্ণের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারছি। আজ-কাল 'মৌতাতি বুড়োরা' আর গুলির আড্ডায় জমেন না, তদপেক্ষা অধিকতর জমাটি নেশা খবরের কাগজের পলিটিক্স্ নিয়ে কখনও হাতাহাতি করেন, কখনও-বা বুঁদ হয়ে থাকেন। এটি বাদ দিলে প্রাচীন কলকাতা আর আধুনিক কলকাতার মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী নেই—মায় হো-হো করা ছেলের দলও এক রকম আছে।

২. **গম্ভীর অথচ সরস বর্ণনা ঃ** "রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রামবসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবিগাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফর্মেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক। তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান।"

এ ভাষা সহজ, পরিচ্ছন্ন, বিবৃতিধর্মী—কিন্তু সহাস্য। লেখক ইতিহাস বলতে গিয়ে সরস পন্থা নিয়েছেন—কিন্তু গাম্ভীর্যের হানি হয়নি।

৩. **সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ঃ** "হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি। গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধুম্বলোচন হবে ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে উঠবার জো নেই! গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্ধন-ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলাগুলি করে থাকেন।"

আধুনিক সংস্কারপন্থী হুতোমের ভাষাভঙ্গিমা এখানে কিছু তীব্র হলেও ধর্মের ভণ্ডামীকে তিনি কোথাও ক্ষমা করেননি, তা সে বৈষ্ণবই হোক, আর ব্রাহ্মণই হোক। তাঁর ভাষা তাঁর দুঃসাহসের মতোই তীক্ষ্ণ। বাংলা সাহিত্যের আবেগ-ব্যাকুল ও করুণরসার্দ্র আবহাওয়াকে তিনি রঙ্গব্যঙ্গ ও অশিষ্ট নাগরালির চত্বর শব্দ প্রয়োগ করে বুদ্ধিদীপ্ত এবং চকমকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বিচ্ছুরণধর্মী করে তুলেছেন। এ ভাষার অনেক নকল হয়েছে, কিন্তু এখনও এ বিষয়ে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও হুতোমকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। হুতোমি ভাষার অশালীন অভব্যতা ক্লাসিকপন্থী বঙ্কিমের মনঃপূত হয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।" বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্যের অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত নয়। 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' (Mid-Victorian) ইংরেজী রুচিবোধের মধ্যে লালিত হয়ে তিনি হুতোমি ভাষার অনাবৃত রঙ্গব্যঙ্গ এবং অসংযত জিহ্বার বৈঠকখানাবিরোধী উল্লসিত নৃত্য সহ্য করতে পারেননি। তাঁর নিন্দা ও অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলা সাহিত্যের একখানি অননুকরণীয় বিচিত্র গ্রন্থরূপে এখনও বেঁচে আছে এবং হুতোমি ভাষার তীব্র প্রাণশক্তি এখনও লেখকসম্প্রদায়ের কাছে পরম গ্রহণীয় ও পাঠকের কাছে স্পৃহণীয় মনে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে প্যারীচাঁদ ও হুতোমের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যমূলক আলোচনাও অনেকের চিত্তে কৌতূহল সৃষ্টি করবে। উভয়েই একই যুগের সন্তান, একই যুগরসে লালিত হয়েছিলেন। তবে প্যারীচাঁদ রসিকতা করলেও আসলে তিনি ব্রাহ্ম আদর্শবাদী। তাঁর পক্ষে থিয়জফির ছাত্র হয়ে মাদাম ব্লাভাট্স্কির শরণাপন্ন হওয়া কিছুই বিস্ময়কর নয়। কিন্তু হুতোম কখনও এসব ধর্মীয় ব্যাপারের (যাকে তিনি 'বুজরুকি' বলেছেন) প্রতি আসক্ত ছিলেন না। বরং 'মহাপুরুষ', 'ভূতনাবানো' প্রভৃতি নক্শায় তিনি বাঙালীর হাস্যকর ধর্মবিশ্বাসের ওপর তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক চালিয়েছেন। প্যারীচাঁদ স্বতঃই গভীর ব্যাপারে যথেষ্ট গাম্ভীর্য অবলম্বন করতেন, হুতোম তথাকথিত গাম্ভীর্যের মধ্যে যে ছ্যাবলামি আছে

তাকে খুঁচিয়ে টেনে বার করতেন। প্যারীচাঁদ মূলত স্ত্রীসমাজের কল্যাণের জন্য লিখেছিলেন, আর হুতোম তাবৎ বাঙালীর চোখে আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দেবার জন্য কলম শাণিয়ে নিয়ে বসেছিলেন। প্যারীচাঁদ জাতীয় চরিত্র নিয়ে কৌতুক করেছেন, খলচরিত্রকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়ে তাদের ধর্মের পথে এনেছেন, কিন্তু হুতোম এ ধরনের রবিবাসরীয় নীতিকথায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর একমাত্র কাজ—খলপনাকে নিদারুণ ব্যঙ্গ করা। প্যারীচাঁদ উপন্যাসের প্রাথমিক রূপ দিয়েছেন, আর হুতোম নকৃশা উড়িয়েছেন—প্যারীচাঁদ নানা উপ-ভাষার সুবিহিত ব্যবহার করলেও সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণ করে ফেলেছেন, হুতোম কলকেতাই মুখের ভাষায় কোথাও সাধুরীতির সংমিশ্রণ করেননি। তিনি সাধুরীতির ও চলিতরীতির পার্থক্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন এবং চলিত ভাষার সঙ্গে সাধু ভাষায় কোথাও গোলমাল করেননি। তাই ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁকে আমরা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

পরিশেষে হুতোমের নিজের কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গের ছেদ টানি—"কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নকৃশা অতি কদর্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চা খেউড় ও পচালে পোরা ও সুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম, একবার কেন, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বলবো—ভ্রম। হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন…। হুতোমের নকৃশা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো।"

৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মজাগরণ ও সামাজিক ঐতিহ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্থিতধী শান্তরসের ভক্ত ও মনস্বী সাধক এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধারূপে অধিক পরিচিত হয়েছেন বলে তাঁর সাহিত্যকীর্তি অনেক সময় উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁর আত্মজীবনীটি ('পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত'—১৮৯৮ সালে প্রকাশিত) তবু পাঠকসমাজে কিছু প্রচারিত আছে। ঔপনিষদিক ভক্তিবাদে ঘনিষ্ঠভাবে অনুপ্রবিষ্ট ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ সংযত ভক্তির

আবেগাতিরেক-বর্জিত সহজ পন্থা নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি এবং সহজভাবে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন যাপন তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র। অবশ্য তাই বলে বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না। শিক্ষা প্রচার, ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ বিস্তার, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রবর্তন, এমন কি স্বাদেশিক ব্যাপারেও তিনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু বাংলা গদ্যেও তাঁর দান অস্বীকার করা যায় না। তাঁর আত্মজীবনীটি তো একযুগের বাংলা-দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মান্দোলনের নির্দেশকরূপে গৃহীত হতে পারে। এর পরিচ্ছন্ন, শান্ত, সংযত অথচ শিল্পগুণসমৃদ্ধ ভাষা বিশেষ প্রশংসনীয়। এ ছাড়াও তিনি ব্রাহ্ম মতবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু পুস্তিকা লিখেছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণও মুদ্রিত হয়েছিল। এতে উপলব্ধির গভীরতা আশ্চর্য স্নিগ্ধ-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে দেবেন্দ্রনাথ যে সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার কথাও এখানে স্মরণীয়। ধর্ম ও সাধনার জগতের অধিবাসী হলেও তাঁর মনটি ছিল বিশুদ্ধ সাহিত্যরসে ভরা, তাই নিছক তত্ত্বকথাও তাঁর কলমে রস বর্ষণ করত। তাঁর ভাষারীতি তাঁর চরিত্রের মতোই পবিত্র, উজ্জ্বল ও সাত্ত্বিক গুণময়। তাঁর বিখ্যাত পুত্রেরা যে বাক্‌নির্মিতিতে প্রজাপতি ব্রহ্মার সমতুল্য হয়েছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁরই সাত্ত্বিক অথচ রসার্দ্র প্রভাব। তাঁকে আমরা ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতা ও সংগঠকরূপে দেখেছি বলে বাংলা গদ্যসাহিত্যে ও গদ্য-রীতিতে তাঁর দান আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫০), 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২), 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০), 'কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১ এবং ১৮৬৬), 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (১৮৯৩)—প্রভৃতি ছোট-বড়ো অনেকগুলি গদ্যনিবন্ধে তাঁর গদ্যশিল্পীর প্রতিভা সুপ্রমাণিত হয়েছে। তবে তাঁর অধিকাংশ রচনা ব্রাহ্মধর্ম-ঘেঁষা এবং সমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বলে উক্ত সম্প্রদায়ের বাইরে পুস্তিকাগুলির বিশেষ প্রচার হয়নি—এই জন্য অনেকে তাঁর গদ্যরীতির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন। এখানে তাঁর দু'ধরনের গদ্যরীতির যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে :

১. গম্ভীর ভাবদ্যোতক গদ্যরীতি—"ভূলোক, দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে, সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ বীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ,

অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তুসকলকে রূপদান করে, তখন সেই জ্যোতিষ্মান সূর্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান।" (১৮৬০ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা—'ব্রাহ্মধর্মে'র ব্যাখ্যান')

২. **সহজ সরস রচনা**—"এই পৃথিবী অতি পূর্বে একটি সুপ্রকাণ্ড অগ্নিগোলক ছিল। জীবজন্তু ওষধি প্রভৃতির চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন পড়িল। ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি—উত্তপ্ত দ্রবধাতু, বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। সূর্যও তখন ঘোর বাষ্পময় মেঘে আবৃত। উত্তাপে অগ্নি পৃথিবী হইতে বারংবার উত্থিত হইয়া পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল।" (১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞান ও ধর্মে'র উন্নতি')

এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে'র আরও কয়েকজন চিন্তাশীল গদ্যলেখকের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। প্রথমেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুর নাম করা যেতে পারে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১) সে যুগের একজন মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাময়িকপত্র পরিচালনা, নানা সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থের সম্পাদনা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি যে ধরনের চিন্তা, বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে সেযুগের পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) এবং 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৫৩) জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে প্রায় 'বঙ্গদর্শনে'র মতোই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য রীতিতে গ্রন্থসমালোচনা আরম্ভ করেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বাংলা সমালোচনার পদ্ধতি সৃষ্টি তাঁর অন্যতম গৌরব বলে স্বীকৃত হতে পারে।

দেবেন্দ্র-প্রভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) বাংলা গদ্যের একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক বলে গৃহীত হয়েছেন। তাঁর চরিত্র, শিক্ষা, স্বদেশপ্রেম ও ধর্মানুরাগ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলদের ভাবরসে বর্ধিত হয়ে মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণের জীবনে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব ঘনিয়েছিল। পরে তিনি দেবেন্দ্রনাথের কক্ষপথে এসে বিশুদ্ধ ধর্মজিজ্ঞাসা ও নীতি-আদর্শের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। ব্রাহ্মসমাজের গঠন ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করে রাজনারায়ণ বাকি জীবন ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তারেই নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য ধর্মপ্রচারণার সঙ্গে তাঁর মনে সমাজের কল্যাণেচ্ছা এবং স্বদেশপ্রেম বাসা বেঁধেছিল, তাঁর কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া

যাবে। তাঁর রচিত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানগুলিতে মহর্ষির মতোই একটি স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। সহজ, সুললিত ও প্রসন্ন গদ্যরীতিটি তিনি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন। 'হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৫), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭), 'আত্মচরিত' (১৯০৯ সালে মুদ্রিত) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর মনীষা ও গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪৯-১৯৩২) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী, বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগরের শিষ্য কৃষ্ণকমল শুধু পাণ্ডিত্য নয়, বাংলা গদ্যেও প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে গেছেন। তাঁরা 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' (১৭৭৯ শকাব্দ) ও 'বিচিত্রবীর্য' (১৮৬২ খ্রীঃ) সরস গদ্যরচনা হিসেবে সুপরিচিত। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কৃত ফরাসী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ ('পৌলভর্জিনী') কিশোর রবীন্দ্রনাথকে মাতিয়ে তুলেছিল। শেষদিকে তিনি তাঁর কালের কাহিনী বলে যেতেন এবং তা লিখে নেওয়া হত। তাঁর এই সমস্ত ঘটনা ও বিবৃতি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত হয়। যদিও এটি তাঁর মৌখিক রচনা এবং পরবর্তী কালে গ্রন্থিত, তবু এ কাহিনী উনিশ শতকের ঘটনা বলে এই সঙ্গে তারও উল্লেখ প্রয়োজন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১. পূর্বতন ধারার নাটক ও নাটকাভিনয়

ইংরেজের দেখাদেখি সে যুগের নবশিক্ষিত তরুণের দল মঞ্চাভিনয়ে যোগদান করলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঠিক নাটমঞ্চের উপযোগী নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল না, তবে সামিয়ানার নীচে বা মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে নানাপ্রকার দেবদেবীর লীলাকাহিনী বিষয়ক লোকাভিনয় বা যাত্রাভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে কিন্তু নাটমঞ্চে অতি চমৎকার দৃশ্যসজ্জা ও কলাকৌশল সহ সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকের রীতিমতো অভিনয় হত, সেইজন্য সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের এত উৎকর্ষ হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত রাজারাজড়ার ব্যাপারে গরীব জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তারা তাই লোকাভিনয় (অর্থাৎ Folk Drama) করে নাট্যাভিনয়ের পিপাসা চরিতার্থ করত—হোলিকা, শবরোৎসব এবং অন্যান্য পৌরাণিক বা লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে এই সমস্ত লোকাভিনয় গড়ে উঠেছিল। পরে বাংলাদেশে ঝুমুর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লোকাভিনয় এবং সংস্কৃত নাটকের কিঞ্চিৎ প্রভাবে নৃত্যগীতবহুল যাত্রাভিনয় খুব লোকরঞ্জক হয়েছিল। বস্তুত সপ্তদশ, অষ্টাদশ—এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা অধিকারীমশাই সেজে কালিয়দমন যাত্রা (শ্রীকৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত সমস্ত যাত্রাই এই নামে অভিহিত হত), শ্রীরামলীলা, চণ্ডীকাব্য, বিদ্যাসুন্দর পালা প্রভৃতির যাত্রাভিনয় করে অর্থ ও পরমার্থ দুই-ই সঞ্চয় করতেন। মুসলিম শাসনে নাট্যাভিনয়ের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল, কারণ ইসলামি সরিয়ত অনুসারে নাট্যাভিনয় 'না-পাক' ব্যাপার। সুতরাং মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি এর ঘোর প্রতিকূল ছিল এবং প্রতিকূল ছিল বলে উদ্যোক্তারাও নাট্যাভিনয়ে সাহসী হতেন না। ফলে মুসলিম শাসনে সারা ভারতবর্ষেই নাট্যকলার বিকাশ শুব্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু লোকাভিনয়কে অবলম্বন করে এর ধারা কোনরকমে বেঁচে ছিল। লোকের চোখের সামনে ভালো আদর্শ ছিল না, কাজে কাজেই ধর্মীয় কাহিনী এবং বিদ্যাসুন্দরের রংদার গল্প ছেলেবুড়ো সকলেই মহানন্দে শুনতে আসত। অবশ্য যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে কয়েকজন খুব খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শিশুরাম অধিকারী, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুদাম, বদন অধিকারী—এঁরা সকলেই আধুনিক কালের পূর্বে নানাধরনের যাত্রাগাওনা

করে জনসমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ'দের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর নাম বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম। বৈষ্ণব ভক্তিরসে নিষ্ণাত কৃষ্ণকমল কয়েকখানি সুমার্জিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাভিনয়ের নাটক লিখেছিলেন; তার মধ্যে 'রাই উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্নবিলাস' একযুগে শ্রোতাদের পবিত্র রসের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল। এরই সঙ্গে অবশ্য লঘুরুচির শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য কোন কোন যাত্রাওয়ালা আদিরসের ভিয়ান চড়িয়ে বিদ্যাসুন্দরের ঢালাও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। গোপাল উড়ে হালকা সুরে ও লঘু নাচের ঢঙে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা গেয়ে কলকাতা ও চারপাশের নাগরিক সমাজকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। পরে উনবিংশ শতাব্দীতে পুরোদস্তুর নাটকের প্রভাবে প্রাচীন যাত্রারও অনেক রদবদল হয়ে গেল। আধুনিক কালে গ্রামাঞ্চলে যাত্রা আজও জনপ্রিয়-আনন্দানুষ্ঠান। তবে যুগধর্মের বশে আজকালকার যাত্রা ও থিয়েটারে শুধু-রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কোন তফাত নেই। ঐতিহাসিক ও আধুনিক সামাজিক কাহিনীও যাত্রার আসরে দিব্যি ঠাঁই করে নিয়েছে। পুরোনো দিন চলে গেছে, পুরোনো দিনের শিশুরাম অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর দলবলও কুশীলব ও সাজবাজনা সহ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

য়ুরোপীয় নাটকের গোড়ার দিকে খ্রীস্টানধর্মসম্বন্ধীয় মিরাক্‌ল ও মরালিটি প্লে চার্চ-প্রাঙ্গণে অভিনীত হত, বিশপ ও চ্যাপলেনেরাই ছিলেন অভিনেতা। পরে এই অভিনয়কলা থেকে ধর্মভাব বিদায় নিল, অভিনয়ও ক্রমে ক্রমে গীর্জার চত্বর ছেড়ে হাটের মধ্যে নেমে এল। তা হলেও য়ুরোপীয় নাটকের আরম্ভ হয়েছিল ধর্মভাবের আদর্শে মিরাক্‌ল ও মরালিটি প্লে-র মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে কিন্তু অধিকারী মশাইদের যাত্রা থেকে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয়নি। ইংরেজের ইংরেজী নাটকাভিনয় দেখে উনিশ শতকের তরুণের দল সর্বপ্রথম নাটমঞ্চে নাটকাভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রথমে খাস ইংরেজী নাটক, পরে সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদ, তারপর প্রকৃত বাংলা নাটকাভিনয় সে যুগের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। ইংরেজ যেখানেই থাক, একটি কফিখানা ও একটি প্লে হাউস তৈরী করবেই। নাট্যাভিনয় তাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কলকাতাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই তারা নাট্যাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেছিল। আমাদের দেশের ধনী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিরা সেই অভিনয় দেখে নাটমঞ্চে নাটকাভিনয়ের কথা ভেবেছিলেন এবং তারপর থেকেই কলকাতায় বাঙালীসমাজে নাটমঞ্চ বেঁধে নাটকাভিনয়ের প্রথা শুরু হয়।

২. আধুনিক নাটকের সূচনা

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজী-পড়া এবং ইংরেজী অভিনয়-দেখা তরুণ ছাত্রের দল ইংরেজী কেতায় অভিনয়ে প্রস্তুত হয়ে বাংলা-নাটকের সূচনা করে দিয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রী অব্দেরও আগে কলকাতার লালবাজারের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত 'প্লে হাউস' ইংরেজদের প্রথম রঙ্গালয়। এর পরেও কলকাতার নানা অঞ্চলে অনেকগুলি ইংরেজী নাটমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য তাতে ইংরেজী নাটকই অভিনীত হত। আবার কলকাতার বাইরে যেখানে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইংরেজকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, সেখানেও একটি করে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে চন্দননগর থিয়েটার (১৮০৮), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩), দমদম থিয়েটার (১৮১৫), সাঁসুচি থিয়েটার (১৮৪৯) প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর একটিতে শকুন্তলা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ *The Indian Drama of Sakuntala or The Fatal Ring* নামে অভিনীত হয়েছিল।

তবে এই প্রসঙ্গে আমরা এমন একজন বিদেশীর নাম করতে চাই যিনি বাংলাদেশে নাটমঞ্চে সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। এঁর নাম হেরাসিম (জেরাসিম বা গেরাসিম) লেবেডেফ, জাতে রুশীয়। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কলকাতায় হাজির হন। তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা ও হিন্দুস্থানী খুব উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, হিন্দুস্থানী ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী বইও লিখেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশীয় নট-নটী ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে নাটকাভিনয়ের প্রযোজনা করেন। ১৭৯৫ সালে কলকাতার পুরোনো চীনেবাজারের কাছে ডোমতলা লেনে বেঙ্গলী থিয়েটার স্থাপন করে তাতে 'Disguise' (১৭৯৫) এবং 'Love is the Best Doctor' (১৭৯৬) নামে দু'খানা ইংরেজী (এর একটি ফরাসী নাটক) নাটক-প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করিয়ে বাঙালী নট-নটীর সাহায্যে অভিনয় করিয়েছিলেন। এতে ভারতচন্দ্রের গানও ব্যবহৃত হয়েছিল। এই অভিনয় দেখবার জন্য প্রচুর দেশীয় ও ইংরেজ দর্শকের সমাগম হয়েছিল। এই 'Disguise'-এর নাম দিয়েছিলেন, 'কাল্পনিক সংবদল', এটি সম্প্রতি মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় নাটকটির বাংলা নাম জানা যায় না, এটি প্রকৃতপক্ষে অভিনীত হয়েছিল কিনা তা ও জানা যাচ্ছে না। এর পর অনেকদিন আর বাংলা অভিনয়ের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর শুঁড়া অঞ্চলে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করে তাতে ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করিয়েছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে স্কুলের ছাত্রেরা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের দু'চারটি দৃশ্য অভিনয় করে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রেরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৫৩) এবং তাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। অবশ্য এ ধরনের প্রচেষ্টা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, হিন্দু থিয়েটার ও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারের পর যথার্থ বাংলা অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ১৮৩৩ সালের দিকে। শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়ীতে যে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়েছিল, কারও কারও মতে এই হচ্ছে বাঙালীর যথার্থ প্রথম বাংলা অভিনয়। হেরাসিম বাঙালী ছিলেন না, এবং তাঁর নাটক দু'টিও খাঁটি বাংলা নাটক নয় বলে তাঁকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়। নবীন বসুর বাড়ীর অভিনয়ের বেশ কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেবের বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা'র অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এর পূর্ব থেকে অভিনয়ের জনপ্রিয়তা দেখে কেউ কেউ বাংলা নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে জি. সি. গুপ্ত* ('কীর্তিবিলাস'—১৮৫২), তারাচরণ সিকদার ('ভদ্রার্জুন'—১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষ ('ভানুমতী চিত্তবিলাস'—১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্ন ('কুলীনকুলসর্বস্ব'—১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (পৌরাণিক নাটক ও প্রহসন) এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের ('বিধবাবিবাহ নাটক' —১৮৫৬) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' বাংলা দেশের প্রথম ট্র্যাজেডি, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' উৎকৃষ্টতর হলেও প্রথম ট্র্যাজেডি নয়, তৃতীয় ট্র্যাজেডি। এই সমস্ত নাটকের মধ্যে উমেশচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে, নাটকের রচনা ইত্যাদি নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। 'কীর্তিবিলাস' প্রথম ট্র্যাজেডি হলেও এর রচনারীতি পুরাতন-ঘেঁষা; তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুনে' পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অনেকটা অনুসৃত হয়েছে। কালীপ্রসন্নের কয়েকটি পৌরাণিক এবং অনুবাদ-নাটক ('সাবিত্রী সত্যবান'—১৮৫৮, 'বিক্রমোর্বশী'—১৮৫৭, 'মালতীমাধব'—১৮৫৯) বিদ্যোৎসাহিনী

*এঁর পুরো নাম জানা যায় না।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সু-অভিনেতা ছিলেন, নিজের নাটকেও বড় বড় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। অবশ্য এযুগের অনেক নাটকেরই বিশেষ কোন নাট্যগুণ ছিল না, অভিনয়ও হয়েছে খুব কম। অভিনয় না হলে নাটকের কোন সার্থকতা নেই। এ'দের মধ্যে রামনারায়ণের নাটকের একটু পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করতে হবে।

৩. রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২—১৮৮৬)

তখনও বঙ্গসাহিত্যাকাশে মধুসূদন-সূর্যের উদয় হয়নি—কেউ কেউ নাটক রচনা করে নবনাট্য আন্দোলনের নান্দীপাঠ শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত নাটকের অধিকাংশই অভিনীত হয়নি, অনেকগুলির কিছুমাত্র নাট্যলক্ষণ ছিল না। কিন্তু একজন পুরাতনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই যুগে এমন কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন লিখেছিলেন যার সাহিত্যমূল্য যেমন হোক, অভিনয়ে এগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের (ভট্টাচার্য) কথা বলছি। অনেকগুলি নাটক লিখে, সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে এবং প্রহসনে হাত দিয়ে এই সেকেলে ধরনের সংস্কৃতজানা পণ্ডিত একযুগের কলকাতা এবং শহরতলীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁকে সবাই 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র নাট্যকার বলে জানে। কিন্তু এছাড়াও তিনি আরও নানাধরনের নাটক লিখেছিলেন। প্রহসনেও তাঁর দক্ষতা মন্দ ছিল না। পুরোনো যুগের এই নাট্যকারের রত্নাবলীর অভিনয় আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে মাইকেল মধুসূদনের মনে সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনার স্পৃহা জাগ্রত হয়।

রামনারায়ণের দুটি নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং 'নবনাটক' (১৮৬৫) যথাক্রমে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের কুফল দেখাবার জন্যই লেখা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি নাটক দু'খানির জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। তর্করত্ন ইংরেজী জানতেন না, পাশ্চাত্ত্য নাটক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলেই মনে হয়। সংস্কৃত নাটক-প্রহসনেই তাঁর ছিল অবাধ অধিকার—এবং তাঁর নাটক পাশ্চাত্ত্যের নয়, প্রাচ্যের নাট্যকলারই একান্ত অনুসরণ। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের ('বেণীসংহার'—১৮৫৩, 'রত্নাবলী'—১৮৫৮, 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'—১৮৬০, 'মালতীমাধব'—১৮৬৭) অনুবাদ করেছিলেন—সেই অনুবাদের কিছু কিছু অভিনয়ও হয়েছিল। অভিনয়গুলি ভালো হয়নি, মধুসূদন রত্নাবলীর অভিনয় দেখে মোটেই

খুশি হতে পারেননি। তর্করত্ন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনখানি মৌলিক নাটকও লিখেছিলেন ('রুক্মিণীহরণ'—১৮৭২, 'কংসবধ'—১৮৭৫, 'ধর্মবিজয়'—১৮৭৬)। কিন্তু তাঁর খ্যাতি প্রধানত নির্ভর করছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং কয়েকখানি প্রহসনের ওপর ('যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান', 'উভয় সঙ্কট')। 'নবনাটক' নাটক হিসেবে আদৌ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি, কিন্তু 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম নাটক—যা অসাধারণ অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল। নাটকের কাহিনী ও চরিত্র এমন কিছু প্রশংসার যোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র, ভাষা ও ভঙ্গিমায় তর্করত্ন যে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ ও বাস্তবতার আমদানি করেছেন, শুধু সে জন্যই এই নাটক সেযুগে বহুবার অভিনীত হয়েছিল। এমন কি এই নাটকের অভিনয় দেখে কুলীনের দল তর্করত্নের ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছিল, কোন কোন স্থানে কুলীন-ব্রাহ্মণদের জোটবাঁধার ফলে এ নাটক শেষ পর্যন্ত অভিনীত হতে পারেনি। সেযুগে নব্যজীবনপ্রবাহ সমাজের শিক্ষিতমহলে ছড়িয়ে পড়ছিল, সমাজের কুসংস্কারের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়েছিল। তাই 'কুলীন-কুলসর্বস্বে'র নাট্যলক্ষণ যেমন হোক না কেন, অভিনয়ে এ নাটক বেশ উতরে ছিল। তর্করত্নের প্রহসনগুলি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বহুবিধ নাটক-প্রহসন রচনার জন্য লোকে তাঁকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলত—এই খেতাবেই তিনি পরবর্তী কালে পরিচিত হয়েছেন। মধুসূদনের পূর্বে তিনিই একমাত্র নাট্যকার যিনি অধিকাংশ স্থলে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই কলম ধরেছিলেন, সমসাময়িক কালে নাট্যকার হিসেবে বেশ খ্যাতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের আবির্ভাবের ফলে রামনারায়ণের পুরাতন রীতির নাটকাভিনয় ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে গেল। তবু এই পুরোনো যুগের নাট্যকার অভিনয়কে জনপ্রিয় করবার জন্য কয়েকখানি মঞ্চসফল নাটক-প্রহসন লিখেছিলেন। এ জন্য তিনি এ দেশের নাটক ও অভিনয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক, এবং প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে নয়—নাট্যকাররূপে। বাল্যকাল থেকেই তিনি ইংরেজী ভাষাটি বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন। কৈশোরে-যৌবনে তিনি ইংরেজের মতোই কবিতা লিখতে পারতেন। মান্দ্রাজে থাকার সময় *Rizia* নামে একখানি ইংরেজী

নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু ছাপা হয়নি। মান্দ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষত বাংলা নাটকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে জড়িয়ে পড়লেন। কলকাতায় তখন নাট্যাভিনয় খুব জমে উঠেছে—সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ দিয়ে অভিনয়ের স্বাদ মেটানো হচ্ছে। এই সময় ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার জমিদার সিংহদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন-অনূদিত 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে আমন্ত্রিত হয়ে মধুসূদন বাংলা নাটক সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন এবং নিজেই নাটক রচনার সিদ্ধান্ত করলেন—যদিও তখন তিনি বাংলাভাষায় কিছুই লেখেননি। যাই হোক, অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ শিল্প-বোধের স্বাভাবিক অধিকারের ফলে মধুসূদন অতি অল্পসময়ের মধ্যে মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' নামে একখানি পৌরাণিক নাটক লিখে ফেললেন। অভিনয়ে এ নাটক প্রথম রজনীতেই অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৫৯ সালের গোড়ার দিকে 'শর্মিষ্ঠা' ছাপা হয়ে বেরুল। খ্রীস্টান মাইকেল মধুসূদন—যিনি এতদিন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পদ্মকাননে বিহার করছিলেন, তিনি যে ভারতের সাহিত্য, বিশেষত মহাভারত সম্বন্ধে এতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কেউ ভাবতেও পারেননি। যাই হোক, এদেশে মধুসূদন সর্বপ্রথম নাট্যকার-রূপেই আবির্ভূত হন। নাটক রচনা করে যখন তিনি নিজ প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেন, তখন তিনি কাব্য-মহাকাব্যে অবতীর্ণ হলেন। তিন শ্রেণীতে তাঁর নাটক বিভক্ত হতে পারেঃ (১) পৌরাণিক ('শর্মিষ্ঠা'—১৮৫৯, 'পদ্মাবতী'—১৮৬০), (২) ঐতিহাসিক—('কৃষ্ণকুমারী'—১৮৬১), (৩) প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা'—১৮৬০, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—১৮৬০)।

আগেই আমরা বলেছি, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত—শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল আখ্যানের কোন কোন চরিত্রকে কবি অধিকতর বিশুদ্ধ চরিত্রাদর্শের দ্বারা নবরূপ দিয়েছেন—যেমন স্বয়ং নায়িকা শর্মিষ্ঠার চরিত্র। তবে বাস্তবতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে দেবযানীর চরিত্র অধিকতর জীবন্ত হয়েছে। কাহিনী ও রচনার কোন কোন অংশে কালিদাসের শকুন্তলার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু এর রচনাক্রম ও গ্রন্থনপদ্ধতি পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্যপন্থী। এই নাটক অসাধারণ অভিনয়-সাফল্য অর্জন করেছিল, আর সেই জন্যই এর পরে যত উল্লেখযোগ্য নাটক লেখা হয়েছে, সব তাতেই পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের অনুসরণ দেখা যায়। বস্তুত

'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশের পর সংস্কৃতরীতি বাংলা নাটক থেকে প্রায় পুরোপুরি উঠে যায়। অবশ্য 'শর্মিষ্ঠা'য় আধুনিক নাটকের প্রথম সার্থক সূচনা হলেও এর মধ্যে মধুসূদনের রচনার কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে। মধুসূদন নাটকে বরাবর পাশ্চাত্ত্য রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে য়ুরোপীয় "stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment" আছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত নাটকে শুধু "all softness, all romance" —তাই তাঁর সুদৃঢ় অভিমত, "Ours are dramatic poem..."। তাঁর এ মত যুক্তিবিরোধী নয়, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'য় তিনি 'softness' ও 'romance'-এর বেশী আমদানি করেছেন। এর গতিবেগ আবেগের দ্বারা মন্থর হয়েছে, সংঘাতের চেয়ে বিবৃতি বড়ো হয়েছে, অতিনাটকীয় ও যাত্রার ধরনের বাগাড়ম্বরের ফলে এর নাটকীয় রস বহু স্থলেই উবে গেছে। তিনি সংস্কৃত নাটকের ততটা প্রশংসা না করলেও সেই ধরনের কৃত্রিম লীরিক বাড়াবাড়ির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। একমাত্র দেবযানী ও শুক্রাচার্য ছাড়া আর কোন চরিত্রেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি। প্রথম নাটক রচনায় নাট্যকারের স্বচ্ছন্দ পদচারণা যে বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) এই সমস্ত ত্রুটি থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছে। নাটকে ভারতীয় পুরাণের ছদ্মবেশ থাকলেও এটি আসলে ভারতীয় ব্যাপার নয়। গ্রীকপুরাণের প্রসিদ্ধ গল্প 'Apple of Discord' অবলম্বনে তিনি ভারতীয় ছাঁচে পাশ্চাত্ত্য গল্পকে খুব সাফল্যের সঙ্গেই ঢেলে নিয়েছেন। এই নাটকে শচী হয়েছেন গ্রীকপুরাণের ইন্দ্রাণী অর্থাৎ জুনো, মুরলা—প্যালাস, রতি—ভিনাস, ইন্দ্রনীল—প্যারিস ও পদ্মাবতী—হেলেন। চরিত্রগুলিকে মধুসূদন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় ধরনের করে তুলেছেন। এতেও তিনি কিন্তু সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছাড়তে পারেননি। গুরুভার আলঙ্কারিক বাক্‌রীতি ও অন্যান্য মুদ্রাদোষ এখনও রয়ে গেছে—তবে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমা 'শর্মিষ্ঠা'র চেয়ে স্বাভাবিক হয়েছে। এই নাটকে তিনি কলির উক্তিতে কয়ছত্র অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ করে কাব্যে ছন্দোগত বিপ্লবের সূচনা করেন। এই কমেডি রচনার সময়ে তিনি দু'খানি প্রহসনও ('একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ') রচনা করে নাট্যসাহিত্যে সব্যসাচীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরে ১৮৬১ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। এর

কাহিনী কর্ণেল টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan* থেকে গৃহীত হয়েছে—সুতরাং কাহিনীটি মূলত ইতিহাস থেকে নেওয়া—এবং এর পরিণাম হল ট্র্যাজেডির হাহাকার। ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি হিসেবে এটি প্রথম নাটক এবং উল্লেখযোগ্যও বটে। এতে রাণা ভীমসিংহের কুমারী-কন্যা কৃষ্ণা বা কৃষ্ণকুমারী রাজ্যের কল্যাণে এবং পিতাকে দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেন। মানসিংহ ও জয়সিংহ দু'জনেই কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থনা করলেন এবং ব্যর্থ হলে ভীমসিংহের সর্বনাশ করবেন বলে ভয় দেখালেন। ভীমসিংহ কন্যাস্নেহ ও রাজ্যরক্ষা—এর মধ্যে কোন্‌টিকে বেছে নেবেন ঠিক করতে পারলেন না। আত্মহত্যা করে কৃষ্ণা পিতা ও পিতৃরাজ্যকে নিশ্চিন্ত করে গেলেন। এই দুর্ঘটনায় ভীমসিংহ উন্মাদ হয়ে গেলেন। এর সঙ্গে প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদেস প্রণীত 'ইফিগেনিয়া এ্যাট্‌ তৌরিস' নাটকের কতকটা সাদৃশ্য আছে। উক্ত নাটকে রাজা আগামেম্‌নন তাঁর কন্যা ইফিগেনিয়াকে বলি দিয়েছিলেন দেবী আর্টেমিসের রোষ শান্তির জন্য। এর সঙ্গে রাজ্যের কল্যাণে কৃষ্ণার আত্মহত্যার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। রচনা, গ্রন্থনা, ঘটনা-সংঘাত ও সংলাপের দিক থেকে এ নাটক মাইকেলের নাট্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে, বাংলা নাটকের ইতিহাসেও এর স্থান খুব উচ্চে। রাণা ভীমসিংহের ট্র্যাজিক ব্যর্থতা ও কৃষ্ণকুমারীর আখ্যানে করুণরসের উচ্ছ্বাস কবি অতি সংযতভাবে বর্ণনা করেছেন—এর সঙ্গে যে উপকাহিনী আছে, তারও প্রয়োগ-যৌক্তিকতা প্রশংসনীয়। অবশ্য নাটকটি ট্র্যাজেডি-ঘেঁষা হলেও পুরোপুরি এবং বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি হতে পারেনি। ভীমসিংহের অতিনাটকীয়তা ও কৃষ্ণার করুণরসের লীরিকমূর্চ্ছনা ট্র্যাজিকধর্মী নাটকে মানায় না। যে যাই হোক, এ নাটকে মধুসূদন গ্রীক অদৃষ্টতত্ত্বকে মেনে নিয়েছেন। এই সময় থেকে তিনি জীবনের বেদনাময় গভীর পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট হন, এর কিছু পরে লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যেও সেই ব্যর্থতার ট্র্যাজিক হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। 'কৃষ্ণকুমারী' বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি না হলেও নাটক হিসেবে অনেকটা সার্থক হয়েছে।

মধুসূদন যখন গম্ভীর রসের নাটক লিখছিলেন তখনই আবার রচনার ফাঁকে ফাঁকে দু'খানি প্রহসন লিখে বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। একখানি হল 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), আর একখানির নাম 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ-ভ্রাতাদের

অনুরোধে মধুসূদন এই দু'খানি প্রহসন রচনা করেছিলেন। প্রথম খানিতে ইংরেজী-শিক্ষিত ভ্রষ্টাচার তরুণ যুবকদের কদাচারকে শাণিত রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় দারুণ কশাঘাত করা হয়েছে, দ্বিতীয় খানিতে তথাকথিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজপতির কুচরিত্র ও লাম্পট্য খুব রসালভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' পুরোপুরি রঙ্গরসের প্রহসন, কাহিনী নামমাত্র। কিন্তু 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে ক্ষীণভাবে কাহিনীও অনুসৃত হয়েছে। প্রথমটিতে নাগরিক কলকাতার তরুণসমাজ এবং দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধ এর আক্রমণস্থল। তৎকালীন সমাজ, ব্যক্তি, তাদের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা কবি এমন কৌতুক ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বহুদিন কেউ তাঁকে এ বিষয়ে অতিক্রম করতে পারেননি। সম্প্রতি কোন কোন অতি-আধুনিক সমালোচক বলতে শুরু করেছেন—মাইকেল বাংলা জানতেন না। এই দু'খানি প্রহসন থেকেই দেখা যাবে মাইকেলের নানাধরনের বাংলা, মায় উপভাষা—কতটা জানা ছিল, আর জন-জীবনের সঙ্গে তিনি কতটা নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। দীনবন্ধুর মতো সত্যকারের নাট্য-প্রতিভাশালী ব্যক্তিও মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে 'সধবার একাদশী' লিখেছিলেন। প্রহসন দু'খানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় হয়নি। কারণ যে-খানাই অভিনয় করা যাক না কেন, অপর দল তাতে দারুণ চটে যেত। সেই মর্মে তারা উদ্যোক্তাদের শাসিয়েছিল। এর জন্য মধুসূদন খুব আঘাত পেয়েছিলেন—রাগ করে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন যে, নাটক লিখেও যদি কারও কারও অপছন্দের জন্য তা অভিনীত না হয়, তা হলে, "I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese." অবশ্য বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলেও দেশের নানাস্থানে এর অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গম্ভীররসের নাটকে মাইকেল কতদূর সফল হয়েছেন, সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু প্রহসন দু'খানিতে তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন।

আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মাণ করেন মধুসূদন, তারপর সে পথ ধরে কত নাট্যকার এসেছেন। প্রথম দিকের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলো তাঁর এবং দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসন নিয়েই আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মধুসূদনের প্রতিভা মূলত মহাকবি ও গীতিকবির প্রতিভা। তবু নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি

চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো খুঁটিয়ে দেখলে তাঁর নাটকেও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়বে, কিন্তু নাটকে, বিশেষত প্রহসনে তাঁর লোকচরিত্রজ্ঞান ও তাদের জীবনচিত্রাঙ্কন আজও প্রশংসা দাবী করতে পারে। কবি দুঃখ করে লিখেছিলেন :

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

রাঢ়বঙ্গের অধিবাসীদের কুনাট্য-প্রীতি দূর করে তিনি তাদের যথার্থ নাটকের স্বাদ দিয়েছেন, এর জন্যও তিনি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৫. দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)

দীনবন্ধু বাংলা নাটকের করাঙ্গুলিগণনীয় দু' একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অন্যতম, কারও কারও মতে বাংলা নাটকের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা করেন, তেমনি দীনবন্ধু বাস্তব জীবন-চিত্র-সংবলিত সমসাময়িক সমাজজীবনের অতি উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হয়ে রঙ্গরসের কবিতা লিখেছিলেন, পরে তিনি সামান্য কিছু কাব্য-কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান খ্যাতি নাটকের জন্য।

দীনবন্ধু ডাকবিভাগে কাজ করতেন। সরকারী কর্মে নানাস্থানে যাতায়াত করতে হত, ফলে নানাধরনের মানুষের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর নাটকে ও প্রহসনে সেই অভিজ্ঞতার বহু বাস্তব পরিচয়ের চিহ্ন রয়ে গেছে। এই প্রসন্নধরনের নিঃস্পৃহ মানুষটি চারিদিকের প্রতি একটিঅনুদ্বেজিত অথচ কৌতুক-রসসিক্ত মন নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। তাই তাঁর নাটকে নানা ত্রুটিসত্ত্বেও এই প্রসন্নতার জন্য উক্ত রচনাগুলি আমাদের অন্তরকে সহজেই আকৃষ্ট করে থাকে।

'নীলদর্পণ' (১৮৬০) তাঁর প্রথম নাটক, সর্বাধিক পরিচিত নাটক এবং বাংলা সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট নাটক। এর সঙ্গে নাট্যসাহিত্য, নাটমঞ্চ, স্বাদেশিকতা, নীল আন্দোলন, সমাজ-দর্পণ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। প্রথম নাটকেই তিনি অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হন—যদিও অনেকেই তাঁর নাম জানতেন না, কারণ এই নাটকে তিনি ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন

করেছিলেন। এই নাটকে বাঙালী কৃষক ও ভদ্রলোকের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। গোপনে গোপনে মধুসূদন এর অনুবাদ করেন।* তাতেও তাঁর নাম ছিল না শুধু প্রকাশক হিসেবে লঙ সাহেবের নাম ছিল। ফলে লঙ সাহেবের জরিমানা ও কারাবাস হয়। কিন্তু কিছুতেই নীলকরদের জারিজুরি টিকল না, নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ *The Indigo Planting Mirror* পার্লামেণ্টে পাঠানো হল, এদেশে-বিদেশে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হল—ইণ্ডিগো কমিসন বসল, আইন করে উক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হল, কিন্তু এ সবের মূলে হচ্ছে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার অনেক আগে থেকে সাহেবরা গ্রামে গ্রামে আড়কাঠি পাঠিয়ে চাষাদের দিয়ে নীল উৎপন্ন করাত, তারপর চড়া দামে সেই নীল রং দেশবিদেশে বিক্রয় করত। তারা নানাপ্রকার বে-আইনি জোর-জুলুমের দ্বারা দাদন দিয়ে কৃষকদের নীল বুনতে বাধ্য করত, কেউ অসম্মত হলে তার সর্বনাশ করে ছাড়ত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকের সহ্যের সীমা অতিক্রম করল; যশোহর, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার কৃষকেরা একজোট হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, দেশনেতারা বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মারফতে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্যাপার বেশীদূর গড়াবার আগেই ইণ্ডিগো কমিসন বসিয়ে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে দেখা গেল, নীলকর সাহেবরা স্ত্রীঘটিত ব্যাপার ছাড়া (কারণ তা প্রমাণ করা যায়নি) আর সব বিষয়েই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। নীলকর সাহেবরা এত সহজে দমবার পাত্র নয়, তারাও উকিল-ব্যারিস্টার দিয়ে মামলা লড়ার জন্য তৈরী হতে লাগল। কিন্তু যুদ্ধের সাজসজ্জা সহসা খসে পড়ল। বিজ্ঞানের কৃপায় নীল চাষ বন্ধ হবার উপক্রম হল। জার্মানীতে আবিষ্কৃত অতি সুলভ রাসায়নিক নীল বাজারে এসে এক দিনেই নীলকর-সাহেবদের কুঠি বন্ধ হয়ে গেল। তারা তখন এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার বিশাল প্রান্তরে চরে খাবার জন্য প্রস্তুত হল—সেখানে গিয়ে নতুন ব্যবসা ফেঁদে বসল। 'নীলদর্পণে'র পিছনে সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণ'কে মার্কিনী মহিলা-

* ইদানীং কেউ কেউ এ-মতে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই অনুবাদে এমন ভুলত্রুটি ও অসঙ্গতি আছে যে, এটি কৃতবিদ্য মধুসূদনের অনুবাদ না হওয়াই সম্ভব।

ঔপন্যাসিক স্টো প্রণীত *Uncle Tom's Cabin* (1852)-এর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন এবং সে তুলনা অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। *Uncle Tom's Cabin*-এর আদর্শে 'নীলদর্পণ' লেখা হতে পারে, কারণ নিগ্রো-দাসত্বের মর্মন্তুদ ঘটনাপূর্ণ স্টো-এর উপন্যাসখানি 'নীলদর্পণে'র আট বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত উপন্যাসের দ্বারা যেমন আমেরিকার জনমত নিগ্রোনির্যাতনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং কালক্রমে সেই নির্মম দাসব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি 'নীলদর্পণে'র (১৮৬০) বাংলা মূল ও ইংরেজী অনুবাদ প্রচারের ফলে শুধু এদেশীয়রাই নয়, বিলেতের উদারমতি শ্বেতাঙ্গ-সমাজও নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে এর প্রতিবিধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আর তা ছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সার্বজনীন ঘৃণাবিদ্বেষ সঞ্চারিত হয় এই নাটকাভিনয়ের দ্বারা, স্বাদেশিক গণ-আন্দোলনেরও ভিত্তিভূমি এই নাটক। নীলকর সাহেবদের কোপে পড়ে গোলোক বসুর সম্পন্ন নিরীহ পরিবার এবং সাধুচরণ নামে এক বিশিষ্ট ভদ্র রায়তের বংশ কীভাবে ধ্বংস হল, উক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্বরেরা নিরীহ গ্রামবাসীর অসহায়তা এবং বিচার-বিভাগের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার সুযোগে কীভাবে পশুবৎ আচরণ করত, এমন কি গর্ভিণী রমণীও তাদের পশুদৃষ্টির ঘৃণ্য ক্ষুধা থেকে বাঁচতে পারত না—তারই অতি কঠোর ও বাস্তবচিত্র এঁকে দীনবন্ধু বাংলা নাটকের নতুন পথ খুলে দেন, বাংলার স্বাদেশিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, গ্রাম্য নরনারীর দুঃখদুর্ভর ও নির্যাতন-পীড়িত অসহায় অবস্থার প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কন করেন এবং বাক্‌রীতি ও সংলাপে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী পরিপূর্ণ বাস্তবজীবনের ভাষা ব্যবহার করে বাংলা নাট্যকারদের মধ্যমণি বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। অবশ্য 'নীলদর্পণ' নাটক ট্র্যাজেডি হিসেবে খুব সার্থক হয়নি। এতে তিনি জনসাধারণ ও দুষ্ট চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিলেও তথাকথিত সৎ ও সাধু প্রকৃতির ভদ্র চরিত্র অঙ্কনে ততটা সার্থক হননি—এঁদের ব্যবহার, ভাষা ইত্যাদি অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া ট্র্যাজেডির সূক্ষ্মতা, বেদনার তীব্রতা প্রভৃতির চেয়ে খুনোখুনি, আত্মহত্যা, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির মতো রক্তারক্তির বাহ্যিক আড়ম্বরটাই এ নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। স্পেনদেশের জাতীয় চরিত্র ট্র্যাজেডি বলতে রঙ্গমঞ্চে খুনোখুনির বাস্তব অনুকরণকেই বেশী পছন্দ করত। দীনবন্ধুর সৃষ্টিপ্রতিভা কতকটা শেক্‌স্‌পীয়রের

সঙ্গে তুলনীয় হলেও 'নীলদর্পণে' তিনি সে ট্র্যাজিক সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি—তা ছাড়া গ্রন্থনৈপুণ্যও তাঁর প্রথম নাটকে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি—অনেক স্থলে অনাবশ্যক ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন। তবু সুকঠোর বাস্তবচিত্র, জনচরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের সহানুভূতি সহজ কৌতুকরস এবং সমসাময়িক উত্তেজক পরিবেশের জন্য নানা ত্রুটিপূর্ণ হয়েও 'নীলদর্পণ' সেযুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এখনও মাঝে মাঝে সৌখীন সম্প্রদায় এই নাটক অভিনয় করে দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

দীনবন্ধুর প্রতিভা মূলত শ্রেষ্ঠ কমেডি-লেখকের প্রতিভা। উচ্চশ্রেণীর নাট্যধর্মময় কৌতুক ও পরিহাস, জীবনের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি নিঃস্পৃহতা, নানা অসঙ্গতির প্রতি প্রথমশ্রেণীর হাস্যরসিকের মতো সকৌতুক সহনশীলতা —এর দ্বারা তিনি বাংলা নাটকে স্পৃহণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু যেখানে রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার চরিত্র নিয়ে প্রেমের গল্প ফেঁদেছেন সেখানে তা প্রাণহীন কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) এই ধরনের কমেডি বা মিলনে সমাপ্ত নাটক। এতে যে পার্শ্বচরিত্রগুলি বর্ণিত হয়েছে, তাদের সরস কৌতুকপ্রবণ রূপায়ণ দীনবন্ধুর স্বাভাবিক ক্ষমতাকেই সুপ্রমাণিত করেছে। 'নবীন তপস্বিনী'র (১৮৬০) জলধর-চরিত্র শেক্‌স্‌পীয়রের *Merry Wives of Windsor*-এর ফলস্টাফের অনুকরণে অঙ্কিত হলেও এর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও কৌতুকরস দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাই হোক বাস্তবজীবনের উজ্জ্বল চিত্রপট ও তার আলো-আঁধারের লীলা তাঁকে এমন আকৃষ্ট করেছিল যে, তিনি রোমান্সের জগতে স্বপ্নপ্রয়াণে ততটা সার্থক হননি।

'নীলদর্পণে'র পর তাঁর খ্যাতি কয়েকখানি প্রহসন ও প্রহসনধর্মী নাটকের ওপর নির্ভর করছে—যাতে তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের যথার্থ পথ পেয়েছে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে বিবাহবাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অকালপরিপক্ক ছেলেরা কীভাবে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেছিল তারই এক কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে এর কাহিনী ও চরিত্র নিতান্তই সাধারণ স্তরের। 'জামাই বারিকে' (১৮৭২) ধনিপরিবারে ঘরজামাই পোষার প্রথাকে হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে —শোনা যায় এর লক্ষ্য ছিল কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ অভিজাত পরিবার।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র ঘটনা নামমাত্র, চরিত্রও সুচিত্রিত হয়নি, কিন্তু 'জামাই বারিকে' প্রধান ও অপ্রধান দুটো কাহিনীই সংগ্রথিত হয়েছে, এবং হাস্যপরিহাস ও কৌতুকরঙ্গে চরিত্রগুলো অতিশয় জীবন্ত রূপ ধরেছে। জামাই বাবাজীদের মর্কটলীলা, বগী-বিন্দী দুই সতীনের 'হাড়াই-ডোমাই' ঝগড়া, দু' সতীনের জ্বালায় পদ্মলোচনের বিড়ম্বনা ইত্যাদির রসিকতা বাংলাদেশে প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ে উঠে গেছে। এতে তিনি যে কৌতুকরস ও কমেডির আয়োজন করেছেন, এখনও তার অভিনয় অতিশয় চিত্তাকর্ষক মনে হয়। তাঁর 'লীলাবতী' (১৮৬৭) সমসাময়িক নাগরিক জীবনের হাস্যপরিহাস ও নায়ক-নায়িকার মিলন-সংক্রান্ত একটা জটিল কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নায়ক ললিত এবং নায়িকা লীলাবতীর প্রণয় ও বিবাহ এর মূল ঘটনা হলেও কয়েকটা রংদার মর্কট শ্রেণীর চরিত্র এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষত নদেরচাঁদের চরিত্র কৌতুকচরিত্র হিসেবে এখনও অতুলনীয়। 'লীলাবতী'র বড়ো আকর্ষণ নায়ক-নায়িকা নয়। তাদের কৃত্রিম প্রণয়, ততোধিক কৃত্রিম পয়ারে প্রেম নিবেদন ও কবিত্বপ্রকাশ প্রায় অসহনীয় মনে হয়। দীনবন্ধু—কেন জানি না, ভদ্র, রোমান্টিক, প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র আঁকতে গেলেই জবুথবু হয়ে পড়তেন। তাদের ভাষা, জীবন-যাত্রা, আচার-ব্যবহার তিনি যেন পরীস্থান থেকে আমদানি করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, রোমান্টিক ব্যাপার এবং আধুনিক নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রণয় সম্বন্ধে তাঁর কোন রকম অভিজ্ঞতা ছিল না, সে যুগে ঠিক এজাতীয় নায়িকাচরিত্র বাস্তবে বড়ো-একটা মিলতও না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে লীলাবতীর মতো "হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙালী সমাজে ছিল না।" এ আদর্শ দীনবন্ধু ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক থেকে নিয়েছিলেন এবং এগুলি বাস্তব ছিল না বলে কিছু অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব একখানি প্রহসনধর্মী নাটকেই ধরা পড়েছে। সেখানি হল 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। এতে সেযুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য এ নাটক মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত। মাইকেলের প্রহসনটি যথার্থ প্রহসন, চরিত্র বা ঘটনার বিশেষ কোন বিকাশ নেই। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসন হলেও

পুরোপুরি নাটকের রীতিতে রচিত। মূল চরিত্র নিমচাঁদ দত্তের সুখদুঃখ, মাতলামির ঝোঁকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। নিমে দত্ত সেযুগের প্রতীকচরিত্র। উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী হয়েও সংযমের অভাবে সে মদের স্রোতে ভেসে গেছে। কিন্তু সে চরিত্রহীন লম্পট নয়, অন্যান্য বদ দোষ তার চরিত্রে নেই। ইংরেজী শিক্ষার সুরাপানে সে বেসামাল হয়ে পড়লেও শিক্ষা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে মাতলামির ঝোঁকেও সর্বদা আত্মসচেতন। কিন্তু সেই ইংরেজী বিদ্যার কল্যাণের দিকটি সে কাজে লাগাতে পারেনি—তার জীবন পানাসক্তির দোষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার সেই হতাশা, পরাভূত চরিত্রের আত্মগ্লানি ও মনোবেদনা হাস্যপরিহাসমুখর ভাষা ও আচরণের মধ্যে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। আমাদের তো মনে হয়, তার পরিহাস, ভাঁড়ামি, রঙ্গব্যঙ্গ—আসলে এর দ্বারা সে নিজের ব্যর্থ জীবনের কান্নাকেই চাপা দিতে চেয়েছে, কিন্তু মুখের হাসিতে চোখের জল ঢাকা পড়েনি। তার উতরোল হাস্য-পরিহাসের পিছন দিকে যেন অশ্রুনিরুদ্ধ ভগ্নস্বর ক্ষীণসুরে বাজতে থাকে। এ প্রহসন নাটক হয়ে উঠেছে, এর চরিত্র 'ক্যারিকেচর' ছাড়িয়ে যথার্থ নাটকীয় চরিত্র হয়েছে। 'সধবার একাদশী' বাংলার দুর্বল নাট্যসাহিত্যের একটি সবল সজীব সংযোজন, এতে তিনি শেক্‌স্‌পীয়রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে আধুনিক ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মুকুটমণি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অবশ্য এই নাটকে, এবং অন্যত্র তিনি কোন কোন সময়ে একটু স্থূল ও কুরুচিপূর্ণ হাস্যপরিহাসের আমদানি করেছেন। 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশীর' কোন কোন অংশ আধুনিক দর্শকের কাছে কিছু আপত্তির মনে হতে পারে। কিন্তু এ জন্য নাট্যকারকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। নাটকে পাত্র-পাত্রীর যথাযথ স্বরূপ ফোটাতে গেলে ভদ্রভব্য রুচির দিকে তাকালে চলে না। 'নীলদর্পণে'র তোরাপ ও আদুরী, 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্তের কথাবার্তা আধুনিক শ্রোতার কাছে বড়ো বেশী গ্রাম্য, বর্বর ও কুরুচিপূর্ণ মনে হতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়রের ইয়াগো-ফলস্টাফও কি খুব মাপাজোখা ভাষায় কথা বলত? বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, দীনবন্ধু "তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে-ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না, নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে নিমচাঁদ যে-ভাষায় মাতলামি করে তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

দীনবন্ধুর নাট্যসৃষ্টি অবিকল শেক্‌স্‌পীয়রের মতো—অবশ্য সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে। সেই বিশুদ্ধ বস্তুগত দৃষ্টি, জীবনের প্রতি প্রসন্নতা, পরিহাস ও বেদনা, ব্যঙ্গ ও করুণার এমন সমাবেশ আমরা আর কোন বাঙালী নাট্যকারের মধ্যে পাইনি। ম্যাথু আরনল্ড কীট্‌সের কবিদৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "He is with Shakespeare" —সেই কথার প্রতিধ্বনি করে দীনবন্ধু সম্বন্ধেও আমরাও বলতে পারি, "He is with Shakespeare." শুধু শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজিক বোধ তাঁর ছিল না, জীবনরঙ্গমঞ্চের পর্দা তুলে দেখবারও তাঁর ইচ্ছে হয়নি। যদি তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের মতো জীবনসমুদ্রের তলদেশে দৃষ্টিপাত করবার মতো প্রতিভার অধিকারী হতেন তা হলে তাঁকে আমরা অবলীলাক্রমে শেক্‌স্‌পীয়রগোষ্ঠীর পুরোভাগে স্থান দিতাম। সে যাই হোক, বাংলার নাট্যমঞ্চের ক্রমবিকাশে তাঁর নাটকগুলির দাম কম নয়। তাঁর 'নীলদর্পণ', 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকের সৌখীন ও পেশাদার অভিনেতৃসম্প্রদায় প্রথম রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন, তাঁর নাটকগুলিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় খুব জমে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্রের মতো অভিনেতা, প্রযোজক ও শিক্ষক এবং দীনবন্ধুর মতো নাট্যকার ছিলেন বলেই বাংলাদেশের শহর ও শহরতলীতে এত শীঘ্র নাট্যাভিনয় সংস্কৃতির বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

কোন কোন দিক দিয়ে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য ছিলেন, কৈশোরকালে 'সংবাদপ্রভাকরে' তিনি অনেক গদ্য-পদ্য লিখেছিলেন, অবশ্য তাতে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন ছিল না। পরবর্তী কালে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে গদ্য-পদ্য রচনার ধারা রক্ষা করেছিলেন। তাঁর 'সুরধুনী কাব্য' (১৮৭১, ১৮৭৬) 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২) নামে কবিতাগুচ্ছ এবং 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' ও 'পোড়ামহেশ্বর' শীর্ষক গদ্য স্কেচ দুটি এমন কোন প্রতিভাদ্যোতক নয়—অবশ্য 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা অটুট আছে। তবে এসব রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি নয়, নাট্যকার হিসেবেই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর অকালে মৃত্যু হয়, তিনি আর একটু দীর্ঘজীবী হলে বাংলা নাটকের কত যে উন্নতি হত, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

৬. কয়েকজন অপ্রধান নাট্যকার

মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে (প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'—১৮৫৯) গিরিশচন্দ্রের

আবির্ভাবের (১৮৭৭ সালে তাঁর প্রথম গীতিনাট্য প্রকাশিত) প্রায় কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলা নাটমঞ্চের চাহিদা মেটাবার জন্য যে কয়জন মধ্যম শ্রেণীর নাট্যকার মঞ্চসফল নাটক রচনা করেছিলেন, তার শিল্পগুণ অধিকাংশ স্থলে উপেক্ষণীয় হলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য এখানে তাঁদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে। এঁরা হলেন মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায় এবং উপেন্দ্রনাথ দাস।

ঈশ্বর গুপ্তের শেষ ও সক্ষম শিষ্য মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) কোন কোন দিক দিয়ে প্রায় গুরুর পুরোনো ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন, গুরুর ঢঙেই কবিতা লিখতেন, এমন কি একবার কবির লড়াইয়ে গুরুশিষ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং রুচি ও চিত্তপ্রবণতার দিক থেকে তিনি ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সত্য কথা বলতে গেলে মনোমোহনকে নাটুকে না বলে যাত্রাওয়ালা বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাঁর অধিকাংশ নাটক যাত্রার ধাঁচে লেখা, এবং বাস্তবিক সে যুগের যাত্রার অধিকারী মশাইয়েরা তাঁর পৌরাণিক নাটক লুফে নিয়েছিলেন। 'সতী' (১৮৭৩) ও 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) ভক্তিরসে মূর্চ্ছাতুর দর্শকশ্রোতৃমহলের যুগপৎ আনন্দ ও পুণ্যসঞ্চয়স্পৃহা তৃপ্ত করেছিল। তাঁর 'প্রণয়পরীক্ষা' (১৮৬৯) এবং 'আনন্দময়' নাটকে রুচির মুখ বদলাবার জন্য তিনি সামাজিক ও গার্হস্থ্য বিষয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এ ধরনের নাটকে তিনি কিছুমাত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। গিরিশচন্দ্রের অভিনেতা ও নাট্যকাররূপে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালার শেষ উত্তরাধিকারী মনোমোহন বসু লোকখ্যাতির বাইরে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, তাঁর সাহিত্যকর্মের নিত্যসঙ্গী 'জ্যোতিদাদা' অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) নাটুকে আবহাওয়ার মধ্যেই বর্ধিত হয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ীর বালক-কিশোর অভিনয়ের 'অধিকারী মশাই' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয়ে, অভিনয় শিক্ষায় এবং নাটক রচনায় সীমাবদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর দেউড়ি-প্রাঙ্গণ পার হয়ে নাগরিক ও সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়েও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত ও কল্পনামিশ্রিত রোমাণ্টিক নাটক এবং মার্জিতরুচির লঘু নক্শা ও প্রহসন গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যামোদী সৌখীন সম্প্রদায়ের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সর্বোপরি অনেক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি সাধারণের অগম্য ভাস, কালিদাস, শূদ্রক,

ভবভূতিকে বাঙালী পাঠকের সমাজে উপস্থিত করেন। নাটকগুলি বেশ সরল ভাষায় অনূদিত হলেও অভিনয়ের পক্ষে অনুপযোগী এবং সুখপাঠ্যও হয়নি। প্রাচীন সংস্কৃত নাটককে আধুনিক পাঠক ও দর্শক-শ্রোতার দরবারে উপস্থিত করতে গেলে যে ধরনের মৌলিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তাঁর ততটা ছিল না। সে যাই হোক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাস, কল্পনা ও স্বাদেশিকতা মিশিয়ে যে কয়খানি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, তার কিছু অভিনয়মূল্য স্বীকার করতে হবে—যদিও সাহিত্যাংশে তার বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য নয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে পুরু ও আলেকজাণ্ডারের কাহিনী অবলম্বনে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫), 'সরোজিনী'তে (১৮৭৯) আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণকাহিনী, 'অশ্রুমতী'তে (১৮৮২) প্রতাপ-সিংহ ও মানসিংহের বিরোধ এবং 'স্বপ্নময়ী'তে (১৮৮২) বাংলাদেশের শোভা-সিংহের বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রেম ও স্বদেশ-প্রেমের কাল্পনিক কাহিনী উপ-স্থাপিত হয়েছে। 'হিন্দুমেলা'র আদর্শে যাঁর কৈশোর-যৌবন কেটেছে, তিনি যে এই সমস্ত নাটকে ঐ স্বদেশপ্রেমকে ভিত্তি করবেন (কিঞ্চিৎ অনৈতিহাসিক হলেও) তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অতিনাটকীয় অসংযম এবং কল্পনার পরিপক্বতার অভাবে তাঁর এ নাটকগুলি ঐতিহাসিক, ও স্বাদেশিক কোনও দিক দিয়েই উৎকৃষ্ট শিল্প হতে পারেনি। এক যুগের সাধারণ দর্শকদের চক্ষুকর্ণের দাবি মিটিয়ে তাঁর এ নাটকগুলি আজ লোকরুচি থেকে মুছে গেছে। তবে তাঁর হাল্কাচালে লেখা কয়েকখানি প্রহসন মন্দ হয়নি—অন্তত তার বক্তব্যবিষয়, সংলাপ ও চরিত্রগুলি বেশ কৌতুকাবহ এবং স্থূল রসিকতা এতে নেই বললেই চলে। 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) প্রভৃতি প্রহসনগুলিতে যেমন উতরোল অট্টহাস্য নেই, তেমনি ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষজ্বালাও নেই। তিনি আর একটু সতর্ক ও সংযত নাট্যকার হলে এ সমস্ত নাটক-প্রহসন পরবর্তী কালেও জনপ্রিয়তার ধারা অব্যাহত রাখতে পারত। তাঁর বড়ো দান—গিরিশচন্দ্রের পূর্বে এবং সমকালে পৌরাণিক ভক্তিরসের জলাভূমি ছেড়ে ইতিহাসের পাহাড়-পথে অবতরণ এবং স্বদেশপ্রেমের বাস্তব আবেগের গৌরব প্রচার। কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রতিভার অভাবে তিনি এ সমস্ত উপাদান যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেননি।

প্রকৃত প্রতিভার অভাবে মৌলিক বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশলও যে ব্যর্থ হয়ে যায় তার প্রমাণ হলেন কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)।

মনোমোহন বসুর সমকালে বর্তমান থেকে তিনি পৌরাণিক নাটকে প্রকৃত যশো-লাভ করেছিলেন। ফারসী বিষয় নিয়ে চুট্‌কি ধরনের নকৃশা রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। তাঁর 'লায়লামজনু' (১২৯৮) এবং 'বেনজীর বদরেমুনির' (১৩০০) একদা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রকৃত যশ নির্ভর করছে কতকগুলি পৌরাণিক নাটকের ওপর—'পতিব্রতা' (১৮৭৫), 'অনলেবিজলী' (সীতার অগ্নিপরীক্ষা), 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪) সে যুগে পৌরাণিক নাটক হিসেবে বহুস্থানে অভিনীত হয়েছিল। অবশ্য এসব নাটক যাত্রার প্রভাব কখনও ছাড়াতে পারেনি। সুলভ ভক্তিরস, অতি-নাটকীয়তা, হাস্যরস, ভাঁড়ামি —যাত্রানাটকের বাঁধাগৎ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। এসব যাত্রাধর্মী নাটকের যেমন মূল্যই হোক না কেন তিনি অন্য ধরনের গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর কালের পক্ষে প্রতিভা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে তিনি গদ্যকবিতার রচনারীতি সর্বপ্রথম বাংলা রচনায় ব্যবহার করেছিলেন—একে তিনি "পদ্যপংক্তি গদ্য" বলেছিলেন। কিন্তু অনেকে তাঁর প্রতিভার এই দিকটি সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন। নাট্যকার হিসেবে আমরা তাঁকে যাত্রাওয়ালার ওপরে স্থান দিতে চাই না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশক থেকে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে ধীরে ধীরে ইংরেজ-বিদ্বেষের মেঘ জমতে শুরু করে। ম্যাজিস্ট্রেট বা উক্ত পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা পদের সুযোগে বাঙালীর প্রতি নির্মম অত্যাচার করত, এমন কি নারীর প্রতি পশুবৎ ব্যবহারেও এই নরাধমের দল পিছপাও হত না। সে যুগের বাংলা কাগজে এরকম ঘটনা নিত্যই প্রকাশিত হত, ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মনে ইংরেজ-বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খুনজখমমূলক স্বদেশী ভাব জাগছিল। নাটকে এই মনোভাবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন উপেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর দু'খানি নাটক এক সময়ে অভিনয়ে প্রবল উত্তেজনা ও ইংরেজ-বিদ্বেষ সঞ্চার করেছিল। এর বিশেষ কোন নাট্যগুণ না থাকলেও এককালে বাঙালী দর্শক এই নাটকের অভিনয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ত। এর নাম—'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫)। লোমহর্ষক ঘটনা, পিস্তল ছোড়াছুড়ি, খুনখারাবি, ডাকাতি, গোরাপ্রহার, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর যথোচিত শাস্তিবিধান প্রভৃতি উত্তেজক ঘটনা এর প্রধান অবলম্বন। এ ধরনের আধাস্বদেশী মেলো-ড্রামাটিক বাজে নাটক এক

সময়ে বাঙালীর মনে প্রচুর কৌতূহল সঞ্চার করেছিল। আরো একটা কারণে উপেন্দ্রনাথ দাস বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। তাঁর 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের একটি দৃশ্যে লম্পট সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নায়িকার ওপর অত্যাচারের দৃশ্য ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সে যুগের সরকার এর মধ্যে অশ্লীলতা ও রাজদ্রোহ-অপরাধের গন্ধ পেয়ে অভিনয়-রাত্রিতে থিয়েটারে হামলা করল এবং নাট্যকার, প্রযোজক ও অভিনেতৃসঙ্ঘকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারে তাঁরা খালাস পেলেও এই ধরনের নাটকাভিনয় বন্ধ করবার জন্য শাসকশক্তি ১৮৭৬ সালে 'Dramatic Performance Act' পাস করল। এই ব্যাপারের জন্য উপেন্দ্রনাথ দাসের নাম টি বাংলা নাটক ও অভিনয়ের ইতিহাসে উল্লিখিত থাকবে। নাট্যকার কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর রুচি-বুদ্ধি ও রচনাশক্তির বিশেষ উন্নতি হয়নি—তাঁর রঙ্গ-রসমুখর তৃতীয় শ্রেণীর প্রহসন 'দাদা ও আমি' তার প্রমাণ।

এই সমস্ত সামান্য প্রতিভাবান নাট্যকার, যাঁরা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন এবং অর্ধশিক্ষিত দর্শকের মনোরঞ্জনের দিকে চেয়ে নাটক লিখেছিলেন, তাঁদের নামধাম আজ আর বেঁচে নেই, সেজন্য এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত যাঁদের প্রভাবে ও দানে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এখানে সেই দু'জন নাট্যকারের কথা উল্লেখ করি। তাঁরা হলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু।

৭. গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

গিরিশচন্দ্র অভিনেতাদের গুরু, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, এবং বাংলা নাটকের অতি বিখ্যাত রচনাকার। কেউ কেউ তাঁকে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু গ্যারিক শুধু অভিনেতা ছিলেন, এবং দু' একখানি অতি বাজে নাটক লিখেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মতো একাধারে নট-নাট্যকার-নাট্যপরিচালক পৃথিবীর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে। কেউ কেউ আবার ভক্তির আবেগে তাঁকে শেক্‌স্‌পীয়রের পাশে, কেউ-বা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের মাথার ওপরে তাঁকে বসাতে চান। এসব অতিভক্তির বাড়াবাড়ি হাস্যকর। শেক্‌স্‌পীয়রের

প্রতিভা তাঁর আদৌ ছিল না, পরবর্তীকালে পৃথিবীর কোন্ নাট্যকারই-বা সর্বাংশে শেক্‌স্‌পীয়রের সমতুল্য? এসব অলঙ্কৃত অযৌক্তিক বিশেষণ ছেড়ে দিলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয়ের গিরিশচন্দ্র যে প্রতীক-পুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর চেষ্টাতেই বাংলা নাটক সর্বপ্রথম পেশাদারী ব্যাপারে পরিণত হয়, তিনিই সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়কে একটি সুচারু শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, চরিত্রাভিনয়ে তিনি একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেন, নাট্যাভিনয় শিক্ষক হিসেবে নতুন 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত করেন, যেখানে অশিক্ষিতা পণ্যারমণীকেও অসামান্যা অভিনেত্রীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। সর্বোপরি তাঁর নেতৃত্বেই ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় (অবশ্য গোড়ার দিকে তিনি মতবিরোধের ফলে এর থেকে কিছুকাল দূরে সরে ছিলেন), যেখানে সাধারণে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত অভিনয় দেখবার সুযোগ পেত। এর আগে ধনী ব্যক্তির বদান্যতার ওপর অভিনয় নির্ভর করত, এবং সেখানে সাধারণের বড়ো-একটা প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই মনে হয়, গিরিশচন্দ্র না এলে আজ বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যে বিকাশ দেখতে পাচ্ছি, হয়তো তার এতটা শ্রীবৃদ্ধি হত না।

প্রথম জীবনে অভিনয়-পাগল গিরিশচন্দ্রের অভিনেতা রূপেই আবির্ভাব হয়েছিল। নিজে ছিলেন সু-অভিনেতা, এবং বিচক্ষণ শিক্ষার গুণে একদল অনুরাগী অভিনেতার সৃষ্টিও তাঁর অন্যতম কৃতিত্বের পরিচায়ক। ক্রমে ক্রমে তিনি মাইকেল-দীনবন্ধু ও অন্যান্য ছোট-বড়ো নাট্যকারের সব নাটক অভিনয় করে পুরোনো করে ফেললেন, অনেক কাব্য-উপন্যাসকেও নাটকাকারে অভিনয় করলেন, যেমন—মেঘনাদবধ কাব্য, পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্কিম-রমেশের উপন্যাস। কিন্তু সব অভিনয়ই পুরাতন হয়ে গেল, নতুন নাটক না হলে দর্শকের মনস্তুষ্টি হয় না। তখন অভিনেতা গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। একাধারে তিনি নট ও নাট্যকারের দুর্লভ প্রতিভার সমন্বয় দেখালেন। শেস্‌কৃপীয়র নাটক অভিনয়ে ভূমিকা নিলেও সু-অভিনেতা ছিলেন বলে শোনা যায় না। গ্যারিক সু-অভিনেতা হলেও দু একখানি প্রহসন ভিন্ন কিছুই লেখেননি। এদিক থেকে গিরিচন্দ্রের প্রতিভা অনন্যসাধারণ।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশ, প্রহসন, 'পঞ্চরং', রূপক গীতিনাট্য প্রভৃতির সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। অভিনয়, নাট্যালয়, অভিনয়-শিক্ষা

প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থেকেও তিনি যে কি করে শতাধিক নাটক লিখলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, অসংখ্য নাটক-নাটিকা লিখলেও এর অনেকগুলিই শুধু দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্য রাতারাতি লেখা হয়েছিল, নাট্যকার এর নাট্যলক্ষণ বা সাহিত্যগুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। এমন কি কিছু অপ্রিয় হলেও বলা যায়, এই শতাধিক নাটকের ক'খানি শতবর্ষ পরে বাঁচবে তাতে গভীর সন্দেহ আছে। কেউ কেউ সুলভ আবেগ ও যুক্তি-হীন ভাবুকতার বশে বলেছেন, "মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ইংলণ্ডে যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের আদর হইয়াছিল—তেমনি একদিন আসিবে—যেদিন এদেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে, তাঁহাকে আদর করিবে, তাঁহার গুণকীর্তনে গর্ব অনুভব করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার গান, তাঁহার নাটক যাচাই করিবার জন্য সাগর পাড়ি দিতে হইবে না; পশ্চিম হইতে বিদেশীয় শিক্ষার্থী আসিয়া নতজানু হইয়া শিখিয়া যাইবে—গিরিশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য" (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন)। এসব অতিভক্তির ভাবাবেগরুদ্ধ স্তুতিবাদ নিশ্চয়ই সাহিত্যবিচারের উচ্চ আদর্শ নয়।

প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গীতিকাব্য ('আগমনী—১৮৭৭, 'অকাল-বোধন'—১৮৭৭, 'দোললীলা', মোহিনীপ্রতিমা') রচনা ও অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত নাট্যগুণ ও সাহিত্যরসের অভাবের জন্য এগুলির কোনখানিই পরবর্তী কালে অভিনীত হয়নি। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে ভক্তিরসের পৌরাণিক নাটক। তাঁর আগে মনোমোহন ও রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটকে কিছু গৌরব অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি অধিকতর উৎকৃষ্ট হয়েছিল বলে অন্য সকলের যশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮১), 'জনা' (১৮৯৪), 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০) একদা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বাংলা ও বাংলার বাইরে অভিনীত হয়েছে। এখনও 'জনা' নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। 'জনা'র জনার মাতৃহৃদয় ও বীরনারীর অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কনে তিনি খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন। অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে হিন্দুর পুরাণসংস্কৃতির ঐতিহ্যগুলিকে পুনরায় লোকসমাজে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই সময়টা চলছিল বঙ্কিমপ্রভাবের যুগ, যাকে বলে Hindu-revival-এর কাল। এর আগে ব্রাহ্মসমাজের নানা দল-উপদল পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্য-

সম্প্রদায় পৌরাণিক সংস্কৃতিকে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা নতুন করে বিচার করতে আরম্ভ করেন। ফলে শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের অনেকেই পৌরাণিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। ঠিক এই সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়। তাঁদের প্রভাবে হিন্দু সংস্কৃতির পূর্বাপর যোগসূত্রটি (অর্থাৎ বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্য) সকলেরই চিত্তে আশা ও প্রশান্তি এনে দিল। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে কিছু স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হলেও ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করলেন, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব পেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মধ্যে ঠাঁই পেয়ে বেপরোয়া জীবনকে সংহত করলেন, ঠাকুরের প্রতি অচলাভক্তি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অবশ্য তাঁর অনিয়ন্ত্রিত জীবন যথার্থতঃ নিয়মের মধ্যে কোনও দিনই আসতে পারেনি। তবু 'ভক্তভৈরব' গিরিশের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এক বিচিত্র অধ্যায়, আর সেই মনোভাবের স্পর্শ পাওয়া যাবে তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিরসের নাটক-নাটিকায়। এ দিক দিয়ে তাঁর 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪) ও 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৮) আদর্শ ভক্তিরসের নাটক। ভারতীয় পুরাণের প্রধান প্রধান নৈতিক আদর্শ, ভক্তি-নিষ্ঠা প্রভৃতি তত্ত্ব-গুলিকে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে পৌরাণিক ও ভক্তিরসের নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অবশ্য সূক্ষ্মদৃষ্টির সমালোচক হয়তো বলবেন, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটককে যথার্থ নাটক করতে পারেননি। সমসাময়িক দর্শকসমাজের দিকে চেয়ে তিনি নাটক লিখে-ছিলেন বলে আধুনিককালে এ সমস্ত নাটকের সুলভ ভক্তিরস ও করুণরসের বাড়াবাড়ি, এবং স্থূল ধরনের হাস্য-পরিহাস অনেকেরই রুচিকর হবে না। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা পাবার পর যাত্রাধরনের পৌরাণিক ও ভক্তির নাটকে তাঁর অকপট হৃদয় এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, এর নাট্যলক্ষণ যাই হোক না কেন, নাট্যকারের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হবে। এযুগের বাঙালী-ঐতিহ্যের পরিচয় পেতে হলে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতেই তার অনেক সূত্র মিলবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'র পটভূমিকায় গোটা বাংলাদেশে যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের দল তাতে যোগ না দিয়ে পারেননি। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের কারবারী হলেও

সমসাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তাপের অাঁচ পেয়েছিলেন। সেই স্বাদেশিক অনুরাগ তাঁর কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকে ফুটে উঠেছে। 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'অশোক' (১৩১১), 'সৎনাম' (১৯০৪)—এই সমস্ত ঐতিহাসিক বা ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক বোধ লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হয়েও ইতিহাসের ঘটনাকে খুব নিপুণভাবে অনুসরণ করেননি। 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিমে'র আখ্যানভাগ গ্রহনে মৌলিক উৎসের সন্ধান না নিয়ে তিনি শুধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের দু'খানি গ্রন্থকে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করেছিলেন। অকারণে স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থানকালপাত্রের অনৈতিহাসিকতা, অতিনাটকীয়তা, বাস্তববোধের অভাব—ইত্যাদির ফলে তাঁর নাটক যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক হতে পারেনি। তিনি যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ নাটকরচনার দাবি মেটাতে পারেননি।

তাঁর কয়েকখানি গার্হস্থ্য নাটক (দু-একখানিতে সমাজ-জীবনের ইঙ্গিতও আছে) একসময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—সে জনপ্রিয়তা এখনকার খুব কম নাট্যকারের ভাগ্যে জুটে থাকে। তাঁর 'প্রফুল্ল' নাটকের জনপ্রিয়তার কথা প্রায় অবিশ্বাস্য। সুদূর পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক দর্শক কলকাতায় আসতেন শুধু 'প্রফুল্লে'র অভিনয় দেখবার জন্য। অনেকে বসবার আসন না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাটক দেখতেন। গিরিশচন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা সমস্যা, দুঃখবেদনা, কারও কারও চারিত্রিক অধোগতি ও পানাসক্তি—যার ফলে অনেক পরিবার উচ্ছন্নে যেত, তিনি তাদের সব সংবাদ রাখতেন। নাটকে তিনি সেই পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সমস্যাগুলিকে করুণরসের দ্বারা মূর্ত করে তুলেছিলেন। একটা বিশেষ অঞ্চলের সমস্যা গোটাদেশের সমস্ত পরিবারের সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছিল। তাঁর 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ), 'মায়াবসান' (১৮৯৮) প্রভৃতি নাটকগুলি মূলতঃ পারিবারিক নাটক। অবশ্য কোন কোনটিতে সামাজিক সমস্যা (যেমন, বিধবা বিবাহ) ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ('মায়াবসান') কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। মদ্যাসক্তি, পারিবারিক বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কুমারী ও বিধবার বিবাহ-সমস্যা, লাম্পট্য, জাল-

জুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা—এই বিষয়গুলি তাঁর পারিবারিক নাটকে ঘুরে ফিরে এসেছে। তখন একান্নবর্তী পরিবারে ফাটল ধরেছে, সেই ভাঙা পরিবারের ছবি তাঁকে অনেক সময় এই ধরনের নাটক লিখতে উৎসাহ দিত। অবশ্য তাঁর সমাজিক নাটকগুলিতে অনেক সময়েই বিশেষ কোন তীক্ষ্ণ ও দুরূহ সমস্যার বিশ্লেষণ ও সত্যরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা নেই, করুণরসাত্মক ('প্রফুল্ল') নাটকের পিছনে ট্র্যাজেডির কোন অমোঘ তাড়না নেই। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ও লম্পটে ভালোমানুষের চরিত্রে দু' একটি ছিদ্র পেয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং সেই সৎলোকটিকে অধঃপাতের চরম তলায় টেনে নিয়ে যায়—তাঁর অধিকাংশ সামাজিক, পারিবারিক নাটকের এই হল মূল অবলম্বন। 'প্রফুল্ল' নাটকটি সেযুগে এবং এযুগেও শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্র্যাজেডি বলে বিখ্যাত হয়েছে। দোষেগুণে এটিই গিরিশ-প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। কেমন করে যোগেশের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' এ নাটকে সেই মর্মন্তুদ ঘটনা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে বলা হয়েছে। এর করুণরস আবেগবহুল হলেও খাঁটি মানবিক বলে অভিনয়ে এখনও এ নাটক অতিশয় জনপ্রিয়। তবে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডির আদর্শে বিচার করলে 'প্রফুল্ল'কে যথার্থ ট্র্যাজেডি বলা যাবে না। অতিনাটকীয়তা, খুনজখম, মাতলামি প্রভৃতির বাড়াবাড়ির ফলে এর ট্র্যাজিক রস বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে—ট্র্যাজেডির সান্ত্বনাহীন হতাশা, শুষ্ক নয়নের অগ্নিজ্বালা গিরিশচন্দ্র কেন, কোন বাঙালী নাট্যকারই আয়ত্ত করতে পারেননি। সুতরাং 'প্রফুল্ল' করুণরসের নাটক হলেও ট্র্যাজেডি হিসেবে বিশেষ সার্থক হয়নি। তাঁর অন্যান্য সামাজিক নাটক সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়।

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি রঙ্গব্যঙ্গ নাটিকা ('সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক-বাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা', ব্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রভৃতি) রচনা করেছিলেন, তাঁর যুগে এগুলির বেশ অভিনয়ও হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখছি, হাস্যরসের এই প্রহসনগুলির হাসির মূল উৎস—লেখকের হাস্যরস-সৃষ্টির শোচনীয় অক্ষমতা। এর সংলাপ অস্বাভাবিক ও 'স্ল্যাং', কাহিনী নামমাত্র, এর ধরনধারণ ঠিক যেন ভদ্ররুচির উপযোগী নয়। তবে 'আবুহোসেন' গীতি-নাট্যটি নিতান্ত মন্দ নয়।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পরিকল্পিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। অভিনয় শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন মধুসূদনের চৌদ্দমাত্রার

অমিত্রাক্ষর ছন্দ অভিনয়ে বড়ো দুরূহ হয়ে পড়ে। তখন তিনি উচ্চারণ ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য চৌদ্দমাত্রার পংক্তিকে ভেঙে ছোট ছোট ছত্রে সাজিয়ে নিলেন। এই ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁরই নামানুসারে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হয়েছে। অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষকরূপে তিনি এই যে নতুন ছন্দের উদ্ভাবন করলেন, পরবর্তীকালেও অন্যান্য নাট্যকার তা গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে নানা ত্রুটি থাকলেও একনিষ্ঠ সরলতার জন্য এগুলির অভিনয়-মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক তাঁর রচনার মধ্যে কৃত্রিমতার ঠাঁই ছিল না। তবে শুধু অকৃত্রিমতাই শ্রেষ্ঠ নাটকের একমাত্র গুণ নয়। রচনার সংযম ও সৌষ্ঠব, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবন সম্বন্ধে নাট্যকারের গভীর প্রত্যয়—এসব তাঁর কতটা আয়ত্ত হয়েছিল তা অবশ্য আজকের সমালোচক জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তার যৌক্তিক উত্তর না পেলে—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাট্য-কারের গৌরব কিছু খর্ব করতে চাইলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে না।

৮. অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

রসরাজ অমৃতলাল বসু বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান, রঙ্গরসের বিখ্যাত নাট্যকার এবং স্বয়ং অভিনেতা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে এত দ্রুত নাট্যকলা ও রঙ্গভূমির উন্নতি করতে পেরেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পরেও অমৃতলাল বসু অনেক দিন জীবিত ছিলেন এবং নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতা ছিল, গুরুগম্ভীর ও রঙ্গব্যঙ্গ উভয় ভূমিকাতেই তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন—অবশ্য অভিনয়-শিক্ষায় গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকেও তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের আদর্শে অভিনয়ের অবকাশে কিছু কিছু গম্ভীররসের ও লঘু-ধরনের নাটক লিখেছিলেন। তাঁর প্রতিভা কিন্তু পুরোপুরি প্রহসনকারের প্রতিভা। তিনি ইতিহাস ও সমাজকে অবলম্বন করে কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন বটে, কিন্তু না লিখলেও নাট্যসাহিত্যের একটা বড়ো রকমের ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। 'হীরকচূর্ণ' বা 'গায়কোয়াড় নাটক' (১৮৭৫), 'তরুবালা' (১৮৭১), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৯৯), 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) প্রভৃতি নাটকের কোনখানিতে পৌরাণিক কাহিনী, কোনখানিতে ইতিহাস, কোনখানিতে বা সমসাময়িক পারিবারিক জীবনচিত্র গৃহীত হয়েছে। এগুলি কোন দিক দিয়েই গিরিশচন্দ্রকে ছাড়াতে

পারেনি। 'যাজ্ঞসেনী' অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে (১৯২৮) রচিত হলেও নাট্যকার এখানে যমকের চমক লাগিয়ে বাজি মাৎ করতে চেয়েছেনে এবং যাত্রার আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। ফলে 'যাজ্ঞসেনী' অসহ্য ভাঁড়ামি বলে মনে হয়। 'হরিশ্চন্দ্র' কিন্তু অভিনয়ের নাটক হিসেবে সেযুগে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'তরুবালা'র জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। 'গায়কোয়াড় নাটকে' গায়কোয়াড়ের শ্বেতাঙ্গ রেসিডেন্টের মৃত্যু-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি মন্দ হয়নি। তবে নাট্যলক্ষণ ও সাহিত্যমূল্য নিতান্তই ক্ষীণ।

কমেডি, রঙ্গনাটক ও ব্যঙ্গপ্রহসন রচনাতেই অমৃতলালের প্রতিভার যথার্থ পরিচয়—যেজন্য তাঁকে 'রসরাজ' বলা হত। স্নিগ্ধ পরিহাসমুখর রোমান্টিক নাটক হিসেবে 'নবযৌবন' (১৯১৪) এবং 'ব্যাপিকাবিদায়' এখনও অতুলনীয়। অবশ্য অমৃতলালের নিন্দা-প্রশংসা নির্ভর করছে প্রধানত তাঁর রঙ্গ-কৌতুক ও ব্যঙ্গনাটকের ওপর। 'বিবাহবিভ্রাট' (১৮৮৪), 'রাজাবাহাদুর' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ), 'খাসদখল' (১৯১২)—এগুলি সামাজিক ব্যঙ্গমূলক রঙ্গনাট্য হিসেবে একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, কলকাতার পেশাদারী ও গ্রামের সৌখীন সম্প্রদায় রাতের পর রাত এই সমস্ত রঙ্গকৌতুক নাটক অভিনয় করতেন। এই নাটকগুলিতে ব্যঙ্গের জ্বালার চেয়ে অসঙ্গতিজনিত কৌতুকরসই প্রধান। কিন্তু যে নাটক-নাটিকায় তিনি এক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, এবং অন্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর নিন্দা-বিদ্রূপ লাভ করেছেন, সেগুলি হল তদানীন্তন সামাজিক অনাচার ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তাঁর তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত। ব্রাহ্মসমাজ, বিলেত-ফেরতা ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, স্ত্রীস্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মিউনিসিপ্যাল ভোটরঙ্গ, শূন্যগর্ভ স্বাদেশিক আন্দোলন—কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'একাকার' (১৩০১ বঙ্গাব্দ), 'কালাপানি' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ), 'অবতার' (১৩০৮), 'বাবু' (১৩০০), 'বাহবা বাতিক'—প্রভৃতি প্রহসনে বাঙালী সমাজের নানা অনাচার, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তীব্র ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে। অমৃতলাল সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে কিছু রক্ষণশীল ছিলেন, ইংরেজী কেতা ও ব্রাহ্ম বাড়াবাড়িকে তিনি সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদগামী ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দৃষ্টি-ভঙ্গীর ঈষৎ গোঁড়ামি বাদ দিলে এরকম তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎকশাঘাত, বাগভঙ্গীর এতটা অট্টরোল, মাঝে মাঝে নাটকীয় কাহিনী গ্রন্থনের আশ্চর্য নিপুণতা আর

কোন বাংলা নাটক ও প্রহসনে দেখা যায় না। তাঁর 'কৃপণের ধন' (১৯০০) এবং 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুয্যে' (১৮৮৪) প্রহসনে ব্যঙ্গের তীব্রতা কিছু কম বলে অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে। দু'একখানি প্রহসনে পাশ্চাত্ত্য প্রহসনের কাহিনী ও চরিত্রও অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু সে অনুসরণ সার্থক।

অমৃতলাল শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ছিলেন, নাটক-প্রহসনে অতি অদ্ভুত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকপরিহাস আমদানি করতে পারতেন। বুদ্ধির দীপ্তি, বাক্‌রীতির মার-প্যাঁচ, কাহিনীর চাতুরী—সব কিছুর অধিকারী হয়েও তিনি আগামী যুগের পদধ্বনি শুনতে পাননি; যা কিছু সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল, শুধু তার মন্দের দিকটাকেই নিন্দা-বিদ্রূপ করেছেন। সেই নিন্দা-বিদ্রূপ কখনও সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি, কখনও আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের প্রতি নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্যকার হয়েও পরের যুগে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে চলে গেছেন। তবে সম্প্রতি হাওয়া ফিরছে। অধুনা অনেক সৌখীন নবনাট্য-সম্প্রদায় তাঁর একাধিক প্রহসনের যুগোপযোগী রূপ দিয়ে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত অভিনয় দেখে মনে হয়, অমৃতলাল এখনও বিস্মরণীর পরপারে নির্বাসিত হননি। তাঁর রচনাকে এখনকার কালের দর্শকেরাও বেশ উপভোগ করতে পারবেন।

—

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলা কাব্যে নবযুগ ঃ মহাকাব্য

১. সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে পুরাতন ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হল, এবং নবধারার শ্রেষ্ঠ সাধক মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব হল। জীবিতকালে লঘুচপল রঙ্গরসের পদ্য লিখে গুপ্তকবি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, সাংবাদিকতা ত'াকে এ বিষয়ে অধিকতর খ্যাতি দিয়েছিল। ত'ার আপাত-তুচ্ছ ছড়া ও কবিতাগুলির পশ্চাতে সমসাময়িক বাংলাদেশের, স্বাদেশিক অনুভূতির প্রথম জাগরণ এবং বাস্তবজীবনের প্রতি আসক্তি আছে বলে সে যুগের তরুণসম্প্রদায়, যাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের যাত্রী ছিলেন ত'ারাও ত'াকে শ্রদ্ধা করতেন, কেউ কেউ ত'াকে কৈশোর-যৌবনে গুরু বলেও বরণ করেছিলেন। তাঁরা গুপ্তকবির 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রে গুরুর অনুকরণে অনেক ছড়া-পদ্য লিখেছিলেন। অবশ্য এই ধরনের রঙ্গকৌতুকের কবিতায় সাময়িক তৃপ্তি হলেও ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার ক্রমপ্রচারের ফলে আধুনিক মার্জিতরুচির পাঠক বিশাল গভীর জীবনকে কাব্যকবিতায় প্রতিফলিত দেখতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজী ধরনের শিক্ষাপ্রণালী শহর-শহরতলী ছাড়িয়ে দূরান্তরের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, কলেজে-পড়ুয়া ছাত্রের ভিড় বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তাতে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের আয়োজন চলেছে। এই ধরনের বিশাল মানব-বোধের পটভূমিকায় আর গুপ্তকবির ভ'াড়ামি ভালো লাগল না। এখন নবজাত গরুড়কে মহাক্ষুধা পীড়িত করছে—সে মহাক্ষুধা আত্মার অভীপ্সা, আত্মসম্প্রসারণের আকূতি। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফতে শিক্ষিত বাঙালী যে বিরাট মহাদেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে, সেই জীবন-দর্শন ও কাব্যপ্রত্যয় বাঙালী পাঠক ও কবিকে নতুন দিগন্তে পাখা মেলতে ব্যাকুল করে তুলল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা কখনও ইতিহাসের বীররস, কখনও প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির প্রাণরস আহরণ করে কেউ লিখলেন ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য, কেউ লিখলেন পুরোদস্তুর মহাকাব্য। বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উল্লিখিত কবিদের দ্বারাই আধুনিক জীবনোল্লাসের উদ্বোধন হল। এতদিন যে জীবনরস নানা বাধানিষেধের পঙ্ককুণ্ডে স্থবির

হয়েছিল, এই সমস্ত কবির রচনায় সেই প্রবাহ পঙ্কশয্যা ত্যাগ করে সাগরগামী হল—এককথায় উনিশ শতকী বাঙালী-রেনেসাঁসের নান্দীপাঠ করলেন রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র। প্রথমে রঙ্গলালের কথা আলোচনা করা যাক।

২. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)

প্রথম জীবনে রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের 'শাগরেদি' করে এবং 'সংবাদপ্রভাকরে' হাত পাকিয়ে (র. ল. ব. ছদ্মনামে) কতকগুলি বাজে কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু ইংরেজীভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে তিনি ইংরেজী ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের আদর্শে রাজপুত দেশপ্রেমের ঘটনা অবলম্বনে স্বদেশ-প্রেমমিশ্রিত ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের পত্তন করলেন। বলতে গেলে বাংলা কাব্যের পালাবদলের গৌরব সর্বপ্রথম রঙ্গলালের প্রাপ্য। খিদিরপুরের একই পাড়ায় মধুসূদনের বাড়ীর কাছে তিনি বাস করতেন, মাইকেলের সঙ্গে কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি কিছুকাল বিখ্যাত পত্রিকা 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করে নিজ গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যে তাঁর পদার্পণের ইতিহাস কৌতূহলজনক। সে যুগের ফ্যাশন অনুসারে কালেজী পড়ুয়ার দল বাংলা সাহিত্যকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করত। এমন এক সভায় কোন এক উগ্রপন্থী 'আধুনিক-ওয়ালা' ইংরেজীনবিশ ব্যক্তি ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বক্তৃতা করেন। তাঁর অভব্য ও উগ্র বাংলা-বিদ্বেষ স্বদেশপ্রাণ ও স্বদেশের ভাষার অনুরাগী রঙ্গলাল সইতে পারেননি। তিনি ১৮৫২ সালে বীটন সোসাইটির অধিবেশনে 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক বক্তৃতায় বাংলা সাহিত্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত নিন্দাবিদ্রূপের যথোচিত জবাব দিলেন। তখন বোধ হয় তিনি ভারতচন্দ্রের আদিরস এবং ঈশ্বর গুপ্তের কৌতুকরস ছেড়ে গভীরতর বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বীররসকে কেন্দ্র করে মানবচেতনাকে উদারতর ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই রঙ্গলাল মধুসূদনের পূর্বেই মহাকাব্যের বীজ বপন করেন—অবশ্য তিনি মহাকাব্য লিখতে পারেননি, তাঁর মহাকাব্যগুলি স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক হলেও মহাকাব্যের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি, সেগুলি হয়েছে পুরোনো ছাঁদে লেখা ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী'

(১৮৬৮) এবং 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)—এই ক'টি তাঁর আখ্যানকাব্য। 'কুমারসম্ভবে'র কিয়দংশের অনুবাদ (১৮৭২) করলেও অনুবাদে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তিনি একখানি প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য ব্যঙ্গকাব্যের অনুবাদ করেন, এটি 'ভেকমূষিকের যুদ্ধ' নামে (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য এ রচনাও কোনদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়। এ ছাড়াও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু কবিতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কবি রঙ্গলাল অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যকবিতার ছাঁদে এবং স্কট, ম্যুর, বায়রণ প্রভৃতির আদর্শে স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে ক'টি বীররসের আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন, তার কাব্যমূল্য যাই হোক না কেন, তার দ্বারাই মাইকেলের আগমনী সূচিত হয়েছিল। টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan*-এ আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ এবং জহরব্রতে আগুন জ্বালিয়ে পদ্মিনীর আত্মাহুতি দানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় কবি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) তারই ওপর ভিত্তি করেছেন। এ কাহিনী যে পুরোপুরি ঐতিহাসিক তা মনে করবার কারণ নেই। আধুনিক গবেষণায় আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ প্রমাণিত হলেও এর সঙ্গে পদ্মিনীর কাহিনীর কোন সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু রাজস্থানে অনেককাল থেকেই সতী পদ্মিনীর জহরব্রতে আত্মত্যাগ-সংক্রান্ত অনেক কাহিনী ভাট ও চারণদের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে। রঙ্গলাল বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীসহ ঐতিহাসিক পরিবেশে প্রবলভাবে স্বাদেশিক রস দিয়ে বীর ও করুণরসের এই আখ্যানকাব্য রচনা করে সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তের আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি—কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। বিশেষত কবি আধুনিক যুগের রচনাকার হয়েও এই বীররসাশ্রিত কাব্যে পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপ-একাবলীর গতানুগতিক পর্যুদস্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন : ফলে এর বাণীমূর্তি প্রাণোচ্ছল নয়, নবযুগের বার্তাবহও হতে পারেনি। কিন্তু ভাবের মধ্যে যে বীররস, রৌদ্ররস ও করুণরসের স্বচ্ছন্দপ্রকাশ ঘটেছে শুধু তার জন্যই তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' স্মরণীয় হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাণা ভীম সিংহের উৎসাহবাণী সকলের কণ্ঠস্থ আছে। তবু এখানে তা থেকে একটু উদ্ধৃত করি :

> স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
> দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়।

এ ভাষা অত্যন্ত লঘু ধরনের, কিন্তু মর্মার্থ রুদ্ররৌদ্রাকীর্ণ যুদ্ধভূমিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বাঙালীর স্বাধীনতার উজ্জীবনলগ্নে এ গান সমরসঙ্গীতের কাজ করেছিল। 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' রাজপুত ইতিহাস থেকে এবং 'কাঞ্চিকাবেরী' ওড়িয়া ভক্তির উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এতেও কবি কোন উল্লেখযোগ্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি, শুধু মুঘল আক্রমণে হিন্দুর উত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে কতকটা আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় ব্যবহার করেছেন—এইটুকু যা উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাবভঙ্গিমাই তাঁকে আধুনিক কবির পূর্ণ গৌরব দিতে পারেনি। অথচ তিনি ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত কাব্যেও তাঁর অধিকার প্রশংসনীয়, 'কুমারসম্ভবে'র অনুবাদই তার প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক মনোভাবের অধিকারী হয়েও রঙ্গলাল সে আবেগকে আধুনিক যুগোপযোগী বাণীমূর্তি দিতে পারেননি। মনে হয় ইংরেজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর মনের বাইরেই শুধু আঘাত লেগেছিল, সমগ্র সত্তা আলোড়িত হতে পারেনি। তিনি আধুনিকতা বলতে বিষয়পরিবর্তন বুঝেছিলেন, কাব্যমূর্তির আমূল পরিবর্তন বুঝতেও পারেননি, সূচনাও করেননি। মাইকেলের সঙ্গে এক পাড়াতে (কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে) বাস করলেও তাঁর মনোভাব পুরাতনের গুটি কেটে নতুন আকাশে পাখা মেলে উড়তে পারেনি। মহাকাব্য দূরের কথা, বীররসাত্মক আখ্যানকাব্য রচনাতেও তিনি বড়ো একটা সাফল্য লাভ করেননি। তাঁর অনুবাদ-শক্তিও নামমাত্র, 'কুমারসম্ভবে'র অনুবাদ আক্ষরিক হয়েছে, কিন্তু শিল্পসম্মত হয়নি। কালিদাসের কুমারের

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ (৩য়।৪৮)*

এই মেঘস্তনিত ধ্যানগম্ভীর শব্দরাজির ভাষান্তর রঙ্গলালের হাতে এই আকার লাভ করেছে—

---

* অনুবাদ—ত্রিলোচন তখন শরীরমধ্যস্থ বায়ুদের রোধ করে রেখেছিলেন, এই জন্য মনে হচ্ছিল, যেন তিনি বৃষ্টির আড়ম্বরহীন একখানি জলভরা গম্ভীর ধরনের মেঘ, অথবা তরঙ্গক্ষোভবিহীন প্রশান্ত সমুদ্র, কিংবা লেশমাত্র-বায়ু-বর্জিত স্থানের নিষ্কম্প শিখাবিশিষ্ট একটি প্রদীপ।

যথা বর্ষাভাবে স্থির মেঘের বিস্তার,
সেইরূপে প্রাণ আদি বায়ুর সঞ্চার,
তরঙ্গবিহীন হ্রদে অপাননিরোধ,
নিবাতনিষ্কম্প দীপ সমান উদ্বোধ ॥

এ অনুবাদ আড়ষ্ট, রসবর্জিত এবং অতি দুর্বল। তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত নীতি ও তত্ত্বমূলক উদ্ভট কবিতার যে অনুবাদ করেছিলেন ('নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত) সেগুলি নিতান্ত মন্দ হয়নি।

বায়সের যদি হয় চঞ্চুটি সুবর্ণময়।
মাণিক মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি প্রকাশে বিমলজ্যোতি
তবু কাক রাজহংস নয়।

অথবা

গ্রন্থগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন ॥

কিংবা

মাতা নিন্দাপরায়ণ পিতা প্রিয়বাদী নন
সোদর না করে সম্ভাষণ।
ভৃত্য রাগে কহে কত পুত্র নহে অনুগত
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন এই ভয়ে বন্ধুগণ
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই এ কারণ কর ধন উপার্জন
ধনেতেই সব বশ হয়।

এপিগ্রামের উদাহরণ হিসেবে এ অনুবাদগুলি নীতিঘেঁষা হলেও নিতান্ত অরুচিকর মনে হচ্ছে না। বিশেষত কবি শেষ উদ্ধৃতিতে যেভাবে ধনের জয়গান করেছেন, তাতে তাঁর দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয়। এখানে নীতি-উপদেশটি ('ধনেতেই সব বশ হয়') কঠোর বাস্তবজীবনের বাণী বহন করছে। যাই হোক রঙ্গলাল কবিত্বের দিক থেকে খুব উচ্চ স্থানের অধিকারী না হলেও তিনি ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের মাঝখানে সংযোজক হিসেবে বর্তমান ছিলেন। খাঁটি বাঙালী গুপ্তকবি এবং 'ডাহা ইংরেজ' মধুসূদনের মাঝখানে রঙ্গলাল দাঁড়িয়ে আছেন, অনেকটা রাজনীতির 'বাফার স্টেটের' (Buffer State) মতো। পুরোপুরি নবজীবনের

জয়বার্তা ঘোষণা করতে না পারলেও তিনি তাঁর প্রাথমিক সূচনা করেছিলেন, শুধু এইজন্যই রঙ্গলাল বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

রঙ্গলাল বাইরের দিক থেকে নবজীবনের সামান্যতম স্পর্শ পেয়েছিলেন আর মাইকেল মধুসূদন সেই নবজীবনের বার্তাবহ হয়ে বাংলা কাব্যের প্রাঙ্গণে সবলে এবং সরবে প্রবেশ করলেন। এতদিন কঠিন পাষাণের ঘুম ভাঙেনি, তার অচেতন দেহের উপর রঙ্গলাল বৃথাই পয়ার-ত্রিপদীর খোঁচা মেরেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের প্রচণ্ড আঘাতে পাথর জেগে উঠল, আর পাথরের তলায় বন্দিনী ভাবমন্দাকিনীও মুক্তি পেল। উনিশ শতকী রেনেসাঁসের প্রতীক হিসেবেই তাঁকে ধরা হয়ে থাকে ; পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে প্রাচ্যভূমির যে সংযোগ হল এবং সে সংযোগের বিদ্যুৎস্পর্শ ছড়িয়ে পড়ল প্রধানত সাহিত্যে, মধুসূদন তারই নকিব। এতদিন ধরে আমরা যে জীবনপ্রত্যয় ও কাব্যাদর্শের মধ্যে নিরুদ্বেগ জীবনযাপন করছিলাম, বাণীর বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদন সেই শান্তির নীড়ে বজ্রাঘাত করলেন, আমরা চকিত চমকে তাকিয়ে দেখলাম—মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা হতমান হয়ে পড়েছেন, রামায়ণ-মহাভারতের পাঁচালীর মন্থর সুর শেষ হয়ে গেছে, বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্তনরসও স্তিমিত হয়ে পড়েছে—আর সেখানে প্রচণ্ড কলরবে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ-উচ্চৈঃশ্রবার তীব্রগতিবেগে, চিরাচরিত সংস্কারের ধূলিশয্যা গ্রহণে নতুন কাব্যরূপ ও জীবনপ্রত্যয় নেমে এসেছে। মহাকবি মধুসূদন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতির সূচনা করে সাত বছরের মধ্যেই, সত্তর বছরের ইতিহাস রচনা করে গেলেন। তাঁর বাংলা সাহিত্যে পদচারণা মাত্র সাতটি বৎসরের মধ্যেই সমাপ্তি লাভ করেছিল। তিনি দীর্ঘজীবী হলে, বাংলা সাহিত্য আর একটু ধৈর্যের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারলে তাঁর মধ্যে আমরা এক দুর্লভ ব্যক্তিসত্তা ও কবিপ্রতিভার পরিচয় পেতাম।

মধুসূদনের নাটকীয় জীবনকাহিনী প্রায় শিক্ষিত লোকেরই জানা আছে। যে-জীবনে গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল, যিনি বিত্তের ওপর আসন করে বসলেও শেষ জীবনে হাসপাতালে অনাত্মীয় পরিবেশে মারা গিয়েছেন, অমিত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নৈরাশ্যের বুকভরা নিশ্বাস নিয়েই যিনি জীবনরঙ্গমঞ্চ থেকে রোগজীর্ণ শরীরে বিদায় নিয়ে গেলেন, তাঁর কথা কে না

জানে? জীবনে তিনি কিছুই হাতে রাখেননি, সবকিছু ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছেন, বুকের পঞ্জরে অভাব-অনটন-রোগশোকের আগুন জ্বললেও এই নব 'প্রমিথ্যুস' নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গৌড়জনের জন্য যে যজ্ঞাগ্নি রেখে গেছেন, তার জন্য বাংলার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠকসমাজ তাঁকে চিরদিন অন্তর থেকে সাধুবাদ দেবেন। তাঁর জীবনকথা নাট্যাভিনয়, ছায়াচিত্র প্রভৃতিতে এত প্রচারিত হয়েছে যে, এখানে সেকথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবু দু' একটি কথা বলা উচিত। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টান হয়েছিলেন বলে কোন কোন জীবনীকার তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হয়েছেন, কেউ কেউ তাঁর চরিত্রের ওপরেও কটাক্ষপাত করেছেন। কিন্তু সংস্কারান্ধ দৃষ্টি পরিত্যাগ করে খোলা চোখে চেয়ে দেখলে দেখা যাবে, মধুসূদন খ্রীস্টান হয়েছিলেন বলেই আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাকবিকে পেয়েছি। খ্রীস্টান হয়ে এবং বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়ে তিনি য়ুরোপের ক্লাসিক ও আধুনিক ভাষা শিখেছিলেন। ফলে মহাকাব্য রচনায় তিনি প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তিনি যদি খ্রীস্টান না হতেন এবং বিশপ্‌স্‌ কলেজে না পড়তে পেতেন তা হলে মাইকেল মধুসূদন, মহাকবি মধুসূদন হতে পারতেন না, বড় জোর হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র হতেন। তিনি অপরিমিত সুরাপান করতেন, ভয়ানকভাবে অপব্যয়ী ও দানশৌণ্ডিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে আর কোন দোষ ছিল না। যাই হোক, এতবড়ো কবিপ্রতিভা এবং অপরিমেয় মানসিক শক্তির অধিকারী কোন কবি ইদানীং ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যেও পদার্পণ করেননি। এখানে আমরা তাঁর কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

বাল্যকালে মধুসূদন ইংরেজী কবিতায় হাত পাকিয়েছিলেন, প্রথম যৌবনে ইংরেজী কবিতা রচনার নেশায় বুঁদ হয়ে তিনি ছোট বড়ো অনেক কবিতা ও খণ্ডকাব্য লিখেছিলেন—তার মধ্যে মৌলিকতার বিশেষ কোন পরিচয় নেই। সে যুগে তাঁর অনেক কবিতা শ্বেতাঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। অশনে-বসনে খাঁটি ইংরেজী ধরন অবলম্বন করে মাইকেল মধুসূদন মনে করেছিলেন, তিনি বায়রনের মতো কবি হবেন, ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে নাম রেখে যাবেন। মান্দ্রাজে থাকার সময় তিনি নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে মান্দ্রাজ থেকে 'Madras Circulator' পত্রিকায় তিনি 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে *A Vision of the Past—Captive Ladie*

শীর্ষক একখানি ইংরেজী কাব্যে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী বর্ণনা করেন। পরে এটি ১৮৪৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য বাঙালীর রচনা হিসেবে খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু অগাধ সমুদ্রতুল্য ইংরেজী কাব্যের তুলনায় এর এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা একে কালজয়ী করবে। তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাক এ কাব্যের এক কপি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি গুণগ্রাহী জে. ই. ডি. বেথুন (বীঠন) সাহেবকে পাঠিয়ে দেন মতামতের জন্য। বেথুন সাহেব এ কাব্য পড়ে কবিকে খুবই প্রশংসা করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, এই ভারতীয় কবি ইংরেজী কাব্যসমুদ্রে পাড়ি জমানোর বৃথা চেষ্টা না করে বরং মাতৃভাষার চর্চা করুন, অক্ষয় যশ লাভ করবেন। তাঁর এই অতি বিচক্ষণ মতামত গৌরদাস মান্দ্রাজে বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বেথুন সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে তিনিও মধুসূদনকে বাংলা কাব্যে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ করলেন। কারও কথা শুনে মাইকেল অভিলষিত পথ ছেড়ে দেবেন, এমন পাত্র তিনি ছিলেন না। সুতরাং বেথুন সাহেবের একখানা চিঠি তাঁর কাব্যতরণীর মোড় ঘুরিয়ে দিল, তিনি দীর্ঘদিনের ইংরেজী কাব্যানুশীলন ছেড়ে দিয়ে ঝটিতি বাংলা কাব্যে পদার্পণ করলেন এটা পুরোপুরি ঐতিহাসিক সত্য নাও হতে পারে। আমাদের মনে হয়, মধুসূদনের মতো সূক্ষ্ম কবিত্ববোধ-সম্পন্ন ও সমালোচনায় অধীতবিদ্য বহুভাষাবিৎ কবি পরদেশী ভাষায় কাব্যরচনার বিড়ম্বনা নিশ্চয়ই পূর্বে বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু দূর প্রবাসে থেকে এ বিষয়ে তখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। উপরন্তু *Captive Ladie* লিখে তিনি যতটা যশ আশা করেছিলেন ততটা পেলেন না, মাঝখান থেকে কলকাতার ক্ষুদ্রমনা ফিরিঙ্গী কাগজের শ্বেতাঙ্গ সম্পাদকের কাছে থেকে শুধু ভর্ৎসনাই লাভ করলেন। ঠিক এইরকম মানসিক বিপর্যয়ের মুখে তিনি বেথুন সাহেবের মন্তব্য এবং গৌরদাসের অনুরোধজ্ঞাপক চিঠি পেলেন। অন্তরের নৈরাশ্য এবার নতুন পথের সন্ধান পেল—তিনি মাতৃভাষায় কাব্য রচনার সিদ্ধান্ত করলেন এবং মান্দ্রাজে বসেই সংস্কৃত, বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা এবং হিব্রু, লাতিন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ভাষা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনো করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য—বিশ্বসরস্বতীর প্রাঙ্গণ থেকে নানা ভাষা অনুশীলন করে তিনি ভারত-ভারতীর অন্যতমা কন্যা বঙ্গভারতীর সেবা করবেন। তাই বন্ধুকে সেই সংবাদ দিয়ে লিখলেন, "Am I not preparing for the

great object of embellishing the tongue of my fathers?" তখন তিনি বুঝতে পারলেন, বাংলা ভাষায় কাব্য রচনাই তাঁর 'great object'। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি ইংরেজীতে কাব্য লিখলেও তার বিষয়বস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয় ইতিহাস থেকে নেওয়া। তিনি মান্দ্রাজে থাকাকালে ইংরেজীতে যে নাটক লিখেছিলেন, তাও সুলতানা রিজিয়ার জীবন অবলম্বনেই লেখা। সুতরাং গোড়ার দিকের কাব্য-প্রত্যয়ে তিনি অভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন, তা ঠিক নয়। তাঁর ভাষা হয়েছিল ইংরেজী, কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রথম যৌবনে *Rajmohan's Wife* লিখেছিলেন, মধুসূদনের ইংরেজী কাব্য-প্রচেষ্টাও কতকটা সেই ধরনের। মাইকেলের মতো যুগপুরুষ কবি অপরের ক্ষেত্রে চাষ করবার জন্য জন্মান না, তাঁরা স্বক্ষেত্র নির্মাণ করে নেবার জন্যই বিধাতা দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে পৃথিবীতে আসেন।

এর আগে দেখেছি মধুসূদন কলকাতায় পুলিশ কোর্টে চাকরী পেয়ে সস্ত্রীক পুরানো শহরেই ফিরে এলেন এবং কলকাতার অভিজাত সমাজে যাতায়াত করতে লাগলেন। এই সময়ে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখে তিনি নিজেই নাটক লিখতে অগ্রসর হন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে নাটক-প্রহসন লিখে বাংলা নাটকের গতিপথ সম্পূর্ণভাবে বদলে দেন। নাটুকে রামনারায়ণের স্থলে খ্রীস্টান মধুসূদনের নাটক-প্রহসন মহসমারোহে সর্বত্র অভিনীত হতে লাগল। নাটক লিখতে গিয়ে তিনি দেখলেন পাশ্চাত্ত্য নাটকের মতো Blank verse না হলে নাটকের কাব্যত্ব থাকে না। অথচ পয়ারপ্রধান বাংলা ছন্দে Blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিকল্পনাও অসম্ভব। অত যে ঐশ্বর্যশালী ফরাসীভাষা, তাতেও তখন Blank verse ছিল না। কাজেই তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিকল্পনা শুনে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা বেশ সন্দিহান হলেন। মাইকেল যেন বাজি ধরেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার প্রয়াস করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, সেকেলে পয়ার ছন্দের আট+ছয় যতিবন্ধনে বন্দী ভাবধারাকে মুক্তি দিতে হলে সর্বপ্রথম পয়ারের ছেদ-যতির গতানুগতিক ও কৃত্রিম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কাব্য-পংক্তিকে ভাবের আবেগে ছেড়ে দিতে হবে, ভাবানুসারে যতিপাত হবে, ছন্দের কৃত্রিম বাঁধনে নয়। এই নিয়মে তিনি বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম

প্রবর্তন করলেন। তবে ছেদ-যতির আঁটাআঁটি বাঁধন খুলে ফেললেও তিনি কিন্তু কবিতার পংক্তিকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিলেন না। পয়ারের মতোই তাঁর অমিত্রাক্ষরের প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দ মাত্রাই আছে এবং ইচ্ছে করলেই পয়ারের মতোই আট+ছয় যতি দিয়ে সে পংক্তি পড়াও যায়। অর্থাৎ তিনি বুঝেছিলেন, অমিত্রাক্ষরের নামে সৃষ্টিছাড়া কিছু করলে বাঙালী পাঠক তা নিতে পারবেন না। উপরন্তু বাঙালীর কান হাজারখানেক বছর ধরে পয়ারের সুরেই তৈরী হয়েছে। তাকে পুরোপুরি ত্যাগ করাও সমীচীন হবে না। তাই ছান্দসিক মধুসূদন অতিসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির বলে বাংলার সনাতন ছন্দ, পয়ারপংক্তির ওপরই অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল দু'রকম। প্রথমতঃ, এর পংক্তিতে পংক্তিতে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস (অর্থাৎ rhyme) তুলে দেওয়া হল—যাকে মিত্রাক্ষর বলে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, প্রতি পংক্তির শেষে না থেমে ভাবের উত্থান-পতন ও অর্থবোধের সঙ্গে থামতে হবে। অর্থাৎ বিরাম ঘটবে উচ্চারণ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের যান্ত্রিক কৌশলের জন্য নয়, অর্থ ও ভাবানুসারে পংক্তির যেখানে খুশি থামা চলবে। এই হল বাংলা ছন্দের প্রথম মুক্তি। সেই মুক্তির বাণীই গিরিশচন্দ্র ('গৈরিশ ছন্দ') ও রবীন্দ্রনাথ (মুক্তক ছন্দ ও গদ্য ছন্দ) বহন করে চলেছিলেন, সেই মুক্তির বাণীকে আধুনিক কবিরাও নব নব বৈচিত্র্যের দিকে নিয়ে চলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ ছন্দকাররূপে মাইকেল বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। একমাত্র 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১) বাদ দিলে তাঁর আর সমস্ত কাব্যই অমিত্রাক্ষরের রীতিতে রচিত। তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) মিলযুক্ত সনেট হলেও এর ছেদ-যতি অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ। এ ছাড়াও 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে 'তিলোত্তমা সম্ভব' থেকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র রচনাকাল মাত্র ছয় বৎসর। তাঁর প্রতিভা এই ছয় বৎসরের মধ্যে বাংলা কাব্যকে যা কিছু দেবার দিয়ে গেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতির এমন অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং তারই সঙ্গে বাঙালীর দীর্ঘকাল-লালিত সংস্কারের সম্পূর্ণ রূপান্তর—এ তাঁর এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব। অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি কাব্য রচনা সমাপ্ত করতে হয়েছিল বলে তাঁর রচনা কোন কোন ক্ষেত্রে

নিখুঁত হয়ে উঠতে পারেনি, অনুশীলনের অভাবের জন্য তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সব সময় অবহিত ছিলেন না। ফলে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র গুণান্বিত মহাকাব্য 'মেঘনাদবধে'ও অনেকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে। তিনি যদি আর একটু অবকাশ ও শান্তি পেতেন তাহলে হয়তো তাঁর প্রতিভার বাধাগুলি অপসারিত হতে পারত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের দিক থেকে বিচার করলে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যই সবচেয়ে নিখুঁত হয়েছে বলে মনে হয়।

মধুসূদন সংস্কৃত পুরাণ থেকে তিলোত্তমার উপাখ্যান ভাগ সংগ্রহ করেন। তিনি রাজকুমার বিদ্যারত্ন নামে একজন বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে খুব ভালো করেই সংস্কৃত শিখেছিলেন। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, কাব্যনাটক ও পুরাণে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। তাই সংস্কৃত পুরাণে সুন্দ-উপসুন্দ দৈত্য ভ্রাতাদের বধের জন্য তিলোত্তমা অপ্সরা সৃষ্টির কাহিনী তাঁর ভালো লেগেছিল এবং সেই কাহিনীকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে তিনি চার সর্গে এই আখ্যানকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন হয়েছে, প্রথম প্রবর্তনায় ত্রুটিও তাই রয়ে গেছে। ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প প্রভৃতিতে তখনও তিনি নিজস্ব মৌলিকতার পথ খুঁজে পাননি; ছন্দ বহু স্থলেই অত্যন্ত আড়ষ্ট, শব্দ যোজনাও অনভ্যস্ত ও কৃত্রিম। তবু এই ছন্দেই বাংলা কাব্যের প্রথম মুক্তি ঘটল। দেবদ্রোহী দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ-উপসুন্দ অত্যন্ত ধার্মিক হয়েও তিলোত্তমাকে দেখে কিভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরস্পরকে আঘাত করে নিহত হল এবং দেবরাজ্য পুনরায় রাহুমুক্ত হল, পুরাণের সেই গল্পটাকেই মধুসূদন একালের উপযোগী করে বলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ছন্দ ও বাক্‌রীতির দু' একটি বৈচিত্র্য ছাড়া তিনি কাহিনী-গ্রন্থনে ও চরিত্রসৃষ্টিতে বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। অবশ্য ইতিপূর্বে রচিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র সঙ্গে তিলোত্তমার আকাশ-পাতাল তফাত। তিলোত্তমার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এ কাব্য যথার্থই আধুনিক কাব্যের সোপানরূপে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। এতে তিলোত্তমার ভীরু লাজনম্র রোমান্টিক সৌন্দর্য বর্ণনা অতি চমৎকার হয়েছে—এসব স্থানে অনেকটা কীটসের মতো সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। কাব্যটি পৌরাণিক আখ্যানকাব্য হলেও এতে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কাব্যের রচনা-প্রকরণগত অনেক সাদৃশ্য ও প্রভাব আছে। এর আরম্ভটি অতি গম্ভীর পরিবেশে থমথম করছে ঃ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—

অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, ভীষণ দর্শন,
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল,
যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র উন্মোচনও এর চেয়ে গম্ভীর নয়। এর ধ্যানগম্ভীর শব্দযোজনা, এবং রজতগিরিনিভ ধূর্জটির তপঃসাগরে-নিমগ্ন যোগস্থ স্তব্ধতা বাংলা কাব্যের ভারতচন্দ্রীয় আদিরসের নূপুরনিক্কণ, গুপ্তকবির রঙ্গব্যঙ্গ এবং রঙ্গলালের পয়ারত্রিপদী মালঝাঁপের বাচালতাকে লজ্জা দিল। প্রথমেই মাইকেল যে অচল অটল শুভ্রসমুজ্জ্বল ধবলগিরির উত্তুঙ্গ শৈলচূড়ার চিত্র অঙ্কন করলেন, বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব। এর প্রথম কয়েক ছত্রেই সে যুগের রসিক ও নবীন পাঠক বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা কাব্যে নতুন প্রতিভার উদয় হয়েছে,—যা দলছাড়া, কূলহারা—একক মহিমায় আসীন।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি এবার রামায়ণ মহাকাব্যের লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত মেঘনাদবধের ঘটনা নিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে (১—৫ সর্গ) এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল ঐ বৎসরের জুন মাসের দিকে (৬—৯ সর্গ)। এর বৎসর খানেক পরে দুটি খণ্ড একত্রে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় (১৮৬২)। তারপর থেকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' এক খণ্ডেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। কাব্যটির প্রথম প্রকাশের দু' সপ্তাহের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধিত করেন। আধুনিক যুগে বাঙালী কবির সংবর্ধনা এই প্রথম।[১] এ কাব্যে মহাকাব্যের যে সুর বেজেছে, বাঙালীর অনভ্যস্ত কানে তা উৎকট, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এর মধ্যে রাম-রাবণের চরিত্র যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, তার জন্য বাঙালীর পুরানো সংস্কার বিদ্রোহী হয়েছিল। এর রচনা-ভঙ্গী, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতিও পাঁচালীর ভক্ত বাঙালীকে বিমূঢ় করে ফেলেছিল। পরে ক্রমে ক্রমে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুপম মহিমা সকলে বুঝতে পারল, কবি শিক্ষিত সমাজের

---

১ চীনাবাজারের সামান্য শিক্ষিত মুদিও মেঘনাদবধ পড়ে আনন্দ পেয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য—নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'।

কাছে মহাকবি রূপে ছাড়পত্র পেলেন। প্রচুর নিন্দাসত্ত্বেও মাইকেল মধুসূদন নব্য-ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র মহাকবি।[১] রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লেখেননি বলে আক্ষরিক অর্থে তাঁকে আমরা মহাকবি বলতে পারি না।

ন'টি সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীরবাহুর নিধন সংবাদ থেকে মেঘনাদের হত্যা এবং প্রমীলার স্বামীর চিতারোহণ পর্যন্ত—মোট তিনদিন ও দু' রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মূল রামায়ণ থেকে কাহিনীর ধারা নেওয়া হলেও রাবণ-মেঘনাদ-প্রমীলাকে অভিনব রূপে উপস্থাপিত করবার জন্য তিনি প্রয়োজন মতো কাহিনী ও চরিত্রকেও অদলবদল করে নিয়েছেন। ন'টি সর্গের মধ্যে সীতা ও সরমার সংলাপ নিয়ে রচিত চতুর্থ সর্গ এবং প্রেতপুরীতে গিয়ে রামচন্দ্রের দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-সংক্রান্ত অষ্টম সর্গটি কিছু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু স্বতন্ত্র লীরিকমাধুর্য, সীতা-সরমার স্নিগ্ধ মধুর চরিত্র এবং গোটা রামায়ণ কাহিনীর পরিণাম সংক্ষেপে এবং সুকৌশলে চতুর্থ সর্গে বর্ণিত হওয়াতে এটি কাব্য থেকে বাদ দেওয়া চলে না। অষ্টম সর্গে শক্তিশেলে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রামচন্দ্র প্রেতপুরীতে গিয়ে মৃত পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মৃত্যু-মহৌষধ জেনে আসেন। এ ঘটনা সম্পূর্ণরূপে রামায়ণ বহির্ভূত, এখানে কবি ভার্জিলের 'ঈনিড' এবং দান্তের 'দিভিনা কোম্মেদিয়া' (*Divine Comedy*)-র বর্ণিত নরকের চিত্র আঁকতে অধিকতর উৎসাহিত হয়েছিলেন—সুতরাং এটির শিল্পচাতুর্য প্রশংসনীয় হলেও এর অনেক স্থানই অপ্রাসঙ্গিক।

এই মহাকাব্যের কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রপরিকল্পনায় মধুসূদন বাল্মীকির আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদর্শেই (বিশেষত হোমরের 'ইলিয়াড'-এর আদর্শে) উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হোমর, ভার্জিল, দান্তে, তাসো, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের শিল্পপ্রণালীই তাঁর পথনির্দেশক হয়েছিল, অবশ্য কাব্যালঙ্কার ও ভাষাভঙ্গিমায় তিনি ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিদের ধারাও অনুসরণ করেছিলেন। তবে এ মহাকাব্যের পরমশোকাবহ পরিণাম গ্রীক ট্র্যাজেডিরই অধিকতর অনুবর্তী। এতে দুরন্ত অদৃষ্টের নির্মম পীড়নই প্রধান হয়ে উঠেছে। কবি এতে কিন্তু 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এই নীতিকে বিশেষ আমল দেননি। বরং দুষ্কৃতকারী রাবণের দুঃখ ও নৈরাশ্য-যন্ত্রণার প্রতি অধিকতর সহানুভূতি

১ মধুসূদন কিন্তু এ কাব্যকে মহাকাব্য বলেননি, তিনি বলেছিলেন 'epicling' অর্থাৎ ছোট মাপের মহাকাব্য।

বোধ করেছেন এবং তাঁকেই কাব্যের নায়কত্ব বা প্রাধান্য দিয়েছেন। ন্যায়নীতির অনুসরণে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে এবং দেবাদেশ শিরোধার্য করে যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কার আমাদের দেশে এতদিন শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বাণীর বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদন তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে যে দুর্মদ, উচ্ছৃঙ্খল, প্রচণ্ড প্রাণশক্তি কোন নিয়ম-সংযম মানে না, তাকেই বরমাল্য দিয়েছেন। উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালী পুরানো বাঁধাবাঁধি সংস্কারের সীমায়িত সঙ্কুচিত গণ্ডির মধ্যে আর তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তাই রাবণের বন্ধনহীন প্রাণের অসহবেদনার মধ্যে গোটা জাতি যেন নিজেকেই প্রত্যক্ষ করল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব চমৎকারভাবে বলেছেন ঃ

> কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতিসূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।...যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

একদা যৌবনের অবিনয়ের বশে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের ত্রুটি দেখিয়ে কঠোর ভাষায় কবির প্রখর সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু পরিপক্ক বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে পরবর্তী কালে তিনি যা বলেছেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তাই হল শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।

মধুসূদন বীররসের কাব্য লিখবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কিন্তু এ মহাকাব্যের আরম্ভ পুত্রশোকাতুর রাবণের অশ্রুবিসর্জনে, সমাপ্তিও রাবণের হাহাকারে। আগেকার যুগের মহাকাব্যের নায়ক যদি এইভাবে বিলাপ করত, তবে তা heroic tale হিসেবে ব্যর্থ হত। কিন্তু আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরাভূত মানবের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস কাব্যসমাপ্তিকে মর্মন্তুদ বেদনা-মাধুরীতে ভরে দিয়েছে। এ কাব্যে আবেগবহুল তরল শোকাবেগের চেয়ে গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো নির্মম অদৃষ্টের নিষ্করুণ তাড়না অশ্রুবাষ্পহীন অন্তর্জ্বালাকেই বেশী ফুটিয়ে তুলেছে। পুত্রের চিতা-পার্শ্বে পুত্রবধূ প্রমীলাকে উপবিষ্ট দেখে রাবণ যখন আর্তনাদে ভেঙে পড়ে বলেন ঃ

হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

তখন এ বিলাপ, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভস্মাবশেষ অপূর্ব মানবরসে মিশে গিয়ে এই মহাকাব্যকে একাধারে মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি ও গীতিরসের সমন্বয়ীরূপ দান করে।*

মধুসূদনের প্রতিভা যে কী পরিমাণে অদ্ভুত ও ক্রিয়াবান ছিল তার প্রমাণ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১)। প্রায় মেঘনাদবধের সমকালেই 'ব্রজাঙ্গনা' লেখা চলেছিল এবং প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হলে পাঠকের বিস্ময়ের ঘোর দ্বিগুণ হল। মেঘনাদবধের তূর্যধ্বনি এবং ব্রজাঙ্গনার বংশীধ্বনি যিনি একই সঙ্গে করতে পারেন, তাঁর প্রতিভা যে একটু বিচিত্র ধরণের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মধুসূদন রাধাকৃষ্ণ-সংক্রান্ত কাহিনী অবলম্বনে 'ওড' (Ode) জাতীয় কাব্য লেখার পরিকল্পনা করলে কেউ কেউ তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসু ছিলেন কবির সহাধ্যায়ী। পৌরাণিক দেবদেবী, বিশেষত রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাসহানুভূতি ছিল না। তিনিও মধুসূদনকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু খ্রীস্টান মধুসূদন কাব্যরচনাকালে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ওপরে উঠতে পারতেন। তাই তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করে যথার্থ কবিজনোচিত ঔদার্যবশত শ্রীরাধার মনোবেদনা উপলব্ধি করলেন। ইতিপূর্বে তিনি সংস্কৃত উদ্ভট কাব্য-কবিতা, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব রসানুকুল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়েছিলেন। তখনই তিনি ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার বিরহমিলনের লীলা-সংক্রান্ত ছোট কাব্য লিখবার বাসনা পোষণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সতীর্থ দেশমান্য প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে পারো?"

* অবশ্য সে যুগের কেউ কেউ এ মহাকাব্যের যথোচিত মূল্য বুঝতে পারেননি। এতে হিন্দু মনোভাব খণ্ডিত হয়েছে বলে রক্ষণশীল সমালোচকেরা খ্রীস্টান মধুসূদনের প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ব্যঙ্গ করে ব্যঙ্গ-মহাকাব্যও লিখবার চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গটি অতি উপাদেয় হয়েছিল। তিনি মাত্র একটি সর্গই লিখেছিলেন। শোনা যায়, মাইকেলও এটি পড়ে কবিকে খুব তারিফ করেছিলেন।

মাইকেল ব্রজেন্দ্রনন্দনের বংশীধ্বনি করলেন তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। বস্তুত মেঘনাদবধ রচনার আগেই তাঁর মনে ব্রজাঙ্গনার পরিকল্পনা উদিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্তি বা রসতত্ত্ব নয়, তার মানবিক দিকটুকু মধুসূদন অনেক পূর্ব থেকেই ভালোবাসতেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বিরহশোকাতুর রাধার মর্মব্যথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম সর্গে বিরহ এবং দ্বিতীয় সর্গে রাধাকৃষ্ণের মিলনে কাব্য সমাপ্ত হবে, এই রকম তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময়াভাবে তিনি শুধু প্রথম সর্গে রাধার শোকাহত চিত্তের কয়েকটি বৈচিত্র্য ফুটিয়েছিলেন, দ্বিতীয় সর্গ লিখবার আর অবকাশ পাননি। কাব্যের গোড়াতেই তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কাব্য 'পদাঙ্কদূত' থেকে এই সংস্কৃত পংক্তিটি উদ্ধৃত করেন—"গোপীর্ভর্তুর্বিরহবিধুরা উন্মত্তেব"—কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা শ্রীরাধার বিলাপোক্তি তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' মূল বক্তব্য। রাধার আক্ষেপানুরাগ ও মাথুরলীলা নিয়ে অতিসূক্ষ্ম ভাবগভীর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাবহ বহু পদ বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে মহামূল্যবান রত্নের গৌরব লাভ করেছে। তিনিও সেই পন্থা অবলম্বন করে, এমন কি বৈষ্ণব কবিদের মতো ভণিতা ব্যবহার করে বৈষ্ণবপদের বাহ্যিক রীতিটি কথঞ্চিৎ অনুসরণ করেছিলেন। যথা:

> কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার
> মধুর বচন।
> সহসা হইনু কালা জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
> আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন।
> মধু—যার মধুধ্বনি, কহে, কেন কাঁদ ধনি
> ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন।

অতি সরল এবং সরস মিত্রাক্ষর রীতির ছন্দে রচিত এই ক্ষুদ্র কাব্যে তিনি শ্রীরাধার বিরহ, বিলাপ, আক্ষেপ, হতাশা ফুটিয়েছেন, আবার বৈষ্ণব কবিদের মতো ব্যাকুলা রাধাকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' অবশ্য বৈষ্ণব কাব্য হয়নি,—না ভাষায়, না ভাবে। এর ভাষা ভারতচন্দ্র ও নিধুবাবুর অধিকতর অনুগামী। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এ মর্ত্যব্যাকুল ভাষার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ভাবের দিক থেকেও বৈষ্ণব অধ্যাত্মরসের দিকে মধুসূদনের কোন আকর্ষণ বা কৌতূহল ছিল বলে মনে হয় না। তাই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকা রাধা এবং বৈষ্ণব পদসাহিত্যের কৃষ্ণের মহাভাবস্বরূপিণী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার মধ্যে গোত্রগত কোনও প্রকার যোগ থাকা সম্ভব নয়। 'Poor Lady of Braja'—এই ভাবেই কবি মর্ত্যমানবী রাধার

মর্তবেদনাকেই রসপূর্ণ করেছেন। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বিচার্য নয়—মধুসূদনও ঠিক বৈষ্ণব কবি নন। আধুনিক মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদন এ কাব্যে ব্রজের রাধাকে মানবীরূপেই উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সে যুগের অনেক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত মধুসূদন ও বৈষ্ণব পদকারদের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিলেন না। খ্রীস্টান মধুসূদন রাধাকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন—এতেই তাঁরা উল্লাসে ঊর্ধ্ববাহু হয়েছিলেন।* শোনা যায়, নবদ্বীপের কোন এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত 'পরমভক্ত বৈষ্ণবশেখর পুণ্যবান মধু'কে দেখবেন বলে কলকাতায় এসে তাঁর হোটেলে গিয়ে দেখা করেছিলেন। কিন্তু কবির বিজাতীয় বেশভূষাদি দেখে তিনি অবাক্‌বিস্ময়ে বলে ফেলেছিলেন, "বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট।" অর্থাৎ তাঁর মতে মধুসূদন প্রকৃতই বৈষ্ণব। কি পাপে না জানি ধড়াচূড়াদির স্থলে হ্যাটকোট এবং বেত্রপাঁচনীর স্থলে সধূম সিগার ধারণ করে বৈষ্ণব আখড়ার পরিবর্তে স্পেনসাস হোটেলে বিহার করছেন। উক্ত বৈষ্ণবভক্তের মতো অনেকেই এ ভুল করেছেন। মধুসূদনের কাব্যক্ষেত্রে কোনও প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না, শ্রীরাধার বিরহবেদনার প্রতি মানবিক বোধেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এমন কি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনেক স্থলে উপমার ক্ষেত্রে এই বৈষ্ণবীয় বেদনা-বিরহের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এর মূলে কোনও প্রকার ধর্মসংস্কার নেই, কোন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা নেই। রাধাকে তিনি মানবী করে তুলেছেন—এখানেই তাঁর কৃতিত্ব, এটাই হচ্ছে ঊনবিংশ শতকের নব্য মানবতাবাদের আদর্শ। বরং রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষারীতি ও ভাববস্তু বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অধিকতর অনুগামী। সে যাই হোক মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিষয়বস্তু, রাধার রূপান্তরসাধন এবং মানবীয় আবেগের যে অনবদ্য লিপিচিত্র অঙ্কন করেছেন, তার নতুন বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন-সংক্রান্ত দ্বিতীয় সর্গটি লিখবার অবকাশ পেলে তাঁর সমগ্র কাব্যটির পুরো মূল্য বোঝা যেত।

১৮৬১ সালে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অধিকাংশই রচিত হয়ে যায়, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। এর বিষয়বস্তু অভিনব, রীতিপদ্ধতি বৈচিত্র্যপূর্ণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ভাষা, শব্দযোজনা অলঙ্করণ প্রভৃতি চমকপ্রদ। বলতে কি কবিতার কারুকর্ম বা craftsmanship বিচার করলে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'কে সর্বশ্রেষ্ঠ

* নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

বলতে হবে। 'মেঘনাদবধে'র অভূতপূর্ব বাচনরীতির মধ্যেও কিছু অনভ্যস্ততা ছিল, কিন্তু 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এদিক থেকে নিখুঁত হয়েছে—অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ রূপটি এ কাব্যে যতটা ফুটেছে, শুধু মধুসূদনের কেন, অন্য কোন কবির ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে পরিপক্বতা ও পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় না।

প্রসিদ্ধ রোমান কবি পাব্‌লিয়াস ওভিডিয়াস ন্যাসো বা সংক্ষেপে ওভিডের (খ্রীঃ পূঃ ৪৩ খ্রীঃ ১৭ অব্দ) *Heroides* ('Heroic Epistle') শীর্ষক পত্র-কাব্যের আদর্শে মধুসূদন ভারতীয় পৌরাণিক পুরাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনাদের এক অভিনব চরিত্রচিত্র উদ্‌ঘাটিত করেন। ওভিডিয়াস যেমন প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ থেকে নারীচরিত্র বেছে নিয়ে তাঁদের কল্পিত চিঠির সাহায্যে প্রেম-বিরহ-কাম-প্রতিহিংসার ছবি এঁকেছেন, মধুসূদনেরও সেই একই উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য ও নাটক থেকে কয়েকটি সুপরিচিত স্ত্রীচরিত্র বেছে নিয়ে তাঁদের লেখা কল্পিত চিঠির মধ্য দিয়ে কবি সেই সমস্ত বিচিত্ররূপিণী নারীর জীবন্ত মূর্তি অঙ্কন করেছেন। একুশখানি পত্রের সাহায্যে তিনি একুশজন ভারতীয় নারীর চরিত্রাঙ্কনের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু পারিবারিক, শারীরিক প্রভৃতি কারণে মাত্র এগারখানি পত্র রচনা করে তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশ করেন। এই এগারখানি পত্রের মধ্যে সোমের প্রতি তারা, অর্জুনের প্রতি উর্বশী, দশরথের প্রতি কেকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা এবং নীলধ্বজের প্রতি জনার পত্র কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট। এই চরিত্র-গুলিতে কামনার রক্তরাগ এবং চরিত্রের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পেয়েছে। এর বিষয়বস্তু হল—কোন নারী নিষিদ্ধপ্রেমে উন্মাদিনী, কেউ প্রিয়সঙ্গলাভের জন্য কামাতুরা, কেউ-বা-দুর্বল ভীরু স্বামীর প্রতি তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণে অকৃপণা। এই চরিত্রগুলির উৎসভূমি প্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্য, কিন্তু মূল আদর্শ পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকতর অনুগামী। এর বাতাবরণের চারিদিকে আধুনিক বাস্তবনিষ্ঠ, প্রশ্নসঙ্কুল, স্বয়ংস্বাধীন নারীজীবনই প্রতিফলিত হয়েছে। এর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী-জাগরণের যেন কোথায় অন্তর্গূঢ় যোগ রয়েছে। অন্য পত্রগুলি (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী) কিন্তু ভাবে ও বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরাণানুগামী। এখানে আধুনিক কালের কবি যেন মন্ত্রবলে পুরাণের ও মহাকাব্যের যুগে ফিরে গেছেন এবং সেকালের জীবন ও সমাজের মধ্যে আসন করে নিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতেই উক্ত নারী-চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন। যাঁরা বলেন, খ্রীস্টান মধুসূদন ভারতীয় ঐতিহ্যের

ইতালীয় কবি পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪ খ্রীঃ অঃ) ইতালীয় ভাষায় সনেটের নবরূপ সৃষ্টি করেছিলেন, অবশ্য তাঁর পূর্বেই সনেটের কৌশল কবিদের অজানা ছিল না। কিন্তু পেত্রার্কাই সনেটকে একটা বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতির মধ্যে বেঁধে দেন। য়ুরোপে পেত্রার্কা ও শেক্‌স্‌পীয়র প্রবর্তিত সনেট রচনার দু'রকম ধারা অনুসৃত হয়। পেত্রার্কারীতি জটিল বলে শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতি অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের মধুসূদন পেত্রার্কারীতিতে কিছু সনেট লিখলেও শেক্‌স্‌পীয়রীয় সরল রীতির অধিকতর অনুরাগী ছিলেন।

বিদেশে দুঃখের দিনে তিনি এই সনেটগুলি রচনা করছিলেন, তাই এতে তাঁর দেশের কথা, বাল্যস্মৃতি, দেখা-লোক—এই সব বিষয় অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের ভের্সাই শহরের ধূমল আকাশ আর হিমার্ত মাটির ওপর অবস্থান করে কবির "শ্যামা জন্মদা"-র কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল গ্রামের কথা, কপোতাক্ষ নদের কথা, নদীতীরে দেবদেউলের কথা, রামায়ন-মহাভারত, কালিদাস, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা, বাংলাদেশের কোলে আশ্রয় নেবার জন্য এই সনেটে তিনি যেন বালকের মতো কেঁদে উঠেছেন। এই সনেটেই তিনি বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষকে মহত্তর গৌরবে সমাসীন দেখতে চেয়ে বলেছেন ঃ

নারিনু মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র মা কি ভুলে তারে!)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে।
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে।
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গে, ভারতরতনে।

ভারতরত্ন বাংলাকে তিনি জ্যোতির্ময় দেখতে চেয়েছিলেন, এর চেয়ে বড়ো দেশহিতৈষণা আর কাকে বলে? কবির অন্তরের গভীরে যে স্বদেশপ্রেম লুকিয়ে-ছিল, এই রকম দু' একটি উক্তি থেকেই তা বোঝা যাবে। তাঁর 'মেঘনাদ-বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনা'য় অসাধারণ কবিত্ব শক্তি বিস্ময়কর প্রাণাবেগে ফুটে উঠেছে, এর জন্য তিনি সারা ভারতীয় সাহিত্যেই মহাকবির গৌরবমুকুট একাকী ধারণ করেছেন। কিন্তু যদি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগের গূঢ়সঞ্চারী ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে হয়, যদি

তাঁর স্মৃতিবহ বেদনার ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করতে হয়, যদি তাঁর আত্মজীবনীর একটি হারিয়ে-যাওয়া পৃষ্ঠার সন্ধান পেতে হয়, তা হলে এই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তেই তার যথার্থ স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। মধুসূদন সনেটের চৌদ্দ পংক্তির মধ্যে নিজের মনের কথাকেই গেঁথে রেখেছেন। আজ শতাব্দীকালের ব্যবধানের পরেও আমরা এই সনেট থেকেই ব্যক্তি মধুসূদনের হৃদয়ের উত্তাপ উপলব্ধি করতে পারি।

মধুসুদনকে আমরা মহাকবি বলে জানি, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তিনিই একমাত্র মহাকবি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের অন্তরালে গীতিকবিতার রসই প্রবাহিত ছিল। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে মনে করতেন গীতিকবিতাতেই তাঁর আত্মার মুক্তি। অবশ্য তাঁর মহাকাব্য এবং অন্য কাব্যের মধ্যেও গীতিরসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাঁর গীতিরসসিক্ত মনের যথার্থ স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এ ছাড়াও তাঁর 'আত্মবিলাপ' (১৮৬২) কবিতা এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২) গানে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিক লীরিক কবিতার বৈশিষ্ট্য সুচিত হয়েছে। তাই তাঁর 'আত্মবিলাপ' কবিতাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম লীরিক কবিতা বলা হয়। যুগের দাবিতে তিনি মহাকবি হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর যথার্থ প্রবণতা ছিল গীতিকবিতার দিকে।

১৮৭১ সালে আয়ুর শেষ সীমান্তে পৌঁছে মধুসূদন 'হেকটরবধ' নামে একটি গদ্য আখ্যান প্রকাশ করেন। 'ইলিয়াডে'র কাহিনীই এর মূল বিষয়, ট্রয়ের বীরকুমার হেক্টর ছিল তাঁর মানসপুত্র, হেক্টরের আদর্শেই তিনি মেঘনাদ চরিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই গদ্য-আখ্যানে তিনি একটি বিচিত্র রীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, বাংলা গদ্যে নামধাতুর অজস্র ব্যবহার এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তখন মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন নৈরাশ্যের মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল, কাব্য-প্রতিভাও ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এই রকম অশান্ত পরিবেশে এ আখ্যান পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছিল, কাজেই এর রীতি ঠিক আদর্শ গদ্যরীতি বলে গৃহীত হয়নি।

মাত্র সাত বৎসর (১৮৫৯—১৮৬৬) বাংলা কাব্যপ্রাঙ্গণে পদচারণা করে মধুসূদন বিস্ময়কর প্রতিভা ও অক্ষয় প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভাব-অভিযোগ, রোগশোক, দারিদ্র্যের জ্বালা তাঁকে সুস্থ হতে দেয়নি। একটু মানসিক শান্তি পেলে হয়তো তিনি ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাকে আরও অভূতপূর্ব সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে পারতেন। অথবা হয়তো এই পরিতাপ, লাঞ্ছনা, অশান্তির জ্বালাই তাঁকে মহাকবি করেছে। নিজের বক্ষপঞ্জরে আগুন জ্বালিয়ে

প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাঁরা যে ঠিক কথা বলেন না, তার প্রমাণ এই চিঠিগুলি। এতে মধুসূদন ভারতীয় নারীর গৃহচারিণী কল্যাণী পতিব্রতা মূর্তিকেই অপূর্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিক থেকে দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণীর চিঠিখানিতে আদর্শ ভারতীয় নারীর একনিষ্ঠ ছায়ামূর্তিই ফুটে উঠেছে। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, ওভিডের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন বলে কবি এতে ভারতীয় নারীর কামান্ধ ছবি এঁকেছেন। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রখানিতে নিষিদ্ধ ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূষিত প্রেমের চিত্র আছে। কিন্তু ওভিডের প্রেমপত্রগুলিতেও যে তীব্র রিরংসা এবং নীতি-দুর্নীতিবোধশূন্য উগ্র কামের ছবি আছে, মধুসূদন স্বভাবতই তার প্রতি অনীহা বোধ করতেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একটি পত্রে তিনি পুরাতন কাহিনী ত্যাগ করে তারাকে চন্দ্রের প্রতি দেহজ প্রেমে উন্মাদিনী করে এঁকেছেন। পুরাণে তারা চন্দ্রের দ্বারা বলপূর্বক লাঞ্ছিত হয়ে তাঁকে প্রচণ্ড অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁকে দয়িতভাবে বা কাম পূরণের উপাদান বলে গ্রহণ করেননি, বা তাঁর সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হবেন বলে কোন পত্র ব্যবহারও করেননি। এদিক থেকে মধুসূদন পুরাণকে ইচ্ছে করেই পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য ঐটুকু পুরাণবিরোধিতা বাদ দিলে, উক্ত পত্রটি নীতিবিরুদ্ধ হলেও নারীপ্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজ ও নীতিসত্তার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব বর্ণনা হিসেবে এটি একটি অমূল্য রচনা। এই ক্ষুদ্র পত্রে তিনি নারীচরিত্রের সুগভীর এবং সুপ্ত প্রবৃত্তির অনির্বাণ দাহকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন, তাতে তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়, তখন আর তাঁর পুরাণবিরোধিতার কথা মনে থাকে না।

'বীরাঙ্গনা' নামটি নিয়েও কেউ কেউ কিছু কিছু গোলে পড়েছেন, স্বয়ং কবিও দু'এক স্থলে সেই গোলযোগের ইঙ্গিত রেখে গেছেন। 'বীরাঙ্গনা'র নায়িকারা সকলেই বীরনারী নয়, অধিকাংশই হচ্ছে প্রেমিকা, জায়া, মাতা—সুতরাং এই পত্রগুচ্ছের নাম বীরাঙ্গনা রাখা ঠিক হয়েছে কি? স্বয়ং কবিও "চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে ("উপক্রম") এঁদের "বীরজায়া" (বীরের জায়া) এবং "বীরপতি" (যাঁদের পতিরা বীর) বলেছেন। একথা ঠিক, এ কাব্যে 'বীরাঙ্গনা' নামটি সর্বত্র বীরপত্নী বা বীরনারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। ইংরেজী 'heroine' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবেই বীরাঙ্গনা শব্দটি মাইকেলের মনে এসেছিল। ওভিডের *Heroides*-এ সর্বত্র বীরনারীর কথা বলা হয়নি, তথাপি তার নাম *Heroides*। সুতরাং বীরাঙ্গনা অর্থে নায়িকা বলেই ধরে নেওয়া উচিত। এখানে আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। যাই হোক বীরাঙ্গনা কাব্যের উপাখ্যান উপস্থাপনা,

পত্রলিখনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রীতি, চরিত্রগুলির নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ছন্দের সৌষম্য, শব্দযোজনার পরিমিতি-বোধ এবং পরিচ্ছন্ন প্রকাশপদ্ধতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। 'মেঘনাদবধ' রচনার সময় তাঁর রচনা-কৌশল এতটা পরিপক্কতা লাভ করেনি, তা স্বীকার করতে হবে। এই আদর্শটি পরবর্তী কালের গীতিকবিদের এত প্রীতিকর হয়েছিল যে, কেউ কেউ এই ঢঙে কিছু কিছু কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৬৬ সালে মধুসূদনের শেষকাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভের মানসে তিনি সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন— বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবেন, এই তাঁর মনোগত অভিলাষ। বিদেশ-বিভুঁয়ে তাঁকে অর্থাভাবে সন্তানাদি নিয়ে যে কতদূর দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তার কাহিনী কবির জীবনীগ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সেই মানসিক উদ্‌ভ্রান্তির সময়ে বিদেশী সনেটের আদর্শে তিনি অনেকগুলি বাংলা সনেট লেখেন, তার নাম দেন 'চতুর্দশপদী কবিতা'। অনেক অভিনব কাব্যরীতির মতো, বাংলা সনেটেরও তিনি উদ্ভাবয়িতা এবং বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকার। দেশে থাকবার সময়েই তিনি পেত্রার্কা-শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সনেটকারদের আদর্শে 'কবি মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট লিখেছিলেন এবং বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে সেটি পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, "In my humble opinion if cultivated by men of genius our sonnet in time would rival the Italian." পরে বিদেশে অনাত্মীয় প্রতিকূল পরিবেশে বাস করবার সময় তিনি পেত্রার্কা ও শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতে একশটি সনেট লিখে দেশে পাঠিয়ে দেন—সেটা ১৮৬৫ সালের কথা। সনেট লেখা অতি দুরূহ, উদ্দাম কবিকল্পনাকে চৌদ্দপংক্তির মধ্যে আটক করা এবং চৌদ্দপংক্তির মিলবিন্যাসের বাঁধাবাঁধি রীতি অনুসরণ করে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখা সহজ ব্যাপার নয়। এইজন্য বিদেশী সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ সনেটলিখিয়ের সংখ্যা বেশী নয়। মধুসূদন বিদেশী সনেটকে দেশী পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়ে বেশ একটি নতুন কবিতাপদ্ধতি অবলম্বন করেন, পরে অনেকেই তাঁর সেই রীতি অনুসরণ করে, কোথাও কোথাও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে বাংলা সনেটের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। সে যুগের দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ এবং এ যুগের প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, অজিতকুমার দত্ত প্রভৃতি কবি-লেখকেরা সনেটের অনেক নতুন কলারূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কেউ মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছেন বলে মনে হয় না।

প্রধানত পৌরাণিক সাহিত্য থেকে দেবগণ কর্তৃক বৃত্রসংহারের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। দেবদ্রোহী অথচ পরম শৈব বৃত্র বলপূর্বক দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে স্বর্গের ইন্দ্র হয়ে বসলেন। এদিকে পরাভূত দেবতারা মহাদেবের কাছ থেকে বৃত্রসংহারের উপায় জেনে নিলেন। উদ্ধত বৃত্র শিবের বরে বলীয়ান হয়ে ধর্মাধর্ম জ্ঞান পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন এবং পত্নী ঐন্দ্রিলার আবদার রাখবার জন্য নিজপুত্র রুদ্রপীড়ের দ্বারা ইন্দ্রাণী শচীকে অপহরণ করে আনবার অনুমতি দিলেন। এইসব ব্যাপারে মহাদেবও ক্ষুব্ধ হয়ে বৃত্রের ওপরে তাঁর যে স্নেহ ছিল তা সংবরণ করে নিলেন এবং ইন্দ্রকে বৃত্রসংহারের উপায় বলে দিলেন। মহাপ্রাণ দধীচি মুনি স্বেচ্ছাক্রমে আত্মদান করলেন, তাঁরই পবিত্র অস্থিখণ্ড থেকে নির্মিত হল বজ্র। ইন্দ্র প্রচণ্ড যুদ্ধে সেই বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরকে বিনাশ করলেন, পাপের প্রাধান্য লোপ পেল, দেবতারা আবার স্বদেশভূমি ফিরে পেলেন। এ মহাকাব্যে হেমচন্দ্র পুরাণের গল্পকে মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, অবশ্য দু' এক স্থলে আধুনিক মনোভাবও দেখিয়েছেন—দেবতাদের স্বদেশভূমির জন্য অনুরাগ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর স্বদেশপ্রেমেরই প্রতিধ্বনি। ঐন্দ্রিলার সর্বনাশা চরিত্রও অনেকটা পাশ্চাত্ত্য অনুগামী হয়েছে। এই মহাকাব্যের মূলনীতি হল poetic justice অর্থাৎ ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। সেদিক থেকে বৃত্রসংহারের কাহিনীর দৈর্ঘ্য ও বিশালতা মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছে। চরিত্রগুলিও বাইরের দিক থেকে মহাকাব্যের অনুপযুক্ত হয়নি। ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, ঐন্দ্রিলা, রুদ্রপীড় প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনে তিনি কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। আর তা ছাড়া এর তাৎপর্য জাতীয় মহাকাব্যেরও সম্পূর্ণ অনুকূল। মধুসূদনের মতো হেমচন্দ্র সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম করে সংস্কারের রজ্জু ছেদনের চেষ্টা করেননি। বরং চিরাচরিত ন্যায়-নীতি ও মনুষ্যধর্ম মেনে চলেছেন, বহুকালাশ্রিত ভারতীয় আদর্শকেই জয়যুক্ত করেছেন। ফলে একদা তাঁর ভক্ত-পাঠকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল, এমন কি তরুণ রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মহাকাব্যের সুকঠোর সমালোচনা করলেও হেমচন্দ্রকে প্রশংসায় ভূষিত করেছিলেন। সে যুগে অনেকেই মনে করতেন মধুসূদনের দুরন্ত প্রতিভা থাকলেও তা জাতীয় মহাকাব্য সৃষ্টিতে সার্থক হয়নি, বরং তিনি যেন সদম্ভে জাতীয় সংস্কারের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য রীতিতে মহাকাব্য লিখলেও মনের দিক থেকে খাঁটি সনাতন ভারতীয়ই ছিলেন। তাই যাঁরা মধুসূদনের প্রচণ্ড নূতনত্বে দিশেহারা হয়ে পড়তেন,

তাঁরা হেমচন্দ্রের মধ্যে প্রাচীন ধারার নবীন অনুগমন দেখে আশ্বস্ত হতেন। কিন্তু আজ প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে হেমচন্দ্রের মহাকবির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার মানসিক অবস্থা পাঠক সমাজের জেগেছে। অধুনা হেমচন্দ্রের প্রতি আমাদের ততটা আকর্ষণ নেই—যতটা আছে মধুসূদনের প্রতি। কারণগুলি সংক্ষেপে নির্দেশ করা যাচ্ছে।

প্রথমত, কাব্যকাহিনী ও বিষয়সন্নিবেশ মহাকাব্যের উপযোগী হলেও চরিত্রাঙ্কনে হেমচন্দ্র মধুসূদনকে এত ঘনিষ্ঠভাবে অনুকরণ করেছেন যে, এ বিষয়ে তাঁর মৌলিকতা অতি সামান্য। বস্তুত মেঘনাদবধের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে বৃত্রসংহারের চরিত্রের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। রাবণের সঙ্গে বৃত্রের, ইন্দ্রের সঙ্গে রামচন্দ্রের, লক্ষ্মণের সঙ্গে জয়ন্তের, মেঘনাদের সঙ্গে রুদ্রপীড়ের, সীতার সঙ্গে শচীর ঘনিষ্ঠ মিল অনবধান পাঠকেরও চোখে পড়বে। ইন্দুমতী ও প্রমীলা বাহ্যত এক হলেও অন্তরের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেবল ঐন্দ্রিলা চরিত্রটি নতুন ধরনের—এর সঙ্গে মন্দোদরীর কোন দিক দিয়েই সাদৃশ্য নেই। সে যাই হোক, প্রধান চরিত্রাঙ্কনে হেমচন্দ্র গুরু মধুসূদনকে অনুকরণ করেছেন এবং সে অনুকরণ অনেক স্থলে নিছক অনুকরণ হয়েছে, তার ঊর্ধ্বে যেতে পারেনি—একথা মেনে নিতেই হয়। চরিত্রাঙ্কন ছেড়ে দিলে, মহাকাব্যের রচনাপদ্ধতিও হেমচন্দ্র ভালো করে আয়ত্ত করতে পারেননি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় তাঁর কিছুমাত্র পারদর্শিতা ছিল না। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ার মাত্র। তার ওপর তিনি আবার বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এই মহাকাব্যে নানা ধরনের ছন্দ ব্যবহার করে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলছেন। বহু স্থলের বর্ণনা পুরোপুরি নীরস ও গদ্যাত্মক ব্যাপার বলে মনে হয়। শব্দযোজনাতেও তিনি মাইকেল-ব্যবহৃত শব্দের হুবহু অনুকরণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এককথায় 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের কায়িক বিশালতা লাভ করলেও এর চরিত্রের মধ্যে দ্যুলোক-ভূলোকসঞ্চারী অপার বিস্ময় নেই, এদের পরিণতির মধ্যে মানবভাগ্যের নিদারুণ ট্রাজেডি নেই, ভাষাভঙ্গিমার মধ্যে মহাকাব্যোচিত বিশাল গাম্ভীর্য নেই, বাক্‌রীতি ও অলঙ্কারের প্রয়োগেও বিশেষ কোন নিপুণতা দেখা যায় না। মধুসূদন যে প্রচণ্ড ক্ষমতার বলে মানুষের জীবনসম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন যার সঙ্গে বিশ্বপ্রতিভার যোগাযোগ রয়েছে, হেমচন্দ্রের মোটা হাতের মোটা রচনার মধ্যে সেরূপ কোন সূক্ষ্মতা ও মনোধর্মের গভীরতা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাইকেলের আবির্ভাব না হলে রঙ্গলালের পরে

তিনি যে রোশনাই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জ্বালা নিজে ভোগ করেছেন, কিন্তু আর আলোটুকু আমাদের দিয়ে গেছেন। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মধুসূদনের প্রতিভা একক মহিমায় উত্তুঙ্গ হয়ে আছে, এবং আরও দীর্ঘকাল থাকবে বলে মনে হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে মধুসূদনের মতো প্রতিভার উদয় হয়েছিল বলেই পরবর্তী কালের বাংলা কাব্যের এত দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল। কাব্যের বাকৃরীতিকে তিনিই সর্বপ্রথম পরিচ্ছন্নতা ও সুগমতা দিয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের বাকৃরীতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈচিত্র্য—যা নিয়ে আমরা গর্ব করি, তার আদিপুরোহিত মধুসূদন, এ কথাটা যেন ভুলে না যাই।

৪. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

মাইকেলকে গুরুপদে বরণ করে যাঁরা মহাকাব্য রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেলের ঈষৎ পরবর্তী কালে প্রায় মাইকেলের মতোই যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর 'বৃত্রসংহার' মধুসূদনের 'মেঘনাদের' মতোই খ্যাতিলাভ করেছিল—যদিও উভয়ের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক। 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করতে গিয়ে মেধাবী ছাত্র হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, বোধহয় তখনই তাঁর মনে মহাকাব্য লিখবার বাসনা উদিত হয়। নিতান্ত তরুণ বয়সেই খিদিরপুরের অধিবাসী হেমচন্দ্র কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁর দু' একখানি কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়াতে তিনি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হন। বিদ্যাবুদ্ধিতে হেমচন্দ্র সে যুগের বিদ্বজ্জনসমাজে সুখ্যাত হয়েছিলেন, তার সঙ্গে কবিপ্রতিভার সমাবেশ ঘটায় তাঁর নাম যে প্রায় মধুসূদনের মতোই গৌরব লাভ করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? নানা ধরনের কাব্য, লীরিক কবিতা, ব্যঙ্গরঙ্গের কবিতা, নাটকানুবাদ, কবিতানুবাদ প্রভৃতির দ্বারা হেমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়েছেন। মহাকবির গৌরবের কিঞ্চিৎ ভাগ যদি মধুসূদন ছাড়া আর কাউকে দিতে হয়, তবে হেমচন্দ্র সে গৌরব দাবি করতে পারেন।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১) একটি বাস্তব দুর্ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়েছিল। তাঁর বন্ধু রামকমল ভট্টাচার্য কোন কারণে আত্মহত্যা করাতে কবি গভীর বেদনা বোধ করেন, সেই পটভূমিকায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী' রচিত হয়।

অবশ্য রচনার দিক থেকে এ-কাব্য কোনও প্রকার প্রশংসা দাবি করতে পারে না—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এটি পড়ান হত বলে লোকে এর নামটি স্মরণে রেখেছে, নচেৎ এর কোন গুণ নেই। তবে তাঁর কয়েকখানি আখ্যানকাব্য মন্দ নয়। 'বীরবাহু' কাব্য (১৮৬৪) কাল্পনিক ইতিহাসের পটে আঁকা স্বদেশ-প্রেমের কাব্য—যদিও কাব্য হিসেবে এ নিতান্তই মূল্যহীন। 'ছায়াময়ী' (১৭৮০) দান্তের 'দিভিনা কোম্মেদিয়া' অবলম্বনে রচিত রূপককাব্য—কাব্যলক্ষণ অকিঞ্চিৎকর। 'আশাকানন' (১৮৭৬) শীর্ষক 'সাঙ্গরূপক' কাব্য নীতি ও তত্ত্বের চাপে বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করেনি। 'দশমহাবিদ্যা'র (১৮৮২) পৌরাণিক চণ্ডীতত্ত্বের ওপর আধুনিক বিবর্তনতত্ত্বের পালিশ দেবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। উনবিংশ শতকের কবিরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরীখে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। হেমচন্দ্র এই পুস্তিকায় পুরাণের দশমহাবিদ্যার কাহিনীর ছাঁচে ব্যঞ্জনার আকারে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন। এসব গুরুতর তত্ত্বকথা ছেড়ে দিলে, এর মধ্যে সতীহারা মহাদেবের চরিত্রটি কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তা স্বীকার করতে হবে। "রে সতী, রে সতী, কাঁদিল পশুপতি, পাগল শিবপ্রমথেশ" প্রভৃতি লঘুগুরু স্বরে উচ্চারিত পশুপতির মানবিক কান্না এককালে বাংলার পাঠকদের কণ্ঠস্থ ছিল। মহাদেবের বেদনাতুর চরিত্র এবং দশমহাবিদ্যার রূপের বর্ণনা বাদ দিলে এতে আর বিশেষ কোন প্রশংসনীয় গুণ পাওয়া যাবে না। এই খণ্ডকাব্যগুলি ছাড়াও তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের *Tempest* অবলম্বনে 'নলিনীবসন্ত' (১৮৭০) এবং *Romeo-Juliet* অবলম্বনে 'রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫) রচনা করেন। এই অনুবাদে সাধারণ চরিত্র ও তাদের ভাষা-সংলাপে তিনি স্থূল বাস্তবতার অনুকরণ করেছেন। অনুবাদটি অন্যান্য স্থানে অতিশয় কৃত্রিম, কোন কোন স্থলে হাস্যকর। এই সমস্ত খণ্ডকাব্য ও শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদে হেমচন্দ্রের এমন কোন প্রতিভা প্রমাণিত হয়নি, যার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালজয়ী হবেন। তিনি স্মরণীয় হয়েছেন, মাইকেলের পাশে স্থান করে নিয়েছেন 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড—১৮৭৫, ২য় খণ্ড—১৮৭৭) প্রকাশিত হবার পর। তাঁর মহাকবি আখ্যা এই মহাকাব্যের জন্যই প্রচার লাভ করেছে এবং 'মেঘনাদবধে'র পরে 'বৃত্রসংহার'ই দ্বিতীয় মহাকাব্যের গৌরব লাভ করেছে।

'বৃত্রসংহারে'র কাহিনী পৌরাণিক হলেও বেদে, এমন কি প্রাগবৈদিক ইন্দো-ঈরানীয় সাহিত্যেও ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী আছে। কবি

কবির রজনী প্রভাত হয়নি, অন্ধকবি অন্ধকারের মধ্যেই আলোক-সুন্দর বসুন্ধরা থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। সেই বেদনার সঙ্গে ঈশ্বরে আত্মনিবেদন বড় করুণ সুরে বেজেছে। তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন মনে হলে তাঁর কাব্যকবিতার বিচার-বিশ্লেষণ ম্লান হয়ে যায়, তাঁর প্রতি মমতায় পাঠকের মন সজল হয়ে ওঠে। মধুসূদনও বহু দুঃখ পেয়েছিলেন, তবে সে দুঃখের সান্ত্বনা—বহু বন্ধু, কবি ও অনুরাগীর অকৃপণ সহানুভূতি। অন্ধ হেমচন্দ্র দূরপ্রবাসে কাশীধামে প্রায় নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব অবস্থায় জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে গেছেন একথা মনে হলেই তাঁর প্রতি আমাদের মন সহানুভূতিতে ভরে যায়।

৫. নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি বিস্ময়কর কবিচরিত্র নবীনচন্দ্র সেন। এঁর ব্যক্তিচরিত্র কবিচরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করাতে নানাদিক থেকেই কবির কাব্যকবিতা আলোচনা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। চট্টগ্রামের এক নবীন যুবক যিনি এফ. এ. পড়বার জন্য রাজধানীতে এসেছিলেন, তিনি বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই অল্পকালের মধ্যে কলকাতার সারস্বতজীবনে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেন।

নবীনচন্দ্রের পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, তারপর তাঁদের এক শাখা সম্ভবত বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে চট্টগ্রামে চলে যান। নবীনচন্দ্রের পিতাও চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যবহারজীবী ছিলেন। কবি বাল্যকালেই কিছু কিছু কবিতা লিখেছিলেন। পরে কলকাতায় কলেজ জীবনে এসে তাঁর কাব্যশক্তি অধিকতর স্ফূর্তিলাভ করে, 'এডুকেশন গেজেট' এবং আরও নানা বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় নবীন-কবির অনেকগুলি গীতিকবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর সুবৃহৎ আত্মজীবনী 'আমার জীবনে' কবির ব্যক্তিগত জীবন ও সমসাময়িক দেশকাল সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক এবং ঈষৎ অতিরঞ্জিত কাহিনী আছে। এই গ্রন্থেই কবি সবিস্তারে তাঁর কাব্যজীবনের ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। সে যুগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র তরুণ বয়সেই সরকারী কার্যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন বলে কর্মক্ষেত্রে উপরওয়ালার দ্বারা নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে স্বাদেশিক বাসনার উদ্রেক হয়—যার ফলে 'পলাশীর

যুদ্ধে'র প্রকাশ। চাকুরী জীবনে তাঁকে অনেকদিন বাংলার বাইরে পুরী ও রাজগিরে থাকতে হয়েছিল। এই সমস্ত জায়গায় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমিকায় অবস্থান করে ইহমুগ্ধ কবির মনে হিন্দুর প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যাদির (যথা, ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদি) প্রতি গভীরতর বাসনার জন্ম হয়। তিনি ভগবান বাসুদেবের পূত চরিত্রকথা অবলম্বনে যে তিনখানি বিরাট কাব্য রচনা করেন ('রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র,' 'প্রভাস'), তার সূচনা এই পুরীধামে ও রাজগিরেই হয়েছিল। একদা তিনি সমগ্র দেশে 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি এবং বাংলার বায়রন বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, কিন্তু উক্ত তিনখানি পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাব্য রচনার পর তিনি মহাকবি নামে ভূষিত হন। বস্তুত মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—এই তিনজন কবি যথার্থ মহাকাব্য লিখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনজনকেই মহাকবি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। নবীনচন্দ্র শুধু কবি হিসেবেই নয়, বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র প্রৌঢ়যৌবনে মহাকাব্যের পরিকল্পনা করলেও আসলে তিনি ছিলেন গীতিকবি, গীতিরসপূর্ণ আখ্যানকাব্যের কবি। প্রথম-যৌবনে লেখা কবিতাগুলির সমস্তই গীতিকবিতা, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যদি কারও কবিতায় যথার্থ পাশ্চাত্ত্য ধরনের লীরিক স্বাদ পাওয়া যায় তবে তার কিছুটা নবীনচন্দ্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ এই ক'টি পংক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে :

> নিবুক নিবুক প্রিয়ে দাও তারে নিবিবারে
> আশার প্রদীপ।
> এই তো নিবিতেছিল কেন তারে উজলিলে
> নিবুক সে আলো, আমি
> ডুবি এই পারাবারে।

এখানে রোমান্টিক প্রেমের নৈরাশ্য চমৎকার ফুটেছে। প্রধানত প্রেম ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই তাঁর অধিকাংশ গীতিকবিতা রচিত হয়েছে, এবং সেগুলি 'অবকাশ-রঞ্জিনীর' দুই খণ্ডে (১ম—১৮৭১, ২য়—১৮৭৮) প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত আবেগ ও চিত্তপ্রবণতা গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সে বৈশিষ্ট্য নবীনচন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিত্ব কোন কোন সময়ে কিছু উগ্র হয়ে 'অহং' (Ego)-এর পর্যায়ে পড়েছে, ফলে গীতিরসের

হেমচন্দ্রকে নিয়ে আমরা মহাকবি বলে খুব উল্লসিত হতে পারতাম। কিন্তু মধুসূদনের প্রচণ্ড প্রতিভার বলে হেমচন্দ্রের গতানুগতিক মহাকাব্য চাপা পড়ে গেছে।

অবশ্য মহাকাব্য ছেড়ে দিলে, কবি হেমচন্দ্র কতকগুলি বিষয়ে নিশ্চয়ই গৌরব দাবি করতে পারেন। যেমন, ইংরেজী লীরিক কবিতার অনুবাদ, উক্ত আদর্শে মৌলিক গীতিকবিতা লিখবার চেষ্টা এবং রঙ্গব্যঙ্গমুখর সামাজিক কবিতার বিস্ময়কর জীবন্ত ভাব। তাঁর তিনখানি গীতিকবিতা-সংগ্রহে (কবিতাবলী, প্রথমখণ্ড—১৮৭০; ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৮০, এবং 'চিত্তবিকাশ'—১৮৯৮) কিছু প্রতিভার ছাপ আছে। এ ছাড়াও ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের সুরসিক বোদ্ধা হেমচন্দ্র পোপ, ড্রাইডেন, লংফেলো, শেলী, কীট্‌স্‌ প্রভৃতি অনেক কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। সে অনুবাদের দু' একটি মাত্র সুখপাঠ্য হয়েছে, অন্যগুলি আক্ষরিক অনুবাদের কৃত্রিমতায় ভরা। তবে পাশ্চাত্ত্য রীতির গীতিকবিতার প্রধান সুর যে মন্ময়তা (Subjectivity), তা তিনি প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বহু গীতিকবিতায় ব্যক্তি-হৃদয়ের বেদনামাধুরী উপলব্ধি করা যায়। একদা 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' ("হতাশের আক্ষেপ"), 'ভারত সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা সাধারণ পাঠকের কণ্ঠস্থ ছিল। প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেম নিয়ে রচিত তাঁর কয়েকটি গীতিকবিতা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে, এর মধ্যে আবেগপ্রবণ কবিহৃদয় চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। অবশ্য বিশুদ্ধ লীরিক বৈশিষ্ট্য, রোমাণ্টিক কল্পনা প্রভৃতি তাঁর ততটা ছিল না, ফলে সাদাসিধেভাবে মনের ভাব প্রকাশে তিনি সক্ষম হলেও সূক্ষ্মতর হৃদয়-বৃত্তি, দূরপ্রসারী চিত্রকল্পরীতি, ভাষা ও ব্যঞ্জনার প্রতীকতা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর গীতিকবিতাগুলি খুব উচ্চ স্তরের নয়। বরং সমসাময়িক গীতিকবিরা (বিহারীলাল ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়) তাঁর চেয়ে অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে সচেতনভাবে ইংরেজী গীতিকবিতার অনুসরণের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য।

হেমচন্দ্র আর এক ধরনের কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের ভাবধারা অনুসরণ করে আবেগব্যাকুল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা এনে সত্যিই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মহাকবি ও গীতিকবি-প্রতিভার যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি আবার ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভণ্ডামির ওপর তীব্র ব্যঙ্গের জ্বালাকর আঘাত হেনেছেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে আন্দোলনমূলক রাজনৈতিক চেতনা জাগছিল। হাস্যকর কৃত্রিম

আস্ফালন, ইংরেজের বিরুদ্ধে ফাঁকা বীররস প্রয়োগ, রাজনৈতিক অনুকরণের নীচতা, ভোটভণ্ডুল, করপোরেশনের নির্বাচন-সংক্রান্ত ঘোঁটপাকানো প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তিনি যে সমস্ত শাণিত ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন, সেগুলির দাম এখনও অটুট আছে। এর ভাষায় রঙ্গব্যঙ্গের উতরোল হুল্লোড়, আক্রমণের অম্লতিক্ত স্বাদ—কোথাও-বা নিছক হিউমারের সহাস্য কৌতুক বড়ই উপভোগ্য হয়েছে। যারা বাইরে ইংরেজের বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই ইংরেজের তোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর উক্তি :

> পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' আবার তারা।
> তাদের আবার 'এজিটেশন' নরুণ উঁচু করা॥

এ রচনার তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে। এ সমস্ত রঙ্গব্যঙ্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন স্বদেশানুরাগ আছে বলে এর দাম এখনও কম নয়। মহাকবির বিশালতা ও গাম্ভীর্য, গীতিকবির আবেগোচ্ছলতা এবং রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতার সমন্বয়ে গঠিত তাঁর প্রতিভা উনিশ শতকের পটভূমিকায় নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার যোগ্য এবং মাইকেলকে না পেলে তাঁকে আমরা স্বচ্ছন্দে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে পারতাম। কিন্তু মুসকিল বাধিয়েছেন মধুসূদন। তিনি মহাকাব্যের তূর্য নিনাদ করে এবং গীতিরসের সপ্তস্বরা বীণাযন্ত্রে তার বেঁধে দিয়ে আমাদের মন-প্রাণ-কান এমনভাবে মাতিয়ে রেখেছেন যে, হেমচন্দ্রাদির মোটা সুর কানে আর ভালো লাগে না। সে যাই হোক, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সমালোচনার মানদণ্ডে তৌল করে তাঁকে আজ আমরা যে আসনই দিই না কেন, তাঁর মতো খোলাপ্রাণের উদার ও স্বদেশানুরাগী কবি চিরদিনই পাঠকের দরবারে শ্রদ্ধার আসন লাভ করবেন। শেষজীবনে কবি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাভাবে নানা কষ্টে পড়েছিলেন, সরকারের দেওয়া কয়েকটি মুদ্রাই ছিল এই অন্ধকবির একমাত্র সম্বল। সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে তিনি আর্তনাদ করে জীবনেশ্বরকে প্রশ্ন করেছেন।

> বিভু কি দশা হবে আমার।
> প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
> পুলকিত করিবে সকলে।
> আমারি রজনী শেষ হবে নাকি হে ভবেশ,
> জানিব না দিবা কারে বলে?

('The Mahabharata of the Nineteenth Century') রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই তীক্ষ্ণ মন্তব্যে কবি ঈষৎ আহত হলেও নিজ সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না, প্রচুর পরিশ্রম করে এই ত্রয়ী কাব্য সমাপ্ত করলেন। প্রকাশের পর এ কাব্যকে বহু পাঠক অতিশয় প্রশংসা করলেন, কোন কোন সমালোচক এর কিছু কিছু ত্রুটিও আবিষ্কার করলেন। কারও কারও মতে এর পরিকল্পনায় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবি কিন্তু সেকথা মানেননি; তাঁর মতে এ কাব্যের পরিকল্পনার জন্য তিনি কারও কাছে ঋণী নন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কিছুটা খর্ব হলে শিক্ষিত হিন্দুসমাজে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা প্রাচীন পুরাণ ও মহাকাব্যাদি বিচার-বিশ্লেষণের রীতি প্রচারিত হয়। এই সময় কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, তাঁর শিষ্য গৌরগোবিন্দ রায়, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী —এঁরা সকলেই নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা শুরু করেন। নবীনচন্দ্রও এই ভাবাবেগের মধ্যে বর্ধিত হয়েছিলেন—সুতরাং তাঁর কাব্যে কৃষ্ণ-চরিত্র পরিকল্পনা বিশেষ কোন লেখক বা গ্রন্থের কাজে ঋণী নয়, সমস্ত যুগমানস তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ত্রয়ীকাব্যে তিনি মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণজীবনকথা সংগ্রহ করলেও, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য—কবির কতকগুলি মৌলিক পরিকল্পনা। এতে তিনি কৃষ্ণকে ভগবান বা অবতার রূপে না এঁকে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহামানব রূপেই এঁকেছেন। আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি আদর্শকেই তিনি কৃষ্ণজীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর কৃষ্ণ পুরাণের পরিমণ্ডল ছেড়ে আধুনিক ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণকে দিয়ে তিনি ভাবী ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য প্রচার করিয়ে নিয়েছেন। এ ছাড়াও সুভদ্রা ও অন্যান্য চরিত্রে আধুনিক যুগ ও জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। এই ত্রয়ীকাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—কবি এতে পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে কয়েকটি কল্পিত কাহিনীর ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। জরৎকারু, শৈলজা, দুর্বাসা ও বাসুকির কাহিনী রচনায় তিনি

সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব কবিপ্রেরণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূল আখ্যানের চেয়ে এই আখ্যান ও চরিত্রগুলি অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও নাটকীয় হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, মূল আখ্যানকে ছেড়ে উপকাহিনীগুলির (যার প্রায় সবটাই পুরাণ-বহির্ভূত ঘটনা) প্রতি ধাবমান হওয়া প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার চিহ্ন নয়, এবং নবীনচন্দ্রের এই তিনখানি কাব্যের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু উক্ত কল্পিত কাহিনীর পটভূমিকা হিসেবে তিনি প্রাচীন ভারতের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র এঁকেছেন সে সম্বন্ধেও সমালোচকের দল অভিযোগ তুলেছেন। এতে দেখান হয়েছে, কৃষ্ণের সমসাময়িক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষমতার অধিকার নিয়ে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল, ব্রাহ্মণদের নেতা দুর্বাসা কৃষ্ণ ও ক্ষত্রিয় সমাজকে খর্ব করার জন্য অনার্য দলপতি বাসুকির সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এ ঘটনা কিন্তু কোন পুরাণে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কাজেই কবির এ মৌলিক পরিকল্পনা ধোপে টেঁকেনি। এই কাব্যে চরিত্র, বর্ণনা, গাম্ভীর্য প্রভৃতিতে কবি যে মহাকবির সম্মান সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন তা মনে হয় না। এই ত্রয়ীকাব্য কোন দিক দিয়েই মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি—এ হয়েছে পুরাণ-কাহিনীকেন্দ্রিক অভিনব আখ্যানকাব্য। কিছু কিছু প্রশংসনীয় রোমান্টিক ও নাটকীয় গুণ থাকলেও মহাকাব্যের বিশালতা, চরিত্র-পরিকল্পনার ঔদার্য এবং রচনারীতির ক্লাসিক গাম্ভীর্য ভাবপ্রবণ কবি নবীনচন্দ্র বড়ো একটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। আসলে তিনি ছিলেন রোমান্টিক ও লীরিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী; এই তিনখানি কাব্যের কোন কোন অংশে রোমান্টিক ও লীরিক বৈশিষ্ট্য বেশ চমৎকার ফুটেছে, কিন্তু মহাকাব্যের বিশাল-রস ও বিস্ময় তাঁর কবিচরিত্রেও ছিল না, কাব্যেও তার প্রমাণ নেই। সে যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য, সামাজিক আদর্শ, রাষ্ট্রচেতনা য়ুরোপীয় প্রভাব শিক্ষিত বাঙালীর মনকে কোন্ দিকে এবং কতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা জানতে হলে এই 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে'র সাহায্য নিতে হবে।

নবীনচন্দ্র কিছু কিছু মহাপুরুষ-জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন। 'খৃস্ট' (১৮৯১), 'অমিতাভ' (১৮৯৫) এবং 'অমৃতাভে' (১৯০৯) তিনি যথাক্রমে যিশু খ্রীস্ট, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের ভাগবতী কাহিনী রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে 'অমৃতাভে' চৈতন্যজীবনকথা তিনি সমাপ্ত করিতে পারেননি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

'সাধারণীকরণ' কিছু বাধা পেয়েছে। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে বায়রনের কিছু মিল আছে। অনুভূতির তীব্রতা, আত্মপ্রকাশের অসংযম, প্রচণ্ড আবেগ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি কিছুটা বায়রনপন্থী ছিলেন। আবার তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শেলীর ভাবাবেগে-উদ্বেল বিশ্বৈক্যবোধ এবং কীট্‌সের সৌন্দর্যপ্রীতিও ছিল। তবে তাঁর প্রতিভায় গীতিকবির ঐশ্বর্য থাকলেও সংযমের অভাবে এ প্রতিভাকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগতে পারেননি। ব্যক্তিগত আবেগকে বশীভূত করে তাকে বিশ্বগত করে তোলার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল না, তাই তাঁর অধিকাংশ গীতিকবিতা আবেগের প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গেছে। সে যাই হোক, তাঁর প্রতিভা মূলত গীতিকবির প্রতিভা, এবং তাঁর কয়েকটি গীতিকবিতা যে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নবীনচন্দ্র কয়েকখানি আখ্যানকাব্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। এই আখ্যানকাব্যেই বায়রনের অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) এবং 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)—এই তিনখানি তাঁর আখ্যানকাব্য। তার মধ্যে 'পলাশীর যুদ্ধ' হাল আমলের কাহিনী বলে বাংলার পাঠকসমাজে অধিকতর পরিচিত। রচনার দিক থেকেও এর কোন কোন অংশ উল্লেখযোগ্য। মতিলাল ঘোষের প্রভাবে তিনি পলাশীর যুদ্ধকে অবলম্বন করে ইতিহাসমিশ্রিত স্বাদেশিক আখ্যানকাব্য রচনা করেন। সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, মিরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র, ক্লাইভের সেই ষড়যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ, সিরাজের পলাশীর মাঠে পরাজয় ও পলায়ন তারপর ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে আসা, পরিশেষে নির্মমভাবে নিহত হওয়া—এই হল পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী। কাব্যটি তরুণ বয়সের রচনা বলে কবি ইতিহাসকে সর্বত্র যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেননি, আবেগের অসংযম তো আছেই। ক্লাইভের চরিত্র কিছুটা সুচিত্রিত হয়েছে। মুমূর্ষু মোহনলালের ক্ষুব্ধ উক্তির মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রাণ কবিরই ধিক্কার ফুটে উঠেছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' দীর্ঘকাল স্কুলে পড়ানো হত বলে এই কাব্য পাঠকসমাজে সুপরিচিত হয়েছিল, কবি পরবর্তী কালেও শুধু এই কাব্যের রচনাকার বলে প্রচুর শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। অবশ্য 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক কাব্য হতে পারেনি। ইতিহাসকে ছেড়ে কল্পনার অবাধ দৌড় করানো তাঁর একটা বড় রকমের ত্রুটি। ইতিহাসের বস্তুসত্য ও কল্পনার কাব্যসত্যকে মিশিয়ে দেওয়া অতি দুরূহ কাজ। বলা বাহুল্য, সে কর্মে তিনি ততটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তবু তাঁর কবিখ্যাতির অনেকটাই 'পলাশীর যুদ্ধে'র ওপর

নির্ভর করছে। 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) আকারে অতি ক্ষুদ্র, বিশেষ কোন প্রতিভা এতে দেখা যায় না। তবে কবি রক্ষণশীল মনোবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে ক্লিওপেট্রাকে সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন, এজন্য তিনি প্রশংসা দাবি করতে পারেন। 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) একটি কাল্পনিক, রোমাণ্টিক স্বদেশপ্রেমের কাহিনী। এর কল্পনা অসংযত, রোমাণ্টিকতা নীরক্ত-পাণ্ডুর এবং স্বদেশপ্রেম আবেগসর্বস্ব উত্তেজনা মাত্র। এতে কবিপ্রতিভা কোন দিক দিয়েই নিজস্ব স্বাক্ষর মুদ্রিত করতে পারেনি। নবীনচন্দ্র যে জন্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়েছেন, তা হচ্ছে 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের জন্য—রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস বাংলা সাহিত্যে 'ত্রয়ীকাব্য' নামে পরিচিত।

১৮৮৭ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে নবীনচন্দ্রের তিনখানি পৌরাণিক আখ্যান-কাব্য মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিকায় রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়—'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)। প্রধানত কৃষ্ণের জীবনকথাই এই তিনখানি কাব্যের অবলম্বন। পুরী ও রাজাগিরে অবস্থান করার সময় তাঁর মনে সর্ব-প্রথম মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। তিনি কৃষ্ণজীবনকে ভিত্তি করে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিশাল মহাকাব্যের সূচনা করেন—এটি সমাপ্ত করতে মোট চৌদ্দ বছর অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে ('রৈবতক') কৃষ্ণলীলার আদি পর্ব ; মূল ঘটনা—অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ। দ্বিতীয় খণ্ডে ('কুরুক্ষেত্র') কুরুক্ষেত্র সমরের পটভূমিকায় অর্জুন-সুভদ্রার পত্র বীরকিশোর অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যু এবং তৃতীয় খণ্ডে ('প্রভাস') যদুবংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দুটি খণ্ডে কৃষ্ণচরিত্র ততটা প্রাধান্য পায়নি, অবশ্য প্রচ্ছন্নাবস্থায় তিনি সমস্ত ঘটনাসূত্র নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তৃতীয় খণ্ডেই তাঁর কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। এই কাব্যের কিছুটা লিখে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাসহ মতামতের জন্য সেগুলি নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে সমস্ত পড়ে কবিকে খুব একটা উৎসাহিত করেননি। তিনি বলেন যে, নবীনচন্দ্র অতিশয় দুঃসাহসের বশে বেদব্যাসের রচনার ওপর নতুন কথা সংযোজিত করতে গেছেন। এতে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ভাবধারাসমূহ সংযোজিত করেছেন—কৃষ্ণ যেন আধুনিক কোন সমাজগুরু বা রাষ্ট্রনেতার মতো মন্তব্য করেছেন। এ কাব্য সম্পূর্ণ হলে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, লোকে কবিকে নিন্দাই করবে। তারা বলবে, কবি এই তিনখানি কাব্যে "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত"

এ কাব্যকাহিনীগুলি রচনার দিক দিয়ে তেমন সুখপাঠ্য নয়। এর মধ্যে 'অমিতাভ' (বুদ্ধজীবনী) কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কাব্যগুলি পড়লে দেখা যাবে মহাপুরুষদের মূর্তি বহ্নিময় হতে পারেনি, হয়েছে অঙ্গারম্লান। এ ছাড়াও তিনি চণ্ডী ও গীতার কাব্যানুবাদও করেছিলেন—সেগুলি অনুবাদ হিসেবে কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়।

তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর কিছু কিছু গদ্যরচনা প্রশংসার যোগ্য তা এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে। 'ভানুমতী' (১৮০৯) নামে তিনি একখানি দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাস হিসেবে এর কোন গৌরব স্বীকার করা যায় না। যিনি আখ্যানকাব্যে এত সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন, তিনি গদ্য উপন্যাসে এতটা ব্যর্থ হলেন কেন বোঝা যাচ্ছে না। এর চরিত্র-পরিকল্পনাও নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত তাঁর 'আমার জীবন' (১৩১৬-১৩২০) শীর্ষক আত্মকথা বাংলা আত্মজীবনীর একটি অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারে। এতে কিছু কিছু অতিরঞ্জন থাকলেও এ ধরনের সরস, সহজ, খোলামনে-লেখা আত্মজীবনী বাংলা ভাষায় আর রচিত হয়নি। তিনি উপন্যাস রচনায় ব্যর্থ হয়েছেন বটে, কিন্তু আত্মজীবনীতে উপন্যাসের রস সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর কিছু কিছু চিঠিপত্রও পত্রসাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

নবীনচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগাদর্শেই লালিত হয়েছিলেন, তাঁর কাব্যাদিতে সেই যুগের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছে। যুগের প্রভাবেই তিনি মহাকবি হবার দুঃসাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন গীতিপ্রতিভার অধিকারী। গীতিকবিসুলভ ভাগাবেগের ঐশ্বর্য ও রোমান্টিক কল্পনার প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন ; তাঁর কয়েকটি গীতিকবিতা এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য রচনার মতো বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতা তাঁর ছিল না, তাই তথাকথিত 'ত্রয়ীকাব্য' অনেক স্থলেই মহাকাব্যোচিত বিশালতা সৃষ্টিতে সার্থক হতে পারেনি। মহাকাব্য রচনায় পণ্ডশ্রম না করে তিনি আরও কিছু গীতি-কবিতা লিখলে বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত আধুনিক গীতিকবিতার শ্রীবৃদ্ধিই হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদনের আবির্ভাবে এবং নবযুগের প্রভাবে বাংলাদেশে মহাকাব্য রচনার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। মাইকেলের অনুবর্তী ও শিষ্যস্থানীয় হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় কোন কোন স্থলে কিছু কৃতিত্ব

দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আর যাঁরা মহাকাব্যরূপ উচ্চ বৃক্ষশাখার অমৃতফল আহরণ করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের বামন কল্পনা তাঁর কিছুমাত্র নাগাল ধরতে পারেনি। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে যে সমস্ত মহাকাব্য লিখেছিলেন তাতে মহাকাব্য দূরের কথা, কোনও প্রকার কাব্যলক্ষণই ছিল না। দীননাথ ধরের 'কংস-বিনাশ' (১৮৬১), মহেন্দ্রচন্দ্র শর্মার 'নিবাতকবচ বধ' (১৮৬৯), ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর 'পাণ্ডব চরিতকাব্য' (১৮৭৭), বলদেব পালিতের 'কর্ণার্জুন কাব্য (১৮৭৫), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শক্তিসম্ভব কাব্য' (১৮৭০), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' (১৮৭৩), গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভার্গববিজয়' (১২৮৪ বঙ্গাব্দে), হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর 'রাবণবধ' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) এবং মাইকেল মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২ সাল) ও 'শিবাজী' (১৩২৫) প্রভৃতি কাব্যগুলি নিতান্তই মহাকাব্য রচনার প্রথাপালনের জন্য রচিত হয়েছিল। প্রতিভা না থাকলে কাব্যরচনা যে কি রকম হাস্যকর বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে, এগুলির অধিকাংশই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন এঁরা মহাকাব্য রচনার জন্য গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছিলেন, তখন কিন্তু বাংলা কাব্যে গীতিকাব্যের যুগ দৃঢ়মূল হয়েছে ; স্বয়ং বিহারীলাল এবং তাঁর শিষ্যগণ গীতিকাব্যের গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে নবযুবক রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন কবি গীতিকাব্যের যে জ্যোতির্ময় মূর্তি নির্মাণ করেন, তার ভাস্বরতায় মহাকাব্য রচনার এই সমস্ত কৃত্রিম প্রচেষ্টা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত হলেও যাঁরা অদৃশ্যপ্রায় কাব্যপ্রবাহকে বলপূর্বক ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা এমন কোন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, যার জন্য বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কেউ কেউ একটি বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতকে বেশ তো মহাকাব্যধারা চলছিল, হঠাৎ সে ধারা বিস্মৃতির বালুকাতলে অবলুপ্ত হয়ে গেল, এবং তার খাত দিয়ে গীতিকবিতার প্রবাহ প্রলয়বেগে বয়ে যেতে লাগল—এর কারণ কি? এর কারণ নির্ণয় খুব দুরূহ নয়। গীতিকাব্যের প্রবণতা বাঙালীর মজ্জাগত সংস্কার, দ্বাদশ শতকের জয়দেব থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার কাব্য প্রধানত গীতিরসকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু ঊনবিংশ

শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া প্রবেশ করলে বাঙালীর হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড, বিশাল ও বিচিত্র আত্মবিকাশের আবেগে জেগে উঠল ; সে নিজেকে প্রসারিত করতে চাইল দেশে ও কালে, আর তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে মাইকেল ও তাঁর শিষ্যদের মহাকাব্যরচনা। যুগপ্রভাবেই তাঁরা মহাকাব্যের খেয়াতরীর হাল ধরেছিলেন। কিন্তু যাত্রার অন্তিমে তাঁদের পৌঁছাতে হল গীতিকাব্যের ঘাটে ঘাটে। অবশ্য মহাকাব্যের যুগের পাশে পাশে গীতিকাব্যের ধারা প্রবাহিত হলেও এরই সঙ্গে আর একটা শাখাও কিছু প্রাধান্য অর্জন করেছিল। এটি হল রোমাণ্টিক আখ্যানকাব্যের ধারা। মনে হচ্ছে, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মাঝখানে আখ্যানকাব্যের ধারা বহমান হয়েছিল। এতে মহাকাব্যের মতো কাহিনীরস ছিল, আর তারই সঙ্গে ছিল গীতিকবিতার মতো রোমাণ্টিক কল্পনাপ্রাধান্য। পরে ক্রমে ক্রমে আখ্যানকাব্য অপ্রচলিত হয়ে পড়ল, তার স্থানে গীতিকাব্য সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল।

৬. সমসাময়িক আখ্যানকাব্য

মহাকাব্যের সমকালে গাথাকাব্য অর্থাৎ আখ্যানকাব্যগুলি প্রচলিত হয়ে গীতিকাব্যকে যে ত্বরান্বিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই জাতীয় কাব্যে একই সঙ্গে বস্তুধর্মিতা অর্থাৎ objectivity এবং কবিদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি অর্থাৎ subjectivity—দুই-ই দেখা যায়। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬) প্রেমের প্রথম গাথাকাব্য। তারপর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবিরা দু' একখানি গাথাকাব্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮) গাথাকাব্যের যথার্থ রূপ দিয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সুরসিক বোদ্ধা ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক গাথাকাব্যের রীতি অনুসরণ করে 'উদাসিনী' (১৮৭৪) নামে একখানি উৎকৃষ্ট গাথাকাব্য লিখেছিলেন। ছোট ছোট গীতিকবিতাতেও তাঁর বেশ অধিকার ছিল, তাঁর 'ভারতগাথা'য় (১৮৯৫) অনেকগুলি উৎকৃষ্ট দেশপ্রেমমূলক কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর 'উদাসিনী' গাথাকাব্যই তাঁকে কবিসমাজে স্থায়ী আসন দিয়েছে। গীতিকবিতার ধরনে আবেগ ও কল্পনার সংমিশ্রণে কবি এই কাব্যে সরলা নাম্নী এক বালিকা এবং সুরেন্দ্র নামে এক যুবকের মিলনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি হালকা, আবেগময় এবং কল্পনারসে সমৃদ্ধ।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের নিকট সাহিত্যকর্মে খুব উৎসাহ লাভ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্য, দর্শন, শিল্পবিদ্যা, গণিত—নানা বিভাগে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন। ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, এ বিষয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় লেখা দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। দেশের নানা মঙ্গলকর্মে তাঁর ছিল অকুণ্ঠ যোগাযোগ। কাব্যের ক্ষেত্রেও তাঁর দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। গীতিরসের সঙ্গে হাস্যরসের এমন অদ্ভুত মিলন বড় কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর 'মেঘদূতের' (১৮৬০) অনুবাদের কিয়দংশ একদা শিক্ষিত সমাজের অনেকের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর 'কাব্যমালা'য় (এতে 'কৌতুক না, যৌতুক' এবং 'গুম্ফ আক্রমণ কাব্য' সংযোজিত হয়েছিল) অনেকগুলি কবিতা বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারে। কিন্তু 'স্বপ্নপ্রয়াণের' (১৮৭৫) জন্যই তিনি বাংলা কাব্যে স্মরণীয় হয়েছেন। এই রোমান্টিক রূপক কাব্যটি কতকটা স্পেন্সরের 'ফেয়ারি কুইন'-এর আদর্শে রচিত। রূপক, রূপকথা, গীতিরস, সৌন্দর্য-সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় রহস্য ও উদ্ভট ব্যাপার মিলেমিশে গিয়ে একটি বিচিত্র কবিমন থেকে স্বপ্নপ্রয়াণের আবির্ভাব হয়। কবির স্বপ্নরাজ্যে যাত্রা এবং নানা বাধাবিপত্তি পার হয়ে কল্পনাসুন্দরীর সান্নিধ্য লাভ—এই সামান্য ঘটনাটি অতি অদ্ভুত রূপক-প্রতীক ও অপূর্ব বর্ণনার সাহায্যে চিত্রায়িত হয়েছে। তবে কবি মূলত ছিলেন দার্শনিক মননের অধিকারী, জগৎ ও জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য তাঁর একপ্রকার স্বভাবধর্ম ছিল। ফলে এ কাব্য বিচিত্র হলেও 'ফেয়ারি কুইন'-এর মতো সংহত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। তিনি নানা ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সেগুলিকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেননি, এলোমেলো ফেলাছড়া করে তিনি প্রতিভার অনেকটা অপচয় করেছেন। সে যাই হোক, তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বাংলা রূপক-আখ্যানকাব্যের যে একটি বিচিত্র দৃষ্টান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেমচন্দ্রের ছোট ভাই ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) প্রকৃত কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তরুণ বয়সেই প্রেম ও স্বদেশপ্রেমের দু-চারটি ভালো কবিতা লিখে কিছু কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর তিনখানি গীতিকাব্যে ('চিত্তমুকুর'—১৮৭৮, 'বাসন্তী'—১৮৮০ এবং 'চিন্তা'—১৮৮৭) এই ধরনের কয়েকটি সুখপাঠ্য কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল। ঈশানচন্দ্র গদ্যও কিছু কিছু

রচনা করেছিলেন। তাঁর টুকরো কবিতা ও আখ্যানকাব্যের প্রধান সুর রোমাণ্টিক স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংঘর্ষ এবং স্বপ্নভঙ্গ। তাঁর কাব্যানুভূতি ও ব্যক্তিগত জীবন একই সূত্রে বাঁধা ছিল, ফলে এই বিপরীত দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনকেই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল—যার শোকাবহ পরিণাম আত্মহত্যা। তাঁর 'যোগেশ' (১৮৮০) নামে আখ্যানকাব্য এককালে করুণরসের কাব্য হিসেবে পাঠকমহলে সুপরিচিত ছিল। বস্তুত এই কাব্যের নায়ক যোগেশ কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়, যোগেশের চরিত্রে স্বয়ং কবি নিজের জীবনের দুঃখবেদনাকেই চিত্রিত করেছেন। যোগেশের নিজ স্ত্রী ছেড়ে আর এক নারীর প্রতি আসক্তির পরিণাম এর বর্ণিতব্য বিষয়। বিষয়টি আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যের সংমিশ্রণে অপূর্ব হয়েছে—যদিও শেষাংশ নীতিবোধের বাড়াবাড়ির ফলে কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক, এই আখ্যানকাব্যে কবি সমসাময়িক সংস্কারের ওপরে উঠতে পেরেছিলেন, তার জন্য তিনি প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

এই যুগে রামকৃষ্ণ রায়ের 'নিভৃতনিবাস' (১৮৭৮), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮), আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনাকাব্য' (১৮৭৬) প্রভৃতিতে আখ্যানকাব্যের ধারারই নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে। তবে ক্রমে ক্রমে আখ্যানকাব্যের ধারা মন্দীভূত হয়ে এল এবং সেখানে গীতিকবিতার অসীম বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করল। এই প্রসঙ্গে একখানি ব্যঙ্গ-আখ্যানকাব্যের উল্লেখ করা কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরসের নিপুণ শিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি পঞ্চানন্দ ও পাঁচুঠাকুর নামে সাময়িক পত্রিকায় লিখতেন) বাঙালীর অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সে যুগের কংগ্রেসী আবেদন-নিবেদনের দীনতাকে বিদ্রূপ করে মাইকেলী ঢঙে 'ভারত-উদ্ধার' নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেছিলেন। গুরুগম্ভীর ভাবে ও ভাষায় অথচ ব্যঙ্গরসের সাহায্যে রচিত এ ধরনের আখ্যানকাব্য ইংরেজী সাহিত্যে Mock Heroic Epic নামে পরিচিত। ইন্দ্রনাথের কিছু পূর্বে জগবন্ধু ভদ্র 'ছুচ্ছন্দরী বধ' কাব্য নামে আর একখানি ব্যঙ্গকাব্যের সূচনা করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের 'ভারত-উদ্ধার' একখানি দুর্লভ ব্যঙ্গকাব্য। রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ আক্রমণ এবং পরিহাসের তরল হাস্যরস এ কাব্যে চমৎকার মিলিত হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলা গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১. ভূমিকা

কবির সুতীব্র ব্যক্তিক অনুভূতি থেকে গীতিকবিতার জন্ম হয়, তাই গীতি-কবিতা একান্তভাবে কবিজীবনীর সঙ্গে জড়িত, অবশ্য তার সঙ্গে মর্ত্যজীবনের সম্পর্ক থাকে অল্প। এই বস্তুজগৎ কবির হৃদয়ে গিয়ে নানা স্পন্দন ও অনু-রণন জাগিয়ে তোলে, মনের আকাশে অযুত বর্ণের মায়া সৃষ্টি করে। সুতরাং কবির "intense personal emotion"-ই যে গীতিকবিতার প্রাণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের পাখায় ভর করে একটি নিটোল রসমূর্তি ধারণ করে, সেই সঙ্গীতময় বাক্‌মূর্তির নাম গীতিকবিতা (Lyric Poetry)।

এক সময়ে গান করার উপরই গীতিকবিতার অস্তিত্ব নির্ভর করত, প্রাচীন গ্রীসে বীণাযন্ত্র বা লায়ার যন্ত্র বাজিয়ে যে কবিতা গান করা হত তাকেই বলত লীরিক, ক্রমে গানের দাসত্ব থেকে কবিতা মুক্তি পেল, কিন্তু কিছুটা গানের ধর্ম গীতিকবিতাতে রয়ে গেল। গান যেমন গায়কের কণ্ঠ থেকে উদ্‌গীত হয়ে শ্রোতার হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করে, তেমনি গীতিকবিতাও কবির হৃদয় থেকে জন্ম লাভ করে পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই যে কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, এটি আধুনিক কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে প্রচুর গীতিকবিতা রচিত হয়েছে, যা প্রাচীন লীরিকের মতো প্রধানত গান করা হত। কিন্তু প্রত্যেক কবিই বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পদ লিখতেন বলে তাঁদের পদে ব্যক্তিগত কথার চেয়ে ধর্মীয় অনুভূতিই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন কোন শাক্তপদে অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে কবিচেতনার ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়। তারপর কবিওয়ালা ও টপ্‌পাগায়কদের গানেও কোন কোন স্থলে কবিমনের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। আধুনিক যুগে ঈশ্বর গুপ্তের দু'চারটি কবিতায় গীতিকবিতার অল্পস্বল্প লক্ষণ থাকলেও ১৮৬২ সালে রচিত মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দুটি যথার্থ আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম সূচনা করে। মধুসূদন

মহাকবি হলেও তাঁর অন্তরের প্রবণতা অনেক সময় গীতিকবিতার দিকেই ধাবিত হত তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি।

বাংলাদেশে যথার্থ গীতিকবিতার শুরু হল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে—এই যুগটি ১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপরে এলেন রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার অযুত ঐশ্বর্য নিয়ে। ইংরেজী সাহিত্যেও দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে নব্য-ক্লাসিকতার বাঁধাবাঁধি নিয়মের স্থলে গীতিকবিতার মুক্তির আহ্বান ধ্বনিত হল ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ ও কোলরীজের মধ্য দিয়ে। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে ত'ারা দুই বন্ধু মিলে *Lyrical Ballads* প্রকাশ করার পর রোমান্টিক গীতিকবিতার যুগ শুরু হয়ে গেল। এই গীতিকাব্যের প্রবল জোয়ারের যুগ হল ১৭৯৮ থেকে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত—এই যুগেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, স্কট, বায়রণ, শেলী ও কীটসের আবির্ভাব। তাঁরা নিজ নিজ কল্পনার বৈচিত্র্য, অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও সৌন্দর্যের অভিব্যঞ্জনাকে অপরূপ গীতিকবিতার রূপ দিলেন। বাংলাদেশের আধুনিক যুগেও খানিকটা পাশ্চাত্ত্য গীতিকবিতার প্রভাবেই বাংলা গীতিকবিতার গোড়াপত্তন হয়। তবে ইংরেজী সাহিত্যে নব্য-ক্লাসিকতা যুগের পর রোমান্টিক গীতিকবিতার যুগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, একই সঙ্গে ক্লাসিক মহাকাব্য, রোমান্টিক আখ্যানকাব্য এবং ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঙালীর স্বভাবধর্মানুযায়ী গীতিকবিতারই জয় হল। ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রকাশ, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক আখ্যানকাব্য 'ললিতা তথা মানস' তারও আগে ১৮৫৬ সালে মুদ্রিত হয়। ১৮৬২ সালে গীতি-কবিতার জনকস্থানীয় বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সঙ্গীত শতক' কয়েকজনের রসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪) এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য' (১৮৮০) প্রায় এক সময়ে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতকে'র (১৮৮৬) পূর্বেই বিহারী-লালের 'সারদামঙ্গল' (১২৮১ বঙ্গাব্দে কিয়দংশ রচিত, ১২৮৬ বাঙ্গাব্দে কাব্যাকারে প্রকাশিত) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। এই উল্লেখ থেকে দেখা যাবে, প্রায় একই সঙ্গে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য কবি ও পাঠকমহলে প্রচলিত ছিল। এর একটা কারণ হল, গীতিপ্রবণতা বাঙালীর স্বভাবধর্ম হলেও যুগের দাবি অনুসারে অনেকেই মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

ফলে একই সঙ্গে তিন ধরনের কাব্যকলা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী সাহিত্যে দীর্ঘ সময় ধরে যেভাবে এক-একটি পর্যায় সমাপ্ত হবার পর আরেকটি পর্যায় আরম্ভ হয়েছে, অধুনিক বাংলা সাহিত্যে তা হয়নি। এখানে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের দু'শতাব্দীর মতো ঐশ্বর্য বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে একই কালে বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্যপ্রকরণ প্রচলিত হয়েছিল।

এই যে গীতিপ্রবণতা, যা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ এবং যা পুরাতন কাল থেকে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধনভজনের গানের মধ্য দিয়ে চলে আসছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাতে মানবিক আবেগের ধারা এক অভূত-পূর্ব মুক্তির নির্বাধ আনন্দলাভ করল। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি গীতিকবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত আবেগানুভূতিকে পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত করলেন। মূলত এ'দের কাব্যের motif বা উপাদান হল প্রকৃতি, নারীপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম। নারীপ্রেমের সঙ্গেই বিশ্ববিথারী সৌন্দর্যানুভূতিও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এ'রা জড়প্রকৃতিকে আর জড়রূপে দেখলেন না, তাকে প্রাণময় করে তার সঙ্গে আনন্দবেদনারসে যুক্ত হলেন। নারীকেও তাঁরা বাস্তবের গৃহাঙ্গনে সহস্র কর্মজালে-জড়িত গৃহিণীরূপে দেখলেন না, তাকে রোমান্টিক আবেগের নায়িকা, কখনও প্রেয়সী, কখনও শ্রেয়সী, কখনও সৌন্দর্য-স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই উপলব্ধি করলেন। বস্তুত নারীর এই বিচিত্ররূপ, উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। স্বদেশপ্রেমকে অব-লম্বন করেও পরাধীন ভারতের মর্মজ্বালা কোন কোন গীতিকবিতায় বিকশিত হয়ে এক যুগের বাংলাদেশে প্রাণের আবেগকে নতুন রসরূপ দান করেছে। কিন্তু প্রেম ও প্রকৃতি নিয়েই গীতিকবিদের কল্পনা অধিকতর উল্লাস বোধ করেছে এবং উচ্চতর কল্পলোকে উধাও হয়েছে। বলাই বাহুল্য ইংরেজী রোমান্টিক গীতি-কবিতা এই যুগের বাঙালী গীতিকবিদের আবেগ ও কল্পনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। উনিশ শতকের সমগ্র গীতিকাব্যের মধ্যে "An extra-ordinary dovelopment of imaginative sensibility"—অর্থাৎ কল্পনাপ্রধান চিত্তবৃত্তির অসাধারণ উৎসার লক্ষ্য করা যাবে। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বঙ্গপুরাঙ্গনারা উনিশ শতকী সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশে কিছু সঙ্কুচিত হলেও গীতিকবিতার স্বগতভাষণে তাঁরা সঙ্কোচ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেই গৃহবধূরা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এবার আমরা উনিশ শতকের গীতিকবি ও তাঁদের কবিকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

২. বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

বিহারীলাল আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম সচেতন কবি এবং পরবর্তী কালে তাঁর আদর্শ ও মানসিকতা বাংলা কবিতায় বহুল পরিমাণে কার্যকর হয়েছে একথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মাইকেল প্রমুখ মহাকবিদের অন্তর্জীবনেও গীতিরসের প্রচ্ছন্ন নির্ঝর ছিল, যার সম্বন্ধে তাঁরা অনেকেই ততটা অবহিত ছিলেন না। কবি বিহারীলাল মহাকাব্যের যুগে সর্বপ্রথম গীতিকবিতার প্রতি সর্বাত্মকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং মহাকাব্য রচনার যুগে তিনি নিজের মনে কাব্যলক্ষ্মীর সুরসাধনা করেছেন। তখন সাধারণ পাঠকসমাজ মহাকাব্যের দুন্দুভি ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়েছিল, এই ভাবরস-নিমগ্ন, আত্মচেতনায় অন্তর্লীন কবির আনন্দবেদনার সুরে তারা ততটা মুগ্ধ হতে পারেনি। কিন্তু ক্রমেই মহাকাব্যের জলোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয়ে এল, তখন এই নীরব কবি-সাধকের গদ্‌গদ কণ্ঠ দু' একজন মরমী কবির কর্ণগোচর হল। কিছু কিছু ভক্ত তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলেন, ক্রমেই তাঁর গীতিকবিতার একটি ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠল। পাঠক সমাজও মহাকাব্যের রণরঙ্গমুখর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে অন্তর্লোকের সুদূরের অভিসারে যাত্রা করল। এই যে বাংলা কাব্যের পালা-বদলের ইতিহাস, এর প্রধান সূত্রকার কবি বিহারীলাল, পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায় গীতিকবিতায় অবতীর্ণ হয়ে যেন তাঁর সূত্রেরই ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভক্তশিষ্য তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনের কোন কোন রচনায় সাক্ষাৎভাবে তাঁর কাব্যধারার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এর পরবর্তী কালে সগর্বে তার স্বীকৃতির চিহ্ন রেখে গেছেন তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে এবং 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১) প্রকাশিত বিহারীলাল সম্পর্কিত একটি অনবদ্য প্রবন্ধে (এটি তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের' মধ্যে আছে)। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটি রচিত হবার আগে একদল মুষ্টিমেয় রসিকগোষ্ঠী বিহারীলালের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু বৃহত্তর পাঠকসমাজ তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন না। কবির তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে ক্রমেই শিক্ষিতসমাজ এই ভাবরসমুগ্ধ গীতিকবির যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন।

বিহারীলাল কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন, সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বেশ নিগূঢ় ছিল, তাঁর কাব্যেও তার চিহ্ন আছে। কোন এক বন্ধুর কাছে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের কিছু কিছু অংশ, অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, স্কট, বায়রণ ও মূরের কাব্যকবিতা পাঠ করেছিলেন। রোমাণ্টিক পর্বের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, কীটস্‌ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর খুব গভীর যোগ ছিল কিনা সন্দেহ হয়—যদিও এ'দের সঙ্গেই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে আত্মীয়তা। এখানে ত'ার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা দেওয়া যাচ্ছে। 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ-সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিণী' (১৮৭১), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে মাসিকপত্রে প্রকাশিত), 'বাউল বিংশতি' (১২৯৪)। এই কাব্য ও কবিতাসংগ্রহের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলরীজ প্রভৃতি 'লেক' কবিগোষ্ঠী-সুলভ অনুভূতিপ্রবণ, সৌন্দর্যপিয়াসী, আনন্দময় মানসমূর্তি ফুটে উঠেছে। তিনি যে বিদেশী লীরিক কবিতা থেকে এর অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তা মনে হয় না। মনে হয়, যেন জন্মসূত্রেই তিনি লীরিক মনোধর্ম লাভ করেছিলেন—এ যেন তাঁর নিজস্ব সংস্কার।

বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শনে' (১৮৭০) জড়প্রকৃতির একটি প্রাণময় পরিচয় ফুটে উঠেছে, যার অভিনবত্ব সহজেই অনুধাবন করা যাবে। ইতিপূর্বে, এমন কি মধুসূদনেও প্রকৃতির যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তার একমাত্র কাজ ছিল বস্তুগতভাবে কতকগুলি ছবি ফুটিয়ে তোলা, অথবা তাকে মানবজীবনের পটভূমিকা রূপে উপস্থাপিত করা। কিন্তু জড়-প্রকৃতিকে একটা পৃথক ব্যক্তিত্ব দিয়ে তার সঙ্গে চেতন কবিপ্রাণের সম্পর্ক স্থাপন, যা লীরিক কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য তার প্রথম স্বাদ পাওয়া গেল বিহারীলালের মধ্যে, কবি বাস্তব জীবন ও সভ্যতার পাষাণপুরী ত্যাগ করে শ্যামলে-শাদ্বলে স্থলে-জলে কোমলে-কঠোরে-গড়া আদিম অরণ্যপ্রকৃতির বুকে ফিরে যেতে ব্যাকুলতা বোধ করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কটি পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আরও চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী'ও (১৮৭০) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষুদ্র কাব্যে তিনি কয়েকটি নারী-চরিত্র অঙ্কন করে তার মধ্য দিয়ে গৃহচারিণী নারীকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে নারী প্রত্যহের পরিচিত পরিবেশে জননী-জায়া-কন্যা-

ভগিনীরূপে গৃহসংসারে আসীন, তাকেই তিনি 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' করে এঁকেছেন। তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় তাঁর নারী চরিত্রাঙ্কনে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ করে অনুধাবন করেছিলেন। কখনও তিনি এই নারীকে 'যোগেন্দ্রবালা' নাম দিয়ে একই সঙ্গে রোমাণ্টিক ও মীস্টিক বাতাবরণে স্থাপন করেছেন, কখনও দেখেছেন—জননীর "কোলে শুয়ে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে, আধ আধ কিবে মধুর হাসে", আর "স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে নয়নের জলে জননী ভাসে"। এ পরিচিত মাতৃ-মূর্তি বাঙালীর নিজস্ব ঘরের সম্পদ। নারীর রোমাণ্টিক ও আইডিয়াল মূর্তির সঙ্গে বাঙালীর ঘরের নারীমূর্তির এই অভূতপূর্ব সমন্বয় বিহারীলালের একটি বিশিষ্ট দান। এর সঙ্গে যে সৌন্দর্যবোধ বিধৃত হয়ে আছে তাই পরবর্তী দু'খানি কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) এবং 'সাধের আসনে' (১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দ) একটি ভাবমূর্তিরূপে ফুটে উঠেছে।

'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের একটি স্মারকচিহ্ন, কবিমানসীর একখানি সুচিরস্থায়ী আলেখ্য—যার দ্বারা বিহারীলালের শিষ্যানুশিষ্যেরা —এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। এই কাব্যখানির দ্বারাই কবি উনিশ শতকের গীতিকবিদের গুরু স্থানীয় হয়েছেন, এবং পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক ও মীস্টিক কবিদের সহধর্মিত্ব লাভ করেছেন। 'সাধের আসন' এরই পরিপূরক।

'সারদামঙ্গলে'র প্রারম্ভে আখ্যানকাব্যের ধরনে ঘটনার বিবৃতি দেখা যায়। রামায়ণে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনাটি দিয়ে কাব্যের উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু তার পরে আর সে কাহিনীর ধারা বা পরিণাম অনুসৃত হয়নি। বাল্মীকি যেমন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকের বশে সরস্বতীর কৃপালাভ করে শ্লোক রচনা করেছিলেন, কবিও তেমনিভাবে দেবী সরস্বতীর প্রসাদ প্রার্থনা করেছেন—এই-ভাবে কাব্যের শুরু হয়েছে। তার পরে আর এতে কোন প্রকার বস্তুজগতের কাহিনীর চিহ্ন নেই। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবির বিরহ-মিলনের অশ্রুভারাতুর ও আনন্দবেদনাময় মুহূর্তগুলি এ কাব্যে একই সঙ্গে রোমান্সের জ্যোতির্বলয়রূপে এবং অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের অনির্বচনীয় প্রকাশের ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে উঠেছে। মনে মনে বহু স্বর্গ-মর্ত্য পরিক্রমণ করে, নানা ভাবসংঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে তিনি সরস্বতীর সান্নিধ্য কামনা করেছেন। এই দেবীকে কখনও মর্ত্যের কায়াবন্ধনে জননী-জায়ার সীমাবদ্ধ মূর্তির মধ্যে, কখনও কালপারাবার পার হয়ে নির্মুক্ত

বিশুদ্ধ চৈতন্যের ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার মধ্যে—কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের, পূর্ণের সঙ্গে খণ্ডের, জায়ার সঙ্গে মানসীর, দেবীর সঙ্গে মানবীর, রোমান্সের সঙ্গে মীস্টিকের যে দ্বন্দ্ব সচরাচর কবিমনে ঘনিয়ে ওঠে, কবি বিহারীলালও তার দ্বারা বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দেবী সারদা কি ঘরের মধ্যে নব নব রূপে লীলা করেন, অথবা তিনি বাক্‌পথাতীত বৈদান্তিক ব্রহ্মের মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে? এই প্রশ্ন, আত্মার এই সঙ্কট—সারদামঙ্গলের কবিকে ব্যাকুল করে তুলেছে। যখনই তিনি সারদাকে সীমাবদ্ধ পার্থিব প্রতীকের মধ্যে অবধারণ করতে গেছেন, তখনই তাঁকে দেশকালাতীত রহস্য-সমুদ্রে হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁকে হারিয়ে মৃত্তিকার বুকে বৃথা আর্তনাদ করে ফিরেছেন। পরে তিনি সমন্বয়ের তীরে এসে পৌঁছলেন। হিমালয়ের মহিমান্বিত পটভূমিকায় দেবীকে লাভ করে কবির সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব ঘুচল—তখন তাঁর মনে হল:

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোকগে এ বসুমতী যার খুশি তার।

এখানে এই বর্ণনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় চণ্ডীতত্ত্ব থেকেই হোক, বা শেলী প্রভৃতি ইংরেজ কবির অনন্ত সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকেই হোক, তিনি সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণাকে সরস্বতী বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এর উৎসভূমি হচ্ছে রামায়ণে-বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনা। শেলীর 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতার সঙ্গে 'সারদামঙ্গলে'র কেন্দ্রীয় ভাবের সাদৃশ্য সতর্ক পাঠকের চোখে পড়বে। শেলী যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবিস্তারী একটি অনন্ত সৌন্দর্যমূর্তি পরিকল্পনা করেছিলেন, কবি বিহারীলালের সারদা পরিকল্পনাও কতকটা সেই রকম, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পুরোপুরি ঐক্য নেই। সারদা হচ্ছেন প্রেম, করুণা ও সৌন্দর্য—বিবিধ গুণের সমবায়ে গঠিত কবির মানসী, তিনি বিশ্বাতিগ হলেও তাঁরই সঙ্গে কবির মর্ত্যরসেরই সম্পর্ক। এই ব্যক্তিগত সম্পর্কটি, যা অনেকটা ইন্দ্রিয়াতীত ধ্যানধারণার বস্তু, তা শেলীর চেয়ে বিহারীলালেই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মতো শুধু অনন্ত সৌন্দর্যের জয়গান করবার জন্যই সারদার পরিকল্পনা করেননি, এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সুগভীর ভাবরসের সম্পর্ক—যা রোমান্সের অতীত, যার সঙ্গে বাস্তব কল্পনা ও আবেগের সম্পর্ক অল্প। এখানে যেন কবির ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী

সংস্কারই জয়ী হয়েছে। কাব্যপরিকল্পনা রোমাণ্টিক সৌন্দর্যলোক থেকে জন্মলাভ করে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে গিয়ে—কবির মনোলীন আবেগের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, তাকে আর পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। শেষের দিকে কবি, পুরোপুরি মীস্টিক রসের অনির্বচনীয়ত্বে এমনভাবে নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন যে, চেতনার উপরতলায় তার কোন বুদ্বুদ বা কম্পন ধরা পড়ে না। রোমান্সের স্বর্ণসূত্রে বয়ন তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও সারদামঙ্গলের পরিণাম হল কবির একাকিত্বের রসাস্বাদন, পাঠক সেখানে বাহুল্য মাত্র। তিনি কবির স্বগতভাষণ আড়ি পেতে শুনতে পারেন, এর বেশী তাঁর অধিকার নেই।

'সারদামঙ্গলে' প্রেম, করুণা ও সৌন্দর্যের যে আদর্শপ্রতিমা সারদারূপকের মারফতে অঙ্কিত হয়েছে, এবং তাঁর সঙ্গে কবির যে ব্যক্তিগত মীস্টিক সম্পর্ক, তার যথার্থ তাৎপর্য সে যুগের অনেক পাঠক-পাঠিকা ধরতে পারেননি, ধরা সম্ভবও ছিল না। কারণ মীস্টিক অনুভূতি এমন একটা ব্যক্তিসাধনা যে, তা অনেকটা গূঢ়চারী ধর্মসাধনার মতো একক উপলব্ধির সামগ্রী, পাঁচজনের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ময়তার দ্বারা উপলব্ধির ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের ভক্ত পাঠিকা ছিলেন। কবি তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কাদম্বরী দেবী (রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণী') একখানি কার্পেটের আসন তৈরী করে, তাতে 'সারদামঙ্গল' থেকেই দুটি পংক্তি বুনে দিয়ে কবিকে উপহার দেন। সেই দুটি পংক্তিতে একটি প্রশ্ন উল্লিখিত হয়েছিল। কাদম্বরী দেবী সেই পংক্তি দুটি আসনে বুনে দিয়ে কবির সারদার ধ্যানমূর্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। কবিও প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, এর জবাব দিয়ে তিনি আর একখানি কাব্য লিখবেন। কোন ব্যক্তিগত করণে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলে কবি অত্যন্ত আঘাত পান এবং অচিরে ভক্ত-পাঠিকাকে স্মরণ করে 'সাধের আসন' (১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দ) নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাদম্বরী দেবী প্রদত্ত কার্পেটের আসনই এর উৎস বলে কবি কাব্যের এই নাম-করণ করেন। এই কাব্যে সবিস্তারে সারদার স্বরূপ এবং সারদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 'সারদামঙ্গলে'র পরিণতি মীস্টিকতার দিকে হলেও তা মূলত কাব্য, তার রচনাকার একজন কবি—যিনি প্রেম-সৌন্দর্যের কল্পস্বর্গে বিহার করেন। কিন্তু 'সাধের আসনে' কবির দার্শনিক সত্তা প্রধান, এতে তিনি টীকাভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ফলে এর স্বতঃস্ফূর্ত

কাব্যলক্ষণ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে, দার্শনিক তত্ত্বকথাও অস্পষ্টতার কুহেলিকায় হারিয়ে গেছে। তাঁর অন্যান্য দু' একটি রচনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য নেই বলে এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল, বিহারীলালকে কেন উনিশ শতকী গীতিকাব্যের জনক বলা হয়, কেনই-বা সে যুগের গীতিকবিরা, মায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যকবিতা সে যুগে এবং এ যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ, এই রোমান্টিক কবি মাঝে মাঝে এতটা আত্মনিষ্ঠ হয়ে পড়তেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য লাগত। দ্বিতীয়ত, তিনি সচেতন শিল্পী ছিলেন না বলে, তাঁর কবিতার কোন কোন স্থল অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ অমার্জিত মনে হয়। কবি যেন নিজের অনুভূতিটুকু ব্যক্ত করেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হলে তার যে একটা শিল্পকলা আছে, ছন্দ-অলঙ্কার ও শব্দের চেষ্টাকৃত রূপনির্মিত প্রয়োজন, এই ভাবুক-কবি সে সম্বন্ধে আদৌ অবহিত ছিলেন না। এইজন্য আবেগের বিশুদ্ধি ও অভিনবত্ব সত্ত্বেও তাঁর কাব্যকবিতা কোনদিন বহুপঠিত হয়নি, তাঁর কাব্য থেকে দু'দশ পংক্তি স্মরণযোগ্য উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনা শিল্পত্ব লাভ করেনি। তাঁর সেদিকে দৃষ্টিও ছিল না। নিজের মনের আনন্দে তিনি গান ধরেছিলেন, সে গানে যথারীতি কলাবতী রাগিণী ফুটেছে কিনা, শ্রোতারা তার প্রতি উৎকর্ণ হয়েছেন কিনা, সে বিষয়ে কোনদিনই এই আত্মভাবরসমুগ্ধ মীস্টিক কবি সচেতন ছিলেন না। ফলে তাঁর কাব্যকবিতার অনেক স্থল অতি উৎকৃষ্ট কবিত্বরসসমৃদ্ধ হলেও তা পাঠক-মনে সুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। দু'চারটি রূপকল্প, আবেগের ব্যঞ্জনা, মীস্টিক অনুভূতির ইঙ্গিত—তার দ্বারা তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিহারীলাল আত্মভাবপ্রধান গীতিকাব্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন, একথাও সত্য। কিন্তু নতুন গীতিশাখার এক অভিনব যুগ সৃষ্টি করলেও বিহারীলাল সে যুগের গীতিকাব্যের যুগন্ধর পুরুষ হতে পারেননি। তাঁর মধ্যে গীতিকাব্যের নব সম্ভাবনা মুকুলিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তা পুষ্পিত হয়ে উঠল। তা হলেও আধুনিক গীতিকাব্যের পুরোচারী হিসেবে কবি বিহারীলাল চিরদিনই শ্রদ্ধা লাভ করবেন।

৩. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)

কবি সুরেন্দ্রনাথও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিহারীলাল বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অবশ্য প্রথম দিকে আখ্যানকাব্যের দিকেই তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার দু'খানি আখ্যানকাব্য 'সবিতা সুদর্শন' (১৮৭০) ও ফুলরা' (১৮৭০) বিয়োগান্ত ব্যাপার নিয়ে রচিত। এঁর রচনাভঙ্গি অত্যন্ত পরিমিত, সংযত ও ভাবনিষ্ঠ। রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাসের চেয়ে ক্লাসিক ঘনত্বই বেশী। তিনি টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। কাব্যরচনার গোড়ার দিকে তিনি কিছুদিন গুপ্তকবির অনুকরণ করতে গিয়ে প্রতিভার অনেকটাই অপচয় করে ফেলেছিলেন। তাঁর 'মহিলা কাব্যে' যথার্থ গীতিকবির প্রতিভা ফুটে উঠেছে। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পরে অসমাপ্ত 'মহিলা' কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালে বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র আদর্শে তিনি নারীর জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতা এই চারমূর্তি সম্পর্কে কাব্য লেখবার প্রযত্ন করেন এবং এই বৎসরে নারীর জননী ও জায়া মূর্তি সম্বন্ধে দীর্ঘ কবিতা রচনা করে ফেলে রাখেন। দুঃখের বিষয় কবির আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আর দুটি রূপ (ভগিনী ও দুহিতা) আর কাব্যমূর্তি লাভ করতে পারেনি।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর কবি সুরেন্দ্রনাথ কিছুকাল এলোমেলো জীবন যাপন করেন ; পরে আবার সুস্থ জীবন লাভ করে নারীর মহিমা সম্বন্ধে অবহিত হন। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জননী ও জায়ার স্নিগ্ধ প্রভাবের ফলে মানবসংসার ও পুরুষের রুক্ষ কঠোর জীবন শ্রীময় হয়, পুরুষও নারীর মধ্যে একটি উন্নততর নৈতিক আদর্শ দেখে সত্তার উন্নয়নে যত্নবান হয়। জীববিজ্ঞান, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি গূঢ় বিষয়ের নানা তত্ত্বকথা থেকে সুরেন্দ্রনাথ একপ্রকার সংযত নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হন, জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করে অতিশয় সংযত ও সংহত ভাষায় নারীপ্রকৃতির সঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে কাব্য রচনা করেন। আবেগে রোমাণ্টিক হলেও প্রত্যয়ে তিনি ছিলেন ক্লাসিক। জগতের প্রতি একপ্রকার আস্তিক্যবাদী যৌক্তিক মনোভাব ক্লাসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবি সুরেন্দ্রনাথ মননের দিক থেকে কিয়দংশে ক্লাসিক ছিলেন, এবং সেই ক্লাসিক নিষ্ঠা তাঁর বাক্‌রীতিকেও বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কাব্যপ্রকরণে একই সঙ্গে রোমাণ্টিক চিত্রকল্প, ভাবাবেগ এবং ক্লাসিক ঘনত্ব ফুটে উঠেছে। বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত

হয়েও তিনি প্রায় ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বিহারীলালের রোমাণ্টিক স্বপ্নাভিসার এবং মীস্টিক আত্মলীনতা সুরেন্দ্রনাথের কবিকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। তবুও প্রেম ও সৌন্দর্য কবির অবলম্বন হলেও নারীর গৃহচারিণী মূর্তিই তাঁর ধ্যেয়। কল্পনার প্রগাঢ়তা, নিটোল বাক্‌রীতি এবং ছন্দের স্থির মন্থরতায় নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র সুরেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হতে পারে:

প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীরশঙ্কায়,
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্তশিখা প্রকাশিত তায়,
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা' পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমায়,
নিবিলে জানিবে খেলা কৌতুক আমায়।

তাঁর মাতৃবন্দনায় যে আর্তি ফুটে উঠেছে তার গভীরতা পুরাতন শাক্ত পদকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আর রচনারীতি ক্লাসিকতার আদর্শকেই তুলে ধরে যেমন:

সুকোমল অঙ্কে নিয়া
অঙ্গে কর বুলাইয়া
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া
স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া
হে জননী, কর পুনঃ বালক আমায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পটভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট আবির্ভাব সকলেরই চোখে পড়বে। অন্য কবিরা যখন রোমাণ্টিক ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে ভেসে চলেছিলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ এই পর্বের কবি হয়েও উচ্ছ্বাসকে সংযমিত করে, শূন্যতার হাহাকারকে স্থৈর্যের ও আস্তিক্যানুভূতির মধ্যে সংহত করে, আবেগ ও মননকে সমান মূল্য দিয়ে এক বিচিত্র গীতিকবির প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য স্থানে স্থানে ক্লাসিক সংযম এত গাঢ় হয়ে পড়েছে যে, অনেক সময় লীরিক সৌন্দর্য ও রসের মূর্চ্ছনা লাবণ্যের সুকঠিন স্ফটিকে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে কবির ব্যক্তিগত বিশ্লিষ্ট জীবনের ভাঙাচোরা স্মৃতি এবং শিল্পজগতের সৌন্দর্যস্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একটা বৈপরীত্য সৃষ্টি

হয়েছে যে, কবি সব সময়ে গীতিরসের পূর্ণতা সৃষ্টি করতে পারেননি। তবু গৃহচারিণী নারীকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর 'মহিলা কাব্য' ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ইতিহাসে একটি অদ্ভুত আগন্তুক বলে চিরদিন বিস্ময় আকর্ষণ করবে।

৪. অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)

অক্ষয়কুমারের কাব্যজীবন বেশ দীর্ঘ। প্রথম যৌবনে তিনি বিহারীলালকে গুরুপদে বরণ করে গীতিকাব্যের আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তার পরের শতকের প্রথম দু' দশকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যের যুগেও কিছু কিছু পুরাতন ভাব-ভাবনার গীতিকবিতা রচনা করে কাব্যজীবনের সুদীর্ঘ আয়ু প্রমাণ করেন। তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বিশেষ কোন সংযোগ ছিল না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিষয়ী, হিসেবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সত্য কথা বলতে কি, অক্ষয়কুমার বাস্তব প্রয়োজনের জীবন এবং প্রয়োজনাতীত সারস্বত জীবনের মাঝখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য মেনে চলতেন, কিন্তু এ সমস্ত কৃত্রিম ভেদ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর। যাই হোক, কাব্যের মহাকাশে তিনি কল্পনাকে উদ্দামভাবে উড়ে বেড়াতে মুক্তি দিয়েছিলেন। অবশ্য বাস্তবজীবনের ক্ষয়ক্ষতি তাঁর কাব্য জীবনকেও মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও প্রেম—এই ত্রিতন্ত্রীতে তাঁর কাব্যবীণা সুরময় হয়েছিল। এদিক থেকে তিনি বিহারীলালের সুযোগ্য শিষ্য এবং তাঁর অন্তরপ্রদীপ থেকে নিজের প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। এইজন্য বিহারীলালের সঙ্গে অক্ষয় বড়ালের কিছুটা মানসিক সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যাবে। নিসর্গের বিষণ্ণ মাধুরী, বর্ষার ধারাস্নাত অলস অপরাহ্ণ ইত্যাদি বর্ণনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা প্রস্তুত করেছিলেন। নিসর্গের পর প্রেম-সম্পর্কিত কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৭৫) এবং 'ভুল' (১৮৮৭)—তিনখানি গীতিকাব্যেই প্রেম-সংক্রান্ত কবিতায় কবির মনোভাবটি চমৎকার ধরা পড়েছে। তাঁর প্রেম মর্ত্যজীবনের সঙ্গে অন্বিত নয়, কীট্‌সের 'এণ্ডিমিয়ন'-এর মতো অধরা, অপ্রাপণীয়া। তাই তাঁর মানসী স্বপ্নস্বর্গসঞ্চারিণী,—বাস্তব জীবনের উত্তপ্ততায় সে রূপ উবে যায়। প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে উৎকৃষ্ট রোমান্সের রসরূপ সৃষ্টি করার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ততটা ছিল না। তাই তিনি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সত্তাকে বেমালুম বাদ দিয়ে বাস্তবাতিচারী কল্পকাননে

পুষ্পচয়নে উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি শেলী-কীট্সের পন্থা ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা তাঁর অতি অল্পই ছিল। অবশ্য 'ভুল' থেকে 'শঙ্খ' পর্যন্ত কাব্যপ্রত্যয়ে কবির একটা নতুন উপলব্ধি ইঙ্গিতে-আভাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'ভুল' কাব্যে তিনি সর্বপ্রথম প্রত্যাহের মধ্যে অনশ্বর ও অনির্বচনীয় প্রেমের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। 'শঙ্খ' কাব্যে কবিমানস বাস্তবজীবনের মধ্যেই প্রেমের রাজসিংহাসন স্থাপন করল, এর পর থেকেই কবিচেতনায় ভাগবত উপলব্ধি জ্যোতির্ময় আলোকরেখায় ফুটে উঠেছে।

অক্ষয়কুমারের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' (১৯১২) বাংলা সাহিত্যেরও একখানি অনবদ্য পরিণত মনের শোককাব্য—এই কাব্যেই তাঁর কাব্যপ্রকাশ পূর্ণতা লাভ করেছে। পত্নীর মৃত্যুতে শোকাহত কবি সহসা জীবন ও মৃত্যুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। এতদিন তিনি কিছুটা কৃত্রিম রোমান্সের স্বর্ণজালাবরণের তলে বাস করেছিলেন। প্রেম ও প্রকৃতির যে পটভূমিকা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার অনেকটাই বস্তুসম্পর্কহীন ভাবপুষ্প মাত্র। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু এসে অক্ষয়-কুমারের কৃত্রিম সংস্কারের দৃষ্টিকে চিতাধূমের দিকে প্রসারিত করল, জীবনের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি তাঁকে বিশ্বরঙ্গপটের সামনে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড় করিয়ে দিল। মৃত্যুর আলোকে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "মরণে কি মরে প্রেম, অনলে কি পুড়ে প্রাণ?" 'এষা' কাব্যে তিনি "মৃত্যু", "অশৌচ", "শোক" এবং "সান্ত্বনা" এই চার পর্বে স্ত্রীর মৃত্যুব্যথাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। 'এষা'র দুঃখ রোমাণ্টিক দুঃখবিলাস নয়, এর সঙ্গে প্রতি দিবসের নিবিড় যোগ রয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুই কবির স্বপ্নালু দৃষ্টিকে জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে প্রখর প্রশ্নে বিস্ময়াহত করে তুলেছে। মৃত্যু এসে জীবনাঙ্গনে যবনিকা ফেলে দিল, প্রিয়জন কালসায়রের কালোজলে চিরতরে হারিয়ে গেল, ব্যথার্ত কবি তা কিছুতেই মানতে পারেননি—"তুমি নাই, হয় না বিশ্বাস"। এই যে বিশাল শূন্যতার দিগন্তহীন মহাগহ্বর, যেখানে অসংখ্য প্রশ্ন মুখ ব্যাদান করে আছে, এর কি কোন অস্তিবাদী তাৎপর্য নেই? তাঁর স্ত্রীর ভৌম সত্তা কি চিতা-ধূমাগ্নির শিখায় নিঃশেষ হয়ে গেল? তখন তিনি অস্তির সঙ্গে নাস্তির সমন্বয় বুঝতে পারলেন, ভূলোক ও দ্যুলোকের সম্পর্কও তাঁর কাছে সুপরিস্ফুট হল। পরলোকের যাত্রী স্ত্রীর আত্মার প্রতি তাঁর শেষ প্রার্থনা:

> দাঁড়াও অভেদ-আত্মা, পরলোক বেলাভূমে,
> বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।

জগতের বাধাবিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক,
নীরব সৌন্দর্যমাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক।

এই 'এষা' কাব্যে কবির গীতিকবিসুলভ প্রকট অস্মিতা প্রিয়-বিরহের শোকে উগ্রতা হারিয়ে ধীরে ধীরে আত্মনিবেদনে প্রস্তুত হল। এ কাব্যের সমাপ্তিতে নির্বেদ-বৈরাগ্যের শান্ত বিষণ্ণতা কবির অশ্রুকলুষিত বাস্তবজীবনের শূন্যতাকে ঢেকে ফেলেছে। এতে তিনি তামসিক শোকের দ্বারা প্লাবিত হয়ে বৃথা হাহুতাশ করেননি, টেনিসনের *In Memoriam*-এর মতো শোকদুঃখের অন্তরালবর্তী বৃহৎ ও মহৎ চেতনার সন্ধান পেয়েছেন।

অক্ষয়কুমারের সমগ্র কবিজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি বিহারীলালের ভাবশিষ্য হলেও গুরুর নির্দ্বন্দ্ব রসসাধনার সরিক হতে পেরেছেন কদাচিৎ। 'এষা'র পূর্বে তাঁর মনে সর্বদা বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল, 'এষা' থেকে তিনি জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের সম্পর্ক বুঝতে পারলেন।

অক্ষয়কুমারের মন ও মেজাজ গীতিকবির উপযোগী হলেও রচনাপ্রকরণে কিন্তু ততটা উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় না। ছন্দ, শব্দচয়ন, প্রতীককল্পের কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হলেও বহুস্থলেই মাত্রা ঠিক রাখতে পারেননি। ছন্দের ত্রুটি প্রায়ই চোখে পড়ে, শব্দযোজনাতেও মার্জিত রুচির অভাবও দুর্লভ নয়। অতীন্দ্রিয় রহস্য ও অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তিনি বিহারীলালের সমকক্ষ নন, ক্লাসিক শুচিতায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর চেয়ে অনেক সতর্ক। ভাবাবেগের তারল্য অক্ষয়কুমারের অনেক কবিতাকে মাটি করে দিয়েছে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হলেও রবীন্দ্রনাথের সমকালে পুরাতনপন্থী গীতিকবি হিসেবে তাঁর খানিকটা খ্যাতি ছিল তা স্বীকার করতে হবে।

৫. দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং বন্ধুস্থানীয় দেবেন্দ্রনাথ সেন বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছেন। ইংরেজি গীতিকাব্যে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, বাংলা গীতিকবিতা রচনায় তাঁর এই অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লেগেছিল। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলার বাইরে অতিবাহিত হয়েছে, সুতরাং বাংলাদেশ থেকে দূরে বসে তিনি নিজের মতো করে কাব্যসাধনা করতে পেরেছিলেন। সে-যুগের পত্র-পত্রিকায় তাঁর অজস্র গীতিকবিতা প্রকাশিত

হয়েছিল, তাঁর মনটি সদাসর্বদা গীতিকবির রসে সিক্ত হয়ে থাকত, বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে জড়িত রোমান্সের প্রতি তাঁর ছিল পুরোপুরি আকর্ষণ। অবশ্য প্রথম দিকে তিনি ভাষাভঙ্গিমা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিয়দংশে মধুসূদনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। 'ঊর্মিলাকাব্য' (১৮৮১), 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২), 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৩) প্রভৃতি কাব্যে তার যৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন পাওয়া যাবে। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, "আমি পুরাতন স্কুলের—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের 'স্কুলে'র কবি। এই রবীন্দ্রযুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত।" তাঁর এ মন্তব্য কিন্তু পুরোপুরি মানা যায় না, তাঁর মনের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের সাদৃশ্যই অধিক। অবশ্য মধুসূদনের কাছ থেকেও তিনি কিছু কিছু কাব্য-উপাদান ও রচনাপ্রণালী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে যে রবীন্দ্রমানসের ছায়া পড়েছে এবং তাঁর কবিতায় যে অনেক স্থলে আধুনিক যুগের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, এর কারণ দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের অশরীরী চেতনা ও ভাগবত উপলব্ধির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক অল্প। তাঁর 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১), 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২), 'গোলাপ গুচ্ছ' (১৯১২) রবীন্দ্রনাথের যুগেও পাঠককে অভিভূত করেছিল। তার কারণ সরল সহজ মর্ত্যরস তাঁর সৌন্দর্যময় কবিতার প্রধান আকর্ষণ, বাস্তবজীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে একটি মমতামেদুর গার্হস্থ্যরস তাঁর গীতিকবিতাগুলিকে লোভনীয় স্বাদুতা দান করেছে।

দেবেন্দ্রনাথের কবিসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন তন্ময় দৃষ্টি। প্রকৃতি, প্রেম, নারী, সৌন্দর্য প্রভৃতি রোমাণ্টিক উপাদান তাঁর কল্পনাকে যেমন উদ্দীপিত করে তুলত, তেমনি প্রত্যহের সংসার ও জীবন তাঁকে কম আকর্ষণ করত না। তাঁর রোমাণ্টিক দৃষ্টি অনেকটা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'স্কাই-লার্কে'র মতো ; মহাশূন্যে উঠেও সে শিশিরসিক্ত পৃথিবী ও মাটির মায়া ত্যাগ করতে পারে না। তাঁর কল্পনা বিহারীলালের মতো অতীন্দ্রিয় ভাবরসে সমাহিত হতে চায়নি, নারী তাঁর কাছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নিরবয়ব মূর্তি নয়। জননী ও জায়ার মধ্যেই তিনি নারী জীবনের বিচিত্র রোমান্স খুঁজেছেন। আর একটা কথা, রোমাণ্টিক গীতিকবিদের অনুকরণে তিনি কৃত্রিম ব্যর্থতার বিষণ্ণ পরিমণ্ডল

সৃষ্টি করে তার মধ্যে নিজেকে স'পে দেননি। এই রূপজগতের মধ্য দিয়ে যে ইন্দ্রিয়গম্য সৌন্দর্যরস ক্ষরিত হচ্ছে তিনি তাকে কামনা করেই বলেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী,
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপবৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী আনন্দে নেহারি।

এখানে কবির রূপের প্রতি আসক্তি অতি সহজ সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সুইনবার্নে'র মতো ইন্দ্রিয়াসক্তির দাহ সৃষ্টি করতে চায়নি।

কবি যে গার্হস্থ্য জীবনরসে মুগ্ধ ছিলেন, তার আর একটা প্রমাণ শিশুবিষয়ক কবিতা। শিশু-সংক্রান্ত কবিতাগুলিতে শিশুত্বের নির্যাসের চেয়ে সরল প্রাণকণিকার হাস্যমুখর ছবিটি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। এইস্থানে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতার পার্থক্য।

ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে।
ওরে, ছেলেদের কি জাত আছে?

এখানে কবির স্নেহসিক্ত মনটি চমৎকার ফুটেছে।

দেবেন্দ্রনাথের সনেটগুলি এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে। সত্যিকথা বলতে গেলে রচনারীতির দিক থেকে এবং ভাবের গাঢ়তার দিক বিচার করলে ত'ার সনেটগুলিকে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন সনেটের চেয়ে উচ্চতর স্থান দিতে হবে। রচনার পরিমিত গঠন এবং আবেগের সংযম ত'ার সনেটগুলিকে বাংলার স্বল্পসংখ্যক সনেট-লেখকদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে।

পরিশেষে ত'ার বাক্‌মূর্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সম্প্রতি কেউ কেউ ত'ার কাব্যনির্মিতি-কৌশলকে "শ্লথ ও অসমান" বলে কিছু মৃদু নিন্দাবাদ করেছেন। কিন্তু এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। রচনার প্রসন্ন পারিপাট্য ও সংযম এই কবির একটা বিশেষ কৃতিত্ব। গীতিকবির ভাবরসার্দ্র আবেগে তিনি বিনম্র, কিন্তু ত'ার কবিতায় ভাষাভঙ্গিমার অতিরেক সযত্নে বর্জিত। বরং অক্ষয়কুমার বড়ালের রচনাপদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে "শ্লথ ও অসমান"। দেবেন্দ্রনাথের ছন্দের মধ্যে বড়ো একটা ফ'াক কানে ধরা পড়ে না। এর একটা কারণ ত'ার অতিসতর্ক ভাষাপ্রয়োগ, দ্বিতীয় কারণ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের প্রবীণ বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, ত'ার কাব্য-কবিতারও তিনি একজন ভক্ত ছিলেন। সুতরাং বাক্‌রীতির এই

পরিমার্জনা রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য প্রভাবের বশেও হতে পারে। সে যাই হোক, রোমান্টিক ভাবস্বর্গ, আবেগের বন্যাপ্রবাহ, না পাওয়ার প্রচণ্ড হাহাকর, প্রেমের তীব্র আসক্তি—এ সমস্ত চিরাচরিত রোমান্টিক প্রকরণের পাশ কাটিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সহজ জীবনের পরিচিত সুর ধরেছিলেন বলেই আজও তাঁকে আমরা যেন আমাদের কালের কবি বলে মনে করি।

৫. গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)

ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার অধিবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাংলা গীতিকাব্যের এক বিরল পথের পান্থ। ত'ার কাব্যে যে প্রচণ্ড 'পাশন' বা উন্মত্ত আবেগের অবাধ উৎসার লক্ষ্য করা যায়, বাংলা সাহিত্যের মার্জিত অঙ্গনে তা যেন একটি অভিনব আগন্তুক বলে মনে হয়। তাঁর কবিতার প্রেম-প্রণয়কে কোনওরূপ সূক্ষ্ম বা অশরীরী প্রত্যয়ীভূত নন্দনতত্ত্ব পর্যবসিত করা হয়নি। প্রেমের যে বিকাশ দেহকে কেন্দ্র করে বিষামৃত পরিবেশন করে, যে কামনার আবেগ দেহের আধারে রক্তশতদল ফুটিয়ে তোলে, ভাওয়ালের ভাগ্যহত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সেই বিচিত্র মনোভাবের কবি—সুতরাং বাংলা গীতিকাব্যে তাঁকে তো অন্য গ্রহের অবাঞ্ছিত জীব বলে মনে হবে, এবং সেইজন্যই অনেক সমালোচক গোবিন্দচন্দ্রের শিরাধমনীর মধ্যে প্রবাহিত উত্তপ্ত শোণিতধারার উন্মাদ গর্জন ততটা বরদাস্ত করতে পারেন না।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে গ্রাম্য পরিবেশে দারিদ্র্যপীড়িত দুর্বহ জীবনভার তাঁকে বইতে হয়েছে, প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহ ত'াকে বিপর্যস্ত করেছে, সেই দুঃখবেদনায় নীলকণ্ঠ কবি সমস্ত গরল নিজে ধারণ করে মরণযন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠ থেকে যে গান ধ্বনিত করলেন, তার অন্তর্দাহ, কামনার উত্তাপ সবই যেন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষীভূত হয়ে ওঠে। বিষয়কর্মে কবি ছিলেন উদাসীন, ইংরেজী বিদ্যা বিশেষ আয়ত্ত হয়নি ; ফলে দারিদ্র্য-শোক-পীড়া প্রভৃতি দুর্ভাগ্য কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। তার ওপর কবি ছিলেন অতিশয় স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী। ফলে ত'ার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। শেষ জীবনে অসহায়, রোগগ্রস্ত, ছিন্নকণ্ঠ কবিকে ভিক্ষার মতো হীনবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল—বাঙালীর এ কলঙ্ক কোন দিনই ঘুচবে না।

গোবিন্দচন্দ্রের 'প্রেম ও ফ্ল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫) এবং 'ফ্লরেণু'র (১৮৯৬) যতটা খ্যাতি পাওয়া উচিত ছিল, কবি ততটা

প্রশংসা লাভ করতে পারেননি। তাঁর কবিতার অনাবৃত জীবনপ্রীতি, নারীর বাসনাময় সৌন্দর্য এবং ভোগাসক্তি যেভাবে আকাঙ্ক্ষার দীপশিখায় জ্বলে উঠেছে, তাতে তাঁর কবিতার প্রতি মার্জিত রুচির পাঠকের কিছু অনীহা সৃষ্টি হতে পারে—এবং হয়েছেও। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যের এককোণে অনাদৃত হয়েই রইলেন। নারী-সৌন্দর্যের এমন প্রচণ্ড আবেগোত্তপ্ত স্তুতি, এমন নির্জলা দেহানুরাগ, যা পুরোপুরি অনঙ্গোল্লাসের মাদকতায় পূর্ণ, তাকে সাগ্রহে স্বীকৃতি জানানো একটু দুঃসাহসের ব্যাপার বটে। কবি কখনও ভাবের ঘরে চুরি করেননি, মনের কথাকে মুখের কথার রূপ দিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর প্রেম তো বৃন্দাবনী তুলসীবনের গন্ধবাসিত নয়, উনিশ শতকী রোমাণ্টিক গীতি-কবিদের অশরীরী প্রেমের কায়াহীন কান্তিমাত্র নয়; দেহের আধারেই এ প্রেমের বিকাশ, রক্তমাংসের নারীরূপের প্রতি কবির অধিকতর আসক্তি।

> আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
> আমি ও নারীর রূপে
> আমি ও মাংসের স্তূপে,
> কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ,—
> ও কর্দমে, ওই পঙ্কে,
> ঐ ক্লেদে, ও কলঙ্কে
> কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ
> আমি তারে ভালবাসি রক্তমাংস সহ।

এই যে বিশুদ্ধ কামসংহিতা, বাস্তব নারীরূপের প্রতি বাস্তব আকাঙ্ক্ষা, এর তীব্রতা সে যুগের রুচিবাগীশ পাঠক ও নীতিবাগীশ সমালোচক সহ্য করতে পারেননি। কিন্তু রুচি, নীতি, সংস্কারের বিবর্ণ চশমাজোড়া খুলে ফেললে আমরা এই দুঃসাহসিক কবির দেহাসক্তিকে প্রশংসা করতে বাধ্য হব। ইন্দ্রিয়ানুগত্য ও ভোগাসক্তি আমাদের প্রেমসাহিত্যে কিছু উপেক্ষিত হয়ে আছে, তাই গোবিন্দচন্দ্রের নারীরূপের এই অভিনব বন্দনা আমাদের অভিনন্দন লাভ করেনি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, তাঁর নায়িকা অনেক স্থলেই তাঁর গেহিনী, গৃহলক্ষ্মী। এই বাস্তব পরিবেশ ও উপাদান তাঁর ভোগাসক্তির কবিতাগুলিকে শুধু 'প্যাশনে' উদ্দাম করে তোলেনি, তাতে একটি স্নিগ্ধ মধুর গার্হস্থ্য প্রীতিরসও সঞ্চার করেছে অপূর্ব কৌশলে—যদিও কৌশল ও কলাকৃতি সম্বন্ধে এই জীবনবাদী গীতিকবি বিশেষ অবহিত ছিলেন না।

তাঁর কোন কোন কবিতার দু'চারটি হারানো পংক্তি এখনও শোনা যায়। পথভিখারীর কণ্ঠে যে গানটি ("স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে, এ-দেশ তোমার নয়") আজও শুনতে পাই, যার মধ্যে কবির প্রচ্ছন্ন স্বদেশচেতনা সক্ষোভে ঝরে পড়েছে, তার সরল প্রত্যক্ষ আবেদনে এখনও মন সাড়া দিয়ে ওঠে।

গোবিন্দচন্দ্র সম্পূর্ণ অভিনব কাব্য-প্রত্যয়ের প্রতীক হলেও তাঁর রচনা কিন্তু অন্য গ্রহ থেকে নিক্ষিপ্ত বিচিত্র বস্তু রূপেই রয়ে গেল, এখনও এর যথার্থ মূল্য বিচার হল না। এর কারণ কবি এই সমস্ত কবিতায় ব্যক্তিজীবনের তীব্র মানবরস ভরে দিয়েছেন, বটে, কিন্তু স্থূল বস্তু-উপাদানকে অনেক সময়ে ভাব-লোকের ব্যঞ্জনায় উন্নীত করতে পারেননি। কবি যখন ক্ষুধার জ্বালায় ভগ্ন কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন :

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকার দিবানিশি করি ছটফট......
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

তখন আমাদের চোখ অশ্রুসজল হলেও এটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, কবি ব্যক্তিগত দারিদ্র্য-দুঃখপীড়নের দ্বারা এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে, স্থূল প্রাকৃত বাস্তবকে সব সময়ে সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করতে পারেননি। আধুনিক বিদ্যার দ্বার তাঁর মুখের সামনে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য গীতি-কবিতার দ্বারা তাঁর মন মার্জিত হতেও পারেনি। অপরদিকে ব্যক্তিগত অশান্তি তাঁকে স্থির হতে দেয়নি। তবু তাঁর 'অশিক্ষিত পটুত্ব' অসাধারণত্বের পর্যায়ে পড়ে বলে তাঁকে 'স্বভাবকবি' বলা হয়ে থাকে। কথাটা কিছুটা সত্যও বটে। তাঁর কবিত্ব তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মিশে আছে, এটা কোন গ্রন্থলব্ধ বা বিদ্যার্জনের দ্বারা প্রাপ্ত অর্জিত সংস্কার নয়। তাঁর কবিপ্রেরণা কোন পোষাকী রোমান্টিক আবেগ নয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তা প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু 'স্বভাবের' সঙ্গে আর্টের ততটা মিলন ঘটেনি বলে তাঁর অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা সব সময়ে সৃষ্টিতে সার্থক হয়নি। তবু উনিশ-বিশ শতকের গীতি-

কবিতার ইতিহাস থেকে তাঁকে বাদ দেবার উপায় নেই—কারণ তাঁর প্রতিভার অভিনবত্ব পরের যুগে অন্য কারও মধ্যে ততটা উপলব্ধি করা যায়নি।

৭. ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা-কবি

এবার আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহিলা-গীতিকবির কথা একটু পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করব · কারণ· তাঁরা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কিছু স্বতন্ত্র উল্লেখ দাবি করতে পারেন। দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকেই ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে' কয়েকজন মহিলা-কবির কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, যার কোনও প্রকার কাব্যগুণ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত মহিলাদের উৎসাহ দেবার জন্যই কবিতার অযোগ্য ছড়াও প্রকাশ করতেন। এগুলি যদি বেনামী রচনা না হয় (হওয়াই সম্ভব), তা হলে দেখা যাচ্ছে, যখন সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রায় কোন প্রচার হয়নি, তখনও কলকাতা ও কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে একাধিক মহিলা গীতিকবিতা লিখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। এঁদের অক্ষম রচনার কথা ছেড়ে দিলে, এই সময়ের কিছু পরে যে সমস্ত মহিলা-কবি গীতিকবিতা বা আখ্যানকাব্যে কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এবং স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। অবশ্য এঁদের অনেকের কাব্যপ্রতিভা বিশ শতকের গোড়ার দিকে অধিকতর বিকাশ লাভ করেছিল। এঁরা ছাড়াও আরও বহু মহিলা-কবির কাব্য-কবিতা ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে পাঠকসমাজে পরিচিত হয়েছিল। কেউ কেউ সাময়িক পত্রে নিয়মিত কবিতা লিখে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এখানে অপেক্ষাকৃত শক্তিমতী মহিলা-কবিদের কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাড়ী বসে মোটামুটি বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার অবলম্বনে সহজ সরল ধরনের অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন। সেগুলি 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), 'আভাস' (১৮৯০), 'অর্ঘ্য' (১৯০২) প্রভৃতিতে সঙ্কলিত হয়েছিল। এর মধ্যে যেগুলিতে তাঁর বৈধব্যজীবন ও পরলোকগত স্বামীর উল্লেখ আছে, সেগুলি খুবই আন্তরিক হয়েছে এবং এই গুণের জন্য কাব্যসুষমা-বর্জিত অতি সাধারণ কবিতাগুলি আধুনিক

পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে। ব্যক্তিগত বিষণ্ণ জীবন এবং পুত্রকন্যাদের কথাই তাঁর কবিতার প্রধান সুর, এই ঘরোয়া ভাবটুকু শুধু গিরীন্দ্রমোহিনীর নয়, এই শতকের প্রায় সমস্ত মহিলা-কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তখন কুলবধূরা অন্তঃপুর ত্যাগ করে প্রকাশ্য রাজপথে পা বাড়াতে সঙ্কোচ বোধ করতেন, তাঁদের কল্পনাও তাই রোমান্সের খোলা আকাশে বিচরণ করতে বোধহয় কিছু লজ্জা বোধ করত। তাই ঘরসংসারের পাঁচাপ'াচ ছবিগুলি তাঁদের কবিত্বশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত এবং সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন এবং রবীন্দ্রযুগের গৌরবময় পরিমণ্ডলেও নিজস্ব ধরনের কাব্যপ্রকল্পে আসক্ত ছিলেন। আধুনিক ধরনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, অভিজাত পিতৃবংশ ও শিক্ষিত স্বামীর সান্নিধ্যে বর্ধিত হয়ে তিনি একযুগে শুধু মহিলাসমাজে নয়, শিক্ষিত পাঠকসমাজেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, নানা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি ইংরেজী লীরিকের আদর্শে বহু মাঝারি ধরনের গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন, যার অধিকাংশই 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), মাল্যনির্মাল্য (১৯১৩) ও 'অশোকসঙ্গীতে' (১৯১৪) সঙ্কলিত হয়েছিল। ১৯২৯ সালে 'দীপ ও ধূপ' শীর্ষক কাব্যসঙ্কলনে তাঁর যাবতীয় কবিতা একত্রে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। স্কুল কলেজের পাঠ্যগ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর অনেক কবিতা একদা পাঠকসমাজের কণ্ঠস্থ ছিল। "গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি, ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার", "নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ, এ ধরা কি শুধু বিষাদময়", "তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা"—প্রভৃতি কবিতা একদা ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত। কবি কামিনী রায় সর্বপ্রথম মেয়েলি ধরনের ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে উদারতর কাব্যাঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন এবং নানা বিচিত্র বিষয়ে কবিতা লিখে প্রতিভার ব্যাপকতা প্রমাণ করেছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেম—এই তিন শাখায় তাঁর মুকুলিত কবিত্ব কবিতা-পুষ্পরূপে ফুটে উঠেছিল। তাঁর কিছু কিছু গদ্যনিবন্ধও আছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে ততটা চমক নেই, বাক্-রীতিও অদ্ভুত কোন কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়, এমনকি কোন কোন স্থলে ছন্দের ত্রুটিও লক্ষ্য করা যাবে। তবু উনিশ-বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত মহিলা-কবিদের মধ্যে তাঁর স্থানই সর্বাগ্রে গণনীয়।

মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪)), 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'বীরকুমারবধ কাব্য' (১৯০৪) প্রভৃতি গীতিকাব্য ও আখ্যানকাব্যে কিছু খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁর কবিপ্রকৃতির কিছু সাদৃশ্য আছে। দু'জনের জীবনের বৈধব্যযন্ত্রণা কবিতাকে একটা নিরাভরণ বৈরাগ্যের বেশ দিয়েছে। উপরন্তু সহজ সুরে গ্রাম্য মেঠোপথে-ধ্বনিত রাখাল বালকের গানের মতো এ'র কবিতা সহজ সরল বলেই কিছু চিত্তাকর্ষী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীররস ও করুণরসের যুগপৎ সমন্বয়ে লেখা 'বীর-কুমারবধ' আখ্যানকাব্যে মহাভারতের অভিমন্যুবধ বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রমীলা নাগ (১৮৭১-১৮৯৬), সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯৩২) প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা-কবির কিছু কিছু গীতিকবিতা একযুগের সাময়িকপত্র-পাঠকের সুপরিচিত ছিল। এ'দের দু'-একখানি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এ'রা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভালো জাতের কবিতা লিখলেও এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর মতো প্রতিভা এ'দের কারও ছিল না। হিন্দুঘরের কুলবধূর মর্মকথা, বৈধব্য-যন্ত্রণা, স্বামিভক্তি, পারিবারিক জীবন—এই হল অধিকাংশ মহিলা-কবির কাব্যরচনার প্রধান *motif*; ষোড়শীবালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত, লজ্জাবতী বসু—এ'দের কাব্যপ্রতীতিও এই পারিবারিক অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ

আমরা এই অধ্যায়ে দুটি উপচ্ছেদে (উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। বলতে গেলে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই যথার্থ উপন্যাস-সাহিত্যের বিকাশ হয় এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধের ঐশ্বর্যের যা কিছু পরিচয় ও মননের যা কিছু গৌরব তারও সিদ্ধিলাভ এই যুগেই ঘটেছে।

প্রথম উপচ্ছেদ : উপন্যাস

১. সূচনা

ইতিপূর্বে আমরা কথাসাহিত্যের সূচনার আলোচনায় দেখেছি যে প্যারীচাঁদ ও ভূদেব উপন্যাস জাতীয় রচনার কিছুটা গোড়াপত্তন করলেও যথার্থ উপন্যাসের রচনা তারও কিছু পরে শুরু হয়, এবং শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র।

গল্পের প্রতি মানুষের চিরকালের আকর্ষণ, তা সে প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী মানুষ হোক, আর আধুনিক কালের কৃতবিদ্য মানুষই হোক। প্রাচীনতম যুগে অরণ্যচারী বর্বর মানুষ সায়াহ্নে যখন আস্তানায় ফিরে আসত, তারা তখন নৃত্যগীতে মত্ত হয়ে উঠত। সে গীতের বিষয়বস্তুর মধ্যে হয়তো কোন শিকারকাহিনী লুকিয়ে ছিল, কিংবা কোন হিংস্র দলসংঘর্ষ, অথবা অপর দলের স্ত্রীলোক চুরি। সেদিন থেকেই মানুষ নিজের জীবনকে অবলম্বন করে গল্প বানিয়েছে, তার রসে মুগ্ধ হয়েছে। এমনি করে মানুষ ক্রমে ক্রমে শত শতাব্দী পার হয়ে গেছে, সভ্যতার হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে, প্রকৃতিকে জয় করেছে, এবং খুনজখমের বীভৎস কাহিনীর স্থলে ভূতপ্রেত, রাক্ষসখোক্কস, দৈত্যদানব, হুরীপরী, 'রাজপুত্তুর-রাজকন্যে'র কাহিনীর মধ্যে বিস্ময়রস খুঁজে পেয়েছে। পুরাতন দিনের মানুষ ছিল অলৌকিকে বিশ্বাসী, রহস্যলোভাতুর; তাই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভবের দিকেই তার কাহিনীর বিকাশ। পরে শিক্ষা সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ফলে নানা গল্প-আখ্যান—কোনটি যুদ্ধবিগ্রহের, কোনটি প্রেম-প্রণয়ের—ক্রমেই সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করল। ব্যালাডের আকারে নানা আখ্যান ছন্দে লয়ে গাওয়া হত, কখনও বা গদ্যভাষায় বিবৃত

হত। এইভাবে পুরাতন সাহিত্যে গদ্য-আখ্যানের উৎপত্তি হল এবং কালক্রমে সেই সমস্ত অপরিণতগঠন গদ্যকাহিনী সুগঠিত উপন্যাসের রূপ লাভ করল।

গদ্য-আখ্যানকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় রোমান্স, যাতে ঘটনার প্রাধান্য ; অনৈসর্গিক, অলৌকিক ও অদ্ভুতেরও বিচিত্র সমন্বয় হতে বাধা নেই। এতে একটা জটিল চিত্তাকর্ষী কাহিনী থাকলেও চরিত্রবিকাশের দিকে লেখকের বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। আর একটিকে বলা হয় উপন্যাস। উপন্যাসও কাহিনী, তবে বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী। এই উপন্যাসের বিকাশ দেখা গেছে গত দু' শতাব্দী ধরে—যখন বাস্তব প্রয়োজন ও পরিবেশ সম্বন্ধে সামাজিক ও ব্যক্তিক মানুষ সচেতন হয়ে উঠল। অবশ্য উপন্যাসেও রোমান্সের অল্পাধিক প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে য়ুরোপের লেখক ও পাঠক বুঝতে পেরেছিল যে, বাস্তব মানুষের কাহিনী, চরিত্র ও চরিত্রঘটিত দ্বন্দ্বই হল উপন্যাস-সাহিত্যের মৌলিক লক্ষণ। অবশ্য তার আগেও উপন্যাসধর্মী রচনার কিছু উল্লেখ মধ্যযুগীয় রেনেসাঁসের য়ুরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন বোকাচিও প্রণীত *Decameron* (1348-1353)। এতে অনেকগুলি বাস্তবধর্মী আখ্যান আছে। তারও আগে পুরাতন গ্রীক ও লাতিন ভাষায় *The Ass, Satyricon Metamorphos* প্রভৃতি গদ্যকাহিনী রচিত হয়েছিল। কিন্তু ইতালীয় লেখক বোকাচিও-র *Decameron* থেকেই বাস্তবধর্মী গল্পকাহিনীর প্রথম সূচনা হল। তিনি এই গল্পগুলিকে 'Novella Storie' অর্থাৎ নতুন গল্প নাম দিয়েছিলেন। এই Novella শব্দ থেকেই Novel শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য জার্মান ভাষায় সাধারণভাবে তাবৎ উপন্যাসকেই 'Romance' বলা হয়, সেই পুরাতন রোমান্টিক কল্পনাপ্রধান আখ্যানের শেষ স্মৃতি এই 'Romance' শব্দের মধ্যে রয়ে গেছে।

য়ুরোপে রেনেসাঁসের ফলে লোকভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সেই ভাষায় মানুষের গল্প রচিত হয়ে জনচিত্তকে রঞ্জিত করে। এই সময়ে ছাপাখানার কল্যাণে এই ধরনের নানা গল্পকাহিনী বহুল প্রচার লাভ করে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সারা য়ুরোপেই দেশীয় ভাষায় অনেক গল্পকাহিনী রচিত হয়েছিল, কিন্তু ঠিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, তার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রয়োজন ছিল। এই শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ, সমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার উত্তাপ, অর্থনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি ভৌম ব্যাপার এমনভাবে মানুষের মনকে প্রভাবিত

করেছিল যে, গদ্যকাহিনীতে তার ছাপ পড়েছে প্রগাঢ়ভাবে। অবশ্য প্রথম দিকে কিছু কল্পনাপ্রধান, কিছু উদ্ভট, কিছু রাজনৈতিক দলাদলি-সংক্রান্ত কাহিনী (যথা—*Robinson Crusoe, Don Ouixote, Gulliver's Travels, Candide* প্রভৃতি) জনচিত্তকে প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু ক্রমে ইংরেজী সাহিত্যে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, জার্মানীর উইলেণ্ড্, গ্যয়ঠে, ফরাসী দেশের মাদাম ফেয়েত্তে, মারিভোস প্রেভোস—এ'রা উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই য়ুরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যে সমাজ ও পরিবারকে কেন্দ্র করে যুগান্তকারী উপন্যাস রচিত হল। তারপর কাল অগ্রসর হয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশ বদলাতে শুরু করেছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক জটিলতর হয়েছে, মনের মধ্যে জট পাকিয়ে উঠেছে। বিশ শতকের য়ুরোপীয় উপন্যাসে সেই জটিলতা নানা ধরনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে এবং সেই বৈচিত্র্যসৃষ্টির এখনও বিরাম নেই।

আমাদের বাংলাদেশের উপন্যাসের উৎপত্তির মূলে আছে ইংরেজী উপন্যাসের প্রভাব। অবশ্য মধ্যযুগের ধর্মপ্রধান কাব্যসাহিত্যের অন্তরালেও মানবজীবনকাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। তারও আগে সংস্কৃত গদ্য-রোমান্স হিসেবে 'কথাসরিৎসাগর', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' এবং নীতিগল্প হিসেবে 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি সুপরিচিত। পালি ভাষায় রচিত জাতক কাহিনীর বাস্তবতাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যাকে আধুনিক কথাসাহিত্য বলে, অর্থাৎ বাস্তব মানবজীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতের কাহিনী—প্রাচীন সংস্কৃত বা পালি সাহিত্যে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যে বাস্তব কাহিনীর অভাব নেই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে কিছু কিছু উপন্যাসের লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু যথার্থ উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথম রচিত হতে আরম্ভ করে, এবং বলাই বাহুল্য,—ইংরেজী আদর্শকে শিরোধার্য করে। এর আগে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রসঙ্গে আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের অবতারণার কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু যথার্থ উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই উপচ্ছেদে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন ঔপন্যাসিকের কথা আলোচনা করব।

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস ও

রোমান্সের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম নানা ধরনের বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেন, কান্তি সংযোজনাও তাঁর অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচায়ক। উপন্যাসের কথা ছেড়ে দিলেও বাঙালীর মননের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব সুপরিচিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—এই তিনজনেই বাঙালীর মনোজীবনে ও আদর্শলোকে নতুন আলোড়ন তুলেছিলেন, পথের দিশারী হয়ে সমগ্র জাতিকে অগ্রবর্তী করে দিয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সকলের চেয়ে গভীর হয়েছিল। বাঙালীর জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মিলনভূমিতে স্থাপন করে মননশীল সাহিত্য, কথাসাহিত্য, দেশ ও দশের কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ও প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাঙালীর মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, সংস্কারকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে, স্বাদেশিক মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তিনি যে নতুন মানববোধের পন্থা নির্দেশ করেন, এক শতাব্দীর বাঙালী সেই পথ ধরেই চলেছিলেন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্র শুধু মাসিক পত্রের আদর্শ নয়, এর মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালীসমাজ আত্মদর্শনের বীজমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যসম্প্রদায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষিত বাঙালীসমাজে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে যেমন রবীন্দ্রযুগ বলা হয়ে থাকে, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বঙ্কিমযুগ বলা হয়। এমন কি রবীন্দ্রযুগের গোড়ার দিকেও বঙ্কিমপ্রাধান্য অটুট ছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁর প্রবন্ধের আদর্শে যুবক রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলন, সমাজবিকাশ, শিক্ষা, ঐতিহ্য—কোন্‌টার সঙ্গেই বা বঙ্কিমচন্দ্রের নিগূঢ় সম্পর্ক নেই? এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর 'আনন্দমঠ' ইংরেজী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা ভারতেই স্বদেশিক ও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র যেন আধুনিক কালের ঋক্‌মন্ত্র, যার দেবতা হচ্ছেন দেশমাতৃকা। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবযুগচেতনা বা রেনেসাঁসের মূল সুর একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য এখানে আমরা শুধু তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী রোমান্স-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাস

(স্যার ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ) এবং সামাজিক-পারিবারিক কথাসাহিত্যের আদর্শে বাঙালীর সুদূরবর্তী ইতিহাস এবং অনতিক্রান্ত সমাজ-পরিবার-জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছিলেন, আজ সে সব গ্রন্থের দেশকাল বহু দূরে সরে গেছে কিন্তু তবু তাঁর গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাঁর উপন্যাসে ক্রমে ক্রমে কাহিনী গৌণ হয়ে পড়ল এবং চরিত্রদ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেতে লাগল, মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত অপেক্ষাকৃত সংচিত্রিত হল। এক কথায় তিনিই বাংলা উপন্যাসের পথের দিশারী এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে লেখা—*Rajmohan's Wife* ; এটি ১৮৬৪ সালের *Indian Field* নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ইংরেজী জড়তাপূর্ণ বা অনভ্যস্ত নয়, কাহিনীও আধুনিক বাঙালীর পারিবারিক জীবন-ঘেঁষা। এখানে লক্ষণীয়, বাংলাতে তিনি প্রথম রোমান্স-মিশ্রিত ও কল্পনাপ্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও তার সামান্য পূর্বে ইংরেজীতে লেখা উপন্যাসে ঐতিহাসিক রোমান্সকে বাদ দিয়ে ঘরের কথার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ তিনি নিজে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের 'বারিবাহিনী' উপন্যাসে সেটুকু সংযোজিত করেছিলেন। পরে বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সজনীকান্ত দাস মহাশয় 'রাজমোহনের স্ত্রী' নাম দিয়ে এর অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এ উপন্যাসের কাহিনী স্বচ্ছন্দ এবং চরিত্রগুলি পরিচিত জীবন থেকে সংগৃহীত ; কিন্তু এতে পরিপক্বতা ও পরিণতির বিশেষ অভাব আছে। এর কিছু আগে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য রচনার দিকে ঝুঁকেছিলেন, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'ললিতা তথা মানসে'ই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু *Rajmohan's Wife* ও 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করতে গিয়ে তিনি স্যার ওয়াল্টার স্কটের মতো বুঝতে পারলেন, কাব্য নয়—গদ্য উপন্যাসই তাঁর প্রতিভার প্রধান নিয়ামক শক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবিতকালের শেষ বাইশ বৎসরের মধ্যে (১৮৬৫-১৮৮৭) মোট চৌদ্দখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হলেও রচনা আরম্ভ হয়েছিল তার আগে। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে। এর পর তিনি আরও সাত বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র তখন উপন্যাস নিয়ে আর ব্যস্ত হননি।

কারণ প্রবীণতার ধূসর অপরাহ্ণে পৌঁছে তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর উপন্যাস লিখবার ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন তিনি প্রবন্ধ, নিবন্ধ, শাস্ত্রসংহিতা, গীতাতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতো নিজের প্রতিভার সীমা ও সংযম সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারামে'র পরিণতি দেখে মনে হচ্ছে, এর পর তিনি উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হলে সার্থক হতে পারতেন না, নানাপ্রকার ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব হয়তো তাঁর উপন্যাসের স্বাধীন গতিকে রুদ্ধ করে ফেলত।

সন-তারিখের ক্রম হিসেবে তাঁর চোদ্দখানি উপন্যাসের তালিকা দেওয়া গেল : (১) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯), (৪) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), (৫) ইন্দিরা (১৮৭৩), (৬) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), (৭) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), (৮) রজনী (১৮৭৭), (৯) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), (১০) রাজসিংহ (১৮৮২), (১১) আনন্দমঠ (১৮৮৪), (১২) দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), (১৩) রাধারাণী (১৮৮৬), (১৪) সীতারাম (১৮৮৭)। গুরুতর সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে, চাকুরির জন্য নানাস্থানে বদলী হয়ে, বহু প্রকার সাহিত্য ও সমাজঘটিত ব্যাপারে জড়িত থেকে তিনি মাত্র বাইশ বৎসরের মধ্যে যে এতগুলি বিচিত্র শ্রেণীর উপন্যাস লিখেছিলেন এতেই তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতা ও বলিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে। এখন সংক্ষেপে তাঁর উপন্যাসগুলির শ্রেণী ও গুণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাচ্ছে। তাঁর বিবিধ ও বিচিত্র ধরনের উপন্যাসগুলিকে আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ধরে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(ক) **ইতিহাস ও রোমান্স** ॥ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', মৃণালিনী', যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম'। বিশুদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে লেখা 'রাজসিংহ'ই একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রও তাই বলেছেন এবং সাহিত্যবিচারের মাপ-কাঠিতেও তাই নির্ধারিত হবে। অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', ও 'সীতারামের' পটভূমিকাতেও ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্র আছে বটে, কিন্তু এখানে ইতিহাসের পটে অনৈতিহাসিক মানুষের কথা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা-আয়েষা-তিলোত্তমা, 'কপালকুণ্ডলা'য় কপালকুণ্ডলা-মতিবিবি-নবকুমার, 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী-পশুপতি-মনোরমা,

'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী, এবং 'সীতারামের' শ্রীর চরিত্র ও ঘটনা —যেগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ বা অধিকাংশই কাল্পনিক, সেইগুলি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। অথচ 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বাংলার পাঠান-মুঘলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, 'কপালকুণ্ডলা'য় মুঘলশাসনে জাহাঙ্গীরের আমল, 'মৃণালিনী'তে বাংলায় তাতার-তুর্কীর আক্রমণ, 'চন্দ্রশেখরে' মিরকাশিমের সমসাময়িক ঘটনা এবং 'সীতারামে' মুঘল আমলের শেষাংশ পটভূমিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিন্দু আমলের আবহাওয়া থাকলেও এর মূলে সন-তারিখযুক্ত কোন ইতিহাসের প্রভাব নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্স ও কল্পনার খাদ মিশিয়ে যে উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন, সেগুলিকে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা না গেলেও বিশুদ্ধ শিল্পবস্তু হিসেবে তার দাম সব যুগেই স্বীকৃত হবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার পরিণাম এবং জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনী ও চরিত্র কি সহজে ভোলা যায়? স্কটের *Ivanhoe* বা ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর সঙ্গে এর কাহিনীর কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু এর রসবস্তু ও নির্মিতি-কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব। অবশ্য প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্সে তরুণ বঙ্কিমের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেলেও এর রচনারীতিগত কিছু কিছু জড়তা ও ত্রুটি রয়ে গেছে। এতে উপন্যাসের চেয়ে রোমান্সের প্রভাব যে বেশী, তার প্রমাণ—চরিত্রের দ্বন্দ্বের চেয়ে কাহিনীবয়নের গুরুত্ব অধিক। কিন্তু এর এক বৎসর পরে প্রকাশিত 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) একখানি অনবদ্য গ্রন্থরূপে সর্বত্র সম্মান লাভ করেছে। এতেও রোমান্সের লক্ষণ প্রবল, কিন্তু তার অতিরিক্ত আছে চরিত্রের সমস্যা, মানসিক প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং নিয়তিতাড়িত মানবভাগ্যের নিদারুণ পরিণাম, আর সে পরিণাম বর্ণিত হয়েছে কখনও কাব্যময় গীতিরসোচ্ছ্বাসের দ্বারা, কখনও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের দ্বারা, কখনও-বা নাটকীয় চমৎকারিত্বের সাহায্যে। প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলা সামাজিক জীবন ও বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়ে—এবং দুজ্ঞেয় নিয়তি নির্দেশে কীভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুপরিণামের দিকে এগিয়ে গেল, কীভাবে তার স্বামী নবকুমার ঘটনাচক্রকে অজ্ঞাতসারে বেগবান করে তুলল, এই সমস্ত বিচিত্র কাহিনী ও চরিত্র এই উপন্যাসে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এর ঠিক তিন বৎসর পরে প্রকাশিত 'মৃণালিনী'-ও বাংলায় মুসলমান অভিযানের পটভূমিকায় উপস্থাপিত কাল্পনিক কাহিনী। অবশ্য

'কপালকুণ্ডলা'র পরে রচিত হলেও 'মৃণালিনী'র কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রবিন্যাস, পূর্ববর্তীর চেয়ে অপকৃষ্ট। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেমের কাহিনী এতে প্রাধান্য পেলেও মনোরমা ও পশুপতির কাহিনীগ্রন্থনে লেখক অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বাধ্য হয়ে কতকগুলি সম্ভাব্য অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন, বিশেষত ইফ্‌তিকার-উদ্দিন-বিন-বক্তিয়ার খিল্‌জির নবদ্বীপ আক্রমণ সম্বন্ধে। তিনি যে কাল্পনিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, অধুনা ইতিহাসকারেরা কতকটা সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। 'যুগালাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) হিন্দু আমলে স্থাপিত একটি প্রেমের রোমাণ্টিক বড়ো গল্প। কাহিনী ও চরিত্র কোন দিক দিয়েই এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ ফোটেনি। 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭) এই তিনখানি উপন্যাসে অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐতিহাসিক পটভূমিকা অনুসৃত হয়েছে। যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত লেখক সেখানে ইতিহাসের অনুকূল কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। মীরকাশিম ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় স্থাপিত হলেও 'চন্দ্রশেখরে'র মূল কাহিনী সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। প্রতাপ-শৈবলিনীর আকর্ষণ এবং শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শ চরিত্র এর প্রধান বক্তব্য। লেখক অবশ্য নীতির মাপকাঠির সাহায্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্ক বিচার করতে গেছেন এবং চিত্তসংযমে অসমর্থা শৈবলিনীকে মানসিক নরকযন্ত্রণা ভোগের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়েছেন। অপরদিকে শৈবলিনীর প্রতি আবেগের দ্বারা অভিভূত হলেও প্রতাপ আত্মসংযমের অভূতপূর্ব আদর্শের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে গৌরবের অংশীদার হতে হয়েছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা নীতি ও সংযমের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁর শিল্পীমানসও আত্মপ্রকাশ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'ই (১৮৮২) একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস, কারণ এর কাহিনী ও প্রধান চরিত্রের সবগুলিই ঐতিহাসিক এবং সুপরিচিত ব্যক্তি। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে ঔরংজেবের বিবাহের ইচ্ছা এবং তা থেকে রাণা রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ, সেই বিরোধে রাজসিংহের জয়লাভ ও চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিবাহ—এই হল মূল ঘটনা, এবং এ ঘটনা ইতিহাস-

অনুমোদিত। কিন্তু এর সঙ্গে তিনি আবার জেবুন্নিসা-মবারক-দরিয়া বিবির একটি কাল্পনিক উপঘটনাও চিত্রিত করেছেন, এবং এই অংশেই তাঁর লিপি-কুশলতা সহজে অগ্রসর হতে পেরেছে, কারণ এখানে ইতিহাসের বাঁধাপথ তাঁর কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। 'সীতারাম' তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। এতে সামান্য ঐতিহাসিক কাহিনী ও পটভূমিকা থাকলেও ঐতিহাসিক চরিত্রে কল্পনার আতিশয্য বড়ো বেশী দেখা যায়। রূপের মোহ চরিত্রবান পুরুষের কতদূর সর্বনাশ করতে পারে এতে তাই দেখানো হয়েছে। সীতারামের চরিত্রটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কিত হলেও বঙ্কিম-প্রতিভার সে দীপ্তি এতে যে ম্লান হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে এখানে আরও দুটি-একটি কথা উত্থাপিত করতে পারি। কেউ কেউ মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যতই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক হোন না কেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি বহুস্থলে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন, বরং রমেশচন্দ্র দত্ত এবিষয়ে অনেক বেশী সতর্ক এবং একনিষ্ঠ। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল, বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্য সব সময়ে গ্রহণ না করলেও ঐতিহাসিক রসসৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ ঔপন্যাসিক বাংলাদেশে দ্বিতীয় কেউ নেই। বিশুদ্ধ ইতিহাস লেখা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, সে কাজ করবেন তথ্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ছায়া-পটে নরনারীর জীবনায়নের মধ্য দিয়ে বিস্মৃত বিবর্ণ যুগকে প্রাণবান করে তুলবেন। সেদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও অতুলনীয়।

(খ) তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস ॥ 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) ও 'দেবী চৌধুরাণী'কে (১৮৮৫) তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস বলা যেতে পারে। 'আনন্দ-মঠের' মধ্যে প্রধান ও প্রবল সুর দেশাত্মবোধ। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মারফতে দেশ, সমাজ, ধর্ম ও জাতীয়তা সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা করছিলেন। এই উপন্যাস দুটিতে সেই তত্ত্বদর্শনের কিছু ছাপ পড়েছে। উত্তর-বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কাল্পনিক গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করেন। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মুঘলযুগের সমাপ্তি ও ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এর কাহিনীর পট বিস্তৃত, কিন্তু বাইরে মুসলমান-বিরোধিতা থাকলেও আসলে ইংরেজ কুশাসনের বিরুদ্ধেই প্রচ্ছন্নভাবে এ উপন্যাস রচিত হয়েছিল। সরকারী কর্মচারী

বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গোপনেই রেখেছিলেন, কিন্তু একটু কল্পনাকুশলী ও দূরদর্শী পাঠক এই স্বদেশপ্রাণ উপন্যাসের আসল তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। এতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীদের উত্থান প্রসঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে ভারতীয়দের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতার কথাই বলতে চেয়েছেন। এর অগ্নিগর্ভ স্বদেশপ্রেম ও রক্তাক্ত আত্মোৎসর্গ সন্ত্রাসবাদের যুগে বিপ্লবীদের মনে উদ্দীপনা ও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র জুগিয়েছিল, আর বন্দেমাতরম্ তো পরবর্তী কালে সমরসঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য স্বাদেশিকতা, আত্মত্যাগ ও আদর্শবাদের দিক থেকে এ উপন্যাস একটি ক্রান্তিকারি ঐতিহাসিক পথনির্দেশক হলেও উপন্যাসের কলালক্ষণ বিচারে এর মধ্যে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে। এর কাহিনীগ্রন্থন সর্বদা সংহত হতে পারেনি, চরিত্রের দিক থেকেও একমাত্র শান্তি ও ভবানন্দ ভিন্ন অন্য কোন চরিত্রই সুপরিস্ফুট হতে পারেনি। সর্বোপরি উত্তরবঙ্গের (বোধ হয় শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, বাঁকুড়ারও বটে) সন্ন্যাসী হাঙ্গামার মতো একটা লুঠতরাজের বিশৃঙ্খল ঘটনাকে জ্যোতির্ময় দেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের আধারে পরিবেশন করাতে কাহিনীটির বস্তুগত যাথার্থ্য কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কারণ ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে একদল উপদ্রবকারী সন্ন্যাসী (উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী) বাংলাদেশে কিছুকাল ধরে যে নির্যাতন, লুঠতরাজ ও আরও নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল, তার সঙ্গে দেশপ্রেম কেন, কোনও প্রকার মহৎ বৃত্তির কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

'দেবীচৌধুরাণী' পুরাতন বাংলার সমাজ ও পারিবারিক পটভূমিকায় স্থাপিত একটি মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনী হলেও এর অন্তরালে আছে গীতাতত্ত্বে-নিষ্ণাত তাত্ত্বিক বঙ্কিমের একপ্রকার সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরণ ঘটিত তত্ত্বকথা। প্রফুল্ল নাম্নী একটি অতি সাধারণ কুলবধূ যাকে শ্বশুরের একগুঁয়েমির জন্য স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল, নানা ঘটনাচক্রে তাকেই হতে হল ভয়ঙ্করী দস্যু নেত্রী দেবীচৌধুরাণী। এ কাহিনীর পিছনেও অল্প-স্বল্প স্থানীয় ঘটনার ছায়াপাত হয়েছে। দেবীচৌধুরাণী হয়ে প্রফুল্ল প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রচণ্ড প্রতাপের অধিকারিণী হলেও তার গুরুর কাছে গীতার নিষ্কাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নারীজীবনের উদ্দেশ্য কি, এবং তার স্থানই বা কোথায় তা বুঝতে পারল। পরে ঘটনা অনুকূল হলে সে সমস্ত ঐশ্বর্য ও শক্তি ত্যাগ করে আবার স্বামীর ঘরে এসে কুলবধূটি হয়েই পুকুরঘাটে বাসন

মাজতে লাগল। এতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাতত্ত্ব এবং হিন্দুনারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যা উপন্যাসের পক্ষে অনেকটাই অবান্তর। উপন্যাসটি বিচিত্র কাহিনীবয়নে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছে, যদিও চরিত্রবিকাশ আশানুরূপ হয়নি। সে যাই হোক, শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র নীতি, আদর্শ, ধর্ম ও সদাচার সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হিন্দুর দিক থেকে যা ভাবছিলেন, তার কিছু গাঢ় প্রভাব এই যুগের উপন্যাসে পড়েছে। অবশ্য এই প্রভাব সর্বদা যে উপন্যাসের পক্ষে ভালোই হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কেউ কেউ 'দেবীচৌধুরাণী'র ঘটনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। এ সাদৃশ্য কল্পনা শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে।

(গ) সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস ॥ রোমান্স, ঐতিহাসিক ও অর্ধ ঐতিহাসিক (Pseudo-historical) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও একক মহিমায় আসীন; সম্প্রতি ঝুড়ি ঝুড়ি ঐতিহাসিক রূপকথা লেখা হচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়ে এখনও আমরা বঙ্কিমের পাদাঙ্গুষ্ঠও স্পর্শ করতে পারিনি। আবার অন্যদিকে বাঙালীর পারিবারিক-সামাজিক-গার্হস্থ্য-সমস্যাসঙ্কুল উপন্যাসেরও তিনি জনকস্থানীয়। এখন আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক—বহু শ্রেণীর উপন্যাস নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের গুরুস্থানীয় তা অস্বীকার করা যায় না।

তাঁর কতকগুলি উপন্যাস ও বড়ো গল্পে সমস্যাবর্জিত বাঙালী পরিবারের মসৃণ ঘরোয়া কাহিনী বিবৃত হয়েছে যাতে কোন অদ্ভুত কাহিনীবিন্যাস নেই, চরিত্রের অন্তর্লীন মনস্তাত্ত্বিক গূঢ়ৈষণাও অনুপস্থিত। কিন্তু একটি প্রসন্ন সরল, সহজ এবং সরস আখ্যান সহজেই পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে। যেমন 'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী'—আকারে এ'দুটি কাহিনী উপন্যাসের পূর্ণতা ও লক্ষণ পায়নি —অনেকটা বড়ো গল্পের মতো। একে ইংরেজীতে novelette বলে—অর্থাৎ ছোট মাপের নভেল। নানা বিপত্তির পরে ইন্দিরার সঙ্গে স্বামীর মিলন প্রথম আখ্যানে, এবং রাধারাণী নামে একটি বালিকার বাল্য-প্রেমের অনুরাগের সফলতা দ্বিতীয় আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রদ্বন্দ্ব বা অন্যান্য ঔপন্যাসিক লক্ষণ এতে না থাকলেও সুখপাঠ্য বড়ো গল্প হিসেবে এখনও এর জনপ্রিয়তা আছে।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের এমন কতকগুলি উপন্যাসের কথা বলব যাতে তাঁর প্রতিভার নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল, যা লিখে সে যুগের এবং এ যুগের পাঠকসমাজে

তিনি নিন্দা ও প্রশংসার ভাগী হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই ধরনের উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র যাত্রা শুরু করেছেন—অবশ্য সে যাত্রা সব সময় তাঁর খনিত পথ ধরেই চলেনি। আমরা 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রজনী' (১৮৭৭) এই তিনখানি উপন্যাসের কথা বলছি। নরনারীর আদিম সম্পর্কের জটিলতা এই তিনখানি উপন্যাসের মূলকথা। চিত্তসংযমে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা থেকে স্ত্রীপুরুষের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সমসাময়িক পারিবারিক জীবনের ওপর ভিত্তি করে এই তিনখানি উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন।

'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনী নামে বালবিধবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিত্তের দুর্নিবার প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে স'পে দিলেন ধনাঢ্য ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথ, এবং সাধ্বী পত্নী সূর্যমুখীর প্রতি উদাসীন হলেন। ফলে অভিমানিনী সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী হলেন। পরে অবশ্য নগেন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন এবং সূর্যমুখী এসে আবার ধরা দিলেন। স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হল বটে, কিন্তু স্বল্প-ভাষিণী কুন্দনন্দিনী সব ব্যাপারের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং নগেন্দ্রনাথ তার প্রতি উদাসীন এই অভিমানে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। উপন্যাসটির নাম 'বিষবৃক্ষ'। নগেন্দ্রনাথ আত্মসংযমে অসমর্থ হয়ে নিষিদ্ধ কামনার যে বীজ বপন করেছিলেন, তাই-ই একদিন বিষবৃক্ষ হয়ে তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে কুন্দকে গ্রাস করল। উপন্যাসের সমাপ্তিতে লেখক বলেছেন যে, এই বিষবৃক্ষ থেকে ঘরে ঘরে অমৃত ফলে উঠুক এই তিনি চেয়েছেন। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চরিত্রশুদ্ধি ও প্রচার এ উপন্যাসের মূল্য লক্ষ্য। ঘটনার গতি ও চরিত্র বিকাশও তার দিকেই অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহ পছন্দ করতেন না, এখানে সে কথাটাও প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিষিদ্ধ কামনার উদ্দামতা আছে, চরিত্রদ্বন্দ্বও আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে এটি প্রথম হলেও উৎকৃষ্ট নয়। কারণ এতে বাস্তব ঘটনায় আঁকা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের চেয়ে রোমান্টিক ধরনের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কন অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। তা হলেও আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিক সমস্যা এবং প্রথাগত বিবাহবন্ধনের অতিরিক্ত আকর্ষণের পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গুরুতর সমস্যার উত্থাপন করেন। অবশ্য এ সমস্যার সমাধান, বিশেষত কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা ঠিক উপন্যাসের প্রয়োজনে সংঘটিত হয়নি, হয়েছে রোমান্স জাতীয় কাহিনীর জন্য।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা সাহিত্যের একখানি অনবদ্য গ্রন্থ, বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক সৃষ্টি। এর বিষয়ও পুরুষের আত্মসংযমে অনিচ্ছা, স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত হওয়া এবং তার শোচনীয় পরিণাম। গোবিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমরকে নিয়ে বেশ সুখে ছিল, হঠাৎ তার জীবনে ধূমকেতুর মতো বালবিধবা রোহিণীর উদয় হল। ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব রোহিণীর পক্ষে গোবিন্দলালকে নিজ অঞ্চলতলে টেনে আনা মোটেই দুরূহ হল না। কিন্তু ভ্রমরবৃত্তিচারিণী রোহিণী একাধিক পুরুষের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে গোবিন্দলালের প্রেমের কোন মর্যাদা দিল না। ফলে অপমানিত গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে তাকে হত্যা করে ফেরার হল। মামলামোকদ্দমার পর সে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু আর সে অঞ্চলে কাউকে মুখ দেখাল না, শুধু স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় সে উপস্থিত হল। ভ্রমর তার পায়ের ধুলো নিয়ে দেহত্যাগ করল, কিন্তু দুষ্কৃতকারী ও নারীঘাতক স্বামীকে পরজন্মে আর স্বামিরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করল না। এই আঘাতে গোবিন্দলালের চৈতন্য হল, সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ঈশ্বর-পাদপদ্মে মনঃসংযোগ করল এবং 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করে জীবনের দুঃস্বপ্ন ভুলতে চেষ্টা করল।

এ উপন্যাসের কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র সন্নিবেশে বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। নারীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব, পুরুষের নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয় মনস্তত্ত্বের দিক থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, হিন্দুর নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সম্পর্ক বিচার করেছেন, এবং সামাজিক নীতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক কামনার সংঘর্ষ হলে অর্থাৎ আর্টের সঙ্গে মরালিটির দ্বন্দ্ব হলে আদর্শবাদী এবং হিন্দুর সামাজিক নীতির সংরক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের কথা অস্বীকার করে আদর্শ ও নীতির জয় ঘোষণা করতে কখনও সঙ্কুচিত হতেন না। কুন্দের আত্মহত্যা এবং রোহিণীর হত্যাকাণ্ড লেখক অশোভন দ্রুততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারের জন্য তিনি বিশ্লেষণপন্থা ও সোপান-পরম্পরা ছেড়ে দিয়ে একেবারে আকস্মিক বজ্রাঘাত তুল্য শেষ আঘাতটি নিক্ষেপ করেছেন। রোহিণীর হত্যাকাণ্ড ও পরিণাম সম্বন্ধে এ যুগের পাঠকের মতো সে যুগের কোন কোন জিজ্ঞাসু পাঠক প্রশ্ন করেছিলেন। রোহিণীর হত্যাকাণ্ড হয়তো অযৌক্তিক নয়, এবং কাহিনী ও চরিত্রের পরিণাম বিচার

করলে এ ধরনের ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু লেখক যেন নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে আকস্মিক ও অতিনাটকীয় ঘটনাকে স্বভাবসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য করার প্রয়োজন বোধ করেননি। রোহিণীর পরিণাম স্বভাবসঙ্গত হলেও আর্টসঙ্গত হয়নি বলে এতে শিল্পকলাগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে। সেযুগের সামাজিক পরিবেশ আলোচনা করলে অবশ্য লেখককে এজন্য খুব বেশী দায়ী করা যাবে না। সে যুগে 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' ('Mid-Victorian') নীতিবাদ, ব্রাহ্ম সামাজিক আদর্শ ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে তিনি যদি এমিল জোলার মতো সমাজের নিষিদ্ধ গলিঘুঁজির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন তা হলে সে যুগে তাঁর উপন্যাসের কোনরূপ জনপ্রিয়তাই থাকত না। উপরন্তু তাঁর মানসিক গঠনও জোলা-মোপাসাঁর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের ছিল। যাই হোক আর্টগত এই যে সমস্ত ত্রুটি সমালোচকের চোখে পড়েছে, তাঁর 'রজনী' (১৮৭৭) এদিক থেকে অনেকটা সে ধরনের ত্রুটিমুক্ত। নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ 'রজনী'র পরিকল্পনা ও পরিণামের মৌলিকতা সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত *The Last Days of Pompeii* উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধ রজনীর চরিত্র অঙ্কন করেন। নানা জটিল ও রহস্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে নায়ক শচীশ এবং অন্ধ রজনীর বিবাহ এবং তারপরে কোনও মহাপুরুষের কৃপায় তার দৃষ্টিশক্তিলাভ—এটা হল উপন্যাসের মূল আখ্যান। এ আখ্যান বয়নে নানা কলাকৌশল অবলম্বিত হলেও কাহিনী বা চরিত্র কোন দিক দিয়েই রজনী-শচীশের মিলনকাহিনী অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করেনি। কিন্তু মূল কাহিনী ও চরিত্রের পাশেই আর একটি উপকাহিনী সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। শচীশের বিমাতা লবঙ্গলতা, যে শচীশকে পুত্রাধিক ভালবাসত, তার কাহিনী বড় বিচিত্র। একদা প্রথম যৌবনে অমরনাথ নামে এক শিক্ষিত যুবা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। লবঙ্গ তাকে ধরে জলন্ত শলাকা দিয়ে তার পিঠে 'চোর' অক্ষর দেগে দিয়েছিল। অমরনাথ পরবর্তী কালে লবঙ্গলতার জীবনে উদিত হল। লবঙ্গলতা জানত, অমরনাথের প্রতি তার মনে শুধু ঘৃণা-অনুকম্পাই সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু অমরনাথ যখন তার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে জীবনরঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থানোদ্যত

হল, তখন সেই দুর্বলতম মুহূর্তে লবঙ্গলতা প্রকারান্তরে তার নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ করে ফেলল। তবু সে নিজেকে সংযত করেছে; যে-ব্যক্তি স্বামী না হয়ে পরপুরুষরূপে তার জীবনে প্রবেশ করতে চায়, তাকে সে সতীধর্মের দোহাই দিয়ে শুধু ঘৃণাই দিতে পারে। কিন্তু যেখানে নীতি, সমাজ, সংস্কার দুর্বল হৃদয়প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যায়, সেখানে সেই নিঃসঙ্গ হৃদয়ের অন্তঃপুরে, লবঙ্গলতা অমরনাথকে বাধা দেবে কি করে? এখানে দেখতে পাচ্ছি, শিল্পী বঙ্কিম ও নীতিবাদী বঙ্কিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়েছিল। লেখক সগর্বে নীতিকে জয়যুক্ত করতে গিয়ে নারীহৃদয়ের দুর্বলতম ব্যথার অমর্যাদা করেননি। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বঙ্কিমের পক্ষে অসাধারণ ব্যাপার বটে।

আমরা বঙ্কিম প্রসঙ্গের প্রথমেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা মনে রেখেও বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। বিষয়বৈচিত্র্যে, রচনাপ্রকরণে, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনে, পরবর্তী যুগে প্রসারিত প্রভাবে তিনি এখনও অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ছেড়ে শাখাপথে অগ্রসর হয়েছেন, শরৎচন্দ্র তাঁর পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে বরং বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন। কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তাঁর পরে উপন্যাসের এক শতাব্দী পার হয়ে গেল। কথাসাহিত্যের কত বৈচিত্র্য, কত কৌশল, কত নূতনত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশাল হিমলয়ের মতো বাংলা উপন্যাসের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছেন তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য ইদানীং কোন্ কোন সমালোচক বলছেন, বঙ্কিমযুগ চলে গেছে, বঙ্কিম-উপন্যাসের যুগও চলে গেছে। এ কথা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য, কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক থেকে নয়; বঙ্কিম-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা এক শ' বছর পরেও সমান অটুট আছে। ইদানীন্তন কালের কোন্ ঔপন্যাসিক সগর্বে বলতে পারেন যে শতবর্ষ পরে তিনি আয়ুষ্মান হয়ে থাকবেন? এর কারণ নীতি ও আদর্শের প্রতি পক্ষপাত সত্ত্বেও মানবজীবনের অতল অপার রহস্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শেক্‌পীয়রের মতোই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, নরনারীর জীবনের বৃহৎ স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই অবহিত ছিলেন। সর্বোপরি বিশেষ দেশকালের পটভূমিকায় বিশেষ দেশকালের নরনারীর চরিত্র আঁকলেও তিনি তারই মধ্য দিয়ে সর্বকালের মানুষের ছবি এঁকেছেন। সেইজন্য এখনকার পাঠকও তাঁর সৃষ্ট কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে নিজের কালের ছবি দেখতে পায়—এই গুণ

এবং রচনার অপূর্ব ঐশ্বর্য তাঁকে যে কালজয়ী করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

সে যুগের প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার প্রথম শ্রেণীর লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসকার হিসেবে আবির্ভাব একটু আকস্মিক ঘটনা। কারণ ইংরেজীতে নানা ধরনের মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে তিনি তরুণ বয়সেই খ্যাতি পেয়েছিলেন, প্রবীণ বয়সে নানা শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করে তিনি দেশ ও সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছিলেন। কিন্তু প্রবীণ বঙ্কিম-চন্দ্রের সঙ্গে তরুণ রমেশচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের পর রমেশচন্দ্রের প্রতিভা আর এক দিকে বিকশিত হয়—তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা।

রমেশচন্দ্র মোট ছ'খানি বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন, নিজের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদও করেছিলেন, সে অনুবাদ ইংরেজীভাষী সম্প্রদায়ের কাছে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। তাঁর ছ'খানি উপন্যাসের মধ্যে দু'খানি ইতিহাসের পটে আঁকা রোমান্টিক কাহিনী, অর্থাৎ 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) এবং 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭)। দু'খানি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস অর্থাৎ 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৮৯); দু'খানি সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস অর্থাৎ 'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪)। প্রথম চারখানি উপন্যাসে মুঘল-ইতিহসের একশ' বছরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বলে এদের একত্রে 'শতবর্ষ' বলা হয়।

'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণে' ইতিহাসের পটভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে। তার মধ্যে 'বঙ্গবিজেতা'য় টোডরমল্লের কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কোন ফাঁক রাখেননি। এতে প্রেম, গার্হস্থ্যজীবন, ক্রূরতা, আত্মত্যাগ—মানবচরিত্রের আলো-অাঁধারের সমস্ত লীলাই বর্ণিত হয়েছে, নেই শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল চরিত্র। 'বঙ্গবিজেতা'র তিন বৎসর পরে 'মাধবীকঙ্কণ' রচিত হয়। পূর্বেরটির চেয়ে এটির চরিত্রপরিকল্পনা, ঘটনাবিন্যাস প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি হয়েছে। টেনিসনের *Enoch Arden* কবিতার ঘটনার আদর্শে 'মাধবীকঙ্কণে'র কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। এর পটভূমিকায় ঐতিহাসিক তথ্যের সমারোহ থাকলেও মানবজীবনের সুখদুঃখ ও বিরহমিলনের প্রতি লেখকের সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশ ও

হেমলতাকে কেন্দ্র করে যে ত্রিভুজ সৃষ্টি হল, তার শোকাবহ পরিণাম বর্ণনায় রমেশচন্দ্র অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের ঘনঘটা, রোমান্সের ঐশ্বর্য এবং পারিবারিক ঘটনার স্নিগ্ধ বর্ণনাকে একসূত্রে মিলিয়ে দিয়ে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্সে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ না হলেও, প্রায় অনুরূপ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেইজন্য বাংলার ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাঁর স্থান সকলেই স্বীকার করে থাকেন।

এর পর রমেশচন্দ্রের দু'খানি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যার ঘটনা ও চরিত্র মূলত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। একখানি 'জীবনপ্রভাত' অর্থাৎ মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), আর একখানি 'জীবনসন্ধ্যা' অর্থাৎ রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৮৯)। প্রথমখানিতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয়খানিতে রাজপুত জাতির পতন বর্ণিত হয়েছে। এখানে ইতিহাসই মূল বর্ণনীয় বিষয়, ঐতিহাসিক চরিত্রই বর্মচর্ম ধারণ করে রণরঙ্গমুখর ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে সংঘর্ষে মত্ত হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক শাঠ্য-ষড়যন্ত্র, দুঃসাহসিক অভিযান, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার এই দুই উপন্যাসে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্যময় বর্ণনার সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে আছে প্রবল স্বদেশ-চেতনার সুর। লেখক স্বয়ং একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসের মধ্যে বিবিধ ঐতিহাসিক চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ ও পরিণাম তিনি নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করতে গেছেন এবং ইতিহাসের মূল সুরটিকেও চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে তাঁর এই দু'খানি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তী কালে কোন কোন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক তাঁকে ভক্ত শিষ্যের মতো অনুসরণ করেছিলেন —যেমন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় রমেশচন্দ্রকে অধিকতর শক্তিশালী ঔপন্যাসিক বলে থাকেন। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' ছাড়া অন্য কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের বড়ো একটা আনুগত্য স্বীকার করেননি। নিজস্ব পরিকল্পনা ও উপন্যাসের খাতিরে তিনি ঐতিহাসিক কাহিনীকে নিজের খেয়ালখুশিমত বদলে নিয়েছেন—তাতে উপন্যাসের আকর্ষণ বাড়লেও ইতিহাসের যাথার্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অপর দিকে রমেশচন্দ্র তাঁর দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাসে

ইতিহাসকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করেছেন, দু'চারটি কাল্পনিক চরিত্র ও কাহিনী থাকলেও তাদেরও গুরুত্ব বেশী নয়। সেইজন্য কেউ কেউ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে রমেশচন্দ্রের অধিকতর গুণগান করে থাকেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তা স্বীকার করতে হবে। শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা বলে যাওয়া বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে হুবহু ইতিহাসের ধাঁচেই লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ নয়। ইতিহাসের পটে ইতিহাসের রস সৃষ্টি করা, ইতিহাসের চরিত্রের মধ্যে চিরকালের মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্যময় কোণে সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। সেই লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে গেলে ইতিহাসের বস্তুগত তথ্য কিছু খর্ব হলে আপত্তির কোন কারণ থাকে না। সর্বাগ্রে দেখতে হবে গ্রন্থটি যথার্থ রসসাহিত্য হয়েছে কিনা, অথবা তাতে সন-তারিখের ব্যূহ সাজিয়ে ইতিহাসের কুশীলবেরা তাল ঠুকে দ্বৈরথ সমরে প্রস্তুত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজনস্থলে ইতিহাসকে কিছু বদলে নিলেও কোথাও ইতিহাসের আত্মার অবমাননা করেননি। আসলে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর প্রতিভা ও স্বাধীনতা তাঁর ছিল। রমেশচন্দ্র সূক্ষ্মাগ্রবুদ্ধি ঐতিহাসিকের মতো ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রকে সারি দিয়ে সাজিয়েছেন, কিন্তু তার দ্বারা প্রথম শ্রেনীর উপন্যাস লিখতে পারেননি। কল্পনার সে ঐশ্বর্য ও শিল্পীর সে শক্তি তাঁর ছিল না—বঙ্কিমচন্দ্র সে-শক্তিতে ছিলেন রাজাধিরাজ।

রমেশচন্দ্রের দু'খানি সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস 'সমাজ' ও 'সংসার'—উপন্যাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য না হলেও দু' একটি বিশেষ কারণে এর কিছু গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। বিশেষ একপ্রকার আদর্শবাদ ও প্রচার-ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তিনি এই দু'খানি সমাজ ও পরিবার-কেন্দ্রিক উপন্যাস লিখেছিলেন। 'সংসারে' (১৮৮৬) বিধবা-বিবাহ এবং 'সমাজে' (১৮৯৪) অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এই দু'খানি উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও গ্রাম্য পারিবারিক জীবন, বিশেষত রাঢ়ের পল্লীচিত্রগুলি এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে। কিন্তু গার্হস্থ্য ও সমস্যামূলক উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। একটা বিশেষ নীতি-আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্যই তিনি এই পারিবারিক উপন্যাস ফেঁদেছিলেন,

মানবজীবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গভীর সমস্যা নিত্যই প্রবল হয়ে উঠছে, সমাজ ও মানব-মানবীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিতান্তই প্রাথমিক ধরনের ছিল। একমাত্র তাঁর মতের ঔদার্য বাদ দিলে এই উপন্যাস দু'খানিতে সমাজ-সমস্যামূলক বা পারিবারিক সঙ্কট-সম্পর্কীয় কোন গূঢ় গভীর চিত্র ফোটেনি। তিনি সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে খুব প্রগতিশীল ছিলেন, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহ) যৌক্তিকতা স্বীকার করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ সব বিষয়ে অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের আত্মিক সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত হয়েছিলেন, মানবজীবনের দুরধিগম্য গুহাপথে আলো ফেলেছিলেন, পরিশেষে প্রবৃত্তিতাড়িত নরনারীকে শ্রেয়ের পথ দেখিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই দু'খানি উপন্যাসে একটি সহজ সরল কাহিনী থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব দেখা যায় না। তা হলেও সমগ্রভাবে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁকেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরে স্থান দিতে হবে।

৪. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি বিরল প্রতিভার ব্যক্তি; ত'ার যতটা সাধ্য ছিল, ততটা সাধ ছিল না। জীবনে তিনি ছিলেন শিথিল ধরনের ব্যক্তি, অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি থাকলেও তৎপরতার অভাবে সে বিদ্যাকে বৈষয়িক প্রয়োজনে কাজে লাগাননি। সাহিত্যবোধ, আবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্যসৃষ্টি, দার্শনিকতা প্রভৃতি বিচার করলে ত'ার মনের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ রচনাকার স্টিল-অ্যাডিসন, আমাদের দেশের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ সাধর্ম্য দেখা যায়। নিঃস্পৃহতা ও সৌন্দর্যবোধ—এই দুটো হচ্ছে ত'ার মনের স্বাভাবিক ধর্ম। অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের মিল ছিল না। ঋজুকঠিন বঙ্কিমচন্দ্র যেন বিচারকের চরিত্র নিয়ে এসেছিলেন। তীক্ষ্ণ মনন, দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব, প্রবল প্রভাব বিস্তারের অদ্ভুত শক্তি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি একনিষ্ঠ আকর্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র মজলিসী মানুষ ছিলেন; অলস অবজ্ঞায়, শিথিল ধরন-ধারণে, কর্মের প্রতি পরম ঔদাসীন্যে তিনি দিন কাটিয়ে গেছেন। আবার কোন কোন ব্যাপারে তাঁর বালকের মতো কৌতূহল ছিল। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বর্ধমানের রাজবাড়ীর

জাল প্রতাপচাঁদকে ঘিরে একদা খুব মামলা-মোকদ্দমা চলেছিল। সঞ্জীবচন্দ্র আদালতের পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে তথ্যবহ চমৎকার উপন্যাস ('জালপ্রতাপচাঁদ') ফেঁদেছিলেন। তিনি যদি তথ্য সংগ্রহে আর একটু গভীর কৌতূহলী হতেন, তা হলে হয়ত আরও একখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করত। কিন্তু বিধাতা তাঁর কপালে বন্ধনবিমুখ মুক্ত পুরুষের ছাপ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাই প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা নিয়ে জন্মালেও তৎপরতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার অভাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রতিভার অনুরূপ ঐশ্বর্য দান করে যেতে পারেননি।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' (১২৮৭-৮৯) ভ্রমণকাহিনী হিসেবে একখানি অনবদ্য গ্রন্থ, ভ্রমণ-সাহিত্যের বিচিত্র উদাহরণ হিসেবে এর দাবি সর্বাগ্রে গণনীয়। সৌন্দর্য, কবিত্ব, নিসর্গচিত্র, দার্শনিকতা, মননশীলতা প্রভৃতি বিচার করলে 'পালামৌ'-এর সমধর্মী রচনা আর পাওয়া যায় না। 'জালপ্রতাপচাঁদে'র (১৮৮৩) কথা পূর্বেই বলেছি। ঐতিহাসিক তথ্য, পারিবারিক কাহিনী এবং অবিশ্বাস্য ঘটনাকে মিলিয়ে দিয়ে তিনি এই উপন্যাসে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের খসড়া করেছিলেন। উপন্যাসের শেষাংশে জালপ্রতাপচাঁদের সকরুণ বর্ণনা সঞ্জীবচন্দ্রের মনের উপযোগী হয়েছে। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭), 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭), 'মাধবীলতা' (১৮৮৫) উপন্যাসগুলিও একদা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'দামিনী'তে তাঁর কয়েকটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। যাকে ছোটগল্প বলে তখন তার চলন না হলেও এই গল্পগুলি থেকে তার পূর্বাভাস বোঝা যায়। 'মাধবীলতা' উপন্যাসের (১৮৮৫) পরবর্তী কাহিনী 'কণ্ঠমালা'য় অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু কালবিন্যাসের পৌর্বাপর্যে কিছু অসঙ্গতি আছে, লেখক এ সব ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। অথচ চরিত্রাঙ্কনের রীতিতে তিনি কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'কণ্ঠমালা'য় তিনি শৈল-চরিত্রে অত্যন্ত নির্মমভাবে স্বৈরিণীর বর্ণনা করেছেন—যে নির্মমতা তাঁর স্বভাবসঙ্গত নয়। তাঁর মধ্যে লীরিক ধরনের ভাব প্রবল হওয়াতে উপন্যাসের চেয়ে গল্প ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধেই তিনি অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সর্বকর্মে উদাসীনতার জন্য তিনি প্রতিভাকে ততটা ফলপ্রসূ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, তাঁর প্রতিভা ধনী গৃহিণী হলেও গৃহিণীপনার অভাবে রাজার ঐশ্বর্যও কোন কাজে

লাগেনি। সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে প্রতিভা ছিল, যে প্রতিভা অনেকেরই থাকে না; কিন্তু তাকে তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে ততটা সার্থক করতে পারেননি—বাংলা সাহিত্যের এ একটা বড়ো রকমের দুর্ঘটনা।

৫. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য যশোলাভ করে বাঙালীসমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি 'স্বর্ণলতা'র সুপ্রসিদ্ধ লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কিছু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের অসাধারণ ঐশ্বর্যের দ্বারা একমুহূর্তেই বাঙালী পাঠকের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি সমসাময়িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত সমস্যাসঙ্কুল বাস্তব কাহিনী গ্রন্থন করেছিলেন, তাতেও অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের গ্লানির চেয়ে সূক্ষ্মতর রোমান্সের প্রাচুর্য পাওয়া যাবে। কিন্তু তারকনাথ ঐশ্বর্যময় রোমান্স ত্যাগ করে, কখনও তার প্রতি কিছু তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে, উনিশ শতকের শেষভাগের সাধারণ বাঙালীজীবনের তথ্যবহ পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন, যে চিত্রে বর্ণাঢ্য কল্পনার অবকাশ নেই বললেই চলে। তা হলেও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' জনপ্রিয়তায় বঙ্কিমচন্দ্রকেও কিছু কালের জন্য ম্লান করে দিয়েছিল। 'স্বর্ণলতা'র অভিনয়-সংস্করণ 'সরলা' কলকাতা ও গ্রামে শত শত রজনী ধরে অভিনীত হয়েছে। সেযুগের মফঃস্বলবাসীরা শুধু 'সরলা'র অভিনয় দেখবার জন্যই রাজধানীতে আসতেন। সাময়িক পত্রে, লোকমুখে, সমলোচকের লেখনীমুখে এই অজ্ঞাত-পরিচয় লেখক একদিনেই খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেন। তাঁর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কেমন একটি ঔদাসীন্য ছিল। 'স্বর্ণলতা'র আরম্ভাংশে তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অতি-রোমাণ্টিক কল্পনার প্রতি একটু কটাক্ষপাত করেছিলেন। কারণ তিনি প্রতিদিনের বাস্তবজীবনের যথাযথ রূপায়ণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, নিজেও সেই পথ ধরেছিলেন। সেই কারণে, অথবা অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য—যে-কোন কারণেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র তারকনাথের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রে তিনি কত ছোট-বড়ো লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেকালের সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে রহস্যময় তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন। সে যাই হোক, বঙ্কিমের প্রসন্নতা না পেলেও তারকনাথ সমগ্র দেশবাসীর অজস্র সাধুবাদ লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবিত

কালের মধ্যেই অতি অল্প সময়ে 'স্বর্ণলতা'র সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল—যা সে যুগের কোন লেখকের ভাগ্যে ঘটেনি।

'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) তারকনাথের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি আরও অনেকগুলি উপন্যাসধর্মী বাস্তব-কাহিনী রচনা করেন। যথা—'ললিত-সৌদামিনী' (১৮৮২), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯), 'অদৃষ্ট' (১৮৯২), 'বিধিলিপি' (১৮৯১)। 'স্বর্ণলতা' রচনার পর লেখক গ্রন্থের পরিণাম সম্বন্ধে সন্দিহান হলেন, নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনীর বাস্তব বর্ণনা লোকে আদৌ গ্রহণ করবে কিনা এই আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তিনি 'স্বর্ণলতা'র প্রথম সংস্করণে নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন। অবশ্য গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে উঠলেন। 'স্বর্ণলতা' বাদ দিলে তাঁর পরবর্তী কোন উপন্যাস ও গল্পকাহিনী 'স্বর্ণলতা'র তুল্য যশোলাভ করতে পারেনি, সবদিক দিয়ে সেগুলি অতি নিকৃষ্ট। প্রথম উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভার যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বর্ণলতা' না লিখলে অন্য উপন্যাসগুলি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত বলে মনে হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একান্নবর্তী পরিবারের ভ্রাতৃবধূদের স্বার্থপরতা ও কলহের ফলে শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাইয়ের সংসারে কিভাবে ভাঙন ধরল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী প্রমদার নীচতা ও ক্রূরতায় কনিষ্ঠের স্ত্রী সরলা মুখ বুজে কত দুঃখ সহ্য করল, সেই সমস্ত সহজ সরল করুণ রসের কাহিনী লেখক নিপুণ সহানুভূতির দ্বারা এঁকেছেন। জীবনের কোন উৎকট প্রশ্ন নয়, সমাজের কোন মস্তিষ্কজীবী সমস্যা নয়—প্রতিদিনের চোখে-দেখা জীবনই তাঁকে সাহিত্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে কেউ পুরোপুরি ষোল আনা শঠ, কেউ নিরীহ ভালোমানুষ, কেউ সদানন্দময় নিঃস্পৃহ, কেউ শুধু দুঃখ সহ্য করবার জনই সংসারের বোঝা বয়ে চলে, কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিকার করতে পারে না, কেউ-বা মূর্খতা ও ভাঁড়ামির দ্বারা ক্ষণিকের জন্য দুঃখের মেঘের ওপরে হাস্যকৌতুকের ঈষৎ কিরণলেখা ফুটিয়ে তোলে। তারপরে সমাপ্তির দিকে 'poetic justice' বা 'ভরতবাক্যে'র জয়ধ্বনি করে লেখক কাহিনী সমাপ্ত করেন। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের প্রশংসা করে এবং শেষ পর্যন্ত ভালোর গৌরব এবং মন্দের নরকবাসের ফতোয়া দিয়ে ঔপন্যাসিক বিশ্ববিধানের ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে

আনেন। প্রতিদিনের বাঙালী-জীবনের বর্ণরিক্ত ঘটনার এমন নিঃস্পৃহ ও বাস্তবানুগামী চিত্রাঙ্কন বঙ্কিমযুগের কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যেই পাওয়া যায় না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এ ধনে ততটা ধনী ছিলেন না। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় অনুরূপ উপাদান অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাস্তব পরিবেশ ও চরিত্রে ছিল প্রবল আদর্শবাদ ও প্রচ্ছন্ন রোমাণ্টিকতা। বিভূতিভূষণ গীতিরসের দ্বারা বাস্তব ঘটনায় আরেকপ্রকার চিত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবকে বাস্তব রেখে, কল্পনার বিশেষ আশ্রয় না নিয়ে তারকনাথ নতুন বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেছিলেন কিঞ্চিদূন শতবর্ষ আগে। তার জন্য অসাধারণ গৌরব তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল, সে খ্যাতির রেশ এখনও মাঝে মাঝে কানে এসে পৌঁছায়।

ইদানীং কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের উপন্যাসগুলি যতই অসাধারণ মনে হোক না কেন, তারকনাথের উপন্যাস অধিকতর সার্থক ও মূল্যবান। এসম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, উল্টোপাল্টা হাওয়া লাগিয়ে সমালোচনার নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া আজকাল একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। নিন্দা-প্রশংসার পক্ষপাতী দৃষ্টি ত্যাগ করে ভেবে দেখলে তারকনাথের প্রতিভার দোষ-গুণ উভয়ই ধরা পড়বে। দৈনন্দিন জীবনের হুবহু ফটোগ্রাফ অাঁকবার ক্ষমতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু ফটোগ্রাফ তো কৃত্রিম ও যান্ত্রিক ব্যাপার—শিল্পীর তুলির টান না পড়লে এর যান্ত্রিকতা ঘোচে না। তারকনাথের হাতে একটি মাত্র ক্যামেরা ছিল, যাতে বোতাম টিপে টিপে তিনি হুবহু ঘটনার ছবি তুলেছেন। কিন্তু সে ছবিতে শিল্পীর তুলির ছোঁয়া লাগেনি। ঘটনাবিন্যাসে তাঁর উপন্যাসে কোনও প্রকার craftsmanship বা কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না, চরিত্রগুলিও পুরোপুরি পাঁচাপাঁচি ও টাইপ ধরনের। কাহিনীর পরিণতির পিছনে থাকে কয়েকটা দুষ্ট ব্যক্তির ষড়যন্ত্র বা বিধাতাপুরুষের কারসাজি—এ ছাড়া তিনি ঘটনানিয়ামক আর কোন গভীরতর প্রবণতার অস্তিত্ব বুঝতে পারেননি। ব্যক্তিজীবন, পরিবার ও সমাজজীবন সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দুরূহ প্রশ্ন উদিত হয়নি; মানুষের আচরণ, নীতিবোধ ও মনস্তত্ত্বের কোন দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে নেই—মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের। তাই তাঁর উপন্যাসগুলি দৈনন্দিন জীবনের গদ্য-পাঁচালী হয়েছে, প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে দানা বেঁধে ওঠেনি। সুতরাং 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের

উইলে'র সঙ্গে 'স্বর্ণলতা' ও 'বিধিলিপি'র তুলনা চলতে পারে না। তবে তাঁর কৃতিত্বটুকু তুচ্ছ করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিমগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কথাকারেরা যখন বাস্তবজীবনকে অনাবশ্যক রোমান্সের প্রাচুর্যে ঢেকে ফেলেছিলেন, তখন তারকনাথ আমাদের দৃষ্টি রোমান্সের স্বর্গলোক থেকে প্রতিদিনের ধূলিম্লান কাহিনীর মধ্যে টেনে নামিয়ে আনেন—এ গৌরব তিনি নিশ্চয় দাবি করতে পারেন।

৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর অপ্রধান ঔপন্যাসিক

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস সাধারণ পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বস্তু বলে মনে হয়েছিল। এই শতাব্দীর বাংলা কাব্য যতই অদ্ভুত হোক না কেন, তবু এ সাধারণ পাঠকের কাছে নতুন মনে হয়নি, কারণ বাংলা সাহিত্য প্রাচীন যুগ থেকে ছন্দের তরণী আশ্রয় করে বয়ে আসছিল। কিন্তু গদ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি একেবারে নতুন এবং অপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিচিত্র প্রতিভার সাহায্যে উপন্যাসের নানা শাখাপথ খুলে দিলেন, তখন লেখক ও পাঠক কেউই এর আকর্ষণ দমন করতে পারলেন না। যিনি দু'চার কলম লিখতে পারতেন, তিনি ছোট-বড়ো উপন্যাস, 'রমন্যাস', 'নবেল', 'নবেলেট' প্রভৃতি লিখতে আরম্ভ করলেন। অধিকাংশ লেখক নিলেন ইতিহাসের সত্য, অর্ধসত্য ও অতিরঞ্জিত ঘটনা। কেউ নিলেন দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গল্প; কেউ-বা ইংরেজী আখ্যান, ফার্সী কিস্সা ও সংস্কৃত গদ্য রোমান্সের অনুকরণে বাংলা কাহিনী ফাঁদলেন। এঁদের অনেকেরই কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল না, তাই এঁদের নামধাম আজ বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে যে দু'চারজনের যৎকিঞ্চিৎ রচনাশক্তি ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা এখনও পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে বেঁচে আছেন; আর যাঁরা ততটা ভাগ্যবান নন, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নামটা কোনও প্রকারে টিকে অছে। এখানে স্বল্পপ্রতিভাধর কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করব। এঁরা হলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' (১ম খণ্ড—১৮৬৯, ২য় খণ্ড—১৮৮৪) নাম দিয়ে প্রতাপাদিত্যের কাহিনীকে বিশাল পরিসরে অঙ্কন করেন। বোধ

কাঁর এ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় আকারের উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব তাঁর বেশ অধিগত হয়েছিল। তিনি ইতিহাস থেকে সেই বাঙালী বীর-রাজাকে বেছে নিলেন যিনি মুঘলের বিরুদ্ধে লড়ে অপমান স্বীকার করতে বাধ্য হন, তারপর লাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর সদ্য-জাগ্রত স্বাদেশিক মনোভাবের বশে লেখক বীর প্রতাপাদিত্যকে দেশপ্রেমের বিরাট অলৌকিকতার মধ্যে স্থাপন করে বিশাল উপন্যাস ফেঁদেছিলেন।* এর কাহিনী ও পরিসর এত দীর্ঘ যে, পূর্বতন ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার সম্পর্ক ধরা যায় না। বঙ্কিমযুগে জন্মে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আওতার বাইরে গিয়ে নতুনভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিস্ময়কর বিশাল আকার সত্ত্বেও লেখক সুখপাঠ্য উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারেননি। ইতিহাসকে তিনি সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার মতো দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল না। এর কাহিনী নিদ্রাকর্ষক, ক্রমবিন্যাস ক্লান্তিকর, চরিত্রগুলি কোন দিক দিয়েই চিত্তস্পর্শী নয়। তা সত্ত্বেও কোন কোন সমালোচক এর বিরাট বপু দেখে পরম পুলকিত হয়ে পড়েন, এর বিশাল আকারের সঙ্গে ইংরেজী chronicle novel-এর সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন, কেউ তাঁকে স্কটের সঙ্গে তুলনা দেন। এ সব যুক্তিহীন ভক্তির কথা ছেড়ে দিলে, 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'কে বিশেষ কোন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের রচনা বলে মনে হবে না। তবে লেখক গুরুতর ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও ছোট ছোট হালকা ধরনের ছবিগুলি ভালোই এঁকেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) দু'-চারখানি উপন্যাস লিখে সে যুগের মধ্যমশিক্ষিতসমাজে কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 'কমলকুমারী', 'বিমলা', 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি শুধু কাহিনীসর্বস্ব, এবং সে কাহিনীও অতি শিথিল ধরনের। চরিত্র পরিকল্পনার কোন প্রাথমিক ধারণাই তাঁর ছিল না। তিনি আর একটি দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

---

* প্রতাপচন্দ্র এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে প্রতাপাদিত্যকে অতিশয় কুৎসিত বর্ণে এঁকেছিলেন। তাঁর ধারণা, মানসিংহই বাংলাদেশকে প্রতাপের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করেন। অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে, বোধহয় পাঠক ও বন্ধুদের উপদেশে প্রতাপের চরিত্রে মাহাত্ম্য আরোপ করেন। এখানে বলা যেতে পারে, 'বউঠাকুরাণীর হাটে' রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বোধহয় আত্মীয়তার দাবিতেই তিনি বেহাই বঙ্কিমচন্দ্রের দু'খানি উপন্যাসের ('কপাল-কুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী') অন্ত্যপর্ব থেকে আবার নতুন করে কাহিনীর জের টেনে লেখেন 'মৃন্ময়ী' ও 'নবাবনন্দিনী'। এতেই তাঁর সাহিত্যবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর 'ঘটে' কিঞ্চিৎ পরিমাণে যুক্তিবুদ্ধি থাকলে 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনীর' "উতোর" দিতে অতি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস লিখতেন না। সব সমাজেই কিছু কিছু 'বুড়ো-খোকা' থাকে, যারা বয়স হলেও ছেলেবেলার রূপকথার নেশা ছাড়তে পারে না। দামোদরের উপন্যাস তাদেরই উপযুক্ত।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮-১৯১৯) বাংলার সমাজ, সভ্যতা, ঐতিহ্যে একটি স্মরণীয় ব্যক্তি। বাংলাদেশের হেন প্রগতিশীল আন্দোলন নেই যার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্তরের যোগ ছিল না; অনেক সৎকর্মের সঙ্গে তিনি নিজেই জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই আদর্শ মানুষটি বাংলা সাহিত্য ও সমাজে একদা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ইংরেজীতে লেখা 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ সমাজ-ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলি এখনও সুপ্রচলিত আছে। শাস্ত্রী মহাশয় সব সময়ে নানা গুরুতর কর্মে ব্যস্ত থাকতেন, নানাপ্রকার চিন্তাপ্রধান রচনাকার্যে ডুবে থাকতেন। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে আবার রসসাহিত্যেরও চর্চা করেছেন।

তাঁর লেখা কয়েকখানি কাব্য এবং উপন্যাস একদা পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নিমাইসন্ন্যাস বিষয়ক "আজি শচীমাতা কেন চমকিলে, ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে" কবিতাটি একদা স্কুলের ছাত্রদের কণ্ঠাগ্রে বিরাজ করত। 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮), 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫), 'হিমাদ্রি-কুসুম' (১৮৮৭), 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮), 'ছায়াময়ী-পরিণয়' (১৮৮৯) প্রভৃতি আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যের সঙ্গে এযুগের শিক্ষিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তিনখানি পারিবারিক উপন্যাসও লিখেছিলেন—'মেজবৌ' (১৮৭৯), 'নয়নতারা' (১৮৮৯) ও 'যুগান্তর' (১৮৯৫)।* এতে তিনি নারীর জীবনাদর্শ ও চরিত্র বিষয়ে বেশ সুন্দর ঘরোয়া কাহিনী লিখেছিলেন। উপন্যাসগুলি অবশ্য নিতান্তই tale হয়ে গেছে, fiction হতে পারেনি। কিন্তু নারীজীবনকে স্বতন্ত্র মহিমায়

* তাঁর শেষ উপন্যাস 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬)-র দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কয়েকটি স্বরচিত অধ্যায় যোগ করে তাঁর পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য 'উমাকান্ত' (১৯২২) নামে প্রকাশ করেন।

প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা তাঁর উপন্যাসেই দেখা যায়। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র নারীজীবনকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন তারই আভাস মিলবে শিবনাথের উপন্যাসগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার বিদুষী সমাজে, পুরুষ সমাজেও—বিদ্যা, শিল্পজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতিভার ছায়ায় পড়ার জন্য তাঁর কৃতিত্বের অনুরূপ খ্যাতি হয়নি। তাঁর মতো প্রতিভাময়ী বিদুষী ও নানাগুণে গুণবতী মহিলা বিংশ শতাব্দীতেও বেশী নেই। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রহসন, গান—সাহিত্যের এমন বিভাগ নেই যেখানে তিনি অবলীলাক্রমে পদচারণা করেননি। তাঁর কয়েকখানি উপন্যাস ('দীপনির্বাণ'—১৮৭৬ ; 'মালতী'—১৮৮০ ; 'কাহাকে'—১৮৯৮ , 'স্নেহলতা'—১৮৯২) একদা পাঠক-পাঠিকা সমাজে খুব প্রচারলাভ করেছিল। কাহিনী গ্রন্থনে ও চরিত্র সৃষ্টিতে সেকালের পুরুষ ঔপন্যাসিকদের কারও চেয়ে তিনি দুর্বল নন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একট কথা বলা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারীর রচনায় প্রায়শই একটা পুরুষালি ভাব চোখে পড়ে, যার ফলে তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে নারী-লেখিকার স্নিগ্ধ স্পর্শ বড়ো একটা পাওয়া যায় না। উপরন্তু কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে অনেক সময় মনে হয়, তারা যেন বড় বেশী কৃত্রিম ও সাজানো-গোছানো। এ ত্রুটি তাঁর একার নয়। ঠাকুরবাড়ীর অভিজাত পরিবারের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী-সমাজের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। তাই এঁদের লেখা গল্প-উপন্যাসের বাচনরীতি, কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রগুলিকে ঠিক যেন প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে মেলাতে পারা যায় না। তা সে যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের কেন্দ্রস্থলে যে স্বর্ণকুমারী বিরাজ করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার আমরা এই শতাব্দীতে লেখা কয়েকখানি তির্যকভঙ্গীর উপন্যাসের কথা বলব। এই যুগে সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার জন্য কয়েকজন লেখক স্বনামে ও ছদ্মনামে কয়েকখানি প্রহসনধর্মী ও ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই যুগে সামাজিক আদর্শ, ব্যক্তিগত আচরণ ও জীবননীতি নিয়ে নানা জনের মনে নানা ধরনের সঙ্কট ঘনিয়েছিল। ইংরেজীওয়ালা নবযুবক, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নব্যদল, বিশেষত ব্রাহ্মিকারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের

শিক্ষিত নারী)—রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। এই সময় নীতি ও মতের গরমিলের ফলে ব্রাহ্মসমাজ যখন ভেঙে তিনখণ্ড হয়ে যায় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে নব্যহিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হচ্ছিল। তখন হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে তথাকথিত অহিন্দু আচারে অভ্যস্ত স্ত্রী-পুরুষকে ব্যঙ্গ করার জন্য কয়েকজন রক্ষণশীল লেখক লেখনী শানিয়ে অগ্রসর হলেন। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রের কর্ণধার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) সমাজসংস্কার ও সম্প্রদায়-বিশেষের অনাচার দমন করবার অভিপ্রায়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কয়েকখানি উপন্যাস ধরনের কাহিনী লেখেন। আরও অনেকে এ জাতীয় পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সাধু ছিল, কিন্তু রচনাশক্তি ছিল না। অপরকে উপহাস করতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই হাস্যাস্পদ হয়ে পড়েছিলেন। এখানে সে-সমস্ত ব্যর্থ রচনার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সেযুগে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) বলিষ্ঠ হস্তে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুক ব্যবহার করেছিলেন, সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে স্নেহ করতেন। ১৮৭৪ সালে তাঁর ব্যঙ্গ-উপন্যাস 'কল্পতরু' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে 'পঞ্চানন্দ' শিরোনামায় এবং 'পাঁচুঠাকুর' এই ছদ্মনামে তিনি অনেক রঙ্গব্যঙ্গ-সংক্রান্ত চুটকি রচনা লিখেছিলেন। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই চুটকি মন্তব্য ও নিবন্ধগুলি পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গের রসান চড়িয়ে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ মন্তব্য সাজিয়েছিলেন। 'কল্পতরু'তে আক্রমণের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত স্ত্রী-পুরুষ। তাঁদের কোন কোন আচরণ ও আদব-কায়দা ইন্দ্রনাথের চক্ষুশূল হয়েছিল, সুতরাং মনের সাধ মিটিয়ে তিনি সেই সমস্ত কল্পিত নরনারীকে গাল দিয়েছেন। তরল কৌতুকরস সৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ঝোঁকে তিনি এই দুর্লভ শক্তি বিসর্জন দিয়ে সমাজসংস্কার, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন—এই সমস্ত মহত্তর উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে অতি তীব্র অভব্য ভাষায় প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করতে গেছেন। তাঁর 'পাঁচুঠাকুরের' অন্তরালে কমলাকান্তের প্রভাব আছে, কিন্তু আফিংখোর কমলাকান্তের ঔদার্য, হাস্যরস, নিঃস্পৃহতা, দার্শনিকতা—এসব পাঁচুঠাকুরের ছিল না। তা হলেও মুষ্টিমেয় ব্যঙ্গলেখকদের মধ্যে তাঁকে খুব শক্তিশালী বলতে হবে।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) প্রধানত সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই ব্যঙ্গ-রচনার আসরে অবতীর্ণ হন। যে মনোভাবের বশে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্র প্রকাশ করেছিলেন, বঙ্গবাসী মুদ্রাযন্ত্র থেকে সুলভ মূল্যে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের ভার নিয়েছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যঙ্গ-উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। উগ্র ইংরেজীয়ানার নকল-নবিশগণ এবং হিন্দু-ধর্মের দূষক ব্রাহ্মসমাজের নেতারা হলেন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। বিশেষ করে আচার-আচরণে কিছু কৃত্রিম ব্রাহ্ম স্ত্রী-পুরুষকে তিনি কঠোরভাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তাঁর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-১৮৮৮), 'চিনিবাসচরিতামৃত' (১৮৮৬), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০) এবং 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (১৯০২ সালে সমগ্রভাবে প্রকাশিত) এক সময়ে হিন্দুসমাজকে আনন্দ দিয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছিল। মতামতে অতিশয় উগ্র, রক্ষণশীল মতে বিশ্বাসী, বদ্‌জোবানে অকুতোভয় যোগেন্দ্রচন্দ্রকে সেযুগের অনেকেই বেশ সমীহ করে, তাঁর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করতেন। তাঁর অধিকাংশ রচনায় অতি উগ্র, অমার্জিত স্থূল ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকত, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ব্যতীত তাতে আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে 'মডেল ভগিনী' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'তে ঐ একই প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকলেও ওতে ধারাবাহিক কাহিনী ও চরিত্র আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের ঝাঁজে অনেক সময়ই উপন্যাস-লক্ষণ বড়ো একটা ফুটে ওঠেনি। আর তা ছাড়া 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র মতো বিপুলায়তন, শিথিলগঠন এবং রক্ষণশীল ধরনের উপন্যাস আজকালকার দিনে পড়ে ওঠাই দুষ্কর। তবু সেযুগের অনেকেই তাঁকে ভয় করতেন—ব্যঙ্গবিদ্রূপের নির্জলা আক্রমণে কে না ভয় পায়?

'কঙ্কাবতী'র (১৮৯২) লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯১৯) এক বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তি এবং বিচিত্রতর স্বাদের লেখক। নানা দুঃখকষ্ট-দারিদ্র্য-দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্য-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে, দুঃখের পাঠশালায় তিনি জীবনসম্বন্ধে নিদারুণ শিক্ষা লাভ করেন। অথচ জীবনসম্বন্ধে প্রসন্নকৌতুকবোধ সর্বদা রক্ষা করেছেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের পুনরুত্থানের তিনি ছিলেন প্রধান প্রচারক ও গবেষক। উচ্চ সরকারী কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি শিল্পের ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য সমগ্র য়ুরোপ পরিভ্রমণ করেন। কৃষিকার্য ও কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তাঁর অনেক ইংরেজী ও বাংলা রচনা

এখনও প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাংলা রসসাহিত্যে ত'ার যে বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, তার জন্য তিনি দীর্ঘকাল বাঙালীর স্মরণে বিরাজ করবেন।

যাকে উদ্ভট রস (grotesque) বলে, গম্ভীর প্রকৃতির বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে তার বিশেষ অভাব আছে। ত্রৈলোক্যনাথ রস, পরিহাস, কৌতুকের সঙ্গে উদ্ভট ও অদ্ভুত ব্যাপারের সংমিশ্রণ করে যে গল্পকাহিনী ও রূপকথা লেখেন (কঙ্কাবতী—১৮৯২; ভূত ও মানুষ—১৮৯৬; ফোক্‌লা দিগম্বর—১৯০১; ডমরুচরিত—১৯২৩ প্রভৃতি), তার বিচিত্র স্বাদ রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সৃষ্টি প্রায় প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টির মতো অননুকরণীয়। রোমান্স, কৌতুক, অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপারকে একত্রে মিশ্রিত করে নতূন স্বাদের রাসসাহিত্যের আদি স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ 'পরশুরামে'র আদর্শস্থল। একদা তিনি পাঠকের কাছে বিস্মৃত হয়েছিলেন। এখন আবার হাওয়া ফিরছে, তাঁর রচনাগুলি একালের পাঠকেরও প্রীতি ও কৌতূহল আকর্ষণ করছে।

উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, এই শতাব্দীর শেষের দিকে ইতিহাস, অর্ধ-ইতিহাস, রোমান্স, পারিবারিক ঘটনা এবং রঙ্গব্যঙ্গ নিয়ে বেশ কিছু কথাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তবে এসমস্ত রচনার অনেকটাই কালের কুক্ষিগত হয়েছে। যা ছিল সমসাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার, আজ তা হারিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকে কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেননি, এ'দের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃতই ঔপন্যাসিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন, নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন, কেউ-বা সাময়িক উত্তেজনার হাওয়ায় খবরের কাগজের পাল তুলে দিয়েছিলেন। এখন ত'াদের অনেকেরই নাম-পরিচয় হারিয়ে গেছে, কিন্তু এক কালের বাঙালীসমাজে তাঁরা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সে যাই হেকে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হচ্ছে উপন্যাস—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর মধ্যে এক যুগের বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি, নীতি, আদর্শ—সবই প্রচ্ছন্নাবস্থায় রয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের ইতিহাসই বাঙালী-সংস্কৃতির ইতিহাস।

দ্বিতীয় উপচ্ছেদ ঃ প্রবন্ধসাহিত্যে মননশীলতার স্বরূপ

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাস বাঙালীর সমাজ, পরিবার ও নীতিবাদকে কতটা আকর্ষণ করেছিল, প্রভাবিত

করেছিল। গদ্যভাষাকে এভাবে রসসাহিত্যে প্রয়োগ করার রীতি মধ্যযুগের বাঙালী লেখকেরা জানতেন না। আধুনিক কালের উপন্যাস-সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে নিশ্চয় বিস্মিত করেছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর একটি সাহিত্য-সংক্রান্ত বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তা হল গদ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ—যা রসসাহিত্য নয়, উপন্যাসের গল্পরস যাতে পাওয়া যাবে না। এ হল "মস্তিষ্ক-কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি"—যে চিন্তাকীটের একমাত্র ভোজ্য হল প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এখানে সংক্ষেপে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্বন্ধে দুচার কথা বলা যাক।

১. প্রবন্ধ ও রচনাসাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা ও মননশীলতার আঘাতে মধ্যযুগীয় বাঙালী, বিশেষত নাগরিক বাঙালী যেন জন্মান্তরের অকূল-অতল বারিধির তটে নিক্ষিপ্ত হল। আধুনিক জীবনের নব নব জিজ্ঞাসা, চিন্তা, সমাজকথা, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনাদর্শ—সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন-না-কোন দিক দিয়ে অভিভূত করল। এর ফল হল—প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রয়োগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তরল সামাজিক অবস্থার সাময়িক প্রতিফলন হয়েছে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকার পত্র-মর্মরের মধ্যে—সমাজ, রীতিনীতি ও ধর্মান্দোলন-সম্পর্কিত দু'চারটি নিবন্ধে। কিন্তু চিন্তাশীল প্রবন্ধসাহিত্য, যা যুগপৎ চিন্তাকে তীক্ষ্ণ করে, নবজাগ্রত জাতিকে সাবালকত্ব দেয়, তার যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রবলভাবে আরম্ভ হয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত এবং য়ুরোপের গ্রীক-রোমান ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা বহু পুরাতন যুগ থেকেই চলে আসছে। মধ্যযুগের য়ুরোপে লাতিন ভাষাতেও ধর্মসংক্রান্ত বহু আলোচনা স্থান পেয়েছিল। রেনেসাঁসের সময়ে যখন দেশভাষার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার কিছু পরে য়ুরোপে ছাপাখানার কাজ শুরু হল, তখন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ও বিবাদ-বিতর্ক দেশীয় ভাষাতেই প্রচারিত হয়েছিল। এইভাবে য়ুরোপে বিশেষ বিশেষ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চিন্তাগ্রাহ্য প্রবন্ধ রচিত হতে আরম্ভ করে। আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা মধ্যযুগে ন্যায়শাস্ত্র ও ষড়দর্শন আলোচনায় সংস্কৃত

গদ্যই ব্যবহার করতেন, কিন্তু সে যুগে একমাত্র চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজ ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যকর্মে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হত না। চিন্তামূলক তত্ত্বপ্রধান গদ্যাত্মক রচনাও (যেমন—কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত') পয়ার-ত্রিপদীতেই নির্বাহ হত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও মনোভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হলে গদ্যভাষা চিন্তামূলক গুরুতর ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে লাগল—এইভাবে গদ্যপ্রবন্ধের উৎপত্তি হল।

এই প্রসঙ্গে আমরা চিন্তামূলক গদ্যরচনার দুটি শ্রেণীর কথা সংক্ষেপে বিবৃত করতে পারি। মানুষের নানা বিষয়ক চিন্তা গদ্যভাষাকে আশ্রয় করে এবং যৌক্তিকতার ওপর নির্ভর করে প্রবন্ধের আকার লাভ করে। এই জাতীয় গদ্য-রচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটিকে বলে প্রবন্ধসাহিত্য, আর একটিকে অন্য নামের অভাবে, রচনাসাহিত্য বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এ বিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য প্রাবন্ধিকদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

প্রবন্ধসাহিত্যকে কেউ বলেন নিবন্ধ, সন্দর্ভ বা বস্তুপ্রধান প্রবন্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস, সমাজ-রাজনীতি, সাহিত্য-শিল্পকলা-প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে যে সমস্ত তত্ত্বকেন্দ্রিক ও বস্তুগত চিন্তামূলক গদ্যনিবন্ধ রচিত হয় তাকে বলা যেতে পারে প্রবন্ধসাহিত্য। একে প্রবন্ধ-নিবন্ধ বলার কারণ—এর প্রধান বৈশিষ্ট্য যুক্তির বন্ধন। যুক্তির সাহায্যে লেখক যখন কোন চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্ব-কথাকে উপস্থাপন, প্রমাণ, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিবাদ করেন তখন তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে। এখানে বস্তুর গুরুত্বই সর্বাধিক, লেখকের কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা-ভালোলাগা-মন্দলাগা—এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার প্রবন্ধে কোন প্রভাগ বিস্তার করতে পারে না। আণবিক বোমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক-প্রাবন্ধিক যদি সহসা নিজের ব্যক্তিগত আর্তি প্রকাশ করে ফেলেন, তাহলে তা হবে হাস্যকর। প্রবন্ধে বিষয়ী থাকবেন অন্তরালে নিঃস্পৃহ হয়ে, বিষয়টি আসবে সামনে। যুক্তি, পারম্পর্য, বৈজ্ঞানিকতা, নিঃস্পৃহতা—এই সমস্ত হচ্ছে প্রাবন্ধিকের বড়ো গুণ। কিন্তু আর একপ্রকার গদ্যনিবন্ধ আছে, যাকে প্রবন্ধ না বলে 'রচনাসাহিত্য' বলা যেতে পারে।

রচনাসাহিত্য, যাকে ইংরেজীতে বলে *Essay Literature*, এর জনক হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মিচেল মঁতেঁই (১৫৩৩-৯২)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি *Essais* নাম দিয়ে কতকগুলি গদ্যনিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ফরাসী ভাষায় *essai* শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। ম'তেঁই একটা নতুন চেষ্টা করেছিলেন বলে উক্ত গদ্যনিবন্ধের নাম দিয়েছিলেন *Essais*, পরে বেকন ইংরেজী সাহিত্যে এই আদর্শ অনুসরণ করেন। তারপর অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে অ্যাডিসন, স্টিল, হ্যাজেলিট, স্টিভেনসন, গোল্ডস্মিথ, ল্যাম্ব্ রচনাসাহিত্যের চূড়ান্ত ক্রমবিকাশ দেখিয়ে গেছেন। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে দু' একজনের লেখায় রচনাসাহিত্যের দুর্লভ গুণ ফুটে উঠলেও রবীন্দ্রনাথই রচনাসাহিত্যের বিচিত্র ঐশ্বর্য সৃষ্টি করলেন। তাঁর পরে আরও কয়েকজন গদ্যশিল্পী এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নিবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তবে আজকাল 'রম্যরচনা' নামে একপ্রকার জলো রচনাকে সাহিত্যের বাজারে রচনাসাহিত্য বলে চালানো হচ্ছে—এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্ষম লেখকের দুর্বল মস্তিষ্ক ও উদ্ভট কল্পনাজাত খোশখেয়াল মাত্র। আজকাল যে কিছুই লিখতে পারে না, সে রম্যরচনায় হাত পাকাবার চেষ্টা করে।

রচনাসাহিত্য গদ্যে লেখা এবং তা কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; আবার তথ্যবহুল তত্ত্বগম্ভীর আলোচনার কচকচিও নয়। গদ্যনিবন্ধ যখন রসসৃষ্টি করতে পারে, যখন তাতে বস্তুভারের চেয়ে সূক্ষ্ম রসের ব্যঞ্জনা থাকে বেশি, যখন সেটি রচনাকারের ব্যক্তিসত্তারই প্রতিফলনরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাকে রচনাসাহিত্যে বলা যেতে পারে। যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করে লেখক যখন নিজের মনের কথা বলেন, তখন তা রচনাসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যে-কোন শিথিল-ধরনের মনের কথাই রচনাসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। গীতিকবিতার আত্মগতভাবে, নাটকের চমৎকারিত্ব, কাহিনীর সরসতা, রোমাণ্টিক সৌন্দর্য, নিঃস্পৃহ দার্শনিকতা, সরস কৌতুকপ্রবণতা—জগৎ, জীবন, পরিবেশ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে উদার সহনশীল ভাব—এসব গুণ না থাকলে সার্থক রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রযত্ন থাকলে ভালো প্রাবন্ধিক হওয়া যায়, কিন্তু রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্পীমন, সরস ভাব এবং সুগভীর প্রত্যয় চাই। রচনাসাহিত্যকে কখনও কখনও মনে হবে, যেন গদ্যে লেখা গীতিকবিতা, কখনও মনে হবে, যেন একটি ছোটগল্প, কখনও মনে হবে, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ। আসল কথা, রচনাকারের ব্যক্তিগত কথা যখন পাঠকের মনে গিয়ে অনুরূপ ব্যক্তিগত ভাব সৃষ্টি করতে পারবে তখন তা সার্থক রচনাসাহিত্যে পরিণত হবে। এর শিল্পপ্রকরণ অতি দুরূহ, শ্রেষ্ঠ গীতিকবি অসংখ্য আছেন বটে, কিন্তু, শ্রেষ্ঠ

রচনাসাহিত্যের সংখ্যা করাঙ্গুলিগণনীয়। অবশ্য এতে যুক্তি-তর্ক, সিদ্ধান্ত, প্রমাণ এবং বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই বলে অনেকে যে-কোন বিষয় অবলম্বনে এলোমেলোভাবে মনের কথা বলতে চেষ্টা করেন। এঁদের শক্তির অভাব হাস্যকরভাবে রচনার মধ্যে ধরা পড়ে যায়। সে যাই হোক, রচনাসাহিত্য দুর্লভ বলে বাংলা সাহিত্যে এর সার্থক উদাহরণ খুব বেশী নেই। এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকজন প্রাবন্ধিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

সব্যসাচীর মতো বঙ্কিমচন্দ্র রসসাহিত্য ও চিন্তাশীল প্রবন্ধসাহিত্যে একই প্রকার গৌরবলাভ করেছেন, উপন্যাসের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাগত গুরুত্ব বেশী। উপন্যাসে লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা শুধু ঔপন্যাসিক বলেই জানি না। স্কটের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ তাঁকে 'বাংলার স্কট' বলে অভিহিত করেন। এ তুলনা ঠিক নয়। কারণ স্কট শুধু ইতিহাসাশ্রিত রোমাণ্টিক উপন্যাসের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও প্রভাব শুধু উপন্যাসের মধ্যেই সঙ্কুচিত হয়ে নেই। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নব্য বাংলা ও বাঙালীর চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, সমাজ, ধর্ম, মনন—সমস্ত কিছুকে নিজের কক্ষপথে টেনে এনেছিলেন। তার জন্য তিনি প্রবন্ধকে বেছে নিয়েছিলেন। নানা প্রবন্ধের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে বাংলাদেশের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী-সমাজের প্রধান নিয়ামক শক্তি বলে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বাঙালীর জীবনে গভীরভাবে নিজ মন ও মনন এবং ব্যক্তিত্বের ছাপ মুদ্রিত করে দিতে পারেননি। সর্বোপরি তিনি নিজে শুধু প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালীর চিত্তবিকাশে সাহায্য করেননি, তাঁর চারিদিকে একদল বুদ্ধিমান শিষ্য তৈরী করে তাঁদের সাহায্যেও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করেছিলেন।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকরে' কৃত্রিম ভষায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার রচনাভঙ্গিমা হাস্যকর, বিষবস্তুও উল্লেখের অযোগ্য। বস্তুত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে তিনি বাংলা প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। অবশ্য এই সময়ে তিনি *The Calcutta Review* পত্রিকায়

Bengali Literature (1871) নামে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে হেস্টি সাহেবের সঙ্গে লিপিদ্বন্দ্বে তিনি ("রামচন্দ্র" ছদ্মনামে) ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্য ও বিতর্কে রামমোহনের মতোই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক হয়ে তিনি নানা ধরনের প্রবন্ধ রচনার তাগিদ উপলব্ধি করলেন। এর পরেও তিনি তাঁর ভক্তদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রচারিত 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সাধারণী'তে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও নীতিঘটিত অনেক প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে যৌবনের দার্ঢ্য দান করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা অল্প নয় —'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ—১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৯৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য়—১৮৯২), 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ('প্রচারে' ১২৯২ ও ১২৯৫ সালে মুদ্রিত)। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রবন্ধেও বঙ্কিমপ্রতিভা কত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ—এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর যুক্তি-আশ্রয়ী সিদ্ধান্ত, মননশীলতার পরিচয় এবং সাহিত্যগুণ পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে। নানা তত্ত্বকথা ও তথ্যকে তিনি প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন আলোচনাই নীরস তথ্যবিবৃতি মাত্র হয়নি। কোন কোন গ্রন্থে হাল্‌কা-চালে আখ্যানের ঢঙে তিনি গুরুতর কথা আলোচনা করেছেন। যেমন—'লোকরহস্য'। এতে সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রনীতির অসঙ্গতি কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে চমৎকার ফোটানো হয়েছে। ফলে গুরুতর তত্ত্বকথাও সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের কথাও যে কত পরিচ্ছন্ন ও সাহিত্যগুণান্বিত হতে পারে তা তাঁর 'বিজ্ঞান-রহস্য' না পড়লে বোঝা যাবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কমলাকান্ত' সম্পর্কে দু' এক কথা বলা সমীচীন।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে এক কাল্পনিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দধিদুগ্ধে প্রতিপালিত হয়ে এবং নসীরামবাবুর দেওয়া আফিং বটিকা উদরস্থ করে মাঝে মাঝে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করতেন এবং তারই ঝোঁকে অদ্ভুত কথা বলতেন। ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইন্‌সির (১৭৮৫—১৮৫৯) *Confessions of an English Opium Eater*-এর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর'

রচনা করেন। অবশ্য দু'জনের মধ্যে মন ও মেজাজের দিক দিয়ে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। ডি-কুইন্‌সি ব্যাক্তিগত জীবনে অসুখ সারাবার জন্য আফিং ধরেন এবং ভয়ানকভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তারপর যখন দেখলেন এত বেশী নেশাগ্রস্ত হলে মৃত্যুও হতে পারে, তখন তিনি নেশার হাত থেকে মুক্তি পান। কমলাকান্তের ধরনধারণ একরকমের নয়। তিনি নেশা করলেও জগৎ ও সংসার সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত, সকলের প্রতিই ত'ার একটা নিঃস্পৃহ ঔদার্যের দৃষ্টি আছে। মানুষ ও সমাজের নানাপ্রকার অন্যায়, ত্রুটি ও অসঙ্গতিকে তিনি উদার হাস্যের দ্বারা সহ্য করেন। কখনও তিনি নেশার ঝোঁকে বিড়ালের ডাকের মধ্যে আধুনিক সাম্যবাদের যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক শুনতে পান, কখনও সাহিত্যের বড়বাজারে গিয়ে মানুষের ক্রয়বিক্রয়ের হাস্যকর অসঙ্গতি দেখে নিজেও হেসে ওঠেন, কখনও স্বদেশপ্রাণ কমলাকান্ত দেশকে 'মা' বলে ডাকতে শেখান। এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র জাতির কল্যাণের জন্য কমলাকান্তের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র দেশবাসীকে তিনি এমন সমস্ত কথা শোনাতে চেয়েছিলেন যা ছদ্মবেশ না নিয়ে বলা যায় না। তাই কমলাকান্তকে বঙ্কিমের প্রচ্ছন্ন সত্তা বলেই গ্রহণ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'দপ্তরে' দেশ ও দশের নানা ব্যাপার নিয়ে নিঃস্পৃহভাবে অনেক মন্তব্য করেছেন, কিন্তু জনারণ্যের মাঝখানে তিনি নিজেকে মাঝে মাঝে বড়ো নিঃসঙ্গ মনে করতেন। কমলাকান্ত বলেছেন, "কেহ একা থাকিও না।" এ যেন নিঃসঙ্গ বঙ্কিমের অন্তঃপুরের চকিত আভাস—যেখানে তিনি ডেপুটি নন, দেশবরেণ্য ব্যক্তি নন, সাহিত্যিক নন, সম্পাদক নন,—যেখানে তিনি আপন একাকিত্বের দুঃসহ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে মানুষের সঙ্গ কামনা করেছেন। এইজন্য এ গ্রন্থের রচনারীতি বিচিত্র, কমলাকান্ত চরিত্র বিচিত্র, এর রসের আবেদনও বিচিত্র। ডি-কুইন্‌সির সঙ্গে তাঁর রচনার বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিতান্তই অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন। কারণ এতেই তিনি ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজের মনের কথা খোলাখুলি বলতে পেরেছেন।

এর রচনারীতিটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কমলাকান্ত ত'ার পারিপার্শ্বিকতার চিত্র এ'কেছেন, তাঁর মনের ছায়াপটে আলো-আঁধারের নানা ছায়াবাজি ফুটে উঠেছে। এতে গল্পরস আছে, গীতিকবিতার সুরমূর্ছনা আছে, নাটকীয়তা আছে, রচনাসাহিত্যের ব্যক্তিগত লক্ষণও আছে।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে মিলিত হয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে একটা অভূতপূর্ব স্বাদু মাধুর্য দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রপ্রবন্ধে' ব্যক্তিগত দিক থেকে নানা কথা শুনিয়েছেন, তার গীতিমূর্ছ'না ও দার্শনিকতা বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য বটে; কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্ত'রে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লক্ষণ থাকলেও এটি ঠিক বিশুদ্ধ রচনাসাহিত্য নয়, এর সঙ্গে সাহিত্যের আরও নানা প্রকরণের যোগ আছে। তাই দেখা যায় এখনও 'কমলাকান্তে'র ঢঙে লেখা নিবন্ধ বাংলা সাহিত্যে অতি জনপ্রিয়। আধুনিক কালের প্রসিদ্ধ লেখকরাও কমলাকান্তকে পুনরুজ্জীবিত করে তার আড়ালে বসে সমসাময়িক বাংলাদেশের নানা রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন—এতেই বোঝা যাচ্ছে বৃদ্ধ কমলাকান্তের নেশাগ্রস্ত মন্তব্য এখনও পাঠকসমাজে কত জনপ্রিয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, 'কমলাকান্তে'র দপ্তরভুক্ত তিনটি নিবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়। ত'ার ভক্ত শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'চন্দ্রালোক' ও 'মশক' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্ত্রীলোকের রূপ' বঙ্কিমের আদর্শেই লেখা। তাই এই তিনটি লেখাকেও বঙ্কিমচন্দ্র ত'ার রচনার অনুরূপ বলে মূলগ্রন্থের অন্তর্ভু'ক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই তিনটি নিবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ হলেও রচনাংশে উৎকৃষ্ট নয়, রাজকৃষ্ণের 'স্ত্রীলোকের রূপে' বঙ্কিমের মুন্সিয়ানার অভাব সহজেই চোখে পড়বে, তবে সরস লেখক অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মন ও মেজাজ অনেকটা ধরতে পেরেছিলেন।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র "কমলাকান্তের বিদায়" শীর্ষক উপচ্ছেদে কমলাকান্ত সক্ষোভে বলেছেন—"সম্পাদক মহাশয়, বিদায় হইলাম, আর লিখিব না, বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর বনিল না।" অনেকদিন আগে সে বৃদ্ধ লোকজীবন থেকে, বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। তিনি বাইরের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেননি, নিজের সঙ্গেও নিজের বনিবনাও হয়নি। কিন্তু তবু তিনি এক শতাব্দী পরেও আমাদের আপনার জন হয়ে আছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধসাহিত্য বা রচনাসাহিত্য কোনটার মধ্যেই পুরোপুরি পড়ে না, বরং গল্প-আখ্যানরসের দিকেই এর ঝোঁক বেশী। লেখক নানা তত্ত্ব ও ব্যাপার সম্বন্ধে হৃদয়ে যা উপলব্ধি করেছেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়ে তাই বলিয়ে নিয়েছেন। কাজেই এ খানিকটা রসসাহিত্যের অন্তভু'ক্ত। কিন্তু বুদ্ধিপ্রধান বিশুদ্ধ প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, স-শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর চিন্তাবিকাশের ভার নিয়েছিলেন, দেশনেতা বঙ্কিমচন্দ্র

বলিষ্ঠ সঙ্কেতে সমগ্র দেশকে নিজের চিন্তা-বলয়ের অভিমুখে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর 'বিবিধ-প্রবন্ধে' সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজবিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে, এখনও তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে স্বাধীন গবেষণার সূত্রপাত, নানা সামাজিক ও দার্শনিক তত্ত্বকথার সরস পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ করে তিনি আদর্শ প্রবন্ধের সার্থক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগে তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার যে আদর্শটি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার প্রথম দীক্ষা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধটি একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, পরে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন ধরনের মানসিকতা লাভ করে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রচার রহিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ কাজ যুক্তিসঙ্গত হয়নি। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও অর্থনীতির যুগবিপ্লবী গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি অতিশয় অবহিত ছিলেন, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু-আলোচিত য়ুরোপের সাম্যবাদ, যাকে য়ুরোপের অধিকাংশ সমাজনেতা জুজুর মতো ভয় করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এতে তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে সমগ্র মানবসভ্যতার বিচার করে শ্রেণীবিদ্বেষ-জর্জরিত সমাজব্যবস্থার আমূল সংশোধনের প্রস্তাব করেন। অবহেলিত জনসাধারণ, বিশেষত কৃষকদের পক্ষ থেকে এত সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনা এর পূর্বে বাংলাদেশ কেন, সারা ভারতবর্ষেই বা ক'টা দেখা গেছে? কিন্তু তারুণ্যের রক্তবন্যা চলে গেলে অপেক্ষাকৃত পরিপক্ব প্রবীণ বয়সে তিনি মনে করেছিলেন যে, সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীবিদ্বেষ দূর করতে গিয়ে নতুন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উচিত নয়। তাঁর পরবর্তী কালের এই অভিমত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর মনোবল যে অদ্ভুত রকমের দৃঢ় ছিল, তার প্রমাণ 'সাম্য' প্রবন্ধেই ফুটে উঠেছে। যে যুগে য়ুরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রনেতারা সাম্যবাদকে নৈরাজ্যবাদ ও বিশৃঙ্খল সমাজবিপ্লব মনে করে দুঃস্বপ্ন দেখতেন, সেই যুগে সরকারী কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেই সাম্যবাদের সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন।

তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের আর একটা বড়ো উপাদান, আমাদের পৌরাণিক ঐতিহ্যকে যুক্তির মারফতে বৈজ্ঞানিক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে দেখা। এ বিষয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। এত দিন ধরে ভক্তি ও অধ্যাত্ম চেতনার সাহায্যে কৃষ্ণকে

অনুধ্যান করতে ভারতীয় মন অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তির দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অনৈসর্গিক ও অলৌকিকতাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বৃহৎ মানবতার আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণকে স্থাপন করেছেন—এ আদর্শ তিনি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যমানবতাবাদী (neo-humanistic) য়ুরোপের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ১৮৮৮ সালে লেখা 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি ধর্মজিজ্ঞাসায় একপ্রকার সংশ্লেষণী, মানবধর্মী এবং সমানুপাতিক জীবনাচরণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফরাসী দার্শনিক অগুয়েস্ত কোঁৎ-এর তিনি ছিলেন অনুরাগী। কোঁৎ খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বের স্থানে মানুষকে, স্বর্গের স্থানে মর্ত্যকে এবং পরকালের স্থানে ইহকালকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে, মানবপ্রবৃত্তির সমূল উৎসাদন জীবধর্মের উদ্দেশ্য নয়, প্রবৃত্তির সংযম ও সমন্বয়ই মানুষের ধর্ম। ভগবান বাসুদেবের জীবনে সেই সমন্বয় লাভ ঘটেছিল; কিন্তু খ্রীস্ট বা বুদ্ধদেবের জীবনে ও দর্শনে তা ঘটেনি। তাঁরা বৈরাগ্যকেই জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বঙ্কিমের ইষ্টদেবতা হচ্ছেন শ্রীমদ্‌ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণের বল্লবীপ্রিয় কৃষ্ণ নন—মহাভারত-মহানাটকের সূত্রধার পার্থসারথি। বাঙালীকে তিনি কৃষ্ণের জীবনাদর্শের প্রচ্ছায়ে নতুন জীবন-প্রত্যয় এনে দিয়েছিলেন। শেষজীবনে অগুয়েস্ত কোঁৎ বা মিল-বেস্থাম ছেড়ে তিনি গীতার ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে বড়ো বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য কোঁতকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেননি, Positivism-এর সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি জুড়ে দিয়ে এক নতুন ধরনের লোকহিতবাদের সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে যে প্রবল যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিকতা, নৈসর্গিক প্রমাণপদ্ধতির প্রতি আস্থা—সকলের উপরে যে পৌরুষের দার্ঢ্য এবং জ্ঞানের জ্যোতি ফুটে উঠেছে, এই শতাব্দীর অন্য কোন প্রাবন্ধিকের রচনায় তার সমতুল্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর শিষ্যের দল তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ভাবধারা কিছুটা বজায় রেখেছিলেন।

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য এবং অন্যান্য প্রাবন্ধিক

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে তাঁর একদল শিষ্য বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ক্রমবিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। চুম্বকের মতো বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমধর্মী অনুরক্ত ভক্তদের নিজ চিন্তা ও ভাবনার মণ্ডল মধ্যে টেনে এনেছিলেন, তাঁদের 'বঙ্গদর্শনে' লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন, অনেকের লেখা সংশোধন করে

দিয়ে, কাউকে-বা নির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দিয়ে তিনি একটি চমৎকার প্রাবন্ধিক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন—এ'রা 'বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী' নামে পরিচিত। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য) কোন-না-কোন দিক দিয়ে প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত বা দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯০০) প্রধানত পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। 'গ্রীক ও হিন্দু' (১৮৭৫) এবং 'বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬) এক সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর ভাষা আবেগবর্জিত ও পরিচ্ছন্ন। তিনি মোটামুটি বাস্তব যুক্তিকে অনুসরণ করেছিলেন।

'আর্যদর্শন পত্রিকা'র সম্পাদক এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যেমন একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন, তেমনি আবার 'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত' (১৮৮০), 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০), 'বীর পূজা' (১ম ও ২য়, ১৯০০) প্রভৃতি জীবনগ্রন্থে বিদেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রচিত্র এ'কে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর মনে স্বাদেশিকতার স্পৃহা জাগিয়েছিলেন। বহরমপুরের অধিবাসী ঐতিহাসিক রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসার পর 'বঙ্গদর্শনে'র একজন নিয়মিত লেখক হয়েছিলেন। তাঁর 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১ম—১৮৭৪, ২য়—১৮৭৬, ৩য়—১৮৭৯) এবং 'ভারত রহস্য' (১৮৮৫) গ্রন্থে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাবৃত্তে তাঁর অসাধারণ অধিকার দেখে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) পরবর্তী যুগে গম্ভীর প্রকৃতির প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখলেও প্রথম যৌবনে কয়েকখানি কাব্য লিখেছিলেন। 'যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮), 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬৯), 'কাব্যকলাপ' (১৮৭০) প্রভৃতি কাব্যগুলি নিতান্ত গতানুগতিক নয়, এতে কিছু কবিত্ব-লক্ষণ আছে। কিন্তু তিনি বাংলাদেশে প্রাবন্ধিক নামেই সুখ্যাত। 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর নানা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রচারী ছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধগুলি মূল্যবান তত্ত্ব-তথ্যে পূর্ণ হলেও উচ্চতর শিল্পগুণ লাভ করতে পারেনি। তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বড়োই নীরস মনে হয়। ইতিহাস, দর্শন, স্মৃতিসংহিতা—সমস্ত

বিষয়ই তাঁর নখাগ্রে বিরাজ করত, কিন্তু অতিশয় কেতাবী কৃত্রিম ভাষার জন্য এই প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হতে পারেনি। তাঁর 'নানাপ্রবন্ধ' (১৮৮৫) বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হবার জন্য একদা ছাত্রসমাজে খুব প্রচলিত ছিল।

আরও তিনজন প্রাবন্ধিক ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ-শিষ্য না হলেও তাঁর ভাবমণ্ডলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এক সময়ে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'ফুল ও ফল' (১২৯২), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' (১৩০৬) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে পুরাতন ধারায় সাহিত্য বিচার করেছিলেন। 'ফুল ও ফলে'র কিছু কিছু অংশ সুখপাঠ্য। কেবলমাত্র হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে সব কিছু বিচার করেছেন বলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি গুরুতর তত্ত্বকথা ছেড়ে দিয়ে সহজভাবে মনের কথা বলতেন ('ত্রিধারা'র অন্তর্ভুক্ত "পাখীটি কোথায় গেল") তখন তাঁর রচনায় একটা স্বাদুতার স্বাদ পাওয়া যেত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯০২) 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী নয়, বিশ শতকের দু'-তিন দশকেও যুবামনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর ভাষাভঙ্গী অতিশয় আবেগব্যাকুল, এর সম্পদ হচ্ছে উচ্ছ্বসিত করুণ রস, ফলশ্রুতি হল নির্বেদ বৈরাগ্য। স্ত্রীর মৃত্যুর পর উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে চন্দ্রশেখর এই গদ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। একদা এর বহু অংশ সহৃদয় পাঠকের কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু অহেতুক ভক্তি বাদ দিয়ে খোলা মনে বিচার করলে দেখা যাবে, এর আন্তরিকতা ও আবেগের মধ্যে অতিনাটকীয় চমৎকারিত্ব থাকলেও বহুস্থানেই শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস মনে হবে। তাঁর 'সারস্বত কুঞ্জ' (১২৯২) ও 'স্ত্রীচরিত্র' (১৮৯৭) কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী ভক্তশিষ্য চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯২৭) নাম করা যেতে পারে। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' মাসিক পত্রের সম্পাদক হিসেবে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মন ও মেজাজের দিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সরস মনোভাবটির আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। কিছু কিছু কবিতা ও উপন্যাস লিখলেও আসলে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান সরসভাষী প্রাবন্ধিক। 'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৫), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'রূপক ও রহস্য' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি তিনি সরসভাবে অনেক

গুরুতর কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরস ও ঋজুগতি—উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিকের অনেক গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার গভীরতা ছিল না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সরসতার সঙ্গে তাঁর মনীষার কিঞ্চিৎ লাভ করলে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হতে পারতেন। তাঁর স্মৃতিকথা ধরনের রচনা 'পিতাপুত্র' এখনও সুখপাঠ্য মনে হয়।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) বঙ্কিম-ধারারই সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ও সাহিত্যবিচারক। সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে তিনি অনেক মৌলিক চিন্তাধারার অবতারণা করেছিলেন। 'সাহিত্যমঙ্গল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র পরিচিত প্রবন্ধসংগ্রহ—যদিও নানা পত্রপত্রিকায় ত°ার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। শুধু সাহিত্যতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নয়, সরস হালকা চালের রচনাতেও ঠাকুরদাসের কৃতিত্ব কিছু কম ছিল না। 'সহরচিত্র' (১৯০১) ও 'সোহাগচিত্রে' (১৯০১) তাঁর কয়েকটি চমৎকার নিবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে।

ঢাকার 'বান্ধব' পত্রের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) এককালে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বলে গৌরবের সর্বোচ্চ শীর্ষ অবলম্বন করেছিলেন, আবেগতরল ও কাব্যধর্মী নিবন্ধ লিখে তিনি একটা স্বতন্ত্র গদ্য স্টাইলের উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। সে যুগের তরুণ লেখকেরা কালীপ্রসন্নের ঝঙ্কার-, মুখর ভাষার অনুকরণ করতে ভালোবাসতেন। 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৮৪), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ সারা বাংলাদেশেই প্রচলিত হয়েছিল। এতে নীতি, দর্শন, সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধে অনেক উচ্চমার্গের রচনা আছে। একদা প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি অতিবিখ্যাত হলেও এখনকার পাঠকসমাজ এই ধরনের অন্তঃসারশূন্য ফ°াকা আওয়াজে ভুলবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য হরপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে (অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৮৫৩-১৯৩১) বঙ্কিমচন্দ্র সহজ সরল ভাষায় গুরুতর প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। ভাটপাড়ার বিখ্যাত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবংশে হর-প্রসাদের জন্ম হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র হয়ে হরপ্রসাদ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। ইতিহাস, সংস্কৃত শাস্ত্রসংহিতা, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব—এই সমস্ত বিভাগে তিনি অবলীলাক্রমে পদচারণা করেছেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার কক্ষেও তিনি সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও গবেষক

হিসাবে দেশবিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, বহু গ্রন্থের আবিষ্কার ও সম্পাদনা করে তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। তিনি আবার 'কাঞ্চনমালা', 'বেনের মেয়ে' নামক দুখানি উপন্যাস লিখে প্রাচীন বাংলার সমাজজীবনের জীবন্ত আলেখ্য অঙ্কন করেছিলেন। অবশ্য উপন্যাস হিসাবে এই দু'খানি বিশেষ সার্থক হতে পারেনি। 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১) নামক পৌরাণিক রূপক আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। এছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ অভিনব তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হয়েছে, যার জন্য তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশব্যাপী হয়েছিল। কিন্তু বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর যে একটা স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে, এখানে আমরা সে কথাটাই বলতে চাই।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবংশের সন্তান হয়ে এবং সংস্কৃত শিক্ষায় লালিতপালিত হয়ে তিনি যে ধরনের আশ্চর্য সরল বাংলা গদ্য লিখতেন তাতে তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তাঁর রচনাপদ্ধতি অনেকটা সংলাপের ধরনে অগ্রসর হত। সরল বাক্যে কাজ মিটলে তিনি কখনও জটিল বা মিশ্র বাক্য ব্যবহার করতেন না। তাঁর ভাষায় শুধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি সাধুভাষা থেকে নেওয়া, সেটুকু বাদ দিলে হরপ্রসাদের ভাষা প্রায় মুখের ভাষার হুবহু অনুকরণ। প্রমথ চৌধুরীর চলতিভাষা সময় সময় জটিল, সাধুভাষার চেয়েও দুরূহ মনে হয়; হরপ্রসাদের ভাষা সাধুভাষা হলেও মুখের ভাষার মতোই সরল। বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বকে সরস করে বলবার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁর ভাষাকেও অতিশয় স্বচ্ছ করে তুলেছে। ভাষার এই সরলতা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ থেকেই পেয়েছিলেন। গুরুতর প্রবন্ধে, চিন্তাশীল আলোচনায়, বিবাদবিতর্ক ও সিদ্ধান্তস্থাপনে তিনি মৌখিক ধরনের ভাষাকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই ভাষারীতি অতীব প্রশংসনীয় হলেও এর গোটাকতক অসুবিধা ও দুর্বলতা আছে। এ ভাষা বৈঠকী ধরনের, হালকা চালের, মজলিসী, আলাপচারী ভাষা—যদিও কাঠামোটি সাধুভাষার বটে। এ ভাষার মধ্যে শক্ত মেরুদণ্ডের কিছু অভাব আছে বলে এ চমক দেয়, প্রীতি আকর্ষণ করে, কিন্তু মনের গভীরে গিয়ে নানা বৈচিত্র্যময় বর্ণালী সৃষ্টি করতে পারে না। ফরাসীরা এ ভাষার খুব তারিফ করতে পারত। কিন্তু আমাদের দেশে গুরুতর ব্যাপারে ভাষাকেও গুরুগম্ভীর করার রীতি; হালকা ছাঁদের

ভাষায় বিষয়ের গুরুত্ব যেন খানিকটা হ্রাস পায়, একথা অনেকেরই মনের কথা। তাই হরপ্রসাদের গদ্যরীতির অভিনবত্ব সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন। কিন্তু কৃত্রিম সংস্কারের চশমা খুলে বিচার করলে তাঁর ভাষাকে অন্তর থেকে প্রশংসা করতেই হবে। এই ভাষার আর একটু মননের গভীরতা সঞ্চারিত হলে তাঁর গদ্য প্রবন্ধনিবন্ধের আদর্শ ভাষা হতে পারত।

এবার আমরা কয়েকজন গদ্যলেখকের কথা বলব যাঁরা বঙ্কিমযুগে আবির্ভূত হলেও নিজ নিজ সাহিত্যসাধনায় নিজস্ব ভাবকল্পনা ও রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। এঁরা সকলেই চিন্তাশীল মনীষী, কেউ ধর্মমতের অবিসংবাদী নেতা এবং সারা দেশের ভক্তির পাত্র ছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি এঁদের কারও একান্ত অভিপ্রেত ছিল না। এঁরা দেশ, সমাজ ও বৃহত্তর মানবচিত্তে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধসাহিত্য ও গদ্যরীতিতেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) ভাবুক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, কোন বিষয়েই তাঁর বড়ো একটা আসক্তির যোগ ছিল না। দার্শনিকতা, কবিপ্রতিভা এবং উদ্ভট খেয়ালের সমন্বয়ে তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। জীবনে তিনি ছিলেন উদাসীন। ফলে প্রতিভার অনুপাতে সঞ্চয় করে যেতে পারেননি। কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গণিত, যুক্তিবিদ্যা—নানা বিষয়ে তাঁর ছিল অসাধারণ কৌতূহল। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তাঁর অধীত বিদ্যা মৌলিক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-৬৯), 'নানা চিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০), 'চিন্তামণি' (১৩০৮-১৩০৯) প্রভৃতি প্রবন্ধসংগ্রহে তাঁর দার্শনিক মনের খবর পাওয়া যাবে। বাংলাভাষায় বিশুদ্ধ দর্শনচিন্তার বড়ো অভাব। সে অভাব এখনও ঘোচেনি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তা, তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের সমীকরণপদ্ধতি অতি চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বিশেষ কোন আসক্তি ছিল না, এই খেয়ালী প্রকৃতির অসাধারণ মানুষটির দার্শনিক চিন্তার মৌলিকতা এদেশের বুদ্ধি-জীবী সমাজে আলোড়ন তোলেনি—এ জাতির দুর্ভাগ্য।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

ধর্মজগতের অধিবাসী হলেও বাংলা গদ্যে অসামান্য অধিকার অর্জন করেছিলেন। এ'রা সাহিত্য করবার জন্য কখনও কলম ধরেননি, অলস অবকাশে রসসৃষ্টির বিলাসিতা এ'দের কর্মযোগী চরিত্রে আদৌ খাপ খেত না। ধর্ম, সমাজ, সম্প্রদায়, ভক্তশিষ্য ও অনুরাগীদের জন্য তাঁরা আলোচনা করতেন, বক্তৃতা দিতেন,—সেগুলি পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। তা থেকে দেখা যাবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান ইচ্ছা না থাকলেও এ'দের স্বভাবের মধ্যেই সাহিত্যের বীজ ছিল। কেশবচন্দ্রের ভক্তির আবেগ, আদর্শবাদ, অধ্যাত্মানুভূতি তাঁর 'জীবনবেদে' (১৮৮৪) ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর যে বাগ্মিতা সে যুগের যুবসম্প্রদায়কে মাতিয়ে তুলেছিল, তার কিছু কিছু তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে ধরা পড়েছে। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রচার করবার জন্য তিনি সুলভ-মূল্যে কয়েকখানি পত্রিকাও ('সুলভ-সমাচার'—১৮৭০ ; 'নববিধান'—১৮৮০, 'বালকবন্ধু'—১৮৭৮) প্রকাশ করেছিলেন—যার ভাষাভঙ্গিমা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি-সংক্রান্ত বর্ণাঢ্য ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে ? তুমি কি পাইলে ? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে ?...হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবনবৃত্তান্ত বল. তোমার প্রাণের ভিতর নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্জনের সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন ? তুমি কিরূপে সকলের দুঃখ-জ্বালা নির্বাণ করিলে ?

স্বামী বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে লিখিত। কিন্তু চিঠিপত্রে গুরুভাই ও শিষ্যদের নানা উপদেশ দিতেন, য়ুরোপ ভ্রমণের সময় ডায়েরি লিখেছিলেন, কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কর্মযোগী বীরসন্ন্যাসী কৃত্রিম সাহিত্য, অলস কাব্যলীলা—এসব ব্যাপারকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। যে সাহিত্য বলিষ্ঠ জীবনের প্রতীক, তাকেই তিনি ভালোবাসতেন। সাধু ভাষায় তিনি কিছু কিছু লিখলেও চলিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী ও ডায়েরির বিচিত্র বিষয়, চলতি বুলির সরসতা ও সজীবতা এখনও আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা', 'পত্রাবলী'—এর মধ্যে প্রায় অধিকাংশই উত্তর-কলকাতার মৌখিক সংলাপের ভাষায় লেখা। তাঁর চরিত্রের প্রচণ্ড পৌরুষ ও মনোরম সরসতা এই চলতি ভাষায় এমন একটা অপূর্বতা সৃষ্টি করেছে যে, বিশ শতকের চলতি ভাষায় কোন লেখকই তার সমকক্ষতা করতে পারবেন না। খাঁটি কলকাতাই 'ককনি' ভাষায় যে

সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, পূর্বেই হুতোম তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর খোলাখুলি ভাষা কিছু কিছু আশালীনতার ধার ঘেঁষে গেছে। বিবেকানন্দের ভাষায় হুতোমের মতোই দুঃসাহস ছিল, কিন্তু অশালীনতার নামগন্ধও ছিল না; প্রমথ চৌধুরীর মতো রসিকতা ছিল, কিন্তু বুদ্ধির মারপ্যাচ ছিল না। আবার কোথাও কোথাও তাঁর চলিত ভাষায় অপূর্ব ধ্বনিগম্ভীর ক্লাসিক ঝঙ্কার সঞ্চারিত হয়েছে। বিবেকানন্দ বাংলা চলিত ভাষার যে একজন বিচিত্রকর্মা শিল্পী তা স্বীকার করতে হবে। এখানে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি?—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও; আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এসব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নামবেন ইট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট আর সেই গাধাবোট; আর এ তালতমাল আর নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভুতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী আগে স্বামীজী যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই আজ বীভৎস মূর্তি ধরে বাংলাদেশের শ্যামশোভাকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা সমাপ্ত হল। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলা সাহিত্য নবযৌবনের দীপ্তিতে ভরে উঠেছে, বিষয়বস্তু ও রচনাপদ্ধতির সমীকরণ হয়েছে, আবেগ ও মনন—দুই-ই সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। সর্বোপরি সাহিত্যের সঙ্গে গোটা বাঙালী জাতির মনের ও ঐতিহ্যের সংযোগ ঘটেছে—এককথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সর্ব-বিভাগে পূর্ণতা লাভ করেছে। 'বঙ্গবাসী' মুদ্রাযন্ত্র ও বর্ধমান রাজবাড়ী থেকে অনেক পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের মারফতে বাঙালীর মনে নতুন নতুন চিন্তার জাগরণ হল। এই পটভূমিকায় বিংশ শতাব্দীর প্রভাত হল, তার কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁকে দিয়েই নবযুগের সূত্রপাত হল, তাই বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটিকে, রবীন্দ্র-যুগ নাম দিয়ে আমরা এর পরের পর্বের আলোচনায় অগ্রসর হব।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

রবীন্দ্রযুগ

ষোড়শ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

কাব্য-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ

১. বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রধানত রবীন্দ্রপ্রভাবিত যুগ বলে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেমন বঙ্কিমযুগ নাম দেওয়া হয়, তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্রযুগ নাম দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকেই কবি রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়াতে আরম্ভ করেছিল, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—যাতে তাঁর প্রতিভার অবিনশ্বর স্বাক্ষর আছে। তবু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র মুকুটহীন সম্রাট বলেই স্বীকৃত হয়েছিলেন, তখন নবযুবক রবীন্দ্রনাথের সারস্বত খ্যাতি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রচারিত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) থেকে 'চৈতালী' (১৮৯৬) কাব্য, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) থেকে 'মালিনী' (১৮৯৬) প্রভৃতি নাটক এবং 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাস দু'টি প্রকাশিত হয়েছিল। বলতে গেলে এর দ্বারাই তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতা ও গভীরতা সহজেই ধরা পড়ে। তবু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এতই অনপনেয় ছিল যে, অন্য কারও প্রভাব সেখানে কোন রকম ছায়াপাত করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর, এবং বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সাহিত্যিকদের ওপর তাঁর প্রভাবের সূচনাও এই সময় থেকে বিপুলভাবে শুরু হল। তাঁর এই প্রভাব তাঁর তিরোধানের পরেও অক্ষুণ্ণ আছে, এবং সম্ভবত আরও দীর্ঘকাল থাকবে—অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রপ্রভাবিত পথ ছেড়ে পন্থান্তরের সন্ধান করছে—সেকথা আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-কালের অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমার্ধের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

বঙ্কিমযুগ প্রসঙ্গে দেখা গেছে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব এবং বিদেশী সাহিত্য--শিল্পকলা-দর্শন প্রভৃতির ছায়া তৎকালীন বাঙালী-মানসকে কতটা রূপান্তরিত করেছিল, সমকালীন রাষ্ট্রচেতনা ও সমাজজিজ্ঞাসা সাহিত্যের মধ্যেও কী পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রথম প্রথম পৌরাণিক সংস্কারের প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায় বিদ্বিষ্ট হলেও পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পুরাণ সংস্কৃতিকে তুচ্ছ না করে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা এর মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ করার দিকে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন। তবে এযুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজসংস্কার—প্রগতি-সম্পর্কীয় যাবতীয় আন্দোলন শুধু নাগরিক জীবনকেই প্রভাবিত করেছিল। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্যের মাদকতায় বুঁদ হয়েছিলেন, তাঁরা সারা দেশকে বাদ দিয়ে শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কল্যাণকেই সারা দেশের কল্যাণ বলে ভাবছিলেন, বিসমার্ক, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনির আদর্শে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বপ্ন দেখছিলেন। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বাস্তব ধরনের রাজনৈতিক চেতনা শিক্ষিত বাঙালীর মনকে আকৃষ্ট করেছিল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এ দেশে ইংরেজ শাসনের সমালোচনামূলক প্রখর রাজনৈতিক আলোচনা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল, এর অধিবেশনে শিক্ষিত ভারতবাসী সদাশয় ইংরেজ সরকারের দাক্ষিণ্যদৃষ্টি লাভের জন্য সাম্বৎসরিক বিতর্ক সভায় মিলিত হতে লাগল। প্রথম দিকে এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সমাজের বিশেষ যোগ ছিল না। কিন্তু ১৮৯০ সালের পর থেকে কংগ্রেসের মধ্যেও নানা নতুন পরিবর্তনের সূচনা হল। এই সময়ে বোম্বাইয়ে গণপতি-উৎসব ও শিবাজী-উৎসবের মারফতে পশ্চিমভারতে ইংরেজবিরোধী মনোভাব ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। বাংলাতেও উগ্র ইংরজবিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করল।

১৮৯১ সাল থেকেই ইংরেজ সরকার বাংলাকে দুটি শাসনবিভাগে বিভক্ত করার সঙ্কল্প করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদকে বাড়িয়ে দিয়ে এদেশের উগ্রপন্থী বাঙালী যুবসমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করবার সিদ্ধান্ত করল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, ফলে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। দেশের আহত আত্মা এক মুহূর্তেই মরনপণ করে জেগে উঠল; শিল্পী, কবি, নাট্যকার—সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, রবীন্দ্রনাথ পুরোধা হয়ে এগিয়ে এলেন। ইংরেজের চণ্ডনীতি এবং সেই নীতির প্রতিবাদে যে-কোন

ত্যাগ স্বীকারে বাঙালীর প্রস্তুতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আলোড়ন তুলল। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত এই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন চলল, মহারাষ্ট্র ও বাংলায় সরকারী চণ্ডশাসনের প্রতিক্রিয়ার ফলে গুহাচারী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গোপনে গোপনে শুরু হয়ে গেল। কংগ্রেসের স্থবির আদর্শেও ফাটল ধরল। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ—এঁদের প্রভাবে নরমপন্থী কংগ্রেসের দ্বিধাসঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেল—অবশ্য নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের চূড়ান্ত ভেদ ঘটল সুরাট কংগ্রেসে—আর এই সময় থেকেই বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দল ইংরেজ-নিধনের জন্য গোপনে গোপনে যুবশক্তিকে প্রস্তুত করতে লাগল। ১৯০৫ থেকে ১৯৩০—প্রায় প'চিশ বৎসর ধরে বাংলার যুবসমাজ গোপনচারী সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইংরেজও ভারতের জাতীয় আন্দোলন বানচাল করবার জন্য ১৯০৬ সলে থেকে মুসলমানকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দ্বারা হিন্দু-আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। জাতীয় আন্দোলন এতেও মন্দাগিত হল না, তখন ১৯০৯ সালে রাষ্ট্রসচিব মর্লি এবং গভর্ণর জেনারেল মিণ্টো ভারত শাসনের সংস্কার করলেন—কিন্তু সে বিশুদ্ধ ধাপ্পাবাজিতে দেশবাসী ভুলল না।

ইতিপূর্বে রুশ-জাপান যুদ্ধে অবহেলিত জাপানের কাছে মহাপ্রতাপশালী জারের রুশদেশ বিপর্যস্ত হলে ভারতীয়েরা বুঝতে পারল, প্রাচ্যদেশের কাছেও পাশ্চাত্ত্য জাতি নতি স্বীকার করতে পারে—যদি আমাদের শক্তি থাকে। সন্ত্রাসবাদীরা আরও সচেষ্ট হলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হল। সুবিচারের আশায় ভারতবাসী ইংরেজকে সর্বপ্রকার সাহায্য করল, কিন্তু তার ভাগ্যে জুটল রাওলাট অ্যাক্ট (১৯১৯) ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)। এদিকে ১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলেন, ১৯১৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পরিচালনা চলল। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসনসংস্কার ঘোষিত হল বটে, কিন্তু ১৯২০ সালের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। এর কিছু পরে ভারতবর্ষের তথাকথিত শাসনসংস্কারের জন্য ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাইমন কমিশন গঠন করলেন। ইংলণ্ডে তিনবার গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেও কিন্তু কোন সুফল হল না। লাভের

মধ্যে মুসলমানসমাজ ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে পড়ল, হিন্দুর মধ্যেও অনুন্নত হিন্দু ও বর্ণহিন্দু—এই দুভাগ করে হিন্দুসমাজকেও দু'ভাগে বিভক্ত করার অপচেষ্টা হল। মহাত্মা অনশন করলেন, আন্দোলন করলেন, কিন্তু কিছুতেই সর্বনাশ রোধ করা গেল না। খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা তিনি মুসলমানসমাজের কিছু সহযোগিতা লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষে তার সুফলটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। ১৯২৩ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির কার্যক্রম শুরু হল। পরে পৃথক নির্বাচন নীত অনুযায়ী ১৯৩৫ সালে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান চালু করা হল। কংগ্রেস দূর থেকে ঘটনাপ্রবাহের ঢেউ গুণতে লাগল। পাছে মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চটে যায়, এইজন্য এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ঘোরতর অন্যায় দেখেও প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে হাত গুটিয়ে রইল। ১৯৩৬-৩৭ সালের নির্বাচনের পর বাংলা ও পাঞ্জাব ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রদেশেই কংগ্রেস একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করল।

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজের অঞ্চলে-বাঁধা ভারতকেও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল। ফলে যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধের ঘৃণ্য বীভৎসতা, সমাজভ্রষ্টতা, চরিত্রহানি দেশকে সর্বনাশের পথে আর একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ১৯৪১ সালে শতাব্দীর সূর্য রবীন্দ্রনাথ জঘন্য দস্যুর সভ্যতার রক্তাক্ত পটভূমিকায় চিরনিদ্রাবৃত হলেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ, তারপর নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আগস্ট আন্দোলন আরম্ভ হল—ইংরেজও চণ্ডনীতিতে অত্যাচার চালাতে লাগল। এই সময়ের একটিমাত্র শুভ ইঙ্গিত, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী মুক্তি পেয়ে আবার মুসলিম লীগের কর্ণধার মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে আপস আলোচনা চালাতে লাগলেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় সমস্ত অমুসলমান আসন অধিকার করল। অতঃপর ১৯৪৭ সালে দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান ভারত ও অমুসলমান ভারত (হিন্দু ভারত ও অহিন্দু ভারত নয় !)—এইভাবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হল, মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করে কংগ্রেস খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ করল। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ শুধু সুযোগ সন্ধান করে ও চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ভারতের মুসলমানদের জন্য অঞ্চলবিশেষের স্বাতন্ত্র্য লাভ করল।

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট এই দুই ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে ইংরেজ শাসক ভারত ত্যাগ করে গেল—পিছনে রেখে গেল দু'শ'বছরের অত্যাচার ও অনাচারের ইতিহাস, মনুষ্যত্বহীনতার কাহিনী—অন্তঃসারশূন্য কবন্ধ দেশকে, পরস্পর-বিবদমান দুটি রাষ্ট্রকে। বিভক্ত দেশের বিষাক্ত আবহাওয়ায় মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়ে সত্যসন্ধ আত্মার জয়বার্তা ঘোষণা করে গেলেন (১৯৪৮)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি আন্দোলনের উল্লেখ করা কর্তব্য। এ হল সাম্যবাদী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তখনও ভারতে তার কোন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়নি। কিন্তু দু' এক বৎসরের মধ্যেই ভারতে সে জলতরঙ্গ প্রবেশ করল—যেদিন (১৯২০, ৩১শে ডিসেম্বর) বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠা হল। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সাম্যবাদী আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। য'ারা নানা রাজনৈতিক অপরাধে দীর্ঘকাল কারাভ্যন্তরে ছিলেন তাঁরা অনেকেই সাম্যবাদী দ্বান্দ্বিক দর্শনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়লেন। ১৯২২ সালে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আদর্শে ও প্রভাবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল, ১৯৩০ সালে এই দল তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালের যথার্থ শাখাভুক্ত হল। এই সাম্যবাদী দল কংগ্রেসের তথাকথিত রক্ষণশীল মনোভাব ও ধনতন্ত্রঘে'ষা আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শ্রমিক-কৃষকদের একজোট করে বিদেশী সরকারকে ক্ষমতাবিচ্যুত করার চেষ্টা করতে লাগল। অবশ্য সাম্যবাদী আন্দোলন শুধু একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে রইল না, ভারতীয় চিরপ্রচলিত সংস্কৃতি ও জীবনবাদকে একপ্রকার অভিনব দর্শনচিন্তার প্রভাবে বিপ্লবাত্মক রূপান্তরের চেষ্টা করতে লাগল—সে চেষ্টার এখনও বিরাম নেই।

এই সমস্ত নানাপ্রকার জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় আমরা রবীন্দ্রযুগের অর্ধশতাব্দীর (১৯০০-১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব। এই পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা সাহিত্য অভিনব অভিজ্ঞতা, রূপান্তর, মত-সংঘর্ষে'র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বলতে গেলে প্রায় প্রতি দশ বছর অন্তর সাহিত্যের আদর্শ, রূপরীতি নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং দলের সঙ্গে দলের নানা সংঘাত ঘনিয়েছে, য়ুরোপ-আমেরিকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এই সাহিত্যে নানা তরঙ্গ তুলেছে। এই পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রপ্রভাব

ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে শীর্ষ সীমায় উঠেছে, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই সেই প্রভাবকে কিছু কিছু অস্বীকার করে, অথবা পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে যাত্রা করার লক্ষণ বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় ফুটে উঠেছে। সেই সমস্ত প্রসঙ্গ আমরা এই পর্বে উত্থাপন করব। উপস্থিত প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে চারিটি উপচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক—প্রথম উপচ্ছেদে কাব্য-কবিতা, দ্বিতীয় উপচ্ছেদে নাটক, তৃতীয় উপচ্ছেদে গল্প-উপন্যাস এবং চতুর্থ উপচ্ছেদে গদ্যপ্রবন্ধের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রথম উপচ্ছেদ : কাব্য-কবিতা

মাত্র বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে আশী বছর পর্যন্ত যিনি অবিশ্রান্তভাবে কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধে কোটালের বান ডাকিয়েছেন, তাঁর কাব্যপরিক্রমা, যত সংক্ষেপেই বলি না কেন, তার সীমা শুধু বেড়েই যাবে। প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য, আবেগের এত গভীরতা রোমাণ্টিক মানসের এভাবে কল্পস্বর্গপরিক্রমা—বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাতীতের, সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের এই মিলনলীলা কোন যুগের কোন-একজন কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার-শেলী, কীট্‌স্‌, হাইনে, গ্যয়ঠে—এককভাবে কোন-একটি কবিপ্রতিভার সঙ্গেই ত'ার তুলনা হয় না। গ্যয়ঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও জীবনবোধের কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তিনি অনুপম। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে ত'ার কাব্যপরিক্রমায় শুধু কাব্যগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের কথাই উল্লেখ করব। অবশ্য কাব্যের কালাশ্রয়ী বিবর্তনের অর্থ হল, কবির অন্তর্জীবনের ক্রমিক রূপান্তর ও বিকাশ। এখানে সেদিকের প্রতি আমরা অধিকতর সচেতন হব। তাঁর কাব্যের কলাকৃতি, মনোভূমি ও প্রাণাবেগ আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় প্রয়োজন, এখানে তার স্থানাভাব বলে বাধ্য হয়েই আমরা রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের শুধু বিবর্তনরেখা নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হব। ত'ার দীর্ঘপ্রসারী কাব্যজীবনকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

১. সূচনা পর্ব

বালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্ট আভিজাত্য, ঔপনিষদিক ভক্ত

পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরিবারে প্রচলিত স্বদেশী মনোভাব, সংযত সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পরুচির মধ্যে বর্ধিত হয়েছিলেন। অবশ্য আবেগব্যাকুল বালক-কবির আত্মপ্রকাশের বাধাও ছিল প্রচুর। দিনকতক স্কুলের কৃত্রিম শাসনের মধ্যে তাঁকে থাকতে হয়েছিল—যা তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে পড়েছিল। বাড়ীতে বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বিদ্যা চর্চার ঢালাও ব্যবস্থার ফলে বয়সের তুলনায় তিনি বিস্তর পড়েছিলেন, ফলে অল্প বয়সেই তাঁর আবেগ, অনুভূতি ও মনন অনেকটা পরিপক্বতা লাভ করেছিল। পিতার সাহচর্যে বাল্যে তিনি একটি ধ্যানগম্ভীর অথচ প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আবার অন্য দিকে মাতৃহারা বালক-কিশোর রবীন্দ্রনাথ বউঠাকুরাণীর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কাদম্বরী দেবী) সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর শিল্পীমানস ও কবিহৃদয় ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের উৎসাহ, অক্ষয়কুমার চৌধুরীর সাহচর্য, বিহারীলালের গীতিরস-সিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত পিপাসা তাঁর কবিসত্তাকে আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল করে তুলল। তার সঙ্গে চলছিল শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে তর্জমা। মনে তখন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত ফরাসী রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান 'পৌলবর্জিনী', আর চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত প্রাচীন মহাজনদের ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণবপদ। এর কিছু আগে ১২৮১ সনের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রচিত অভিলাষ" কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল—কবিতায় বালককবির নাম ছিল না। কিন্তু এটি তাঁরই রচনা। বোলপুরে থাকবার সময় তিনি 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে যে বীররসাত্মক কাব্য লিখেছিলেন তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম স্বাক্ষর-যুক্ত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' ১৮৭৫ সালের হিন্দুমেলায় পঠিত হয়—এটি হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীতে'র অনুকরণে রচিত। এ হল তাঁর কাব্যজীবনের নীহারিকামণ্ডল, এর মধ্যে ধূম্র-সলিল-মরুতের বড়ো বাড়াবাড়ি। এ হচ্ছে তাঁর শৈশবের গন্ধর্বলোক, মৃত্তিকার সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই।

আমরা রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমার প্রথম তিন বছরকে শৈশব বা সূচনাপর্ব আখ্যা দিতে পারি—১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই এই পর্বের পূর্ণ বিকাশ। এই ক'বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য। 'শৈশবসঙ্গীত' ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হলেও এর আগে রচিত

অনেক কবিতা এতে স্থান পেয়েছিল। এই সূচনাপর্বের অধিকাংশ কাব্যই রোমান্টিক, গীতিধর্মী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ আখ্যানকাব্য; সে আখ্যান প্রায়ই ব্যর্থ প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং সে ব্যর্থ প্রেমের নায়ক হচ্ছেন একজন কবি। এই কবির মধ্যে দিয়ে আমাদের কিশোর কবি অপরিণত বয়সের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি কামনা করেছেন। 'শৈশবসঙ্গীতে'র কয়েকটি কবিতায় ভাবীকালের মহাকবির কিছু আভাস লক্ষ্য করা যাবে। বাল্যকৈশোরের এই সমস্ত তরল আবেগপূর্ণ কাব্য-কবিতা এবং জলীয় আবেগপূর্ণ নাট্যধর্মী কাব্যোচ্ছ্বাসের জন্য কবি উত্তরকালে কিছু সঙ্কুচিত হয়েছিলেন—হবার কারণও ছিল। এই অপরিণত রচনাগুলির মধ্যে শুধু ভাবের মেঘ জমে উঠেছিল, তখনও রসের বর্ষণ শুরু হয়নি। তবু দেখা যাচ্ছে নাগরিক জীবন-বহির্ভূত উদার পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে ফিরে গিয়ে মুক্তির স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা কিশোর-কবিকে যে অ-ধরার পিছনে ধাবিত করিয়েছিল, সেই বৈশিষ্ট্যটি উত্তরকালে প্রকৃতি-প্রেম ও মানবের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ রোমান্টিকতার তুরীয় লোকে উত্থিত হয়েছে।

অবশ্য কিশোর-কবি প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলেন ১২৮৪ সনের বর্ষাকালে (ইংরাজী ১৮৭৮), যখন তিনি বাঁধাবাঁধি ছন্দের ছক ছেড়ে দিয়ে, রোমান্টিক কাহিনীর স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাবমান না হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলির ঢঙে লিখলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। বালক-কবি চ্যাটারটনের (১৭৫২-৭০) গল্প শুনে লেখা এই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীও একপ্রকার অনুকরণ। কিন্তু অনুকরণের মধ্যে কবির প্রথম স্বাতন্ত্র্য ফুটল। ভাবে-ভাষায় আধুনিক কালের যাঁরা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সতের বছরের রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ই অনেকটা মূলের নিকটবর্তী হয়েছে। উত্তরকালে এ কাব্যের জন্য তিনি কিছু বিব্রত বোধ করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, এ-কাব্য নিছক নকল-কাব্য হয়েছে, আসলের কোন স্বাদই এ-থেকে নাকি পাওয়া যায় না। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র আভ্যন্তরীণ দিক থেকে মৌলিক প্রভেদ থাকলেও কিশোর-কবি এতে যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা স্বীকার করতে হবে।

২. উন্মেষ পর্ব

১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মোট চার বৎসরের মধ্যে তাঁর যে

কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম কবি রোমান্টিক মহাকাশসঞ্চরণ পরিত্যাগ করে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন এবং এই পর্ব থেকেই তাঁর কাব্যধারার যথার্থ বিকাশ শুরু হল। এই পর্বের মধ্যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৩), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)—এই কাব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী পূর্বের পর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই পর্বে তিনি অস্ফুটভাব ও তরল আবেগের পিচ্ছিল পথ ছেড়ে দিয়ে স্বকীয় ভাব-ভাবনার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হলেন। এদিক দিয়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত' দু'খানি কাব্য সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' অকারণ বিষণ্ণতা, সঙ্কীর্ণতার চেতনার বেদনা, এবং আপনার মধ্যে আপনি গুটিয়ে থাকার বিড়ম্বনা যে রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তা কিছু পরিমাণে চিরাচরিত রোমান্টিক হা-হুতাশেরই অঙ্গীভূত। এই যে চেতনার সীমাবদ্ধতা, এ প্রথম বিশালতর প্রাঙ্গণে মুক্তিলাভ করল 'প্রভাত-সঙ্গীতে'। প্রভাত যেমন সন্ধ্যার বিপরীত, 'প্রভাতসঙ্গীত'ও তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিপরীত। 'প্রভাতসঙ্গীতে'র "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" সমস্ত কাব্য এবং কবিমনের প্রতীক বলে গৃহীত হতে পারে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবিহৃদয় অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, মানুষের সমাজ থেকে কবি নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা কৃত্রিম বিষণ্ণতার পরিমণ্ডলে স্থাপন করেছিলেন। 'প্রভাতসঙ্গীতে' তিনি হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। তিনি দেখলেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল, হৃদয়ের উত্তাপে শিলীভূত তুষার বিগলিত হল। এখন কবি আর রুদ্ধ বাতায়নে সন্ধ্যার ছায়াময় বেদনায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে চাইলেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রেমে ও আনন্দে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। 'প্রভাতসঙ্গীতে'র রচনারীতি ও ভাবাবেগ কুহেলিকামুক্ত নয় বটে, কিন্তু এই কাব্যে তিনি নিজস্ব সুরসাধনার ঠিক খবরটি পেলেন। প্রেম ও আনন্দ—যা রবীন্দ্র-কবিভাবনাকে একটা বিচিত্র ঐশ্বর্য ও অভাবনীয় সার্থকতার পথে প্রেরণ করেছে, তার প্রথম সূচনা 'প্রভাতসঙ্গীতে'।

এই জগৎ-প্রতীতি ও মর্ত্যের প্রতি মমতা পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গানে' দৈনন্দিন জীবনের আনন্দবেদনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল। 'প্রভাতসঙ্গীতে'র

বিশালতা নয়, প্রতিদিনের জীবনের ছোটখাট ছবি গানের সুরে বেজে উঠল। কবিদৃষ্টি ক্রমেই মৃত্তিকার বুকে নেমে আসছে, 'ছবি ও গান' থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অবশ্য কাব্যকলা ও রচনাসমুৎকর্ষ বিচার করলে 'ছবি ও গান' কিছু দুর্বল মনে হবে। এ কাব্য চিত্রধর্মী ও সঙ্গীতধর্মী বটে, কিন্তু সে চিত্র অস্পষ্ট, সে সঙ্গীত অস্ফুট—রচনারীতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। কিন্তু ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। 'কড়ি ও কোমলে'ই রবীন্দ্র-কবিজীবনের প্রথম পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যাবে। এই কাব্যে তিনি মর্ত্যজীবনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে বলেছেন।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

জগতের সৌন্দর্যকে দস্যুর মতো লুঠ করে নিয়ে যৌবনের মাদকরসে মত্ত হয়ে কবি মর্ত্যধরিত্রীর আর একটি মোহময় রূপ আবিষ্কার করলেন। জগতের প্রতি আসক্তি, নারীরূপের প্রতি উত্তপ্ত কামনার দিব্যরাগ ইত্যাদি অভিনব ব্যাপার—যাকে খানিকটা সুইনবার্নসুলভ ইন্দ্রিয়পরবশ বলে মনে হয়, সেগুলি নিটোল সনেটের মধ্যে মর্ত্যের রস সৃষ্টি করল। মনে হয়, রবীন্দ্র-জীবনে এই সনেটগুচ্ছ যেন গ্রহান্তরের জীব। কারণ এর মধ্যে নারীদেহের প্রতি যে রূপোচ্ছ্বাস উচ্ছ্রিত হয়েছে, তাতে খানিকটা ইন্দ্রিয়জ আসক্তির উত্তাপ আছে। সেজন্য সে যুগের কেউ কেউ এর মধ্যে রুচিবিকার লক্ষ্য করে বিষন্ন হয়েছিলেন, কেউ-বা এর প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ ব্যঙ্গকটাক্ষও নিক্ষেপ করেছিলেন (যথা, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ছদ্মনামে লেখা 'মিঠেকড়া')। কিন্তু ইন্দ্রিয়-পারবশ্যের মধ্যেই এ কাব্যের সমাপ্তি নয়, শেষ পর্যন্ত কবি উচ্ছ্বসিত সুধাপাত্রকে অধরাগ্র থেকে ফিরিয়ে দিলেন; আসক্তির মধ্যে, দেহের উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অসহ উল্লাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর বন্দী হয়ে থাকতে পারলেন না—'কড়ি ও কোমলে'র ইন্দ্রিয়ময় জগৎ থেকে মুক্তির সন্ধান করতে লাগলেন, লাবণ্যের সীমাবদ্ধ জগৎ থেকে যে মুক্তির কামনা করলেন, তার বিচিত্র ঐশ্বর্য পরবর্তী পর্বে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ নিয়ে প্রকাশিত হল।

৩. ঐশ্বর্য পর্ব

রবীন্দ্রনাথের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে লেখা এই পর্বটিকে কেউ

কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় বলতে চান। কারণ তাঁর অতিপ্রসিদ্ধ কাব্যের অনেকগুলি এই পর্বে প্রকাশিত হয়। শিল্পরূপ, আবেগ, রোমাণ্টিকতা ও গভীর প্রত্যয়ের এমন সমন্বয় অন্য পর্বে এতটা হয়েছে কিনা সন্দেহ। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬) এই চারখানি কাব্যের মধ্যে কবিচেতনার এক অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যাবে। অবশ্য পরবর্তী পর্বে 'নৈবেদ্য', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হলেও কাব্যসৃষ্টির মৌলিকতা, শিল্পরূপ এবং চৈতন্যের গভীর উপলব্ধি বিচার করলে এই ছয় বৎসরের কাব্যের ফসলকে অসাধারণ তাৎপর্যময় মনে হবে। 'কড়ি ও কোমলে' কবিচিত্ত পার্থিব চেতনার উত্তাপের মধ্যে যেন শান্তি পাচ্ছিল না, 'মানসীর' মধ্যেও ঐ ধরনের অশান্তি, দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। প্রেম ও প্রকৃতি —'মানসী'র এই দুটো প্রধান সুরের মধ্যেই সেই সংশয় ঘনায়িত হয়েছে। দেহ ও আত্মার অন্বয় সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও তিনি পূর্ণতর চেতনার সাক্ষাৎ পাননি, প্রেমকে দেহচেতনার অঙ্গীভূত করে দেখছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁর মানসিক বিক্ষোভ। বাসনার উত্তাপে প্রেমকে পাওয়া যায় না—"নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে"। তাই 'মানসী' কাব্যে কবি শেষ পর্যন্ত মর্ত্যকেন্দ্রিক বাসনাবন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে 'অনাদি কালের হৃদয়-উৎস' থেকে প্রবাহিত 'যুগল প্রেমের স্রোতে' ভেসে গেছেন এবং "আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা"—এই কথা বলে দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের জগৎ থেকে বিদায় চেয়েছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের মিল ঘটাতে না পারার জন্যই কবি পোষমানা প্রাণের দাস্যগিরি ত্যাগ করে বন্য-বর্বর জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছেন; কখনও প্রকৃতির মধ্যে দ্বৈতসত্তা লক্ষ্য করেছেন, কখনও তার মধ্যে বীভৎস মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছেন, কখনও-বা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পরম ঐক্যকে ('অহল্যার প্রতি') আবিষ্কার করেছেন, কখনও ক্ষুব্ধ চিত্তে বাঙালী-জীবনের সঙ্কীর্ণতার দিকে ব্যঙ্গের কটাক্ষপাত করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে কবি যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না, জীবন প্রতীতির দুই প্রান্তকে মেলাতে পারছেন না। মানসীর রচনারীতি সাফল্য লাভ করলেও কবিমানস তখনও বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ঠিক খবরটি পায়নি। এর সামান্য পরে প্রকাশিত 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ক্রমে স্থৈর্যের সন্ধান পেল, অশান্ত বিক্ষোভ অনেকটা দূর হল।

'সোনার তরী' রবীন্দ্র-কবিজীবনের একটা বিশেষ প্রতীক বলে গৃহীত হতে

পারে। এ-কাব্যে নিসর্গের অপূর্ব মাধুরী ব্যক্তিমানসের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল, কবি যেন জাতিস্মর হয়ে সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে নিজ জীবনপ্রবাহকে অঙ্গীভূত করে উপলব্ধি করলেন ('সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা')। এই কাব্য থেকেই মানসসুন্দরী জীবনদেবতা তত্ত্বের প্রথম পুরো রূপটি চোখে পড়ল। প্রেমকে একটি নির্বস্তুক ভাবস্বরূপ না দেখে তাকে তিনি মানবিক প্রতীকরূপে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করলেন। অবশ্য 'সোনার তরীতে'ও কবির সঙ্গে মানসসুন্দরীর পরিপূর্ণ মিলনের অদ্বয় যোগ স্থাপিত হয়নি। এর প্রথম কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি জীবনের উপকূলে বসে যত সোনার ধান সঞ্চয় করেছিলেন, সোনার তরীর নাবিক এসে সে সমস্ত তুলে নিয়ে চলে গেল, কিন্তু কবিকে সে তরণীতে ঠাঁই দিল না। কিন্তু সর্বশেষ কবিতায় ('নিরুদ্দেশ যাত্রা') দেখা যাচ্ছে নৌকায় কবির ঠাঁই মিলেছে, কিন্তু তখনও অপরিচয়ের রহস্য এবং যাত্রাসঙ্গিনীর নিগূঢ়তা রয়ে গেছে। এ-কাব্যে কবির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সঙ্গে মিলনের সূত্রপাত হয়েছে—এটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, বিশ্বসাহিত্যেও এর স্থান অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা এ কাব্যের সম্পদ। এতে মানস-সুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব একটা পরিপূর্ণ সমন্বয় ও ঐক্যের মধ্যে মিলিত হয়েছে—প্রথম কবিতা 'চিত্রা', 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী', 'সিন্ধুপারে'—এই কবিতাগুলি হচ্ছে রবীন্দ্র-কবিজীবনের সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, জীবনদেবতা বিষয়ক বৃত্তের প্রথম সঙ্কলন। এর মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন তাঁর ছোট সত্তার সঙ্গে একটি বড়ো সত্তার নিত্যই মিলনলীলা চলেছে। তাকে তিনি কখনও অন্তর্যামী, কখনও মানসসুন্দরী, কখনও লীলাসঙ্গিনী ('পূরবী') কখনও বা জীবন-দেবতা বলেছেন। এই তত্ত্বকথাটি পরবর্তী কাব্যগুচ্ছে কখনও বিনম্রভক্তির একান্ত আত্মনিবেদনে, কখনও-বা প্রেমসৌন্দর্যের মানবিক রক্তরাগে উদ্ভাসিত হয়েছে। 'চিত্রা' কাব্যে বাইরের সঙ্গে অন্তরের, সীমার সঙ্গে সীমাতীতের, বিচিত্রের সঙ্গে ঐক্যের এমন নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের অন্য কাব্যেও বড়ো একটা দেখা যায় না। বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য ও অনৈক্যের মধ্যে যে বিপুল ঐক্যের সূত্র অদৃশ্যভাবে রয়েছে কবি সেই গূঢ় সত্যটি এতে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন। শিল্প, সৌন্দর্য, তত্ত্ব প্রভৃতি বিচার করলে 'চিত্রা' কাব্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব দিতে হয়।

সৌন্দর্যের অপ্রয়োজনের উল্লাস, রবীন্দ্রনাথের শিল্পী চিত্তে যা বার বার আসা যাওয়া করেছে, তারও সূচনা 'উর্বশী' কবিতা থেকে। এইজন্য 'চিত্রা' কাব্যকে বিশেষ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

'চিত্রা' কাব্যের এক বৎসর পরে প্রকাশিত হল 'চৈতালি'—এতেই এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষিত হল। পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দ, ঐশ্বর্য, খণ্ড ও প্রত্যহকে অখণ্ড অনন্তের সঙ্গে গেঁথে তুলবার ইচ্ছা এবং প্রাচীন ও পুরাতন ভারতবর্ষের মধ্যে মানসপরিক্রমা—গাঢ়বন্ধ সনেটের মধ্যে চমৎকার ফুটেছে। এই পর্বের সর্বশেষ কাব্য বলে একে চৈতালি ফসলের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। এর পর তাঁর মন প্রাচীন ভারত, কল্পজগৎ ও বিশাল সৌন্দর্যলোকের মধ্যে আর একপ্রকার মুক্তি পেল।

৪. অন্তর্বর্তী পর্ব

আগের পর্বে আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ প্রেম, সৌন্দর্য ও জীবনদেবতা তত্ত্বের বিচিত্র ঐশ্বর্য ও শিল্পীর কলাকৃতির সাহায্যে জগৎ ও জীবনের মাঙ্গলিক রচনা করেছিলেন। কবি সর্বদা সীমাবদ্ধ প্রত্যয় ও অসীম চৈতন্যের বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হয়েছেন। অবশ্য 'চৈতালি' পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব অনেকটা নির্দ্বন্দ্ব সমীকরণের রেখা আবিষ্কার করেছে। 'চৈতালি'র কবি প্রাচীন ভারতকে যে নবরূপে আবিষ্কার করেছেন, পরবর্তী পর্বে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'স্মরণ' (১৯০২-১৯০৩), 'শিশু' (১৯০৬), 'উৎসর্গ' (১৯১৪ সালে প্রকাশিত) এবং 'খেয়া' (১৯১০)—মোট দশ বৎসরের মধ্যে দশখানি কাব্য বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নেই। শুধু একটি বৎসরেই (১৯০০) চারখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা'র ইতিহাস-পরিক্রমা এবং প্রাচীন ভারতীয় জীবনে পদচারণা মূর্ত হয়ে উঠল। 'কল্পনা' কাব্য এই পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপক্ব সৃষ্টি। 'কল্পনার' একদিকে রয়েছে প্রাচীন ভারত আবিষ্কারের ব্যাকুলতা আর একদিকে আছে আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বীর্যবান প্রাণশক্তির জয়ঘোষণা। তাঁর এক মন "দূরে বহুদূরে উজ্জয়িনী পুরে" নিশীথরাতের অন্ধকারে পূর্বজন্মের প্রিয়াকে সন্ধান করেছে, আর এক মন সমস্ত বাধাবিপত্তি চূর্ণ করে নভোচারী হতে চেয়েছে এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গের মধ্যে অবারিত প্রাণাবেগের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে—"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।" তাই

দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসী বৈশাখের খর তাপ এবং জলভারাতুর বর্ষার কাজরী গাথার মধ্যে কবিকল্পনার অপরূপ সমাবেশ হয়েছে। 'বর্ষশেষ' এবং 'অশেষে'র মধ্যে দীপ্ত জীবনের জয়োল্লাস নবদিগন্তে নতুন আশার বিদ্যুৎকণা হেনেছে। 'ক্ষণিকা'র মধ্যে আপাত চটুল ছন্দ ও বাগ্‌বিন্যাসের হাল্‌কারীতির সাহায্যে কবি যেন ক্ষণশাশ্বতীর বন্দনা করেছেন। পরবর্তী কালে 'বলাকা' কাব্যের তত্ত্বলোকে কবির যে মানসমুক্তি ঘটেছিল, 'ক্ষণিকা'র মধ্যে প্রেম, সৌন্দর্য ও নিসর্গলোকে সেই মুক্তি ঘটল। জগতকে ভালোবেসে এর মানব-যাত্রায় যোগ দিয়ে 'ক্ষণিকা'র কবি ক্ষণমুহূর্তকেই অনন্তের রসে পূর্ণ করে তুললেন। কিন্তু সবশেষে কবি দেখলেন, "সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা"—'গীতাঞ্জলি'র সুরসাধনার প্রথম ইঙ্গিত এই পংক্তিতেই চকিতে ফুটে উঠল।

'নৈবেদ্য'-এর কয়েকটি গীতিধর্মী কবিতা ও সনেটে তদানীন্তন ভারতের নবজাগ্রত জীবনপিপাসা, প্রাচীন ভারতের আত্মস্থ স্থিতধী অবস্থা এবং সর্বোপরি প্রাণেশের সঙ্গে কবির নিবিড়তর আসক্তির কথা চমৎকার ফুটেছে। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দেশের ভোগলোলুপ সভ্যতাকে সুকঠোর সমালোচনা করে এবং তদানীন্তন ভারতের জড়ত্বের দাসত্বকে নিন্দা করে তিনি এমন কয়েকটি সনেট লেখেন যাতে তিনি আর শুধু কবিমাত্র রইলেন না, দেশের 'প্রফেট'-রূপে দেখা দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, পুত্রকন্যাদের কেউ কেউ ইহলোক ত্যাগ করেছে। কবির ব্যক্তিগত জীবনে অনেক দুর্ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে। কবি স্ত্রীপুত্রের শূন্য স্মৃতি বুকে করে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিত্য কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীবিয়োগজনিত শোককাব্য 'স্মরণ' রচনা করেন। জীবনে যিনি কল্যাণী-গেহিনী ছিলেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত সত্তা ক্ষিত্যপতেজমরুদ্‌ব্যোমে মিশে যেতে পারে না। 'স্মরণে' কবি জীবনসঙ্গিনীকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন রূপে খুঁজে পেলেন। এর পর প্রকাশিত 'শিশু' কাব্যটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাতৃহারা শিশু ক'টিকে কিছু আনন্দ দেবার জন্য কবি রূপকথাপ্রিয় শিশুচিত্তের অপূর্ব কাব্য রচনা করলেন। এই 'শিশু' কাব্য শিশুমনের কাব্যকবিতা হিসেবে অতি বিস্ময়কর। কেউ কেউ শিশুজীবনের রূপকে ('ব্লুবার্ড' ও 'পিটার প্যান') অনেক তত্ত্বকথা বলেছেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো শিশুমনের অন্তঃপুরে আর বড়ো কেউ প্রবেশ করতে পারেননি। এর পর প্রকাশিত হল 'খেয়া'—এ নামটি খুবই ইঙ্গিতবহ। এই 'খেয়া' কাব্যেই

এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। এই সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই কবির জীবনের নানা অশান্তি ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের জড়ত্ব, অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে দেশের মনের সঙ্গে কবির যোগস্থাপন—কিন্তু তিনি বেশীদিন এইভাবে আত্মরসে নিমগ্ন থাকতে পারলেন না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে যুবশক্তি যখন সন্ত্রাসবাদের গোপন গুহায় বিস্ফোরক সঞ্চিত করছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই রাজনৈতিক দলাদলি ও রক্তাক্ত বিদ্বেষের মধ্যে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সন্ত্রাসবাদের চাপা গর্জনকে উপেক্ষা করে খেয়াতরী নিয়ে অকূলে ভাসলেন। ক্লান্ত কবি বলে উঠলেন ঃ

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই,
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

এবার কবি দলাদলি, দলভাঙা প্রভৃতি বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিলেন। কারণ তখন তিনি ক্লান্তশ্রান্ত চিত্তে ওপারের দিকে চেয়ে "দুখযামিনীর বুকচেরা ধন" প্রত্যক্ষ করলেন—এবার 'চিত্রা'-'কল্পনার' জগৎ ছেড়ে নতুন জগতের দিকে তিনি খেয়া নৌকা ভাসালেন—এ হল 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্যে'র যুগ। একদিকে রূপজগৎ আর একদিকে অরূপজগৎ—এই দুয়ের মাঝখানে 'খেয়ার' জগৎ। খেয়া নৌকা যেমন একঘাট থেকে অপরঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি কবিও প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে ভক্তি ও অধ্যাত্ম সাধনার জ্যোতির্ময়লোকে যাত্রা করলেন।

৫. গীতাঞ্জলি পর্ব

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সাধারণ সমাজে 'গীতাঞ্জলি'র জন্য সর্বপ্রথম সার্বজনীন গৌরব লাভ করেছিলেন। তিনি যে বিশ্বকবি বলে সুধীসমাজে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তারও অন্যতম প্রধান কারণ—এই 'গীতাঞ্জলি'। ১৯১৩ সালে সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী গদ্যানুবাদ *Song Offerings*-এর (এতে 'গীতাঞ্জলি' ছাড়াও অন্য কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ গৃহীত হয়েছিল) জন্য তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করলেন। এর ফলে তিনি স্বদেশে-বিদেশে আশাতীত প্রশংসা লাভ করলেন, এদেশে যাঁরা নানা কারণে তাঁর কবিতার প্রতিকূল সমালোচক ছিলেন, তাঁরাও এ ঘটনার পর দ্রুতবেগে ভোল পাল্টে ফেললেন, বিদেশের গুণিসমাজ তাঁকে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং নবীন ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা বলে

গ্রহণ করলেন। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে য়ুরোপ-আমেরিকায় তাঁর বিরুদ্ধসমালোচনাও হয়েছিল। আবার য়ুরোপের কোন রাষ্ট্রধুরন্ধর (ইতালির সিনর মুসোলিনী) তাঁর আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তাকে নিজেদের স্বার্থসাধনেও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কার্যে, চিন্তায় ও আচরণে অতিশয় পরিমিতাচারী ও বিচক্ষণ কবি সে ফাঁদে পা দেননি। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং স্বদেশে গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রধানত 'গীতাঞ্জলি'ই দায়ী। এই 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০) সমসাময়িক এবং কোন কোন দিক দিয়ে সমধর্মী আরও দু'খানি গীতিসংগ্রহ 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) এবং 'গীতালি' (১৯১৫)—এই তিনখানি কাব্যকে অবলম্বন করে এই পর্বকে 'গীতাঞ্জলি' পর্ব নাম দেওয়া যেতে পারে। আবার এই পর্বটির বৈশিষ্ট্য বিচার করে একে রবীন্দ্রকবিজীবনের অধ্যাত্মপর্ব'ও বলতে পারা যায়। কারণ এই তিনখানি গীতিসংগ্রহের মূলকথা কবির সঙ্গে তাঁর ঈশ্বরচেতনার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ।

এর আগে 'খেয়া' কাব্যে দেখা গেছে, কবি বস্তুলোকের ঘাট ছেড়ে অন্তর্লোকের সুদূর তীর্থে যাত্রী হতে চেয়েছেন—গীতাঞ্জলিতে সেই অন্তর্লোকের রহস্য ধরা দিয়েছে। কবি এই গীতিসংগ্রহে অন্তরদেবতাকে প্রিয়রূপে, সখারূপে, প্রাণেশরূপে—মানবসম্পর্কের বিভিন্ন রূপ ও রসের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করলেন। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে মিলনের পূর্ণ রূপটি যেন ঠিক ফুটে উঠতে পারেনি। এ কাব্য বিরহের রসে আর্দ্র। ধনজনমানসম্ভ্রমের অযুত বাধা যেন কিছুতেই ঘুচতে চায় না, চরণধূলার তলে মাথা নত হতে চায় না। তাই কবিকে ঝড়ের রাতে প্রিয়ের অভিসারে যেতে হয়, কখনও-বা আষাঢ়সন্ধ্যায় শূন্যঘরে হতাশমনে কবি অপেক্ষা করেন, "ঐ যে আসে আসে, আসে।" এই মিলনের জন্য বুকফাটা আর্তি 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে একই সঙ্গে ভাগবত মহিমা ও মানবরস ভরে দিয়েছে। আত্মনিবেদনের এমন সুর পৃথিবীর কোন ভাষায় এতটা আন্তরিকভাবে বেজে ওঠেনি। অবশ্য ইদানীং কেউ কেউ এই কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলতে চান না, কারণ এতে রোমান্টিক ঐশ্বর্য ও মানবিক অনুভূতির চেয়ে একটি স্থির অচপল অধ্যাত্ম মহিমা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, নীতিবাদ বা সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণমূলক ধর্মসাধনা এ কবিতার প্রাণবিন্দু নয়। তীব্র বিরহের আর্তি ও মিলনের পিপাসা অধ্যাত্ম-রেণুরঞ্জিত হয়ে এই গীতিনিবেদনত্রয়কে সত্যকারের কাব্যরূপ দান করেছে। 'চিত্রা' থেকে

'কল্পনা', 'খেয়া' পর্যন্ত জীবনদেবতা, মানসসুন্দরী, অন্তর্যামী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কবিমানস বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে অগ্রবর্তী হচ্ছিল, 'গীতাঞ্জলি'তে তারই স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম লক্ষ্য করা যাবে। যাঁরা কাব্য থেকে ব্যক্তি-চেতনার গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধি বাদ দিতে চান, তাঁরা পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে বঞ্চিত হবেন—রবীন্দ্রনাথকেও যথার্থ ধরতে পারবেন না। কবিত্বের দিক থেকে কবিগুরুর 'চিত্রা' ও 'কল্পনা' অধিকতর সার্থক হলেও তাঁর অন্তর্জীবনের মূল রহস্যের চাবিকাঠি যে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্যত্রয়ের মধ্যেই আবদ্ধ তা অস্বীকার করা যায় না।

'গীতালি'-তে অধ্যাত্ম চেতনার আর এক ধরনের বৈচিত্র্য দেখা গেল। এটি মূলত গীতিসংগ্রহ—তত্ত্ব নয়, অধ্যাত্ম সাধনাও নয়। কবির প্রাণেশ দেখা দিলেন প্রেমিকের বেশে—এবং উভয়ের মধ্যে লীলারসের সম্পর্ক ফুটে উঠল। তাই কবি সার্থক আনন্দের সুরে বলে উঠলেন, "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।" উপলব্ধির নিবিড়তা 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'কে 'গীতাঞ্জলি'র চেয়ে আর একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য দিয়েছে, তা হচ্ছে জীবনেশ্বরের সঙ্গে মর্ত্যসম্পর্কের মধ্যে বিধৃত কবির মানবাসক্তির রক্তরাগ। কিন্তু 'গীতালি'তে 'গীতাঞ্জলি'র তত্ত্ব-প্রাধান্য আবার ফিরে এসেছে। অবশ্য রবীন্দ্র-কবিজীবনের অধ্যাত্ম পিপাসাকে নস্যাৎ করা যায় না, সে অনুভূতি প্রতিপর্বেই নানা বিচিত্র বেশে আবির্ভূত হয়েছে। মহর্ষির সান্নিধ্য ও উপনিষদের তত্ত্বরসে নিস্নাত হয়ে এবং বাংলার বৈষ্ণব কাব্য ও মধ্যযুগীয় ভারতের সন্ত-সাহিত্যের ভক্তিরসে অবগাহন করে রবীন্দ্রনাথ যে এই তিনখানি গীতিগুচ্ছ সঙ্কলন করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে এটুকু নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, অধ্যাত্মরসের গানগুলিতেও পার্থিব আসক্তির উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই নিছক ভজনগীতিকার নীরিখে এই গীতিসংগ্রহকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না।

৬. বলাকা পর্ব

রবীন্দ্র-কবিজীবনের সর্বশেষ পরিণত পরিপক্ব পর্বকে আমরা 'বলাকা'র নামানুসারে চিহ্নিত করতে পারি। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) এবং 'মহুয়া' (১৯২৯)—এই পর্বের তিনখানি কাব্য রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় জীবনের প্রসন্ন স্নিগ্ধতার মধ্যে রচিত হলেও এর প্রত্যেকখানিতে যে জাগ্রত জীবনবোধ,

বুদ্ধির যে বিস্ময়কর দীপ্তি এবং বিশ্ব সম্বন্ধে যে বিশালতার ইঙ্গিত রয়েছে, তা তাঁর প্রৌঢ় জীবনের একপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার বলেই মনে হবে। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের স্বাভাবিক প্রবণতা অধ্যাত্মমুখী, কবিজীবনের সাধারণ রীতি ও প্রবণতা অনুসারে এইখানেই ছেদরেখা পড়তে পারে। কিন্তু সহসা ঝড়ের বেগে কবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এল 'বলাকা'। এর কিছু পূর্বে তিনি পশ্চিমবিশ্ব পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন, য়ুরোপে তখন সর্বনাশা যুদ্ধ ও মৃত্যুর প্রভাবে মানবচিত্ত ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফরাসী দার্শনিক আঁরি লুই বার্গ্‌সঁ (১৮৫৯-১৯৪১)-এর *Elan Vital* বা ক্রমবিকাশশীল গতিতত্ত্ব য়ুরোপের দার্শনিক ও শিল্পীমহলে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। এই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক মতবাদে স্থিতিকে, জড়ত্বকে নস্যাৎ করে গতিবাদের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। থেমে থাকা মিথ্যা, বিরতির নাম মৃত্যু, সত্যের সংজ্ঞা হল অবিকারী ও অপরিণামী গতি। গতিবাদের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব এ কাব্যে হৃদয়বেদ্য রসানুভূতিতে পরিণত হল, দর্শনের গতিবাদ হল কাব্যের গতিরাগ। 'শাজাহান', 'ছবি', 'চঞ্চলা', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতায় "ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবনমেখলা" কবিকে অনন্ত গতিবেগে চঞ্চল করে তুলল। তাঁর মনে হল, "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"। আবার কোন কোন কবিতায় ('ঝড়ের খেয়া') বৃহৎ জীবনের সঙ্গে জীবনের বাস্তব আদর্শও কবিকে উতলা করেছে, "যাত্রা কর যাত্রা কর, যাত্রীদল, এসেছে আদেশ"—এই বলে তিনি সকলকে চলার বেগে যাত্রা করতে আহ্বান করলেন। অবশ্য একথাও স্বীকার্য, 'বলাকা' কাব্যে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক গতিবাদ স্বীকৃত হয়নি। অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন গতি আস্তিক্যবাদী কবিকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়নি। তিনি যেমন গতির মধ্যে প্রচণ্ড জীবনোল্লাস উপলব্ধি করলেন, তেমনি দেখলেন যে, গতি ও স্থিতি, Becoming ও Being-এর মধ্যে একটা নিবিড় পরিণতির যোগ রয়েছে।—"এ দুয়ের মাঝে তবু আছে কোন মিল।" সে মিলের অর্থ—ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতম হয়ে ওঠাই জীবনের শেষ পরিণাম। সেই সত্যটি 'বলাকা' কাব্যের অন্ত্যপর্যায়ের কবিতার মধ্যে স্থির জ্যোতির্বিন্দুর মতো ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের বিচিত্র মুক্তছন্দ ও শব্দপ্রয়োগের অসাধারণ কৃতিত্ব বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের যৌবন মূর্তিকেই ফুটিয়ে তুলল।

'পলাতকা' কাব্যের মধ্যে মর্ত্যধরিত্রীর যে রূপটি ফুটেছে, 'পূরবী'র মধ্যে তাই-ই নবরূপে ও অপূর্ব দীপ্তির সঙ্গে জ্বলে উঠেছে। নিভবার আগে দীপশিখা শেষ

বারের মতো জ্বলে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অন্ত্যপর্বের অভিনব কাব্যপ্রকরণে যাবার আগে 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র মধ্যে রঙিন যৌবনের সমস্ত আবেগ-আসক্তি ঢেলে দিয়ে বৈরাগ্যের গেরুয়া উত্তরীয় ধারণ করে নতুন জগতে অবতীর্ণ হলেন। 'পূরবী' কাব্যে আবার তিনি 'লীলাসঙ্গিনী'র হাতছানি লক্ষ্য করলেন; কিন্তু তখন যৌবনের কিংশুকমঞ্জরী ঝরে পড়েছে, রবির ছন্দে পূরবীর বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হয়েছে। 'বলাকা'র কোন কোন কবিতা তত্ত্বের দিক থেকে বিস্ময়কর হলেও 'পূরবীর' "তপোভঙ্গ" রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পেতে পারে। মহেশ্বরের তপোভঙ্গের প্রতীকের মধ্য দিয়ে কবি নিজের কাব্যজীবনের অখণ্ড সৌন্দর্য ও যৌবনের জয়মাল্য ধারণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আর এক বিচিত্র যৌবনমূর্তির পরিচয় ফুটে উঠল 'মহুয়া' কাব্যে। তিনি প্রেমের সাধনবেগকে প্রতিদিনের তুচ্ছতা ও আরামের পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করে তাকে বৃহৎ ও মহৎ কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—যেমন "উজ্জীবন" কবিতাটি। এর আগে প্রেমের রোমান্টিক সৌন্দর্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে এত বীর্য ছিল না। সত্তর বৎসর বয়সের পাণ্ডুর প্রান্তে পৌঁছেও তিনি জীবনের এই সজীবতা, উজ্জ্বলতা ও কর্তব্যকঠোর সাধনার নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন—এ একটা অপরূপ বিস্ময় বটে। 'পূরবী' ও 'মহুয়া'তে রবীন্দ্র-কবিজীবনের প্রধান পর্বের সমাপ্তি হল। এর পর ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪১ সালে—এগার বৎসরের মধ্যে তাঁর কবিধর্ম, সাধনা ও প্রকাশরীতি আর একটি নতুন পথ অবলম্বন করেছে, যার সঙ্গে এই সমস্ত পর্বের বিরোধিতা না থাকলেও আত্মীয়তার সম্পর্কও খুব নিবিড় নয়।

৭. অন্ত্য পর্ব

১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে বারো বৎসরে অতিবৃদ্ধ অশক্ত কবির বারোখানি কাব্য প্রকাশিত হল। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও কবিগুরুর সজীব মন ও উজ্জ্বল প্রাণশক্তির কিছুমাত্র খর্বতা হয়নি। অথচ শেষের দিকে তাঁকে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সঙ্কটমুহূর্ত অতিক্রম করতে হয়েছিল। দেহের দিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অপটু হয়ে পড়েছিলেন, তিনি বার্ধক্য ও ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণ তুচ্ছ করে কী করে যে বারোখানি কাব্যে একটি বিচিত্র পর্বের সূচনা করলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

এতদিন ধরে কবি যে রূপপদ্ধতি ও বাক্‌নির্মিতি অনুসরণ করে চলছিলেন

তার পরিচিত পথ পরিত্যাগ করে তিনি অনভ্যস্ত পথে চললেন। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' থেকে 'মহুয়া' (১৮৮২-১৯১৯) পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি কাব্যে যা বলেছেন, তার ছন্দ ও কলাধর্মকে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নতুন করে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু বাক্‌রীতি ও বিষয়বস্তুতে, একেবারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলতে যা বোঝায়, তার জন্য তাঁর উত্তরকালের কাব্যগুলিই সর্বাধিক প্রশংসা পেতে পারে। অবশ্য ১৯৩১ সালে রচিত 'বনবাণী'তে বৃক্ষবন্দনাসূচক যে কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাতে নিসর্গ-প্রকৃতির অপূর্ব রূপ অভিনব ধ্বনিমাধুর্য ও চিত্রপ্রতীকের সাহায্যে ফুঠে উঠেছে বটে, কিন্তু তার বাক্‌রীতি এমন কোন অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু 'পুনশ্চ' (১৯৩২) থেকে তাঁর নতুন কাব্যপ্রতীতির যাত্রা শুরু হল। 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' (১৯৩২-১৯৩৬)—চার বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হল—'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬)—অন্ত্যপর্বের প্রথম দিকের এই কয়খানি কাব্যকে আমরা 'পুনশ্চ'-বর্গের কাব্য বলতে পারি। 'বলাকা' কাব্যে প্রবহমান পয়ার ছন্দে যে সাফল্য দেখা গিয়েছিল, 'পুনশ্চ'বর্গের কাব্যগুলিতে তারই এক চূড়ান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল। 'পুনশ্চ' থেকেই গদ্যকবিতার সূচনা এবং 'শ্যামলী' পর্যন্ত গদ্যছন্দই রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের বাণীবাহক। 'লিপিকা'র গদ্যের অনুচ্ছেদবন্ধনে তিনি গদ্যকবিতার স্বাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য বাংলা গদ্যকবিতার আদিপ্রবর্তক রাজকৃষ্ণ রায় অনেক পূর্বে ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'অবসর সরোজিনী' কাব্যে গদ্যকবিতা রচনা করেছিলেন। সে যাই হোক, 'বলাকা' পর্বে ছন্দের যে মুক্তি দেখা দিল শেষজীবনের কয়েকখানি কাব্যে তাই গদ্যছন্দ নাম নিয়ে আরও স্বাধীন হয়ে পড়ল। এই কাব্যগুলিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি দৈনন্দিন ভাঙাচোরা জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। জীবনের পারঘাটে পৌঁছে তিনি মোহমুক্ত বৈরাগ্যের দৃষ্টি দিয়ে পরিপার্শ্বকে দেখে নিলেন। সেই জীবনরস সৃষ্টির জন্য এই গদ্যছন্দের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 'শ্যামলী'র "ছেলেটা" কবিতা কি সনাতন তানপ্রধান ছন্দে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করা যেত? অবশ্য একথাও মানতে হবে যে, 'পলাতকা' কাব্যে 'বলাকা'র মিত্রাক্ষর ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সে ছন্দ গদ্যছন্দ না হলেও তাতে তো দৈনন্দিন জীবনকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। কাজেই গদ্যছন্দকে বাহন হিসেবে না পেলে তিনি শেষজীবনের কাব্যগুলি সৃষ্টি করতে পারতেন না, তা মনে হয় না।

'পুনশ্চ'বর্গের পর কতকগুলি লঘুধরনের হাস্যপরিহাসযুক্ত কাব্যগ্রন্থ ('খাপছাড়া'—১৯৩৭ ; 'ছড়া ও ছবি—১৯৩৭ ; 'প্রহাসিনী'—১৯৩৯) প্রকাশিত হলে বৃদ্ধকবির কৌতুকরসোজ্জ্বল আর একধরনের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কিন্তু অন্ত্যপর্বের শেষবর্গের কয়েকখানি কাব্য এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'ছড়া' (১৯৪৩), 'শেষলেখা' (১৯৪১)—মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে এতগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর কবিজীবনের বিকাশধারা অধিকতর বিস্ময়জনক মনে হবে। প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও বাস্তব-দৃষ্টির অখণ্ড ঐক্য, যা এই শেষজীবনের কাব্যগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার বিচিত্র সুর এই কবিতাগুলিকে একটা বিশেষ মহিমা দিয়েছে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া চারিদিকে হানা দিয়ে ফিরছিল। সেই দারুণ-দুঃখদহনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক কবিও মৃত্তিকার মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, শেষজীবনের কবির রোগপাণ্ডুর ক্ষীণদৃষ্টি সমকালীন বিশ্বের অনাচার ও মৃত্যুমারীর বীজ দেখে চমকিত হয়ে উঠেছিল। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, সুদীর্ঘ জীবন ধরে প্রেম, রোমাণ্টিকতা, প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে বসে তিনি যা রচনা করেছেন, তার সঙ্গে দুঃখহত জনজীবনের কোন যোগ নেই। তাই তিনি নিজের পূর্বতন কবিজীবনকে ব্যর্থ বলেছেন। তাঁর এই যে প্রাণশক্তি, যা বার্ধক্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েও বাস্তব জগতের প্রতি মানবিক মমতায় আকৃষ্ট হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলিকে বরবাদ করতে চায়, তার নিষ্ঠা ও ঔদার্য শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার্য।

এইজন্য কেউ কেউ মনে করেন, ১৯৩৮-১৯৪১—এই তিন বৎসরেই রবীন্দ্র-কাব্যের যথার্থ বিকাশ হয়েছে। কারণ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রেম ও অধ্যাত্মবাদের আস্তিক্যবাদী কবি নীরক্ত রোমান্সের অবাস্তব পাণ্ডুরতা ত্যাগ করে কল্লোলিত বাস্তব ও পরিচিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়ে 'পৃথিবীর কবি' হতে চেয়েছেন। একথা অবশ্য ঠিক, শেষজীবনে তাঁর রোগম্লান দৃষ্টি পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলতে চেয়েছেন, ইতিহাসের রথচক্রে গতিবেগ দানে অভিলাষী হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে আর একটা কথাও যে সত্য, তিনি ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্ব ও

আত্মমুক্তির অনির্বাণ পিপাসার দ্বারাও শেষজীবনের ম্লান মুহূর্তগুলিকে আশ্বাসের রসে ভরে দিয়েছেন। অসীম বৈচিত্র্যপিয়াসী রবীন্দ্রনাথের কোন এক পর্বকে, অথবা বিবর্তন তত্ত্বানুসারে সর্বশেষেরটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। রবীন্দ্রকাব্যের অন্ত্যপর্বে মমতাময়ী পৃথিবী এবং সামান্য মানুষের প্রতি কবির যে আবেগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, তার জন্য তাঁর অসাধারণ মৌলিকতাই দায়ী। তাই বলে 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত পর্বকে 'চিত্রা' ও 'বলাকা' পর্বের সমগোত্র বা তার চেয়েও উৎকৃষ্ট বলার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্র-কবিমানসের তত্ত্বগত বিকাশের কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু স্বল্পপরিসরে তাঁর রূপনির্মিতিকৌশল, ভাব ও তত্ত্বের মৌলিকতা এবং বিকাশধারা, রোমান্টিক প্রতীতির স্বরূপ, অধ্যাত্মচেতনা ও কবি-প্রত্যয়ের সম্পর্ক, তাঁর কবিমানসে প্রাচীন ভারত, নব্যভারত ও আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনদর্শনের প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে দু'একটি ইঙ্গিত ছাড়া বিস্তারিতভাবে কিছু বলা গেল না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি কোন কোন উৎসাহী সমালোচক বলতে শুরু করেছেন যে, আধুনিক জীবনের বিবর্ণতা ও বিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক, ভাববাদী অধ্যাত্মপন্থী বিশাল প্রত্যয়ে কোন ঢেউ তোলেনি। কেউ আবার সুর চড়িয়ে বলছেন, রবীন্দ্রনাথ বড়ো জোর য়ুরোপের দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির সমতুল্য। এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। তবু উপসংহারে বলা যেতে পারে, সাহিত্যবিচারে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি শ্রেণীচিহ্ন এঁকে দেওয়া হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথকে অধ্যয়ন করতে বসে, তিনি কেন গ্যয়ঠে, র‍্যাবো, রিল্‌কে, কামু, সার্ত্র-এর আদর্শে পরিচালিত হলেন না, এ প্রশ্ন মূঢ়তার প্রশ্রয় থেকেই উঠেছে। শীলার কেন শেকস্‌পীয়র হলেন না, ভবভূতি কেন কালিদাস হলেন না, ম্যালার্মে কেন শেলী হলেন না, গোর্কী কেন টলস্টয় হলেন না, এ প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনি হাস্যকর—রবীন্দ্রনাথ কেন গ্যয়ঠে হলেন না, এই প্রশ্ন। সংক্ষেপে শুধু এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে বিশ্বসংস্কৃতির যে ধারাপ্রবাহ চলেছে, রবীন্দ্রকাব্য যে তারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাতে কোন সন্দেহ নেই।*

* সম্প্রতি কোন-এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটে শরৎচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্ধারিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজে আর জনপ্রিয় নন, বহুপঠিত নন। এ সংবাদ দেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে দুঃসংবাদ।

দ্বিতীয় উপচ্ছেদ ঃ নাটক

গীতিকবিরা সাধারণত ব্যক্তিগত ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হন বলে অনেক সময়ে নাটক রচনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না। কারণ নাটক হচ্ছে একপ্রকার মিশ্রধরনের বস্তুশিল্প (objective art)—যেখানে নাট্যকার নিজের কথাকে চাপা দিয়ে রঙ্গমঞ্চে কুশীলবের (নাটকের পাত্র-পাত্রী) কথা বলতেই বেশী ব্যস্ত থাকেন। অপরদিকে গীতিকবিরা নিজের কথাতেই মশগুল হয়ে থাকেন। তাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিরা অনেক সময়েই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হতে পারেন না। শেলী-কীট্‌স-ব্রাউনিং-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে য়ুরোপে নাটকের তথাকথিত বস্তুশিল্প ও নাট্যকারের নিঃস্পৃহতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ঐ সময়ে য়ুরোপের মানুষের মনে ও সমাজে নানা ধরনের উৎকট প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, নাট্যকারেরাও সামাজিক মানুষ। তাঁরা তাঁদের মনের কথাকে, ভাবাদর্শকে ও মতামতকে নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইলেন। যেমন ইবসেন, বার্নার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি প্রভৃতি। আবার অন্যদিকে কোন কোন রহস্যবাদী ও অধ্যাত্মপন্থী নাট্যকার রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরশায়ী সত্যকে নাটকের আধারে পরিবেশন করতে লাগলেন। যথা—মেটারলিঙ্ক, হপ্টম্যান, স্ট্রীণ্ডবার্গ, ইয়েট্‌স প্রভৃতি। এই ধারায় আমরা রবীন্দ্রনাটকের আলোচনা করলে তাঁর মধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পাব, যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে—শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও অভিনব মনে হবে।

রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলত গীতিকবির প্রতিভা—তা তিনি নাটক, গল্প-উপন্যাস যাই লিখুন না কেন। নিজস্ব আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন ও তত্ত্ববাদ তাঁর নাটকগুলিতে যে একটু প্রকটভাবে ধরা পড়বে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? রবীন্দ্র-সমালোচক ডঃ এডোয়ার্ড টমসন এ বিষয়ে একটি মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action." রবীন্দ্রনাথের নাটক, কাব্যনাটক, সাঙ্কেতিক নাটক—সবই কবিপ্রত্যয়ের বাহন হয়ে উঠেছে একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, কবিমনোভূমি এই নাটকের রঙ্গভূমি, এবং নাটকের চরিত্রগুলি তাঁরই মানস-সন্তান হলেও তত্ত্বের অনুরোধে বা কবির ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসের জন্য নাটকের নাট্যধর্ম ক্ষুণ্ণ না হয়ে এমন এক ধরনের নাট্যকলা সৃষ্টি

করেছে যে, বাংলা সাহিত্যে এ ধারাটির গৌরব কোনও দিনই খর্ব হবে না।

১. কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য

কৈশোর-যৌবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে লীরিক আবেগ, নাটকীয় ঘটনার বিকাশ এবং গীতিধর্ম (music) মিশে গিয়ে এক ধরনের বিচিত্র রস সৃষ্টি করেছিল। কৈশোর ও যৌবনে 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) এবং পরিপক্ক জীবনে 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৮৯৪), 'কাহিনী' (১৯০০)—এ সমস্ত কখনও নাট্যধর্মী কাব্য, কখনও কাব্যধর্মী নাটক, কখনও-বা গীতিনাট্য।* 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য, নাটকের আধারে সঙ্গীতপরিবেশনই এর মূল লক্ষ্য। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে, অবশ্য এতে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'রও প্রভাব আছে। এর বিচিত্র সুরসংযোজনা, বিশেষত প্রয়োজন স্থলে আইরিশ সুর ব্যবহার একদা শ্রোতৃসমাজকে মাতিয়ে দিয়েছিল। 'মায়ার খেলা' সখীসমিতির মহিলাদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য রচিত হয়েছিল, প্রেমের হাসিকান্নাই এর মুখ্য বক্তব্য। এসব নাটক-নাটিকা যেন গানের মালা গেঁথে ঘটনা বিকাশের চেষ্টা। ফলে গীতিপ্রবণতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, নাট্যলক্ষণ কিছু কম।

নিতান্ত কিশোর বয়সে লেখা 'রুদ্রচণ্ড' কাব্যধর্মী হলেও তার মধ্যে কিশোর-কবি কিছু নাটকীয় ঘটনাসংবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্যনাট্যে সর্বপ্রথম এমন একটা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের বিশেষ যোগ আছে। প্রেমের মধ্যেই মুক্তি আছে, শুষ্ক ও জীবন-বিরহিত বৈরাগ্যসাধনায় জীবনরস নেই, "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—উত্তরকালের এই কবিভাবনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বিদায় অভিশাপে' মহাভারতের কচ ও দেবযানীর ঘটনা গৃহীত হয়েছে। মাত্র দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রেমের রক্তরাগের ব্যর্থতা এবং পরিশেষে প্রসন্ন

---

* যে নাটকে কাব্যধর্ম অর্থাৎ লীরিক আবেগ ও কল্পনার প্রাধান্য থাকে তাকে কাব্যনাট্য এবং যে কাব্যে নাট্যলক্ষণ অর্থাৎ ঘটনা, সংঘাত, চরিত্র ও সংলাপ থাকে তাকে নাট্যকাব্য বলে।

নির্বেদের মধ্য দিয়ে এর যবনিকা নেমেছে। 'কাহিনী'তে প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস ও মহাকাব্যের চরিত্র ও ঘটনা সাফল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। "কর্ণকুন্তীসংবাদ", "গান্ধারীর আবেদন" প্রভৃতিতে মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাটকের আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে; অবশ্য দীর্ঘ সংলাপের জন্য নাটকীয় সংঘাত ও ঘটনাপ্রবাহ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে একটু বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ একদা এই নাটকের রুচি ও শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠক-সমাজে প্রচুর আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদ উঠেছিল। মহাভারতে অর্জুন ও মণিপুর-রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার প্রেমের গল্প আছে। কবি এর উপাদান সেখান থেকে গ্রহণ করলেও মহাকাব্যের ঘটনাকে বিবৃত না করে এতে নিজের বিশেষ ধরনের ভাবপ্রাধান্য অব্যাহত রেখেছেন। পুরুষের মতো কঠোর-অবয়ব চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুন আকৃষ্ট হননি, তখন অর্জুনের প্রেম লাভ করবার জন্য চিত্রাঙ্গদা মদনকে আহ্বান করলেন। মদনের বরে তিনি অপার্থিব লাবণ্যে ভরে উঠলেন। অর্জুন পরুষ-কঠোর চিত্রাঙ্গদাকে ফিরিয়ে দিলেও দেববরে-ধন্যা সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে ফেরাতে পারলেন না। কিন্তু এইভাবে ধারকরা লাবণ্যের দ্বারা অর্জুনের মোহকে আকর্ষণ করে চিত্রাঙ্গদার নিজের কাছেই নিজেকে পরাভূত মনে হল। ক্রমে দেববরপুষ্ট অপূর্ব লাব্যণ্যের এক বছর কেটে গেল, অর্জুনও ইন্দ্রিয়াসক্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে চিত্রাঙ্গদার মধ্যে সহধর্মিণী ও নিজ সন্তানের জননীকে লাভ করে ধন্য হলেন। এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, নারী শুধু পুরুষের নর্মসহচরী নয়, সে তার সুখদুঃখের অংশভাগিনী, সর্বকর্মের সঙ্গেই যুক্ত। এই অপূর্ব কাব্যনাট্যের ঘটনাবস্তু, চরিত্র, বিচিত্র বিষয়, কাব্যসৌন্দর্য ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কলাকৃতিকে সুপ্রমাণিত করেছে। যাঁরা এর মধ্যে অশ্লীলতা দেখেছেন, তাঁরা কৃত্রিম নীতির মাপকাঠি অবলম্বন করে শিল্প-সাহিত্যকে মাপতে গেছেন। এদিক থেকে, বিশেষত শিল্পাদর্শের বিচারে এতে নীতিঘটিত কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একদা নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এর মধ্যে অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে অকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' সর্বশ্রেষ্ঠ।

২. নিয়মানুগ নাটক

এর পরে এবং সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি সনাতন রীতির

নিয়মানুগ পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করে নাট্যপ্রতিভার আর এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯)—এই নাটকগুলিতে ঘনিষ্ঠভাবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। এর পূর্বে লেখা গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যগুলি সাহিত্যবিচারে উৎকৃষ্ট হলেও তার নাট্যলক্ষণ ছিল ক্ষীণ। কিন্তু 'রাজা ও রানী' থেকে তিনি প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করেছেন এবং পর পর অনেকগুলি ঐ রীতির নাটক লিখেছেন। অবশ্য এতে পঞ্চাঙ্করীতি অনুসৃত হলেও সাধারণ মঞ্চঘেঁষা নাটক থেকে এর পার্থক্য আছে। কবিভাবনার বিশেষ তত্ত্বকথা এই লীরিকগুণ এই নিয়মানুগ নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বপ্রাধান্য ও লীরিকগুণ নাটকীয়তা এর ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা তাই নিয়ে তর্ক উঠেছে। তত্ত্বের বিশেষ প্রাধান্য ও লীরিক-উচ্ছ্বাস বস্তুপ্রধান সনাতন পদ্ধতির নাটককে যে কিছু ব্যাহত করে তা স্বীকার করতে হবে—রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত নাটকের কোন কোন ক্ষেত্রে যে সেরূপ ত্রুটি নেই তা বলতে পারি না। তবে তাঁর মতো আত্মভাবপ্রধান গীতিকবির পক্ষে এরকম নিয়মকানুনের দাসত্ব স্বীকার করাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডি—রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রার দাম্পত্য-সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আকাঙ্ক্ষার পীড়ন থেকে স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে পরিত্যাগ এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চূড়ান্ত বেদনার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি—এই আদর্শ কবি অনেকটা শেক্‌স্‌পীয়রীয় ঢঙে হত্যা-আত্মহত্যার রক্তাক্ত কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন। এর রচনাংশ, চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীগ্রন্থন কিছু দুর্বল। কবি এর ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই এই একই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরসের আর একখানি গদ্যনাটক লেখেন, 'তপতী' (১৯২৯)। 'তপতীর' মধ্যে তত্ত্বেরই প্রাধান্য, নাটকীয়তাকে তত্ত্ববাদ কিছু আচ্ছন্ন করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের প্রতীকধর্মী তত্ত্বনাটকের সঙ্গে এর গোত্রগত মিল আছে। 'বিসর্জন'ও পঞ্চাঙ্ক সনাতন পদ্ধতির নাটক। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূলকাহিনীকে নাটকের ছকে লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একটি সুরুচিসঙ্গত ও অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করেছেন, যার অভিনয়মূল্য ও সাহিত্যমূল্য দুই-ই প্রশংসনীয়। প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে প্রেমেরই জয়লাভ, এ নাটকে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য, দেবীমন্দিরে বলিদানের নির্মম প্রথা

উঠিয়ে দিলেন। তখন প্রথা ও সংস্কারের দাস মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বাধল। রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মহত্যার ফলে তাঁর কুলিশকঠোর চরিত্র একেবারে ভেঙে পড়ল, এক মুহূর্তেই সংস্কারের বাঁধন শিথিল হয়ে গেল, দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি রঘুপতি স্নেহপ্রেমের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে হৃদয়ধর্মের মূল্য বুঝতে পারলেন। এ নাটকেও আগাগোড়া বিশেষ তত্ত্বকথার প্রাধান্য, এবং অনেক সময় চরিত্রগুলি সুদীর্ঘ বিবৃতিমূলক সংলাপের মারফতে কবির ভাবনা-কল্পনারই প্রতীকে পর্যবসিত হয়েছে। লীরিক আবেগও নাটকের কোন কোন স্থানের সংহতিকে কিছু বিপর্যস্ত করেছে। তবু জনপ্রিয় নাটক হিসেবে এ নাটক বহুবার অভিনীত হয়ে এর প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছে। 'মালিনীর' বিষয়ও প্রায় অনুরূপ। রাজকুমারী মালিনীর হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হল, দুই বন্ধু ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের মধ্যেও প্রথার সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব ঘনাল। ক্ষেমঙ্কর যখন মনে করল, বন্ধু সুপ্রিয় প্রেমের মোহে বহুকালাশ্রিত বহু জীবনের নির্ভর প্রথাসিদ্ধ ধর্মাচারকে ত্যাগ করে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন এই নিষ্ঠুর বন্ধু প্রিয় বন্ধুকে নির্মম শাস্তি দিয়ে স্বহস্তে সুপ্রিয়কে হত্যা করল। এর মধ্যে কবি প্রথার স্থলে প্রেমকে জয়ী করলেও প্রথা-সংস্কারের প্রতীক ক্ষেমঙ্করকে তিনি রঘুপতির মতো রিক্ত ও পরাভূত করেননি। 'মুকুট' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রায় একধরনের নাটক। বোলপুরে আশ্রম-বালকদের জন্য রচিত 'মুকুট' খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নাটক নয়—ত্রিপুরার রাজবাড়ীর সিংহাসন লাভের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় কবি এর মধ্যে বালকমনের উপযোগী মহান আত্মত্যাগের কাহিনী লিখেছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এর নাট্যমূল্য উচ্চস্তরের না হলেও উগ্র বীরত্ব ও জাতিপ্রেমের সর্বনাশা ভয়ালরূপ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের মধ্য দিয়ে চমৎকার ফুটেছে। পরে তত্ত্বনাট্যযুগে 'প্রায়শ্চিত্ত' ভেঙে তিনি 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) রচনা করেন। এতে মূলের কাহিনী থাকলেও বহু স্থলে চরিত্রও পাল্টিয়েছে, ঘটনাও অন্যভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রচণ্ডতা ও বলের সামনে আত্মত্যাগ ও অসহযোগের দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা—এই তত্ত্বকথা প্রাধান্য পেলেও নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ তত্ত্ব ও লীরিক-প্রভাবে কিছু ব্যাহত হয়েছে। শেষদিকে লেখা 'নটীর পূজা' (১৯২৬) বৌদ্ধ যুগের আত্মত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত, বহু পূর্বে 'কথা' কাব্যে সেই একই বিষয় অবলম্বনে তিনি একটি

অনবদ্য কাহিনী-কবিতা ('পূজারিণী') রচনা করেছিলেন। এই নাটকে অনেকটা গ্রীক ট্রাজেডির ধারা অনুসৃত হয়েছে। নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকলেও এর মধ্যে যে তীব্র ঘটনাসংবেগ এবং চরিত্রের অন্তর্নিহিত নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ঘনায়িত হয়েছে, তার নাট্যমূল্য অসাধারণ।

৩. রঙ্গনাট্য

গীতিকবিদের প্রধান অবলম্বন কল্পনা ও আবেগ, কিন্তু হাস্যরসের বা কৌতুকের জ্ঞাতিশত্রু হচ্ছে আবেগ। বরং আবেগের বাড়াবাড়িই অনেক সময়ে হাস্যরসের প্রধান উপাদান। তাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিরা প্রায়শই হাস্য ও কৌতুকরসের রঙ্গপ্রহসন ততটা জমাতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্র প্রতিভাধর কবি-ব্যক্তিত্বের পক্ষে সবই সম্ভব। এটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে, উচ্চ রুচির রঙ্গপ্রহসন ও স্নিগ্ধকৌতুকোজ্জ্বল কমেডি রচনা করে কবিগুরু পেশাদারী নাটমঞ্চের স্বাদবৈচিত্র্য ফেরাতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কালে বাংলাদেশে একাধিক কৌতুক নাট্যকার বা প্রহসনরচয়িতা রঙ্গব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের অনেক প্রীতিঘন নাটক লিখে এবং নিজেরা অভিনয় করে অভিনয়ের এই শাখাটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিলেন। কিন্তু এই শাখাকে জনপ্রিয় করলেও এতে তাঁরা বিশেষ সম্মান ভোগ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ী ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে লালিত হয়ে এবং ব্যক্তিগত মার্জিত রুচির প্রসাদে ভাঁড়ামি ও ইতর রঙ্গরসের অশুচিপূর্ণ বাহুল্যকে খর্ব করে নাটমঞ্চের ওপর একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রহসন ও কৌতুকরসের আদর্শ স্থাপন করেন। প্রথম দিকে তাঁর কাব্যধর্ম-মণ্ডিত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসংবলিত নাটক-নাটিকা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চসফল নাটকরূপে উপস্থাপিত করা যায়নি। কারণ ঈষৎ স্থূল জনরুচির কাছে এই সমস্ত উচ্চশ্রেণীর নাটকের বিশেষ কোন আবেদন ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রহসন ও কমেডিগুলি (যথা, 'চিরকুমারসভা' এবং 'শেষরক্ষা') অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এই সমস্ত নাটকের প্রসন্ন কৌতুকরস, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য ঝিকিমিকি, ঘটনাপরিস্থিতির হাস্যকর অসঙ্গতি প্রভৃতি নাট্যকৌশল মার্জিত-রুচির দর্শককে পরিতৃপ্ত করেছিল। তাঁর 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২ ; ১৯২৮ সালে 'শেষরক্ষা' নামে পুরোপুরি নাটকীয় আকারে অভিনয়যোগ্য সংস্করণরূপে প্রকাশিত), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমারসভা'

(১৯২৬ ;—১৯০৮ সালে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে গদ্য-কাহিনীরূপে প্রচারিত) শ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্য ও প্রসন্ন কমেডিরূপে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যে ঘটনাগ্রন্থনের জটিলতার চেয়ে চরিত্রের তির্যকতাই অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। অথচ ঘটনাকৌশলের বৈচিত্র্য ও 'সিচুয়েসনে'র ওপর রঙ্গনাট্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। সেদিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্যকারদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলির ঘটনাপরিস্থিতি কিছু ম্লান। কিন্তু বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও চরিত্রগুলির বিশেষ ধরনের প্রবণতার ঐশ্বর্যে এ ত্রুটি ঢেকে গেছে। 'উইট' বা বাক্‌রীতির কৌতুকময় বৈচিত্র্য তাঁর রঙ্গনাট্যকে বাংলা সাহিত্যে এক গৌরবময় স্থান দিয়েছে। 'চিরকুমারসভা'র চির-কুমারদের 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' কীভাবে কিশোরীদের সামান্য স্পর্শেই ভেঙে পড়ল, তার এক কৌতুককর বর্ণনা এতে পাওয়া যাবে। 'চিরকুমারসভা' মার্জিতরুচির অভিজাত-সংঘে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলেও এর অনেকাংশ অতিকথন-দোষদুষ্ট এবং অনেক স্থানে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে; এর ঘটনা-সংবেগও কিছু ক্লান্তিকর ও মন্থর। এর তুলনায় 'শেষরক্ষা' কমেডি হিসেবে অনেক বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সামান্য ভ্রান্তি ও খেয়াল থেকে তরুণ-তরুণীর নাস্তানাবুদ হওয়া, তরী বানচাল হবার মুখে এসে গলদের অবসান এবং হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়ে 'মধুরেণ' সমাপ্তি এই নাটিকাকে জনসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় করেছে। এর সামান্য জটিলতাপূর্ণ ঘটনাগ্রন্থন এবং বিশেষ বিশেষ 'টাইপ' চরিত্রের হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণ রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কলাকৌশলকে নতুন গৌরব দিয়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বা ছোট কৌতুক নাটিকাগুলির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিস্ময়কর, উইটের ফুলঝুরিও কম বৈচিত্র্যময় নয়। কিন্তু ঘটনাগ্রন্থনে বিশেষ কোন নিপুণতার পরিচয় নেই। তবে স্ত্রীভূমিকাবর্জিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র সরস কৌতুকের সঙ্গে একটা স্নিগ্ধমধুর করুণরসের প্রচ্ছন্ন প্রবাহ আছে বলে এর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। তবে 'অতিকথন' দোষ 'চিরকুমারসভা'কে যেমন কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিকতার ভারে অবসন্ন করে তুলেছে তেমনি আবার 'সামান্য কথন' দোষ 'বৈকুণ্ঠের খাতা'কে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করেছে। এখানে ঘটনাগ্রন্থন ও চরিত্রে বৈচিত্র্যসৃষ্টির আরও অবকাশ ছিল। সে যাই হোক, বাংলা কৌতুকনাট্যের ক্রমবিকাশে রবীন্দ্রনাথের দান যে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমাদের দেশের সাধারণ দর্শককে কৌতুকরসের নাটকে স্থূলরুচির রঙ্গরস ও ভাঁড়ামি

চায় বলে এখনও রবীন্দ্র-কৌতুকনাট্য ও কমেডি সর্বসাধারণের মধ্যে ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

৪. রূপক ও সাঙ্কেতিক তত্ত্বনাটক

নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছিলেন; তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছিল সেকালের ঠাকুরবাড়ীর তর্ুণদের নবনাট্য-আন্দোলন ও অভিনয়ের মধ্যে। পরবর্তী কালে এই মিশ্র সাহিত্যের প্রতি তাঁর উত্তরোত্তর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, প্রথম যৌবন ও পরিণত বয়সে কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি নগরের অভিজাত সমাজের অভিনয়-কলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, কোন কোনটির সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। এইজন্য নাটক-নাটিকা, গীতিনাট্য, কৌতুকনাট্য, নৃত্যনাট্য —এ সমস্তই যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শিল্পকলা বলে মনে হয়। কিন্তু কবির অন্তরশায়ী নানা তত্ত্ববাদ, বিশেষত নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনাকে কেন্দ্র করে এমন একপ্রকার নাটক সৃষ্টি হয়েছে, যার দ্বারা তিনি বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। এই বিশেষ ধরনের নাটক রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক নামে উল্লিখিত হয়ে থাকে—সাধারণভাবে একে তত্ত্বনাটকও বলে। কারণ এই নাটকের ঘটনাগ্রন্থনা ও চরিত্রগুলিকে কোন একটা দার্শনিক তথা সামাজিক-রাষ্ট্রিক-মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকথার বাহনরূপে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য রূপকনাটক (Allegorical drama) প্রাচীন য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যে এমন কোন অভিনব ব্যাপার নয়। বুদ্ধিগ্রাহ্য, আকার-অবয়বহীন তত্ত্বকথাকে রূপকের নাম-রূপের আধারে ফ্টিয়ে তোলা সেযুগের এবং এযুগের সাহিত্যের একটা জনপ্রিয় *motif*—প্রাচীন গ্রীক, রোমীয়, মধ্যযুগীয় য়ুরোপের ভাষায় এবং আধুনিক-কালে সামাজিক বা অন্য কোন তত্ত্বকে রূপকের মারফতে নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত করার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃতেও র্ূপকনাটকের অভিনয় বেশ প্রচলিত ছিল। অবশ্য রূপকনাটক বলতে এখন আমরা যা বুঝি সংস্কৃতে 'রূপকে'র সে অর্থ ছিল না। সংস্কৃতে নাটকের অপর নামই ছিল 'রূপক'। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' সংস্কৃত রূপকনাটকের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৃষ্টান্ত। এতে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ নানা রূপকের ছলে বর্ণিত হয়েছে। মানবমনের নানা দোষ ও গুণকে শরীর ধরে এর মধ্যে উপস্থিত হয়ে মানুষের মনের ওপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে দেখা গেছে। য়ুরোপেও খ্রীস্টানধর্মের প্রভাবে নৈতিক তত্ত্বসংক্রান্ত অনেক

রূপকনাটক রচিত হয়েছে। তাই রূপকসাহিত্য ও রূপকনাটক বিশ্বসাহিত্যে এমন কোন অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু যথার্থ অভিনব হল সাঙ্কেতিক নাটক, যাকে ইংরেজীতে Symbolic drama বলে।

য়ুরোপ ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে নানা দেশে একধরনের প্রতীকাশ্রয়ী সুগভীর তত্ত্ব-নাটক প্রচলিত হয়। প্রথম প্রথম লোকে এর কদর বুঝতে পারেনি, অনেকের কাছেই এর বাণী ছিল দুর্বোধ্য, অভিনেতব্য ব্যাপার ছিল রহস্যপূর্ণ ছায়াময়। পরে য়ুরোপের মরমী এবং বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রতীক-নাটকের খুব সমাদর দেখ দিল। কবি ইয়েটস্, মেটারলিঙ্ক, হপ্টম্যান, স্ট্রিণ্ডবার্গ্ এবং আধুনিক-কালের ফরাসী পরাবাস্তববাদী ('সুররিয়েলিস্ট') ও অস্তিত্ববাদী ('এক্‌জিস্‌টেনশিয়া-লিস্ট্') দর্শনে বিশ্বাসী বহু কবি-সাহিত্যিকেরা প্রতীককে বিশেষ বিশেষ ভাবানুষঙ্গে, বিশেষত নাটকে ব্যবহার করে থাকেন। তাহলে কথা উঠবে রূপকনাটকে ও সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। রূপকের ধর্ম রূপময় করা, স্পষ্টতর করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপারকে বুদ্ধি ও প্রতীতির গোচরীভূত করা। সাঙ্কেতিক নাটকের ধর্ম স্বতন্ত্র। সাঙ্কেতিক সাহিত্য মূলত অপরূপ রহস্যেই ভরপুর। রহস্য সমাধান সঙ্কেতের কাজ নয়। জগৎ ও জীবনের চারিদিকে যে রহস্যময় বাতাবরণ রয়েছে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যার অস্বচ্ছতা ভেদ করতে পারে না, যার স্বরূপ বুঝতে গিয়ে দুর্জ্ঞেয়তার পাষাণ প্রাচীরে বাধা পায়—সংকেতের সাহায্যে তার আভাস-ইঙ্গিত লাভ করার চেষ্টা সাঙ্কেতিক সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের প্রত্যক্ষ ও বাস্তবজীবনের অন্তরালে যে পরোক্ষ ও ইন্দ্রিয়াতীত জীবন-জলধি প্রতি মুহূর্তে ভাষাহীন কল্লোলে আলোড়িত হয়ে উঠছে, সাঙ্কেতিক নাটকে তাকেই বাণীময় করার জন্য আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্য নেওয়া হয়। জীবনের চারদিক অপরূপ রহস্যের অন্ধকার নিত্যই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বোধি বা গভীর চেতনার প্রতীক-প্রদীপ জ্বেলে সেই অন্ধকারকে কথঞ্চিৎ অপসারিত করার চেষ্টা সাঙ্কেতিক নাটকে দেখা যায়। কিন্তু রূপক নাটকে যেমন সর্বত্র রহস্যের সমাধান হয়, সবকিছুকে বুদ্ধির মাপজোখ করে দেখা যায়, সাঙ্কেতিক নাটকে, অন্তত য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক নাটকে সে রকম কোন রহস্যসমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং সাঙ্কেতিকতার আলোকে অন্তরের রহস্যতিমির আরও রহস্যময়, আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। তাই য়ুরোপের সাঙ্কেতিক নাটকে কোথাও বিষণ্ণতা, কোথাও শঙ্কা, কোথাও মৃত্যু, কোথাও অবক্ষয়ের

(তা সামাজিক, মানসিক—যে রকমেরই হোক না কেন) দিকেই সঙ্কেতের অঙ্গুলি-নির্দেশ।

মেটারলিঙ্ক বা অন্য কোন সঙ্কেতবাদী নাট্যকারের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকের প্রেরণা পেয়েছিলেন, একথা কেউ কেউ বলে থাকেন। কারণ তাঁর তত্ত্বপ্রধান সঙ্কেত-নাটকের আগেই মেটারলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯), হপ্টম্যান (১৮৬২-১৯৪৬), স্ট্রিণ্ড্‌বার্গ (১৮৪৯-১৯১২) প্রভৃতি নাট্যকারের প্রধান প্রধান সাঙ্কেতিক নাটক রচিত, কোন কোনটি ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মেটারলিঙ্কের *Les Sept Princesses* (1891), *Palleas et Melisande* (1892), *Monna Vanna* (1902), *Interieur* (1894), *L'osieu bleu* (1909)* রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাটকের পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং সমধর্মী নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এ'দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, এরকম অনুমান অযৌক্তিক নয়। তবে এ বিষয়ে দুটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথম কথা, সাঙ্কেতিকতা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মসাধনা থেকে শুরু করে সাহিত্যসাধনা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় মন সাঙ্কেতিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং সাঙ্কেতিক শিল্পরীতি রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে আমদানি করেছেন, তা মনে হয় না। দ্বিতীয় কথা, তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি অধিকাংশ য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক নাটক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি জীবনপ্রত্যয়ে আস্তিক্যবাদী, এবং ঔপনিষদিক ভাবরসে লালিত। সুতরাং আনন্দবাদের মধ্যে সব অনৈক্য-অসত্যকে ডুবিয়ে দেওয়া তার স্বভাবধর্ম। তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকে রহস্য ও বিষণ্ণতার ব্যঞ্জনার চেয়ে পরম প্রাপ্তির সুদৃঢ় প্রত্যয়ই অধিকতর সার্থক হয়েছে। নাটকের অন্তিমে সব রহস্যের যবনিকা উঠে গেছে, ব্যক্তির সঙ্গে পরম দয়িতের মিলনলগ্ন নিকটতর হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, রহস্যসমাধান তো রূপকনাটকের ধর্ম, রহস্যের ঘনায়মানতাই সাঙ্কেতিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত সাঙ্কেতিক নাটককে পুরোপুরি সাঙ্কেতিক নাটক বলা যায় কি? কথাটা ঠিক। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের অন্তিমে কোন বিষণ্ণতার দুশ্ছেদ্য যবনিকা আর থাকে না, যবনিকা পতনের পূর্বে চিরজ্যোতির্ময় সত্য অনির্বাণ দীপশিখায় নিষ্কম্পভাবে জ্বলে ওঠে। তাঁর মতো অধ্যাত্মপন্থী কবিসাধক জীবনের অপূর্ণতা, বিনষ্টি, শঙ্কা ও ব্যর্থতাকে প্রাধান্য

* এরই ইংরাজী অনুবাদ The Blue Bird বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে।

দেবেন তা কখনও হতে পারে না। তাই তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকে কিছু রূপকের প্রভাব আছে, কোনটি-বা রূপকের পরিণামের দিকেই অগ্রসর হয়েছে। এটি তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকের এক নতুন বৈশিষ্ট্য, যেখানে তিনি মেটারলিঙ্ক, হপ্টম্যান প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর ভারতীয় অধ্যাত্মসংস্কার এবং ব্যক্তিগত চিত্তপ্রবণতা, যা তাঁর কাব্যসাহিত্যের পরম সম্পদ, তার সবটুকু বৈশিষ্ট্য সাঙ্কেতিক নাটকেও ধরা পড়েছে, একথা স্বীকারের মধ্যে কোন অগৌরব নেই। বরং তিনি যে প্রতীচ্যের বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যাশ্রয়ী সাঙ্কেতিক নাটকের আদর্শ অনুসরণ করেননি, এতে তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যই প্রমাণিত হয়েছে।

'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০; এর সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অরূপরতন' ১৯২০ সালে প্রকাশিত), 'অচলায়তন' (১৯১২; এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'গুরু' ১৯১৮ সালে প্রকাশিত), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), এবং 'কালের যাত্রা' (১৯৩২)—এইগুলি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-আশ্রয়ী সাঙ্কেতিক নাটক। অবশ্য 'শারদোৎসবে' ঋণপরিশোধের পটভূমিকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের মিলনসত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও একে সাঙ্কেতিক নাটক বলা যায় না, যদিও বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব এর রাখালী (pastoral) ধরনের পটভূমিকায় অপূর্ব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজা' থেকেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাঙ্কেতিক নাটকের শুরু। 'রাজা'র কাহিনী বৌদ্ধ "কুশজাতক" থেকে নেওয়া হয়েছে। কুরূপ রাজা ও সুন্দরী রাণীর বিড়ম্বিত জীবন কি করে সুস্থ ও স্বাভাবিক হল তাই এই জাতকে বলা হয়েছে। এরই ওপর ভিত্তি করে রাজা, রাণী সুদর্শনা ও পরিচারিকা সুরঙ্গমার এক বিচিত্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অপরূপ তত্ত্বের ইঙ্গিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা প্রকাশ্যে কারও কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না, এমনকি রূপপিয়াসিনী রাণী সুদর্শনার কাছেও না। শুধু তাঁর ভক্ত ঠাকুরদা ও সুরঙ্গমার কাছে তিনি সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে আসেন। অন্ধকার কক্ষের মধ্যে রাজা ও রাণীর মিলন হয়। কিন্তু তাতে সুদর্শনার তৃপ্তি নেই, তিনি ইন্দ্রিয়জ রূপাসক্তির মধ্য দিয়ে রাজাকে পেতে চান, না পেয়ে রাজাকে কুরূপ মনে করেন। তারপর পতঙ্গ যেমন করে রূপশিখায় ঝাঁপ দিয়ে দহনজ্বালা লাভ করে, তেমনি রাণীও রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আর্তনাদ করেন, এবং সেই ভয়ঙ্কর ভয়াল মুহূর্তে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে রাজার অতিভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভীত বিতৃষ্ণ হয়ে পালিয়ে যান। তারপর কি করে রাণীর রূপের পিপাসা

মিটল, তিনি রাজার মধ্যে অরূপের সন্ধান পেয়ে ধন্য হলেন, রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব নাটকীয় মুহূর্ত, ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ ও নিগূঢ় অধ্যাত্মসঙ্কেতের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। বসন্ত-উৎসবের পটভূমিকায় এ নাটকের পরিকল্পনা, ঋতুনাট্যের এক বিচিত্র প্রকাশ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। এর অসাধারণ নাটকীয় সংঘাত বাদ দিলেও তত্ত্বকথাটিতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধরনের জীবনদর্শনই ব্যক্ত হয়েছে। ভগবানকে রূপের মধ্যে পাওয়া যায় না, সীমাবদ্ধ প্রতীকের মধ্যে তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। যে ভক্ত (যেমন ঠাকুর্দা, সুরঙ্গমা), সে তাঁকে ঠিক চিনে নেয়। কিন্তু যার মন সংশয়দোলায় আন্দোলিত, যে সুদর্শনার মতো সীমাবদ্ধ রূপের আধারে অরূপকে পেতে চায়, তার দুর্গতির সীমা থাকে না। অবশেষে অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়ে তাকে সত্যের সাক্ষাৎ পেতে হয়। তখন তার রূপের পিপাসা, সীমার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। এই তত্ত্বকথাটি কবিগুরু আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। এক হিসেবে 'রাজা'র অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সমগ্র রবীন্দ্র-জীবনেরই মর্মকথা। একসময়ে য়ুরোপে এর ইংরেজী অনুবাদ, *The King of the Dark Chamber* সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে, এ নাটকে সাংকেতিকতার চেয়ে রূপকের প্রাধান্য বেশী। কারণ নাটকের শেষে সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে এবং কে কার রূপক, সে সম্বন্ধেও কারও কোন সন্দেহ থাকে না। অন্ধকার কক্ষে রাজার কণ্ঠ যখন ধ্বনিত হয় তখন তাঁকে ঠিক অশরীরী সঙ্কেত বলে মনে হয় না, চাক্ষুষ রূপ না থাকলেও ধ্বনির মধ্য দিয়েও তাঁকে রূপময় মনে হয়। সুতরাং তাঁকে পুরোপুরি অরূপ বলে মেনে নেওয়া কঠিন। 'ডাকঘরে' রাজাকে কোনো রূপের সঙ্কেতে উপস্থিত করা হয়নি, তিনি বরাবর অরূপ সঙ্কেত-ব্যঞ্জনার মধ্যেই রয়ে গেছেন। আরও একটা কথা, রাজার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং রণবাদ্যমুখর বাস্তব পটভূমিকার মধ্যে সমন্বয় করাও দুরূহ। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভাবসত্যের জন্য 'রাজা' নাটককে তাঁর সমগ্রজীবনের তত্ত্বপ্রাতিভূ বলা যেতে পারে। এর সঙ্গীতগুলিও অতি অপূর্ব, সঙ্গীতের চাবি দিয়েই যেন সঙ্কেতের রুদ্ধ দ্বার খুলতে হয়।

'অচলায়তনে' প্রাচীনকালের মন্ত্রতন্ত্রের (মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব) পট-ভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের চাপে মানবাত্মার স্বাধীন প্রকাশের বিলোপ এবং তা থেকে মুক্তিলাভের কথা ঘোষিত হয়েছে। আচারবিচার, জপতপ ও মন্ত্রতন্ত্র

যখন অচল অবরোধ সৃষ্টি করে, তখনই গুরুর আবির্ভাব হয়, তখন অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে ধুলার সঙ্গে মিশে যায়, মানবাত্মার যাবতীয় পীড়নের অবসান হয়।

এরপর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ডাকঘর'—যেটি *The Post Office* নামে বিশ্বের সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, এখনও এর জনপ্রিয়তা স্বদেশে-বিদেশে প্রচুর। সব দিক বিচার করলে 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক, এমনকি এই গোষ্ঠীর নাট্যকার মেটারলিঙ্কের *L'osieu bleu ('The Blue Bird')*-কেও এর আবেদনের তুলনায় কিছু ম্লান মনে হয়। নিঃসম্পর্কীয় বালক অমল ব্যাধিতে শয্যাগত; সে ঘরের বন্ধন ছেড়ে বাইরের সীমাহীনতায় ছড়িয়ে পড়তে চায়। হঠাৎ সে দেখল রাজার ডাকঘর স্থাপিত হয়েছে, বসন্ত, শরৎ প্রভৃতি ডাকহরকরারা চিঠি বিলি করছে। সে মনে করল, বুঝি রাজা তাকেও চিঠি পাঠাবেন। তার এই অসম্ভব কল্পনাকে পাকাবুদ্ধির দল পরিহাস করে, কিন্তু রহস্যের যথার্থ ভাণ্ডারী বৃদ্ধ ঠাকুরদা সত্যের দর্শন পান। রাজা একদিন অমলের নামে চিঠি পাঠাবেন জেনে সে আর বাইরে যেতে চায় না, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবে, কবে রাজা আসবেন। রোগযন্ত্রণা যখন প্রবলাকার ধারণ করল, তখন রাজকবিরাজ এসে জানিয়ে দেন যে, গভীর রাতে রাজা তাঁর বালক-ভক্তের কাছে আসবেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়, দীপ নিভে আসে, দূর আকাশ-প্রান্ত থেকে তারার ম্লান আলো আসতে থাকে, ক্রমে ক্রমে অমল ঘুমিয়ে পড়ে। সকলে শঙ্কিত পরি[illegible]হূর্তে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শেষ মুহূর্তে অমলের সখী সুধা এসে বলে যায়, ও যখন জাগবে, তখন ওকে যেন বলা হয়, সুধা ওকে ভোলেনি। এ নাটকের ভাববস্তু বড়ো চমৎকার। অমল হল মুমুক্ষু মানবাত্মার প্রতীক। সে জীবন-ব্যাধি-জর্জর, "that disease called life"—সমাজসংস্কারের নীতি তার ঊর্ধ্বগতিকে রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু সমস্ত বাধা-বন্ধন ছিঁড়ে সে অসীমের বুকে ফিরে যেতে চায়। হঠাৎ সে দেখল রাজার ডাকঘর বসেছে। তখন সে ভাবল, বুঝি রাজা তার নামেও চিঠি পাঠাবেন। তখন অসীমের জন্য আকুলিবিকুলি ভাব কমে গেল, ঘরের মধ্যেই তার ভালো লাগল। এর তাৎপর্য বোধহয় এই যে, অসীমের পিয়াসী মানুষের সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে সংস্কারমুগ্ধ লোকে ব্যাধি বলে মনে করে। নানা বাধানিষেধের ফলে তার বাসনা আরও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। তারপর রাজার ডাকঘর স্থাপিত হয়—এ হল ভগবানের বহিঃপ্রকাশ—এই বিশ্ব। এই সীমাই হল অসীমের প্রতীক। সীমা ও অসীমের পরস্পর

সম্পর্কই মানুষের যথার্থ প্রত্যয়। প্রথমে অমলের সুদূরের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল ছিল, সীমার মধ্যে সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে রাজার ডাকঘর বসল, তখন সে ঐ ডাকঘর-থেকে-পাঠানো রাজার চিঠি পাবার জন্য ব্যাকুল হল। ডাকঘর যদি অসীম ঈশ্বরের সীমার প্রতীক হয়, তাহলে অমল ডাকঘরের দিকে চেয়ে ঘরের মধ্যেই শান্ত হয়ে যায়—এর তাৎপর্যও সহজ হয়ে পড়ে। সুদূর ও অসীমকে যখন সীমা থেকে পৃথক করে দেখা হয়, তখন পরম সত্যকে পুরোপুরি পাওয়া যায় না, সীমা ও অসীমের নির্দ্বন্দ্ব সাধনাই রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা সেকথা অমলের প্রতীকের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। অমলের ঘুম হল মর্ত্যজীবন থেকে তার পরিত্রাণের কাহিনী। মুক্ত মানবাত্মা অসীমের বুকে মিশে গেল—এই হল ফলশ্রুতি। অবশ্য রোমান্টিক কবি মর্ত্যধরিত্রীকে কি একেবারে মুছে ফেললেন? নাটকের অন্তিম পর্যায়ে সুধা এসে বলে গেল, সে অমলকে ভোলেনি। সে হচ্ছে মর্ত্যজীবনের প্রতীক। ধরিত্রীকে ছেড়ে মুক্ত মানবাত্মা সুদূরের অভিসারে চলে যায় বটে, কিন্তু মর্ত্যে পড়ে থাকে তার স্মৃতি, ধরিত্রীর সেইটুকু মাত্র সম্বল। তত্ত্বকথা বাদ দিলেও এ নাটক অপূর্ব কাব্যরসে ও রোমান্টিক শিশুকল্পনায় এমন ভরে উঠেছে যে, বিশ্বের শিশুকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও তার জুড়ি মিলবে না।

'ফাল্গুনী'তে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যু, শীত ও বসন্ত, জরা ও যৌবনের দ্বৈত সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের পটভূমিকায় এক নতুন ঋতুনাট্যের পরিকল্পনা করেছেন। একদল তরুণ, চন্দ্রহাস যাদের নেতা—পণ করেছিল গুহার মধ্যে আত্মগোপনকারী জরা-বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে আসবে। বহু প্রয়াসের পর গুহার ভেতর থেকে যখন সেই বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে এল, তখন দেখা গেল—এ তো বৃদ্ধ নয়, জরা নয়, শীত নয়, রিক্ততা নয়—এ হচ্ছে তাদেরই সর্দার, যৌবনের প্রতীক, বসন্তের প্রতীক, পূর্ণতার প্রতীক। বাইরে থেকে, দূরে থেকে দেখলে তাকে জরা-বৃদ্ধ বলে মনে হয়, আসলে সে যৌবনেরই প্রতীক। এই তত্ত্বকথাটি 'ফাল্গুনী'র মূল ফলশ্রুতি। নাটকাভিনয়ে একদা অভিজাত সমাজে এ নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে কেউ কেউ এর প্রতীকধর্ম ও নাট্যধর্মের মধ্যে ততটা সমন্বয় দেখতে পান না।

এ পর্যন্ত তাঁর প্রতীকনাটক সম্বন্ধে দেখা গেল, কখনও আধ্যাত্মিক সত্য, কখনও বা দার্শনিক সত্যকে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে প্রতীকীকরণ করেছেন। কিন্তু এর পরে 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও 'কালের যাত্রা'য় তিনি

আধুনিক জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পটভূমিকায় এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীর সাঙ্কেতিক নাটকের পরিকল্পনা করলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে উক্ত তিনখানি নাটক রচিত হয়েছে, যখন এদেশেও উগ্র রাজনৈতিক এবং উৎকট অর্থনৈতিক সমস্যা কবিচিত্তকে ব্যথিত করছিল। 'মুক্তধারা'য় কবিমানসের অভিনবলোকে উত্তরণের চিহ্ন ফুটে উঠল। এতে সাম্রাজ্যলোভের সঙ্গে যন্ত্রবিজ্ঞানের অশুভ মিলনের ফলে মানবনির্যাতন কতদূর প্রচণ্ড ও বর্বর হতে পারে এবং সেই নির্যাতনের কোন্ রন্ধ্রপথ দিয়ে মুক্তির বাণী আসে তার কথা নাটকীয় ঘটনাসংবেগের দ্বারা বলা হয়েছে। উত্তরকূটের শাসকেরা শিবতরাইয়ের দুর্বিনীত প্রজাদের শাস্তি দেবার জন্য যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে ঝরণার জলকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করবার অভিপ্রায়ে এমন একটি যন্ত্র তৈরি করাল যে, শিবতরাইয়ের তৃষ্ণার জলের চাবিকাঠি রইল উত্তরকূটের হাতে। এই অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন উত্তরকূটের রাজকুমার বলে পরিচিত অভিজিৎ। আসলে অভিজিৎ কোন রাজবংশে জন্মাননি, উত্তরকূটের রাজা একটি পরিত্যক্ত শিশুকে ঝরণাতলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের সন্তান বলে প্রচার করেছিলেন। ইনিই অভিজিৎ। অভিজিৎ যন্ত্রদানবের এই দাপট কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না, শিবতরাইয়ের জনসাধারণের পক্ষে দাঁড়ালেন, তার জন্য সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা অপমান মাথা পেতে নিলেন। যন্ত্র-অধিকর্তা জানতেন—তাঁর যন্ত্র নিখুঁত, এর কোথাও ত্রুটি নেই। কিন্তু অভিজিৎ এর একটা দুর্বল স্থান জানতেন। ঝরণার জলধারাকে মুক্ত করবার জন্য তিনি সেই রন্ধ্রপথে আঘাত হানলেন, তাতে মহাদেবের জটানির্মুক্ত ভাগীরথীর মতো ঝরণার রুদ্ধ ধারা মুক্তি পেল, মুক্তি পেল শিবতরাইয়ের তৃষ্ণাতুর প্রজার দল, মুক্তি পেল তারা উত্তরকূটের দাম্ভিকতার আঘাত থেকে। সেই মুক্তির বাণী আনলেন রাজবংশে প্রতিপালিত এবং যুবরাজ বলে পরিচিত অভিজিৎ। কিন্তু যন্ত্রের আঘাতে তিনিও প্রাণ দিলেন। যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়ো, সে-কথা মানুষকে প্রাণ দিয়েই প্রমাণ করতে হয়, অভিজিৎ সেই শহীদ মানুষের প্রতীক—তাঁর জন্ম যেখানেই হোক না কেন।

আগেই বলা হয়েছে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসর যন্ত্রশক্তির বিকারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এ নাটকই তার প্রমাণ। এতে তত্ত্বের সঙ্গে ঘটনাবহুল নাট্যধর্মও স্বীকৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এতে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অসহযোগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর কর্মপদ্ধতিকেই

নতুন মহিমার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য এ নাটকের কোন কোন অংশ সাঙ্কেতিক নাটকের পক্ষে কিছু অনাবশ্যক মনে হবে, অভিজিৎকে ঝরণা-তলায় কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে বলে বর্ণনা করাতে মূল বক্তব্যের তাতে বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। তাঁকে প্রকৃত রাজপুত্র করে আঁকলে, রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েও সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অংশ গ্রহণ করাকে অনেক বেশী নাটকীয় মনে হত।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এক অসাধারণ প্রতীক-নাটক, বিশ্বের যে-কোন একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের সমকক্ষ। এতে তিনি আধুনিক সমস্যার আর একটি উৎকট দিককে একটি অপরূপ প্রতীকতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। এতে বর্তমান কারখানাঘরের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস মানবজীবন এবং লোভের ফলে মানুষের মরণফাঁসের নিদারুণ স্বরূপ অদ্ভুত প্রতীক ও রহস্যময় ব্যঞ্জনার দ্বারা আভাসে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এ নাটক 'যক্ষপুরী' নামে রচিত হয়েছিল, তারপর পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই এর দ্বিতীয় বার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন 'নন্দিনী', অবশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় এর ব্যঞ্জনানুসারে একে 'রক্তকরবী' নামে অভিহিত করা হয়। মাটির তলে যক্ষপুরী,—অর্থাৎ সোনার খনি। সেই অন্ধকারে শ্রমিকের দল অমানুষিক পরিশ্রমে তাল তাল করে সোনা তোলে। তাদের জীবনে অবকাশ নেই, আনন্দ নেই, মুক্ত আকাশ নেই, সবুজ পৃথিবী নেই। তারা শুধু নেশাগ্রস্তের মতো সোনা তোলে আর নেশা করে পড়ে থাকে। জালের আড়ালে আছেন স্বয়ং যক্ষরাজ, প্রচণ্ড শক্তিধর, অমিত ঐশ্বর্যের মালিক। তাঁর নির্দেশে বড়ো সর্দার, মেজ সর্দারের দল যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে কাজ চালিয়ে যায়, কোথা থেকে ক্ষীণতম প্রতিবাদ উঠলে অচিরেই তাকে চিরদিনের জন্য তারা নীরব করে দেয়। শুধু রঞ্জনকে তারা করায়ত্ত করতে পারে না। রঞ্জনকে যেন কোন বন্ধনেই বাঁধা যায় না, ভয় দেখালে সে হেসে ওঠে; তার বেপরোয়া ব্যবহারে অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যেও প্রতিবাদের কাঁপন লাগে। ইতিমধ্যে মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হল রক্তকরবীর কঙ্কণপরা নন্দিনীকে, সিঁথিমূলেও তার রক্তকরবীর রক্তিমা। রঞ্জনের সখী নন্দিনী। সে অন্ধ যক্ষপুরীতে বাইরের পৃথিবীর বাণী নিয়ে এল। তার আসার ফলে চারিদিকেই যেন বে-নিয়মের হাওয়া বইতে শুরু করল। এমন কি জালের আড়ালে স্বেচ্ছাবন্দী যক্ষরাজও প্রচণ্ড শক্তির মধ্যে থেকে উপবাসী আত্মার ক্ষোভ ভুলতে পারলেন না। নন্দিনীকে দেখে তাঁর শক্তির আড়ালে জমে-

ওঠা ক্লান্তি ও শূন্যতা পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠল। এদিকে সর্দারের দল দেখল, নন্দিনী ও রঞ্জন যদি মিলিত হয়, তাহলে কেউ তাদের আর বাধা দিতে পারবে না। সর্দারদের এত সাধের যক্ষপুরী ও সর্দারী ভেঙে যাবে। রাজার আচার-আচরণেও তারা কি রকম বিপদের আঁচ পেয়েছে। যক্ষরাজ ক্রমে ক্রমে নন্দিনীর পরিচয় পেয়ে দেখলেন, নন্দিনী বালিকা হলেও সে প্রেমের শক্তিতে শক্তিময়ী, যে প্রেম ও প্রাণরস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে যক্ষরাজ নিজের চারিদিকেই দুর্নিরীক্ষ্য জালের আবরণ টেনে দিয়েছেন। প্রেমের মধ্যে এত বড়ো প্রাণশক্তি ও মহিমা দেখে তিনি মনে করলেন, রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন দেখে তাঁর মৃত্যু হলেও ক্ষতি নেই। ইতিমধ্যে রঞ্জনকে যক্ষরাজের কক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সর্দারের দল তাকে বিনাশ করতে চাইল। সেই যৌবনমূর্তিকে অমিত শক্তিধর রাজা না জেনে বিনাশ করলেন। পরে যখন তাঁর চমক ভাঙল, তখন দেখলেন, যে-রঞ্জন-নন্দিনীর মিলনের মধ্যে তিনি জীবনের প্রশান্ত পরিণতি খুঁজতে গিয়েছিলেন, সেই রঞ্জনকে অজ্ঞাতসারে তিনিই বিনাশ করেছেন। তিনি নিজেই তাঁর জালের আবরণ ছিঁড়ে ফেললেন। নন্দিনী দেখল, তার রঞ্জনের মৃতদেহ পড়ে আছে, রাজা তাকে বিনাশ করেছেন। রাজা বুঝতে পারলেন, তাঁর শক্তি অর্থাৎ সর্দারের দল তাঁকে ঠকিয়ে রঞ্জনকে তাঁকে দিয়েই হত্যা করিয়েছে। নন্দিনীর আর্ত প্রশ্নে তিনি ঐশ্বর্যের স্তূপীকৃত সমারোহের ব্যর্থতা এবং প্রেম, প্রাণ ও প্রকৃতির অর্থ বুঝতে পারলেন। তখন তিনি নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই এগিয়ে চললেন নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে। ইতিমধ্যে মাঠে মাঠে পৌষালি ফসল পেকেছে, দূর থেকে ফসল কাটার গান ভেসে আসছে।

এই প্রতীক নাটকটিতে যেমন আধুনিক জীবনের একটি অভিশপ্ত দিকের কথা বলা হয়েছে, তেমনি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার দ্বারা রক্তকরবীর রক্তিমার সাহায্যে অপরাজেয় প্রেম ও প্রাণের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। স্বর্ণলোভী আধুনিক জীবনের শক্তি ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হচ্ছেন যক্ষরাজ, নন্দিনী হল শস্যমুগ্ধ শ্যাম বসুন্ধরা। রঞ্জনকে যৌবনের প্রতীক বলা যেতে পারে। নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেমের প্রতীক হল রক্তকরবী। ঐশ্বর্যের স্থলে কৃষিজীবনকেই যেন কবি সমস্ত গৌরবে ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি 'রক্তকরবী'র তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, কারণ তাঁর মতে রামায়ণে ঐশ্বর্যের (রাবণ) স্থলে কৃষি সভ্যতাকেই (অর্থাৎ রামচন্দ্র, কারণ তিনি নবদূর্বাদলশ্যাম) জয়গৌরব দেওয়া হয়েছে। তা

সে যাই হোক, অভূতপূর্ব প্রতীকের ব্যঞ্জনা, তির্যক উজ্জল বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, নাটকীয়তা ও গীতিরসের মূর্চ্ছনার দ্বারা 'রক্তকরবী'তে রূপক-প্রতীকের প্রাধান্য সত্ত্বেও যে ঘটনামুখর নাট্যরস এবং যক্ষরাজ চরিত্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তা যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কল্প-জগতে বিহার করতেন না, বাস্তবজীবনের ক্ষয়ক্ষতি ও বেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং বাস্তব সমস্যার উৎকট অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে-কোন নেতা ও রাজনীতিবিদের চেয়ে অধিকতর সচেতন ছিলেন, তা 'রক্তকরবী'র বিষয়বস্তু ও পরিণতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

'কালের যাত্রা' শীর্ষক ক্ষুদ্র নাটিকায় তিনি দেখিয়েছেন, মহাকালের যাত্রা অর্থাৎ জীবনসত্তার বিকাশধারা তখনই অচল হয়ে থাকে, যখন সমাজের অপাংক্তেয় 'অচ্ছুত'গণ পঙ্কস্তরে ডুবে থাকে। শ্রেষ্ঠী, মন্ত্রী, রাজার টানে মহাকালের রথ চলে না ; যখন জনসাধারণ এসে দড়িতে হাত লাগায় তখন রথ চলে প্রচণ্ড গতিতে। তখন সেই রথচক্রতলে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে যায় রাজার রাজপ্রাসাদ, শ্রেষ্ঠীর সৌধ। কবি এখানেও আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন রূপকের ছলে উপস্থিত করেছেন। অবশ্য এই ক্ষুদ্র নাটিকায় তত্ত্বকথাটা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে বলে এর নাট্যলক্ষণ বড়ো কম। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রতীক নাটকের বিষয়বস্তু, রচনাকৌশল ও প্রতীকতা বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ প্রতীক-নাট্যকারের সমকক্ষ—কখনও কখনও উৎকৃষ্টতর, তা তাঁর উল্লিখিত নাটকগুলি থেকেই বোঝা যায়।

এরপর তাঁর কয়েকটি নৃত্যনাট্য ('তাসের দেশ'—১৯৩৩, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'—১৯৩৬, 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'—১৯৩৭, 'শ্যামা'—১৯৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্বতন রচনা থেকে এর মূল ঘটনা আহৃত হলেও কবি এতে নৃত্যকলা, অভিনয় ও সঙ্গীতের এক আশ্চর্য সমন্বয় করেছেন। এখনও এই সমস্ত নৃত্যনাট্য অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তাঁর কয়েকখানি নাটক-নাটিকা আছে। 'শোধবোধ' (১৯১৬), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'বাঁশরী' (১৯৩৩)—এর মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে গল্পগুচ্ছের দুটি গল্পের নাট্যরূপ। 'গৃহপ্রবেশ' বাস্তবপরিবেশের সামাজিক নাটক হলেও এর অন্তরালে রূপক-প্রতীকের কিছু প্রভাব আছে। 'বাঁশরী' একটু গোত্রবহির্ভূত নাটক। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে একপ্রকার বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকতার সঞ্চার হয়েছিল বেশী। 'বাঁশরী'তে ভাষা ও ভাববস্তুর মধ্যেও

একপ্রকার বুদ্ধিদীপ্ত স্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে। 'বাঁশরী'র পরিবেশ আধুনিক জীবনের পরিচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এর ঘটনাবস্তু, চরিত্র ও সংলাপ—কিছুই যেন বাস্তব বলে মনে হয় না। অবশ্য অভিনয়ে এই নাটকটি খুবই উতরে গেছে। দু' একটি সৌখীন দল এই নাটকাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক অনেক সময়ে অতিমাত্রায় লীরিকপ্রধান, কখনও কখনও বাস্তব পরিবেশ অতি-রোমাণ্টিকতার শূন্যলোকে উধাও-প্রায়, কখনও সমস্ত ব্যাপারটাই কবির তত্ত্বকথা ও অনুভূতির বাহন হয়ে পড়ে। তবু তাঁর নাটকে যে বিচিত্র ঐশ্বর্য দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পর্যায়ে তার একান্ত অভাব ; তাঁর অনেক নাটক, বিশেষত প্রতীক নাটক এখনও অননুকরণীয়—এর দ্বারাই নাট্যকার হিসেবে তিনি কালজয়ী হবেন।

তৃতীয় উপচ্ছেদ ঃ উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রপ্রতিভা যে কত ব্যাপক তা তাঁর গল্প-উপন্যাস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। উপন্যাসের স্বাদবৈচিত্র্য, বিষয়বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিবৈচিত্র্য ফোটাতে তিনি যে বিশেষ শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন, তার ঐশ্বর্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্ববাসীরও অভিনন্দন লাভ করেছে। অবশ্য একটা কথা সত্য, তাঁর উপন্যাসগুলির উৎসভূমি ততটা বাইরের পৃথিবী নয়, যতটা তাঁর মনোভূমি। গীতিকবির পক্ষে নাটক ও উপন্যাসে নিজস্ব ভাবকল্পনা ও আবেগ বর্জন করা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁর চিত্তলোকের কুশীলবে পরিণত হয়নি, একথা জোর করে বলা যায় না। তা সে যাই হোক, বাংলা উপন্যাসের মোড় ফেরাতে, নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে তাঁর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই স্বীকৃত হবে। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র ভিন্ন পথে গেলেও রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের প্রভাব ছাড়াতে পারেননি।

মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথ কৈশোরের সীমা ভালো করে পরিত্যাগ করেননি, তখনই 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয় (১৮৭৭-৭৮), কিন্তু এতে ততটা পরিপক্কতা নেই বলে পরে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তখন কিশোরকবি হৃদয়-অরণ্যের মধ্যে

দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, মনের মধ্যে শুধু রোমান্টিক আবেগের বাষ্প জমে উঠেছিল—কাজেই উপন্যাসের বস্তুভূমি যে আবেগে ও ব্যক্তিগত প্রবণতায় কিছু পিচ্ছিল হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কোথায়? একটি কিশোরীর জীবনকথা 'করুণা'র মূল কথাবস্তু। কিন্তু সাধারণকে অসাধারণের কোঠায় তুলে ধরার অপূর্ব দক্ষতা, যা তাঁর পরবর্তী কালের বৈশিষ্ট্য, তা তখনও তাঁর রচনায় ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে দেখা যাবে, 'করুণা'র সাধারণ বেদনার গল্প প্রায় কোথাও জমে উঠতে পারেনি। কবিও তাই এ কাহিনীকে পরবর্তী কালে কোনোরূপ স্বীকৃতি দেননি। প্রায় বাইশ বছর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) প্রকাশিত হয়, তারপর থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও কলারূপের ওপর প্রত্যক্ষ অধিকার অর্জন করেন। এখানে তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিষয়ভেদে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

১. ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার গোড়ার দিকে ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা উপন্যাস বা তথাকথিত 'রমন্যাস' (romance) লিখতেন তাঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী অবাধ কল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র সেই অবাধ কল্পনাকে বস্তুভিত্তিক তথ্য ও শৃঙ্খলাপূর্ণ কল্পনার দ্বারা সংযত করে তাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মে নিয়োগ করেছিলেন; কিন্তু স্বল্পপ্রতিভার লেখকদের সে শক্তি ছিল না, তাঁরা ইতিহাসকে ছাড়িয়ে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে উন্মত্তভাবে ধাবমান হতেন। রবীন্দ্রনাথ যৌবনারম্ভে যেমন কাব্যজীবনে হৃদয়বাষ্পপূর্ণ কল্পনার আর্দ্রভূমি পার হয়ে পায়ের তলায় মাটি পেলেন, তেমনি 'করুণা'র অবেগতরল দুর্বল কাহিনী ছাড়িয়ে ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাহিনীকে বস্তুভিত্তিক কল্পনার জগতে মুক্তি দিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের দু'খানি উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এবং 'রাজর্ষি'তে (১৮৮৭) বাংলা দেশ ও ত্রিপুরার ইতিহাসের কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। 'বউঠাকুরাণীর হাটে' রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বলা হয়েছে। অবশ্য এতে প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়, পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভার গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে, যার অধিকাংশই ইতিহাসে

নেই। প্রতাপাদিত্যের মূঢ় নির্মমতায় (যাকে সকলে বীরত্ব বলে শ্রদ্ধা করেছে) কীভাবে তার অন্তঃপুরে শান্তি বিঘ্নিত হল, পুত্র-কন্যার জীবন বিষময় হল, পিতৃব্য প্রাণ হারালেন এবং সদ্য-বিবাহিত কন্যা বিভার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল—সেই বেদনার কাহিনীটি এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তখন তাঁর বয়স অল্প ; তা সত্ত্বেও তিনি এমন একটা দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যাতে দেশবাসীর অনেকেরই সমর্থন ছিল না।

এতে তিনি প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করে প্রতাপাদিত্যকে উদ্ধত, অবিনয়ী, মূঢ়, নির্মম ও অপরিণামদর্শী চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন। সে যুগের ঐতিহাসিক ও লেখকেরা প্রতাপাদিত্যের ছিটেফোঁটা ঐতিহাসিক কাহিনীতে প্রচুর স্বদেশপ্রেমের কাল্পনিক গৌরব মিশিয়ে ধূমঘাটের ভূস্বামীকে মুঘলের বিরুদ্ধে স্বদেশপ্রেমিকরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেকথা মানতে পারেননি। পরে দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের অনুমানই ঠিক। আধুনিক কালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রতাপ মোঘলের বিরুদ্ধে লড়ে বন্দী হন এবং আগ্রায় নীত হবার সময় পথিমধ্যে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন, এইজন্য তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমন সমস্ত ত্রুটি ছিল যে, আদর্শ বীর ও মহৎ শাসক বলে তাঁকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা করা যায় না। পরবর্তী কালে কবিগুরু সর্বগ্রাসী 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-কে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাপাদিত্যের আচার-আচরণের মধ্যে তিনি সেই প্রচণ্ড ক্ষুধার হানিকর প্রাচুর্য দেখেছিলেন। পরেও তাঁর মন প্রতাপাদিত্য-ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছিল। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটক দুটি এই একই কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। 'বউঠাকুরাণীর হাটে' একটি দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে, কয়েকটি চরিত্রও (বিশেষত বসন্তরায়) সুচিত্রিত হয়েছে, প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অধুনা ইতিহাস-সম্মত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর ঘনত্ব ও চরিত্রের তির্যকতা—বিশেষত মানসিক দ্বন্দ্ব অতিশয় প্রাথমিক ধরনের হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের ওপর যে আঘাত এসেছে, তার সবটাই যান্ত্রিকভাবে এসেছে প্রতাপাদিত্যের দিক থেকে। কাহিনীর দুর্যোগের মূলে এই বাহ্যিক কারণটি এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে, এতে উচ্চশ্রেণীর উপন্যাসের কলাকৌশল বড়ো একটা ফুটে উঠতে পারেনি।

'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ত্রিপুরার রাজবংশের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এতে কল্পনার বৈচিত্র্য থাকলেও লেখক ইতিহাসকে বড়ো কোথাও অতিক্রম

করেননি। শেষ দিকে তো তিনি উপন্যাসের কাহিনীকে পুরোপুরি ইতিহাসের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। রাজা গোবিন্দমাণিক্য, যিনি দেবীমন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির নিদারুণ দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে এবং সে কাহিনী সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসসম্মত। এর সঙ্গে কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের সুযোগসন্ধানী ষড়যন্ত্র, ব্রাহ্মণ রঘুপতির সংস্কারাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যদম্ভ এবং সর্বশেষে তাঁর মনে বাৎসল্যরসের উদয় অতি চমৎকার উদারতর মানবধর্মের পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে। পরে এর থেকে উপাদান নিয়ে তাঁর 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়েছিল। এ উপন্যাসেও তাঁর প্রিয় ভাবধারার জয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথা ও সংস্কারের স্থলে মানবিক মূল্য এবং স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার যে আদর্শ চিত্র এতে আছে, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরেই তার সাধনা করেছেন। স্ফীতভূমিকাবর্জিত এই উপন্যাসটিতে প্রথম পরিণত শিল্পকৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস

পূর্ব-আলোচিত দু'খানি উপন্যাসের পর তিনি অনেকদিন কোন উপন্যাসে হাত দেননি। তারপর বাংলা ১৩০৮-১৩০৯ সনে 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে একখানি বড়ো উপন্যাস প্রকাশিত হল—'চোখের বালি' (১৯০০)। 'রাজর্ষি' প্রকাশের ষোল বৎসর পরে, বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী উপন্যাস 'চোখের বালি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই ষোল বৎসরের মধ্যে তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লিখেছিলেন। পূর্ববর্তী দু'খানি উপন্যাসে তিনি বোধহয় আশান্বিত হতে পারেননি। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন তাঁর মতো আত্মকেন্দ্রিক গীতি-কবির পক্ষে ছোটগল্পই অধিকতর শিল্পসুষমামণ্ডিত হবে। 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পে আশ্চর্য বিশ্লেষণ ও চরিত্ররূপায়ণ দেখা গেল। এবার বোধহয় তিনি বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস রচনার শক্তি অর্জন করলেন। 'চোখের বালি'তে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নূতনত্ব সঞ্চারিত হল। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পর বড়ো রকমের পালাবদল হল 'চোখের বালি'তে। বাল-বিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানা-পোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই আদর্শই শরৎচন্দ্রকে 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী চরিত্রাঙ্কনে প্রেরণা দিয়েছিল। মহেন্দ্র, আশা,

বিহারী ও বিনোদিনী—দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের জীবনের সমস্যা কিভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থিমোচন হল, বাঙালী-সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগসঞ্চিত সংস্কারে কবিগুরু কিভাবে আঘাত দিলেন, তার এক বিচিত্র, বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা এই উপন্যাসে পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা রমণীর পুরুষপ্রসক্তি সহ্য করতে পারেননি, অপরাধিনীকে হয় বিষপানে, আর না হয় পিস্তলের গুলিতে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বালবিধবার প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেননি, আবার তাকে সমাজ-সংসারের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। যাই হোক, মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অবচেতন সত্তার নিগূঢ় ইঙ্গিত, সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংঘাতের ফলে নারীর জীবন কোন্ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে সে কথা বলেছেন। গীতিকবির পক্ষে এভাবে কঠোর বাস্তবকে অনুসরণ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী'তে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে তাকে বাস্তবতার দিকে থেকে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলার মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকেরা 'চোখের বালি'র পন্থা ও রীতি অনুসরণ করে চলেছেন, অবশ্য মানসিক প্রবণতা অনুসারে তাঁরা কিছু কিছু ভিন্ন সুরও আমদানি করেছেন। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণমূলক রীতি রবীন্দ্রনাথের হাতে যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, তা 'চোখের বালি' থেকেই বোঝা যাবে।

'চোখের বালি'র কয়েক বছর পরে ১৯০৬ সালে 'নৌকাডুবি' প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব নেই। 'চোখের বালি'র লেখকের পরিণত ও পরিপক্ক লেখনী থেকে কাহিনীসর্বস্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর এ উপন্যাস কি করে জন্মলাভ করল সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র পর রচিত 'মৃণালিণী'-তে যেমন উৎকৃষ্টতর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং কেন এরকম হল সে বিষয়েও কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না, ঠিক তেমনি 'চোখের বালি'র মতো নিখুঁত নিটোল উপন্যাসের পর তরল রোমান্স-আশ্রয়ী ঢিলেঢালা ধরনের 'নৌকাডুবি' রচিত হল কেন সে বিষয়েও কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। রমেশ নামে এক যুবক নৌকাডুবির পর কোনও ক্রমে রক্ষা পায়। চেতনা ফিরে আসার পর দেখল, তার

পাশে আর একটি অপরিচিত নববধূ পড়ে আছে। তার নাম কমলা। সদ্য-বিবাহিতা কমলা বিয়ের রাতে স্বামীকে ভালো করে দেখেনি। কাজেই সে রমেশকেই তার স্বামী বলে মনে করল। এদিকে রমেশ হেমনলিনী নামে আর একটি তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে কিন্তু কমলাকে সব সময় দূরে দূরে রাখত, কখনও তার সঙ্গে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করেনি। কারণ সে তো কমলাকে পরস্ত্রী বলেই জানত। কমলার আসল স্বামীর নাম নলিনাক্ষ। পরে নানা বিচিত্র ঘটনার পরে নলিনাক্ষ-কমলার মিলন হলেও রমেশ-হেমনলিনী দূরে দূরেই রয়ে গেল। বলা বাহুল্য এ কাহিনীতে অপরিপক্বতার চিহ্ন বিদ্যমান, চরিত্রগুলিও স্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে ওঠেনি ; এর রোমান্স রূপকথার অধিকতর অনুগামী হয়েছে। কমলা যে মুহূর্তে নলিনাক্ষকে নিজের যথার্থ স্বামী বলে জানতে পারল, সেই মুহূর্তেই তার সমস্ত মন রমেশকে ছেড়ে নলিনাক্ষের দিকে সবেগে ধাবিত হল —এ বর্ণনায় মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা রক্ষিত হয়নি।

এর পরবর্তী কালে লেখা আর একটি জটিলচরিত্র উপন্যাসের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর নাম 'যোগাযোগ' (১৯২৯)। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৩৪-১৩৩৫) এটি 'তিনপুরুষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম এর মুখ্য বিষয়। হঠাৎ ধনাগমে-স্ফীত শিক্ষাসংস্কৃতিবর্জিত মধুসূদন মার্জিত আভিজাত্যে-বর্ধিত পড়তিঘরের স্নিগ্ধ মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করল। একদিকে কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজের স্নিগ্ধমধুর আভিজাত্যমণ্ডিত প্রভাব, আর একদিকে স্থূল রুচির মধুসূদনের স্থূলতর আকাঙ্ক্ষার অশুচি পীড়ন—কুমুদিনীর জীবন যখন প্রায় ব্যর্থ হতে বসেছিল, ঠিক তখনই বিধাতা এক বিচিত্র উপায়ে এ রহস্যের সমাধান করে দিলেন। কুমুদিনী আবিষ্কার করল সে সন্তানসম্ভবা। উপন্যাসটি পরবর্তী কালের রচনা হলেও মনস্তাত্ত্বিক দাবি এতে পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি, চরিত্রগুলিতেও বৈচিত্র্যের অভাব রয়েছে। কেউ পুরোপুরি সৎ, কেউ-বা অসৎ, অভদ্র, ইতর। মানসিক-সংঘাত একতরফা হওয়াতে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে এ অনবদ্য হতে পারেনি

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি সুপ্রসিদ্ধ 'নষ্টনীড়'। বাইরের দিক থেকে এ অনেকটা উপন্যাসের মতো, কিন্তু এর অন্তরে রয়েছে ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। এতে ঘটনার জটিলতার চেয়ে বিভিন্ন মনের নানা প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে। 'চোখের বালি'র

পর 'নষ্টনীড়'কেই মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকলনপন্থার শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। এর কাহিনী আর একটু ব্যাপক ও জটিল হলে এটি পুরোপুরি উপন্যাস হতে পারত। যাই হোক এই বর্গের উপন্যাসগুলির মূল বৈশিষ্ট্য মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য, এবং প্রায়শই নারীর মনস্তত্ত্ব। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী কালের লেখকদের পথনির্দেশক হয়েছেন।

৩. বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস

উপন্যাসের রচনার গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর হৃদয়দ্বন্দ্ব এবং তার সঙ্গে সমাজ, পরিবার ও নৈতিক চেতনার সম্পর্ক নিয়ে নানা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে অশান্ত সমাজ এবং বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক চেতনার আঘাতে তাঁর উপন্যাস এবার বিশালতর পটভূমিকায় জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে এসে দাঁড়াল। 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) যুগধর্ম ও নরনারীর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, রাজনীতি, স্বাদেশিকতা ও সমাজসমস্যার উদ্বেল তরঙ্গমালা বাঙালী জীবনকে কতটা সংক্ষুব্ধ করেছিল তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসগুলি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। সে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, বাঙালী ও ভারতীয় জীবনধারার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন, শুধু বিদেশী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং স্বাদেশিক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদী হিংসা, স্বদেশিয়ানার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভলালসা এবং হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি উগ্র হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নিল। রবীন্দ্রনাথ মনের আকাশকে কখনও খণ্ড খর্ব করে দেখতে চাননি, স্বদেশপ্রেমের স্থলে রক্তশোষী উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেননি, শাসকের বিরুদ্ধে গুপ্ত অভিযানের রক্তাক্ত পরিণাম কোন দিন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর উল্লিখিত উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর জীবনসমস্যা উদারতর মানববোধের পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর 'গোরা' এদিক থেকে শুধু তাঁর নয়, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগান্তকারী উপন্যাস, এটি য়ুরোপের epic novel-এর সঙ্গে তুলনীয়। আকারে-

প্রকারে, ভাবে, আদর্শে 'গোরা' মহাকাব্যের মতোই বিশাল—একটা গোটাজাতির মানসিক সঙ্কটের কাহিনী এর মূল বক্তব্য। এর ঘটনাবস্তুও খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র গোরা আসলে আইরিশ সন্তান। মুটিনির সময় তার জন্ম হয়েছিল। জন্মের পর তার বিদেশিনী মা মারা গেলে কৃষ্ণদয়ালবাবু তাকে নিজের সন্তান বলে প্রচারিত করেন, গোরাও তাই জানত। সে যেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে গোটা ভারতবর্ষের প্রতিভূ। প্রবল চরিত্র ও প্রবলতর কণ্ঠস্বরে সে একটি কথা ঘোষণা করতে চাইত—ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, হিন্দুর আচার-আচরণ নিষ্ঠাভরে পালন করাই দেশ-হিতৈষিতা। এর জন্য সকলের সঙ্গে সে তাল ঠুকে লড়াইয়ে নেমেছে। তার প্রচণ্ড পৌরুষের উত্তাপে তার চার পাশের সকলে—সে হিন্দুই হোক, আর ব্রাহ্মই হোক, ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বন্ধু বিনয়কে তো সে লঘু বোঝার মতো যত্রতত্র টেনে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত গোরাকে কবি উগ্র জাতীয়তাবাদী করে এঁকেছেন। সে যেন মানুষ নয়—মতপ্রচার, দলভাঙ্গা ও দলগড়ার প্রচণ্ড হাতিয়ার। ফোনোগ্রাফের মতো তার কণ্ঠ থেকে অবিরাম গৈরিক লাভাস্রোত বেরোয়। এই গোরার মানবিক পরিবর্তন, মানসিক রূপান্তর এবং যথার্থ ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করে কাহিনীটিকে নাটকীয় মুহূর্তে সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তারই সঙ্গে দাম্ভিক দেশপ্রেম, যা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ত্যাগ করে প্রচণ্ড লোভের মধ্যে সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়, তারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস রচনা করেন। একদা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন, কিন্তু সমস্ত আন্দোলনটি যখন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের গূঢ় ফণায় পর্যবসিত হল, তখন তিনি সেই তামসিক মত্ততা থেকে সরে দাঁড়ালেন, স্বাদেশিকতার নাম করে নির্জলা প্রমত্ততাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর রুচিকে তিক্ত করে তুলেছিল। সেই তিক্ততা প্রকটভাবে ধরা পড়ল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ, এই ত্রিভুজের কাহিনী মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাহায্যে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। চলিত ভাষায় লেখক তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে রচনারীতির দিক থেকেও এক অসাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নিখিলেশের শান্ত সংযত জীবনাদর্শ এবং বিমলার নিরুদ্বিগ্ন পাতিব্রত্য হঠাৎ বাধা পেল স্বদেশসেবী বলে পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। লোলুপ, উদ্ধত, অবিনয়ী, আবেগ-উন্মত্ত সন্দীপ দেশসেবকের ছদ্মবেশে বিমলার শান্ত প্রসন্ন মনটিকেও উদ্বেজিত করে তুলল। সন্দীপের প্রচণ্ড আবেগের পিচ্ছিল মত্ততায় হয়তো বিমলাও স্খলিত হয়ে ঢলে পড়ত। সন্দীপ 'বন্দেমাতরম্' বলে তার মন ভোলাতে চাইলেও আসলে সে নারীরূপকেই লালসার দৃষ্টিতে বন্দনা করেছে। শেষ পর্যন্ত স্বামী নিখিলেশের ধৈর্য ও মহানুভবতায় বিমলা নিজের আবিল অবস্থাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে উদার বিশ্বের বৃহত্তর পট-ভূমিকায় আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, ঘরের বন্ধন তার শিথিল হল, কিন্তু বাইরের আকাশ তাকে আমন্ত্রণ করে নিল। এ উপন্যাসের একদিকে বিমলার চরিত্রে দুই পুরুষের আকর্ষণ, আর একদিকে উগ্র স্বাদেশিকতার নগ্নমূর্তি ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ লোভী স্বাদেশিকতার বীভৎস আকার তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের চরিত্রদ্বন্দ্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণাম এবং নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে এক যুগের বাঙালী-জীবনের লিপিচিত্র অঙ্কন করেছেন।

'ঘরে বাইরে'র বেশ কিছু পরে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর আপন স্বরূপ কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তারই মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে তিনি লিখলেন 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। অতীন্দ্র ও এলার সেই ব্যর্থতার কথা এ উপন্যাসের মাত্র চারিটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর ঘটনা উপন্যাসের মতো পূর্ণ গঠিত নয়, কাহিনী ও উপকাহিনীগুলির মধ্যেও সংযম-সংহতির অভাব আছে। সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র, দেশসেবার নামে যে-কোন অপকর্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিকূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। অতীন্দ্র-এলা তথাকথিত দেশসেবার দেউলে নিজেদের মানবধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল, এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বড়ো আঘাত এল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর। রবীন্দ্রনাথ গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে—সর্বত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও উগ্র স্বদেশী ব্যাপারকে কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারতেন না। স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিবাদটাই তাঁর চোখে বড়ো বেশী পড়েছে, এর পিছনে যে আত্মত্যাগের রক্তিম পরিচয় রয়েছে তার গৌরবময় দিকটি তিনি এই সমস্ত উপন্যাসে উপেক্ষা করেছেন। যে যাই হোক, বার্ধক্যে লেখা 'চার

অধ্যায়ে'র ভাষা অতিশয় কৃত্রিম হয়ে পড়েছে, ঘটনাসন্নিবেশে কোন প্রকার সংগতি দেখা যায় না, সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র-সংক্রান্ত চিত্রগুলিও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। নরনারীর চরিত্রগুলি যেন লেখকের মনের রঙ্গমঞ্চে তাঁরই ভাবকল্পনার বাহন হিসেবে কাজ করে গেছে, সুতরাং কাহিনী ও চরিত্রে বাস্তব ঘটনার চেয়ে কাল্পনিক বর্ণনা ও ব্যাপারের অধিকতর প্রাধান্য দেখা যায়। তাই উপন্যাসের সমাপ্তি ধীর-মন্থর গতিতে অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে গড়ে উঠতে পারেনি; বরং বহুস্থলে, বিশেষত শেষদিকে ঘটনার স্বাভাবিকতা অতিনাটকীয়তার ঝড়ো হাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছে। উল্লিখিত তিনখানি উপন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ আত্মঘোষণাপরবশ জাতীয়তাবাদকে বিশেষ পছন্দ করতেন না, গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য হানিকর ব্যাপার, যা বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তির মনেও আগুন ধরিয়েছিল, কবিগুরু সে সমস্ত নগদ বিদায়ের লোভ সম্বরণ করে দেশসেবক ও দেশের নেতাদের এপথ থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো স্থিতধী সাধক তৎকালীন দেশ ও সমাজের গ্লানি কোথায়, তা নির্মমভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে উপন্যাসের কতটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা ভেবে দেখা উচিত। একমাত্র 'গোরা'র মধ্যেই সমসাময়িক জীবনচিত্র ও বিরাট দেশ-পরিকল্পনা মহাকাব্যের বিশালতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।

৪. মিস্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের গদ্যময় ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও তিনি দু'একটি উপন্যাসে অসাধারণ কল্পনাবৈচিত্র্য এবং রোমান্সের অদ্ভুত ঐশ্বর্য ফুটিয়েছেন, কোনটিতে বা মানবজীবনের অন্তরালবর্তী ব্যাখ্যাতীত নিগূঢ় সত্যকে অশরীরী রহস্যের আকারে রূপ দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গে' (১৯১৫) মিস্টিক জীবনরহস্য এবং 'শেষের কবিতা'য় (১৯২৯) মর্ত্যজীবনকে রোমান্টিক পট-ভূমিকায় উন্নীত করার আশ্চর্য কৌশল ফুটে উঠেছে।

'চতুরঙ্গে' শচীশ-দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানা-পোড়েনের আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাকে শুধু মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় না। চেতন মনের অন্তরালে যে রসধারা বহমান, আমাদের দেশের আউল-বাউল-সহজিয়া সাধকেরা যে রসের রসিক, শচীশের মতো মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী আধুনিক যুবকও লীলানন্দ স্বামীর কাছে সেই রসের দীক্ষা

নিয়ে রূপজগৎকে অরূপ জগতের অঙ্গীভূত করে নিল। অপর দিকে দামিনী শচীশকে রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়ে কামনা করে। এই বিচিত্র মনোদ্বন্দ্ব আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও অপরূপ রহস্যময় ব্যঞ্জনার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে রচিত কাব্যধর্মী ও রোমান্স-আশ্রিত উপন্যাস 'শেষের-কবিতা' (১৯২৯) একটি বিচিত্র বিস্ময়। তখন রবীন্দ্রনাথ সুবৃদ্ধ, কল্পনাবৃত্তির কিঞ্চিৎ খর্বতা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যৌবনমূর্তি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় যেন নতুন রামগিরি, নতুন অলকাপুরীর অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন। অবশ্য 'শেষের কবিতা'কে পুরোদস্তুর উপন্যাস বলা যায় না। প্রচুর কাব্যধর্ম, উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার স্তবক এবং রোমান্সের উচ্ছ্বাস এই গ্রন্থকে ক্ষণে ক্ষণে গদ্যকাব্যে রূপান্তরিত (সংস্কৃত মতে গদ্যপদ্যময় মিশ্র রচনাকে 'চম্পূ' কাব্য বলে) করেছে। অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের আখ্যান এ কাহিনীর প্রধান উপাদান হলেও এর মধ্যে কবি একটি গভীর তাৎপর্য সংযোজিত করেছেন। দৈনন্দিন বিবাহিত জীবনের কর্তব্যপীড়িত গতানুগতিকতা এবং অপার্থিব রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসার—এ দুয়ের মধ্যে মিল ঘটানো দুঃসাধ্য। তাই অমিত ও লাবণ্য পরস্পরের প্রেমকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বশ্বাস তাড়নার দ্বারা মলিন করল না, অমিত কেটী মিত্রকে এবং লাবণ্য শোভনলালকে সামাজিক বিবাহ করে চিরাচরিত কাজকর্ম করে যেতে লাগল। ঘড়ার জলে তৃষ্ণা মিটল, কিন্তু সমুদ্রজলের অশ্রুলবণাক্ত আস্বাদ উভয়ের মনে জন্মান্তরীণ সুখসৌভাগ্যের মতো বেঁচে রইল। এর তত্ত্ব যাই হোক না কেন, এরকম অপূর্ব কাব্যধর্মী বর্ণনা, তির্যক বাগ্‌বিন্যাসের নিপুণতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বর্গলোক রচনা এবং তা থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনের সকরুণ বেদনা বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের যৌবনমূর্তিকে এমন একটি অভাবনীয় ঐশ্বর্য দিয়েছে যে, সেকালের তরুণ সম্প্রদায়, যাঁরা 'রবীন্দ্রযুগ চলে গেছে' বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত হতচকিত হয়ে গেলেন। সেই-জন্য কথাসাহিত্যের আধুনিকতার ইতিহাসে 'শেষের কবিতা'র একটা বিশেষ মূল্য আছে।

এইগুলি হল রবীন্দ্রনাথের পুরোদস্তুর উপন্যাস, যদিও গীতিপ্রবণতা, কবির ব্যক্তিগত ভাবভাবনা এতে নানা প্রভাব বিস্তার করেছে। এছাড়াও তাঁর আরও দু-একখানি আখ্যানধর্মী গদ্যরচনা আছে, যেগুলি যথার্থ উপন্যাসের আকার লাভ করতে পারেনি। 'দুই বোন' (১৯৩৩) এবং 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) আসলে

ছোটগল্পের আখ্যান, তাকে একটু দীর্ঘায়ত করে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়েছে। নারী দু'রূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে—প্রিয়ারূপে আর জননীরূপে। প্রধানত এই তত্ত্বটি 'দুই বোনে'র শর্মিলা, ঊর্মিমালা ও শশাঙ্কের কাহিনীর মধ্যে বিবৃত হয়েছে। এই সমস্যাই আর একটু ভিন্ন দিক থেকে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা এবং আদিত্যের জীবনে রূপায়িত হয়েছে। এই দুটি উপন্যাসই ছোটগল্পের কলমে লেখা। ঘটনা ও চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুধু আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, ভাবরসেই তাঁর আত্মার মুক্তি। ঔপন্যাসিকের যে ধরনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণকুশলতা থাকা প্রয়োজন, গীতিকবিরা ঠিক সে জাতের শিল্পী নন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসে বাস্তব চিত্রগুলি কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। সেইজন্য সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মুগ্ধ হলেও তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই অধিকতর সীমাবদ্ধ। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও যে একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম এবং বাংলা উপন্যাসের নতুন দিক্‌নির্দেশক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. ছোটগল্প

গল্প বলা ও শোনা মানুষের একটা দীর্ঘকালের সংস্কার। প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ অসম্বদ্ধ ভাষায় গল্প কাহিনী রচনা করত, শুনত। কিন্তু যাকে ছোটগল্প অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় short story বলে, তার জন্ম হাল আমলের ব্যাপার। ছোটগল্প এমন একটি শিল্পকর্ম যার উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য আধুনিক যুগের প্রয়োজন ছিল। শ'খানেক বছর আগেও পাশ্চাত্ত্য গল্প-লিখিয়েরা ও সমালোচকগণ ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি নিয়ে দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর নানা ভাষায় নীতি, ধর্ম, রোমান্স, অদ্ভুত, উদ্ভট নানা বিষয় নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে। আমাদের সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষাতেও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু ছোটগল্প বলতে একটা নতুন ধরনের শিল্পকে বোঝায়। ছোটগল্পের মোটামুটি সংজ্ঞা হল—"A short story must contain one and only one informing

idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method." এ থেকে মনে হয়, ছোটগল্প আর পাঁচটা গল্পের মতো শুধু আখ্যানসর্বস্ব ব্যাপার নয়। সংহত পরিধিতে বাহুল্যবর্জিতভাবে মানুষের জীবন সম্বন্ধে কোন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাপারের ওপর আলোক নিক্ষেপ করাই হল, ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ। তাই নাটকীয়তা, গীতিমূর্ছ'না, আকস্মিকতা ও ব্যঞ্জনা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান। ছোটগল্পের নানা শ্রেণী-উপশ্রেণী হতে পারে। কোনটিতে আখ্যান, কোনটিতে চরিত্র, কোনটিতে প্রকৃতির রহস্যময়তা, কোনটিতে দুর্জ্ঞেয় নিয়তির অঙ্গুলিসঙ্কেত, কোনটিতে সমাজ-রাষ্ট্রের পীড়ন-জনিত মানুষের দুর্ভাগ্য, কোনটিতে বিশ্লেষণ, কোনটিতে-বা ব্যঞ্জনার প্রাধান্য থাকে। মানুষ যেমন অযুত বৈচিত্র্যে ভরা, তেমনি মানুষের গল্পও অসংখ্য ধরনের হতে পারে। অধুনা ছোটগল্পের আঙ্গিক নিয়ে বিশ্বের গল্পলিখিয়েরা নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, গল্প ও চরিত্রের প্রতি প্রাধান্য দিতে আজকের গাল্পিকেরা আর প্রস্তুত নন, বিশ্লেষণের খুঁটিনাটিও তাঁরা ত্যাগ করতে চান। তাঁরা এখন ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে নিমজ্জিত নানা আভাস-ইঙ্গিত নিয়ে ব্যস্ত। যাকে অধুনা 'চৈতন্যপ্রবাহ' ('stream of consciousness') বলা হচ্ছে, অর্থাৎ লেখকসত্তার অবচেতন-কোঠায়-বন্দী ব্যাখ্যাতীত ভাবানুষঙ্গ—সাম্প্রতিক ছোটগল্পে সেই সমস্ত চলিষ্ণু চেতনার টুকরো-টাকরা আভাস লেখকেরা ফুটিয়ে তুলতে চান। আধুনিক ছোটগল্পের ধরনধারণ দেখে মনে হচ্ছে, অচিরে গীতি-কবিতা ও ব্যক্তিগত নিবন্ধের (personal essays) প্রতীকতার মধ্য দিয়ে ছোটগল্প এমন একটি রূপকল্প গ্রহণ করবে, যাতে গল্প-আখ্যান, চরিত্র, পরিবেশ প্রভৃতি ব্যাপার সম্পূর্ণ লোপাট হয়ে যাবে, শুধু লেখকের কয়েকটি অস্পষ্ট, কায়াহীন অসম্বদ্ধ ধারণা ছোটগল্প নাম নিয়ে পাঠকমহলে হাজির হবে। এক হিসেবে ভারতীয় মতে ব্যঞ্জনা এবং পাশ্চাত্ত্য মতে প্রতীকতাই হল শিল্প সাহিত্যের শেষ পরিণাম। ছোটগল্প অদূরভবিষ্যতে যদি শুধু দুটি-একটি আভাসে অথবা প্রতীকে পর্যবসিত হয় তা হলে আপত্তি করার কারণ থাকবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এযুগ প্রধানত ছোটগল্পের যুগ, ধাবমান কালস্রোতে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে স্বল্পকালের মধ্যে ছোটগল্প গড়ে ফেলাই আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য। এখন *War and Peace*-এর মতো বৃহৎ-কলেবর উপন্যাস রচনা

ও পাঠের দিন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। মহাকাব্য যেমন লুপ্ত হয়ে গেছে, তার স্থান অধিকার করেছে গীতিকবিতা, তেমনি উপন্যাসও একদিন অতিকায় প্রাণীর মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর তার শূন্যস্থান পূরণ করবে অসংখ্য ছোটগল্প। এ অনুমান নিতান্ত হাস্যকর নয়। ছোটগল্প বিশ্বের সর্বত্র আজকাল এত প্রাধান্য অর্জন করেছে যে, এরপর শুধু ছোটগল্পই থাকবে, কথাসাহিত্যের শাখাপ্রশাখা বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এ রকম অভিমত অগ্রাহ্য নাও হতে পারে। কিন্তু আধুনিক কালেও দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্ত্য দেশে epic novel নামে মহাকাব্যের মতো বিশাল উপন্যাস রচিত হচ্ছে, এবং তার জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট। আমাদের বাংলাদেশেও ছোটগল্প অতিশয় জনপ্রিয় হলেও আজকাল যে সমস্ত স্ফীতকায় উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে, (ছুঁড়ে মারলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, এমন তার আকার ও ওজন!) তাতে কি মনে হয় না যে, উপন্যাসের প্রতি আকর্ষণ এত সহজে যাবার নয়?

বাংলাদেশে গল্প-আখ্যান প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথই যথার্থ ছোটগল্পের জীবনদান করেন। তাঁর আগে সঞ্জীবচন্দ্রের দুটি-একটি রচনায় ছোটগল্পের কিছু লক্ষণ ছিল। কিন্তু তখনও বাংলাদেশের কোন লেখকই ছোটগল্পের স্বতন্ত্র শিল্পকথা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তাঁরা এবং পাঠকেরা মনে করতেন, ছোটগল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখলে উপন্যাস হয় এবং উপন্যাসের ডালপালা ছেঁটে দিয়ে ছোট করে দিলে ছোটগল্প হয়। এ মত একেবারে ভ্রান্ত। ছোটগল্প ও উপন্যাসের ধরনধারণ ও রীতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সচেতনভাবে ছোটগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন, তিনিই এর পথনির্মাতা, আবার তিনিই এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। গীতিকবিতা ও ছোটগল্প মেজাজের দিক থেকে যেন যমজভাই। তাই গীতিকবির পক্ষে ছোটগল্প লেখা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা যেমন হোক না কেন, ছোটগল্পে তিনি বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের সমকক্ষ। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' লিখলেও তিনি যেন তখন অন্তরের সুরটি ঠিকভাবে ফোটাতে পারছিলেন না। তাই তাঁর উপন্যাস রচনায় দীর্ঘ বিরতি লক্ষ্য করা যায়। ইতিমধ্যে তিনি এক বিচিত্র ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিতে মেতে উঠলেন। নিজস্ব শিল্পমানস সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় মনে করেছিলেন, দীর্ঘায়ত উপন্যাসে নয়, ছোটগল্পেই তাঁর মনের মুক্তি ঘটবে। এই সময়ে তিনি সাপ্তাহিক

'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক রূপে যোগ দিলেন এবং প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছোটগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। নানাকারণে এ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু ছোটগল্প রচনার নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। পদ্মাতীরে জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার অবকাশে তিনি বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে পরিচিত হলেন, বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখদুঃখের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। দ্বন্দ্ব-কলহ, মামলামোকদ্দমা, ত্যাগ-ভোগ, নীচতা-স্বার্থপরতা, স্নেহ-ভালোবাসা প্রভৃতির সংমিশ্রণে পল্লী-বাংলায় যে জীবন গড়ে উঠেছে তাকে গল্পে ফোটাতে তিনি উৎসাহী হলেন। একটি কবিতায় তিনি তাঁর এই সময়কার মনোভাব চমৎকার ফুটিয়েছেন ঃ

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

এই মনোভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তিনি বহু ছোটগল্প রচনা করেন, যার অনেকগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোটগল্প রচনার আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত তাঁর অটুট ছিল, জীবনের প্রান্তভূমিতে পৌঁছিয়েও তিনি আধুনিক জীবনসমস্যাকে ছোটগল্পে গ্রহণ করে তরুণ লেখকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহ তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র তিনখণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। সেই ছোটগল্পগুলি শিল্পলক্ষণ বিচারে যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি বাঙালীর গ্রামীণ ও নাগরিক চিত্র হিসেবেও তার মূল্য অসাধারণ। কিন্তু তাই বলে তিনি গল্পগুলিকে শুধু বাঙালী-জীবনের স্থানকালঘেরা গণ্ডির মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে রাখেননি। বাঙালী-জীবনের আধারে এর মধ্যে চিরকালের মানুষের সুখদুঃখ স্থান পেয়েছে, তাই বিদেশীরাও তাঁর গল্পের মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দ খুঁজে পান।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানুষ, প্রকৃতি এবং রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃত ভাবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। আমাদের গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের নানা ছবি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা দশা, পারিবারিক বিরোধ, স্নেহ-প্রেমের সংঘাত

ও সঙ্কট, নানাধরনের ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ, পরিশেষে মানবধর্মের জয় ইত্যাদি বাঙালী-জীবনের নানা ধরনের ছোট বড়ো কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তিনি গোটা বাঙালী-জীবনকে দেখেছেন। সে জীবন কলকাতার নাগরিক জীবন হতে পারে, আবার গ্রামজীবন হতেও বাধা নেই। এই সমস্ত পারিবারিক কাহিনীতে বাস্তব পরিবেশের এমন জীবন্ত রূপ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমরা আর কোথাও বড়ো একটা দেখিনি। তাঁকে অনেকে খিরদহর্ম্যনিবাসী কল্পনাবিলাসী কবি বলে মনে করেন। কেউ বলেন, পদ্মার বুকে বোটের ওপর থেকে তিনি দুই তীরের জীবনের ছবি দেখেছেন, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ভবনচূড়া থেকে কলকাতার ছবি এঁকেছেন। সুতরাং তাঁর ছোটগল্পে বাস্তবের আভাস আছে, পুরো বাস্তব নেই—এসব কথার চুলচেরা বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়। তবে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" সাংবাদিকের ধর্ম—শিল্পীর ধর্ম নয়। বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে শিল্প সৃষ্টি হতেই পারে না, একথা কড়াকড়ি করে মানলে অনেক শিল্পীকেই লেখায় ইস্তফা দিতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন, কল্পনার সাহায্যও সেই রকম প্রয়োজন, বা বেশী প্রয়োজন। কল্পনার সাহায্য না পেলে গল্পকাহিনী সংবাদপত্রের আইন-আদালতের পৃষ্ঠা ছেড়ে বেশী দূর উঠতে পারবে না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও পারিবারিক গল্পগুলিতে সমাজ ও জীবনের যে বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে, তাকে কবির রচনা বলে অবহেলা করার উপায় নেই। এর মধ্যে কয়েকটি প্রেমের গল্প আছে, যাতে প্রেম, সৌন্দর্য ও কল্পনার বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। যথা—'একরাত্রি', 'দুরাশা', 'শেষের রাত্রি', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি গল্প অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গৃহীত হতে পারে। 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'রাসমণির ছেলে', 'ছুটি', 'দিদি', 'ঠাকুরদা' প্রভৃতি গল্পে আমাদের স্নেহপ্রেমের এমন একটা পারিবারিক রূপ ফুটেছে যাতে কবির দৈনন্দিন জীবনপরিচিতি খুবই নিবিড় রসে ভরে ওঠে। 'নষ্টনীড়ের' কথা আমরা উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এটি আকারে দীর্ঘ হলেও প্রকারে ছোটগল্পের জাত। অমল ও চারুর বিচিত্র সম্পর্ক এবং তার পরিণামটি লেখক নিপুণ বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে বলেছেন। বিশ্লেষণমূলক ছোট-গল্পের দিক থেকে এটি অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে।

তাঁর কয়েকটি গল্পে গীতিকবিতা ও রহস্যরসের সমন্বয়ে জড়প্রকৃতির একটি

চমৎকার মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় যোগাযোগও অপূর্ব ব্যঞ্জনার আকারে নির্দিষ্ট হয়েছে। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি গল্পে উদার বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কাহিনীগুলি নিটোল গীতিকবিতার আকারেই ফুটে উঠেছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির উদাসীন ঔদার্যের ছায়াতলে মানুষের স্বাতন্ত্র্য কিছু নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা' ইত্যাদি গল্প আমাদের সাধারণ ভৌতিক সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলি ঠিক ভূতের গল্প নয়। ভৌতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের অপার রহস্য দূরান্তৃত জীবনের অশরীরী ব্যঞ্জনা প্রভৃতি এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, এতে প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। বিশ্বের সেরা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলির মধ্যে তাঁর উল্লিখিত গল্পগুলিও প্রশংসনীয় স্থান পেয়েছে।

শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত গল্পে আধুনিক জীবনের সমস্যার অবতারণা করেছেন—যেমন 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি'। এতে আধুনিক জীবনের নানা ব্যক্তিগত সমস্যার অবতারণা করে বৃদ্ধ কবি বর্তমান সমাজ-সংসারের প্রতি সজীব কৌতূহলেরই পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য পূর্বতন গল্পগুলির তুলনায় এই আধুনিক গল্পগুলিতে মানবজীবন সম্পর্কে এমন কিছু অভিনবত্ব দেখা যায় না। তরুণ লেখক ও সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য আধুনিক মনের জন্য এই গল্প নিয়ে প্রচুর জয়ধ্বনি করেছিলেন। আধুনিক জীবনের বক্র সমস্যাকে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত বক্রোক্তির দ্বারাই জীবনময় করেছেন।

ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে টলস্টয়, মোপাসাঁ, চেকভের পাশেই স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য টলস্টয়ের কোন কোন গল্পে অনাবশ্যক খ্রীস্টানী নীতিতত্ত্বের বাড়াবাড়ি রয়েছে। মোপাসাঁ য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পকার হলেও আদিরসের উল্লাসের দিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে কোন কোন [illegible]ংকৃষ্ট ছোটগল্প জীব-জীবনের স্থূল তাড়নার দ্বারা অন্ধকার গুহাপথেই যাত্রা ক[illegible]ছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে টলস্টয়সুলভ কোন ধর্মীয় অনুশাসনের ইঙ্গিত [illegible]ই, মোপাসাঁর মতো মানুষকে তিনি শুধু একটা দেহধারী সজীব জন্তু ভাবতে পারে[illegible]। মানুষের গভীর সত্তার স্বরূপ তাঁর গল্পে যতটা ধরা পড়েছে য়ুরোপের পু[illegible] দিনের খুব কম লেখকই তার নাগাল ধরতে পারবেন। এদিক থেকে [illegible]

গল্প আধুনিক কালেও সকলের বিস্ময় আকর্ষণ করে থাকে। তাঁরই জন্য আধুনিক বাংলা ছোটগল্প সারাভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করেছে, কারণ তিনি শুধু ছোটগল্পের স্রষ্টা নন, ছোটগল্পকে বিশিষ্ট শিল্পমূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর একক কৃতিত্ব বলে পরিগণিত হবে। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ছিলেন বলেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পে এত সহজে উত্তীর্ণ হয়েছেন, কারণ এই প্রসঙ্গের গোড়াতেই আমরা দেখেছি যে, গীতিকবিতা ও ছোটগল্পের মধ্যে কৌলিক সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।

চতুর্থ উপচ্ছেদ : প্রবন্ধ-নিবন্ধ

এই উপচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথের আর এক বিচিত্র সাহিত্যকর্মের পরিচয় নিয়ে রবিপ্রদক্ষিণ সমাপ্ত করব। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত রসশিল্পী হলেও বাংলা-দেশের অর্ধশতাব্দীর মননের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সহজেই চোখে পড়বে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে যে প্রাবন্ধিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরাই বাংলা প্রবন্ধের নানা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেছিলেন। কিন্তু কিশোর রবীন্দ্রনাথ মাত্র পনের বৎসর বয়স থেকেই চিন্তাশীল প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এ সংবাদ বিস্ময়কর বটে। বাল্যকৈশোরের কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ ততটা স্পষ্ট হতে পারেনি। ভাবাবেগ, অকারণ বেদনা, রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস প্রভৃতির অতিরেকের ফলে তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যসাধনা থেকে অস্ফুটতা ও অস্পষ্টতার বাষ্পাচ্ছন্ন ভাব ঘোচেনি এবং ঘোচা সম্ভবও ছিল না। কারণ কৈশোর বয়সটাতে কিছু ভাবাবেগ থাকবেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বয়সে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি অদ্ভুত সংযমের সঙ্গে যুক্তিতর্কের ক্ষুরধার পথ অনুসরণ করেছেন এবং স্বল্প বয়সে স্বল্প অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই কিশোর সমালোচক 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যের আলোচনায় এই মহিলাকবির রচনাকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। এ কাব্যের কে প্রকৃত রচনাকার, তখন কেউ তার সন্ধান জানত না, সকলে এটিকে স্ত্রীলোকের রচনা বলে উল্লসিত হয়েছিল। কিশোর কবি-সমালোচক এ কাব্যের রচনাকারের কৌশল যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা বিচার করলেও এটি যে স্ত্রীলোকের রচনা নয়, তা তখন ধরতে পারেননি, ধরেছিলেন অনেক পরে—'জীবনস্মৃতি'তে তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তরুণ বয়সেই তিনি 'মেঘনাদবধের' অতি কঠোর সমালোচনা করে

'ভারতী' পত্রে (১২৮৪) প্রকাশ করেছিলেন। সে আলোচনায় একটু উদ্ধত ভাব ফুটে উঠলেও তার অনেক স্থান খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। অবশ্য পরিণত বয়সে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং অল্প-বয়সের অবিনয়ী সমালোচনার জন্য উত্তরকালে কিছু সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৯) তিনি আর একবার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে উক্ত মহাকাব্যের কিছু কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকলেও যুক্তিবন্ধন অধিকতর সুষ্ঠু হয়েছিল। মাত্র পনের বৎসর বয়স থেকে তিনি গদ্য প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪১ সালে বৈশাখ মাসে 'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক শেষ প্রবন্ধে (জন্মদিনের ভাষণ) তিনি প্রাবন্ধিক সত্তার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে জীবনরঙ্গভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। সুদীর্ঘ জীবন ধরে তিনি সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এত প্রবন্ধ রচনা করেছেন যে, তার পরিমাণ তাঁর রসসাহিত্য থেকে খুব কম হবে না। এই সমস্ত প্রবন্ধে তাঁর অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন ও যুক্তিনিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমকালীন বাংলাদেশে তাঁর প্রবন্ধগুলিই শিক্ষিত সমাজে নব নব আদর্শ প্রচার করেছিল। তাঁকে যে মহাত্মাজী গুরুদেব বলতেন, তা শুধু কাব্যকবিতার জন্যই নয়; রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্য দিয়েই চিন্তা, মনন, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরম শ্রদ্ধার্হ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখানে তাঁর বিচিত্র প্রাবন্ধিক প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

১. সাহিত্য-সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ কবি ও রসপ্রমাতা। পৃথিবীর বহু কবিই সমালোচনা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ড্রাইডেন, ওয়ার্ড'স্ওয়ার্থ, শেলী, কোলরীজ, ম্যাথু আর্নল্ড, এলিয়ট—এ'রা যুগপৎ কবি ও সমালোচক। রবীন্দ্রনাথও রসতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, আলোচনা করে নানা প্রসঙ্গে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্য দিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যের পুরো মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, এবং সেই আদর্শ স্থাপন করে তারই মাপকাঠির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মূল্য বিচার করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭) 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭) 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)

'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) এবং 'সাহিত্যের স্বরূপে' (১৩৫০) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য বিচার ও বিশেষ বিশেষ কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রচিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম দেশী-বিদেশী গ্রন্থ এবং নিজস্ব অন্তঃপ্রেরণা থেকে সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব (aesthetic) সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব নিষ্কাশিত করে নেন। 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের স্বরূপ' ও 'সাহিত্যের পথে'—তিনি এই তিনখানি গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্ববোধের সঙ্গে শিল্পবোধের সংযোগ, সাহিত্যস্রষ্টা, পাঠক ও সমালোচকের সম্পর্ক প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্বকথা—যা অনেকটা কাব্যতত্ত্বের (poetics) পটভূমিকায় রচিত হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে শিল্প বিচারপদ্ধতি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এই আলোচনায় মুখ্যত রস, সৌন্দর্য, আনন্দ ও অনন্তের নিরিখে তিনি কাব্যতত্ত্ব ও শিল্পসমীক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে ঔপনিষদিক আনন্দবাদ তাঁকে প্রধান প্রেরণা জুগিয়েছে। এইভাবে সাহিত্যবিচার সম্পর্কিত কয়েকটি মূল সূত্র প্রতিষ্ঠিত করার পর সেই সূত্রানুসারে তিনি প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ যুগ ও ব্যক্তির পরিচয় নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। অবশ্য সন তারিখ ধরলে দেখা যাবে, হয়তো সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কথা তিনি বহু দিন পূর্বে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু আলোচনার তত্ত্বটি অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে 'থিওরি' এসেছে পরে, 'থিওরি'র নিরিখে লেখা সাহিত্য-নিবন্ধগুলি লেখা হয়েছে আগে। এর মূল রহস্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে যুক্তিশাস্ত্রের *a posteriori* বা inductive (আরোহ) থেকে *a priori* বা deductive (অবরোহ)-এ গেছেন, বিশেষ বিশেষ কবি-সাহিত্যিকের কথা আলোচনা করতে করতে তাঁর মনে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত কতকগুলি মৌলিক চিন্তা ও তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। সেগুলি তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপে' আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'প্রাচীন সাহিত্যে' তিনি ভাবব্যাকুল ও রসার্দ্র দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে (বিশেষত রামায়ণ, কালিদাস ও বাণভট্ট) বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় তাঁকে পথ দেখিয়েছে বিশ্লেষণবুদ্ধি নয়,

একটা সমগ্র রসচেতন দৃষ্টি। রামায়ণ ও কালিদাসের যুগে তিনি মানস-পরিক্রমা করে যে যুগ, সাহিত্য ও জীবনধারার মধ্যে অবগাহন করেছেন, সে যুগের প্রাণের বাণীটি আধুনিক কালের কর্ণগোচর করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, এ তো সাহিত্য বিচার হয়নি, এ হয়েছে রসাবেশে-আপ্লুত পূজারতি। দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেকথা পূর্বেই বলে নিয়েছেন। তাঁর মতে প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনার অর্থ পূজারতি। প্রাচীন ক্লাসিক কবিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে তিনি তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে শ্রদ্ধাসহ প্রবেশ করেছেন, প্রাচীন ভারতের যথার্থ জীবনচিত্র তিনি রামায়ণাদি মহাকাব্যে এবং কালিদাসাদি ক্লাসিক-রোমান্টিক শিল্পীদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। 'আধুনিক সাহিত্যে'ও তিনি মুখ্যত আধুনিক বাংলা এবং গৌণত দু'একটি বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাতে বিশ্লেষণপদ্ধতি এবং বিচার-বিতর্ক কিঞ্চিৎ অনুসৃত হয়েছে। আধুনিক কালের মানুষ বলে তিনি তাঁর সামসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে যে কিছু 'ক্রিটিক্যাল' হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? তবু এই পুস্তিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি তাঁর অগ্রজ ও গুরুস্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের শিল্পপ্রবণতা ও সাহিত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একটা সমগ্র চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এদিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষত এদেশের এবং ওদেশের সাহিত্যিকদের তুলনামূলক আলোচনায়। অবশ্য নানা দিক দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিচার সংক্রান্ত অনেক আদর্শ তিনি মানতে পারেননি। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়র ও কালিদাসের তুলনামূলক আলোচনায় শেক্সপীয়রের চেয়ে কালিদাসকে ঈষৎ নিকৃষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পথ পরিত্যাগ করে অন্যভাবে কালিদাসের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'লোকসাহিত্যে' (১৯০৭) তিনি বাংলার অবহেলিত গ্রাম্য সাহিত্য ও কবিসঙ্গীতের বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর শিল্পরস ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশে আজকাল লোকসাহিত্য চর্চার যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তার পুরোধা হলেন স্বয়ং কবিগুরু। এবিষয়ে তিনি এত কৌতূহলী ছিলেন যে, নিজেই অনেক লোকসাহিত্যের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছিলেন। আবার শুধু সাহিত্যবিচার ও সাহিত্য সমালোচনাই নয়, ব্যাকরণ ('বাংলা ভাষা পরিচয়'—১৯৩৮), 'ছন্দ' (১৯৩৬), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯)—প্রভৃতি নিতান্ত গদ্যময় নীরস

ব্যাপারকেও তিনি সাহিত্য-বিচারবুদ্ধির দ্বারা রমণীয় করে তুলেছেন। সাহিত্যালোচনায় বিচারবুদ্ধির সঙ্গে রসভোগ ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে—একথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার্য।

২. রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যালোচনায় নয়, দেশের রাজনীতি, সামাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে কত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং সেই চিন্তাকে গঠনমূলকভাবে যুক্তিসমন্বিত প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেছিলেন, তা তাঁর ঐ বিষয়ক কয়েকখানি প্রবন্ধ-সঙ্কলনের পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। তাঁদের পরিবারে বহুকাল আগে থেকেই স্বদেশী ও ভারতীয় ভাবের চর্চা ছিল, অশনে-বসনে-চিন্তায়-কর্মে ঠাকুরবাড়ী সে যুগের মর্কটবৃত্তিধারী ইঙ্গবঙ্গীয়দের অনুকরণ করেনি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকৈশোর সেই স্বদেশী আবহাওয়াতেই বর্ধিত হয়েছে। 'হিন্দুমেলা'র অনুষ্ঠানে বালক রবীন্দ্রনাথ একটি জোরালো স্বদেশী কবিতাও পাঠ করেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলাদেশে রাজনীতিঘটিত স্বদেশী আন্দোলন, বিশেষত 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সঙ্গে যুবক রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ঘটেছিল, কারণ তিনি এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে সমগ্র জাতির উত্থানের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই 'রাখীবন্ধন', 'শিবাজী উৎসব' প্রভৃতি কবিতায় তিনি সেই স্বদেশপ্রেমের গৌরব ও মিলনপ্রচেষ্টাকে অভ্যর্থিত করেছেন। তখন তিনি ('ভারতী' পত্রে) গঠনমূলক স্বদেশচিন্তা প্রসঙ্গে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে পরের অনুকরণ, বিশেষত তদানীন্তন কংগ্রেসের পরমুখাপেক্ষিতাকে তিনি প্রকাশ্যেই নিন্দা করেছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' যুগে এবং তারপরে সন্ত্রাসবাদী যুগে নানা প্রবন্ধে তিনি গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বিদেশী বস্ত্রবিনাশ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কর্মপ্রণালীকে সুস্থ স্বদেশী আন্দোলন বলে গ্রহণ করতে চাননি। সেজন্য সেই যুগের রক্তমাতাল নেতৃবৃন্দ এবং অগ্নিবর্ষী সাময়িক পত্র তাঁকে ইংরেজ শাসকের পক্ষভুক্ত মনে করে অনেক নিন্দাবিদ্রূপও নিক্ষেপ করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতা ও চণ্ডনীতি সম্পর্কে তিনি মানবধর্মের দিক থেকেই কঠোর প্রতিবাদ তুলেছিলেন। তেমনি আবার যে সমস্ত উগ্রপন্থী নেতা দেশকে ভেতর থেকে সমগ্রভাবে প্রস্তুত না করে শুধু উত্তেজনার আগুন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সে কর্মপন্থার কখনও সমর্থক ছিলেন না। তাঁর সমসাময়িক উপন্যাসেও এই ধরনের উগ্রতার বিরুদ্ধে নানা কথা বলা

হয়েছে। রাজনীতি ও সমাজ আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ আদর্শে বিশ্বাস করতেন, এই যুগের প্রবন্ধে সেই আদর্শকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন। এমনকি মহাত্মা গান্ধীকে তিনি অতিশয় স্নেহ ও সম্মান করলেও তাঁর কোন কোন কর্মপন্থা তিনি অনুমোদন করেননি। নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের কথা তিনি 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'পরিচয়' (১৯১৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় বলেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা,—সর্বত্র তিনি মানবধর্মকে জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছেন, এবং আশু ফললাভের জন্য ভাবী মনুষ্যত্বকে অবহেলা করতে চাননি। এই সমস্ত কথা, যা আজকের দিনের রাষ্ট্রনেতা ও সমাজনেতাদেরও বিচলিত করে তুলেছে, অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে নানা প্রবন্ধে তিনি তার পূর্বসঙ্কেত দিয়ে গিয়েছেন। আজকে সমাজে, জীবনে ও আচরণে যে ভয়াবহ অধঃপতন ঘনিয়ে আসছে, এটা যে অসম্ভব কিছু নয়, তা তিনি বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, আমাদের স্বদেশতত্ত্ব ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজ-সংস্কারের আস্ফালনে শুধু কলরবটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। যখন অশুভ-অন্যায় পন্থাও কার্যোদ্ধারের জন্য স্বীকৃত হয়েছিল, তখনই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে পাপ প্রবেশ করেছিল—রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। অপ্রিয় সত্যের প্রতি আমাদের নেতারা চোখ বুজে ছিলেন; ভেবেছিলেন—যে-কোন পন্থায় কার্যোদ্ধার হলেই হল। সেই অনৃতাচার ও কপটতার শাস্তি পরবর্তী যুগে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'প্রফেট' রূপেই গণ্য করা যায়।

'শিক্ষা' (১৯০৮) শীর্ষক একটি প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যা, পাশ্চাত্য রীতিনীতির সঙ্গে বাংলাশিক্ষার বিরোধ, মাতৃভাষার প্রতি দারুণ অবহেলা শিক্ষাকে কৃত্রিম ছাঁচে ঢেলে প্রাণহীন আবহাওয়ার সৃষ্টি প্রভৃতি শিক্ষার ত্রুটিগুলিকে তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত এ সমস্ত আলোচনা নিতান্ত থিওরির কচকচি নয়। তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সামনে এসেছিলেন, 'শিক্ষা' গ্রন্থে সেই বিষয়েই আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে তিনি যৌক্তিকতা, মননশীলতা ও উদার দৃষ্টির যে পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে তার মূল্য অসাধারণ।

৩. ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি এবং কবির যে ধরনের মনোদর্শন থাকা সম্ভব, তাঁরও সেই ধরনের দার্শনিক প্রবণতা ছিল। অন্যান্য কবির সঙ্গে তাঁর অনেক তফাত আছে, ধর্ম-দর্শন-অধ্যাত্মপ্রবণতাতেও সেই পার্থক্য বর্তমান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় প্রতীকতা ও গোষ্ঠিগতপ্রাণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। ভারতীয় জীবনদর্শনের কয়েকটি অনুকূল-প্রবাহ তাঁর প্রাণ ও অনুভূতিকে গভীর চৈতন্যরসে ডুবিয়ে দিয়েছিল। মূলত ঔপনিষদিক তত্ত্ববাদের ওপরে তাঁর দর্শনচিন্তা ও মননপ্রণালী গড়ে উঠেছে। মহর্ষিদেবের সাত্ত্বিক সান্নিধ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে; ঠাকুরবাড়ী চিরদিনই বাঙালীর সাধারণ ধর্মসংস্কারের কিছু বাইরে থাকত। মুসলমান আমলে এঁদের পরিবারে মুসলমানী আদবকায়দা ঢুকেছিল, উপরন্তু এঁরা 'পীরালি' শ্রেণীর (যদিও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিক ব্রাহ্মণ) ছিলেন বলে সমাজের তথাকথিত ব্রাহ্মণশ্রেণীর সঙ্গে এঁদের খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। তারপর রামমোহনের বেদান্ততত্ত্বের প্রভাবে দ্বারকানাথ থেকেই এ পরিবারে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আচার-বিচার ও ধর্মতত্ত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। মহর্ষিদেবের প্রভাবে বেদান্তের মায়া-মুক্তির স্থলে ঔপনিষদিক আনন্দবাদ ও লীলারস এঁদের আচার-আচরণকে একটি সংযত, আত্মগত ধর্মীয় উপলব্ধি এবং সাত্ত্বিক তন্ময়তা দিয়েছিল, যাকে সেযুগের সনাতনপন্থী ও পৌরাণিকমতে-বিশ্বাসী হিন্দুসমাজ বিশেষ সন্দেহ করত। সে যাই হোক, বাল্য থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের তত্ত্ব ও সাধনায় নিষ্ণাত হয়েছিলেন।

কাব্যসাধনা, তত্ত্বোপদেশ, চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি থেকে তাঁর বিশিষ্ট ধর্মমত ও দর্শনপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, যথার্থ কবির কোন মার্কা-দেওয়া দার্শনিক প্রবণতা বা প্রতীকচিহ্ন থাকতে পারে না। কবি যে-পরিমাণে বিশুদ্ধ দার্শনিক, সেই পরিমাণে কবিত্ব থেকে স্খলিত। তবে অনেক সময় কবি দর্শনচিন্তাকে নিজের আবেগ-অনুভূতির অংশীভূত করে নেন, তত্ত্বকথা তখন রসের আকারে কবিসত্তাকে প্লাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে তাই ঔপনিষদিক জীবব্রহ্মবাদ অর্থাৎ সীমা-অসীমতা, বেদান্তের-ব্রহ্মতত্ত্ব, মধ্য-যুগীয় বৈষ্ণব ও সন্তসাধক সম্প্রদায়ের প্রেমভক্তির লীলারস এবং বাংলার রহস্যবাদী বাউল সম্প্রদায়ের গীতাত্মক অধ্যাত্মসাধনা বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করে তাঁর অনুভূতিকে অবগাঢ় ঐক্যের অভিমুখে নিয়ে গেছে। সেই

সমস্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে সঙ্কলিত হয়েছে। 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬) এবং 'মানুষের ধর্মে' (১৯৩৩) তাঁর এই সাধনা ও তত্ত্ববাদ প্রবন্ধ ও আলোচনার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে 'শান্তিনিকেতন' নামীয় পুস্তিকাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলিতে তিনি তাঁর নিজের ধর্মানুভূতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে উপনিষদের তত্ত্বকথাই তাঁর মূল অবলম্বন, কিন্তু তাতে নতুন রঙ ধরেছে তাঁর ব্যক্তিগত চিত্তপ্রবণতার প্রভাবে। অবশ্য কেউ যদি উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের সঙ্গে তাঁর আলোচনাকে মেলাতে যান তবে তিনি ব্যর্থ হবেন। কারণ উপনিষদই হোক আর বেদান্তই হোক, সমস্ত তত্ত্বকথাই কবিমনে গিয়ে নতুন রূপ নিয়েছে। ফরাসী দর্শনিক বার্গসঁ *Elan vital* তত্ত্বে গতিবাদ ও পরিবর্তন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 'বলাকা' কাব্যরচনার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বের দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বার্গসঁ সে তত্ত্বকে চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বরূপেই দেখেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে অনুভূতিতে গ্রহণ করেছেন বলে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক সত্য কাব্যসত্যে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির ফলে দার্শনিক ও কবির উপলব্ধ সত্যের আকার ও পরিণাম সুস্পষ্ট হয়েছে।

তাঁর ধর্মানুভূতি ও দার্শনিক চিন্তার মূলকথা হল—সীমা-অসীমের নির্দ্বন্দ্ব সম্পর্ক, বিশ্বগত ঈশ্বরচেতনাকে ব্যক্তিগত ঈশ্বরচেতনার অর্থাৎ জীবনদেবতা তত্ত্বের মধ্যে বিবৃত করা এবং জাতিসম্প্রদায়হীন বৃহৎ মানবসত্তায় আত্মোপলব্ধি। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত তত্ত্ব ও চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির রূপ ধরেছে, ফলে বুদ্ধিগ্রাহ্য মননের খোলস খসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের যদি কোন দর্শন থাকে, তবে তা কবির জীবনদর্শন; তার সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের প্রভাব ও সংযোগ থাকলেও বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তা রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম নয়। কয়েকখানি গদ্যনিবন্ধে তাঁর সেই বিচিত্র জীবনদর্শন বিবৃত হয়েছে।

৪. ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

এতক্ষণ ধরে আমরা রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা এবং তত্ত্বমূলক প্রবন্ধনিবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। যদিও তিনি কবি ও রসস্রষ্টা, তবু বিবিধ তত্ত্ব-কথা সম্পর্কে তিনি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের মতোই যুক্তিতর্কসহ আলোচনা করেছেন

এবং পরিশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁর গদ্যনিবন্ধের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, আত্মকথা, চিঠিপত্র, ডায়েরি, ভ্রমণকাহিনীগুলিই অধিকতর মূল্যবান। কারণ এই রচনাগুলিতে তিনি নিজের মনের কথা বলতে চেয়েছেন এবং তত্ত্ব, তথ্য ও বস্তু-উপাদানকে নিজের রসচেতনায় সিক্ত করে প্রবন্ধকে রসচেতনার কোঠায় তুলে ধরেছেন। এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তাঁর মননের যথার্থ মুক্তি হয়েছে। তাঁর মতো বিশুদ্ধ গীতিকবির পক্ষে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-নিবন্ধে বেশী স্বস্তি বোধ করা সম্ভব এবং তাঁর উক্ত রচনা কবিতার মতোই বিশুদ্ধ রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ব্যক্তিগত রচনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' (১৯০৭), এবং 'লিপিকা'র (১৯২২) নাম করা যেতে পারে। অবশ্য 'লিপিকা'কে পুরোপুরি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ এর অনেকগুলি নিবন্ধ ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। তবে সর্বত্র কবিমানসের নিবিড় উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-রূপেই বিচার্য। 'পঞ্চভূত'কে মানুষ বানিয়ে তাদের মুখে এবং বিতর্কসভার মারফতে প্রচুর কৌতুকরসের আমদানি করে কবি সাহিত্য, রস, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গুরুতর তত্ত্বকথাকে নিজের মনের রসে রাঙিয়ে বলেছেন। 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' অষ্টাদশ শতাব্দীর স্টিল-অ্যাডিসন-গোল্ডস্মিথ এবং উনবিংশ শতাব্দীর চার্লস্ ল্যাম্বের আদর্শে রচিত হলেও এ গ্রন্থে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও দার্শনিক চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এর বহু অংশ গদ্যকাব্য বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়পটে জগৎ ও জীবন যে ছায়া ফেলেছে, মনের বীণায় যে সুর বাজিয়েছে, 'বিচিত্রপ্রবন্ধে' তার বিচিত্র রসরূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রথম নির্ভেজাল দৃষ্টান্ত হল এই সঙ্কলন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, জীবনস্মৃতি, ডায়েরী, ভ্রমণকাহিনী—সর্বত্র এই ব্যক্তিগত সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯৩), 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২), 'চিঠিপত্র' প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর জীবনকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র' ও 'রাশিয়ার চিঠি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুটিতে তাঁর কাব্যজীবনের পটভূমিকা এবং তৃতীয়টিতে তাঁর প্রগতিশীল আধুনিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি' কবির তথ্যসঙ্গত বাস্তব আত্মকথা

নয়, 'ছিন্নপত্র'ও 'কেজো' কথায় ভর্তি চিঠিপত্রও নয়—এ দুটি হচ্ছে তাঁর কবি-জীবনেরই উপাদান এবং পটভূমিকা। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে সমস্ত রচনায় কবি স্ফুটবাক হতে পারেননি, 'জীবনস্মৃতি'তে ব্যাখ্যার ছলে সেগুলিকে তিনি স্ফুটতর করেছেন। তা ছাড়াও প্রথম জীবনের যে সমস্ত স্মৃতির টুকরো কবির কাব্যজীবনের সহায়ক হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন, এতে তারই কথা বর্ণিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' হল তাঁর কয়েকখানি চিঠির নির্বাচিত অংশ। একেও কবির অন্তর্জীবন ও সাহিত্য-জীবনের, বিশেষত তাঁর গল্পগুলির পটভূমিকা বলে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য চিঠিগুলি নির্বাচিত আকারে মুদ্রিত হয়েছে বলে কবির ব্যক্তিগত ও বাস্তব জীবনাংশ এতে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। 'রাশিয়ার চিঠি' রুশদেশের ভ্রমণকথা। ও দেশের বিপ্লবোত্তর জীবনের গৌরবময় ইতিহাস, তাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও ঐতিহ্যের সহৃদয় ব্যাখ্যা তাঁর আগে বিশ্বের কোন কবিসাহিত্যিকই এতটা খোলাখুলিভাবে করতে সাহস করেননি। বৃটিশ শাসক একদা রাশিয়ার 'জার'-জুজুর ভয়ে কম্পমান ছিলেন, বিপ্লবোত্তর যুগের রাশিয়াকে ঘিরে বলশেভিক ভীতি এ দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের নিদ্রাতন্দ্রা কেড়ে নিয়েছিল। সেই যুগে কবিগুরু খোলা মনে রুশদেশের গৌরবকথা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ কোন কালেই ইতিহাসের জড়বাদী দ্বান্দ্বিক বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবু সেই পন্থায় অবহেলিত রুশজাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশের অন্নবস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলে তিনি তাদের মন খুলে প্রশংসা করেছিলেন। তখন (১৯৩১) রাজনৈতিক নেতারাও এ বিষয়ে স্বচ্ছদৃষ্টি ও উদার মনোভাবের ততটা অধিকারী ছিলেন না। 'জাপানযাত্রী', 'পথের সঞ্চয়' প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনী শুধু ভ্রমণের বর্ণনা নয়, তিনি যে-দেশে গেছেন, সে দেশের জীবনযাত্রা তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তা ঐ ভ্রমণকাহিনীগুলি থেকেই পাওয়া যাবে।

স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকার গ্রন্থপরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁর কাব্যপ্রতিভা এমন বিচিত্র ও ব্যাপক যে, দু'কথায় তা সেরে ফেলা যায় না। এখানে ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্য শুধু সূত্র নির্দেশ করা হল। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তী সভার অভিনন্দনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথাই শেষ কথা।

সপ্তদশ অধ্যায়

রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

১. সূচনা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যকে যেমন বঙ্কিমপর্ব বলা হয় তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্রযুগ নাম দেওয়া যেতে পারে। এই শতকের প্রথম দিকে না হলেও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩) পর থেকে তাঁর প্রভাব ক্রমে ক্রমে বাঙালীর সাহিত্য, জীবন, সংস্কৃতি ও আদর্শকে রূপান্তরিত করেছে, নব মূল্যবোধ দিয়েছে। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে ১৯৩০ সালের পর থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব ও পন্থা পরিত্যাগ করে নতুন পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা কোন কোন কবিবিহঙ্গকে চঞ্চল করে তুলেছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় নবীনের দলকে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সামাজিক অবক্ষয় সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজে রবীন্দ্রপ্রভাব খুব গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্কিমপ্রভাবের রেশ মিলিয়ে যায়নি, রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধেও অনেকের সংশয় ঘোচেনি। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল—এঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও আদর্শ সম্বন্ধে এই সময় থেকেই প্রতিকূল স্রোতে সমালোচনার তরণী ভাসিয়েছিলেন, কেউ কেউ দুর্নীতির অভিযোগ এনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিলেন। এ যুগের উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের একচক্ষু-নীতি কবিগুরু সমর্থন করেননি। যিনি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী নেতা ছিলেন, তিনি এর মধ্যে রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদের গূঢ়চারী গতায়াত দেখে এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করলেন এবং মানুষ তৈরীর কাজে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর এই রাজনৈতিক অনীহাকে কেউ কেউ ভীরুতা অপবাদে নিন্দা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সমাজে ব্রাহ্ম মতাদর্শ স্বাভাবিক কারণে হীনবল হয়ে পড়লে এবং সংস্কারকামী হিন্দুসমাজ পুনরুত্থিত হলে তাঁকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মনে করে কেউ কেউ তাঁর সর্ববিধ কর্মের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়লেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলির বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে দুর্নীতিপূর্ণ অশ্লীলতার অভিযোগ

আনলেন, তাঁকে নিন্দা করার জন্য 'আনন্দবিদায়' নামে বিদ্রূপপূর্ণ রঙ্গনাট্য লিখলেন। অবশ্য তার জন্য তিনি সকলের কাছে নিন্দিতও হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরাণাচারী হিন্দুধর্মের যে পুনরুত্থান ঘটল, তারই মুখপাত্র হিসেবে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিতবাদী' (১৮৯১), সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' (১৮৯০) প্রভৃতি পত্রে হিন্দুধর্ম ও সমাজবিষয়ক কিছু কিছু রক্ষণশীল মত প্রচারিত হতে শুরু করল। অপর দিকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা আবার বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিছু হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কার, তাকেই যেন বিদ্ধ করতে লাগল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান হলে নব্য-হিন্দুধর্মের প্রচারক তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের কেউ কেউ উল্লিখিত হিন্দুসমাজের মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকাগুলিতে যোগদান করলেন, যাঁদের অনেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমর্থক ছিলেন না। বিশেষত রবীন্দ্ররচনা এমন একটা সূক্ষ্ম মানসিক অনুশীলন ও স্থিতধী চেতনারসের বস্তু যে, দ্বৈরথসমরে অভিলাষী সূক্ষ্মতাবোধহীন ব্যক্তির পক্ষে তার গহনে প্রবেশ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌঁছলে রবীন্দ্রবিরোধী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের বিষোদ্গার যে একবারে বন্ধ হয়ে গেল তা নয়। একটু পরবর্তী কালে যখন রবীন্দ্র-প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে উঠেছে, তখনও কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি নিন্দার তূণ থেকে দুটি-চারটি শায়ক নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অবশ্য এবার বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, সাহিত্যাদর্শ নিয়েই তাঁর সঙ্গে নবীন ও প্রাচীনের দল বিবাদ-বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং নবীনতর সাহিত্যিকেরা—রবীন্দ্রসাহিত্য যথেষ্ট বাস্তব নয়, এবং তাতে যুগযন্ত্রণা ফোটেনি, এই ধরনের অর্ধসামাজিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ'দের কারও কারও সঙ্গে তিনি বিতর্কে অবতীর্ণ হতেও বাধ্য হন। ক্রমে ক্রমে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্রবিরোধিতা হ্রাস পেল। এর পরে কয়েকটি শক্তিশালী পত্রিকাগোষ্ঠী তাঁকে কবিগুরু বলে বরণ করে নিল, তাঁর সমর্থক ও ভক্তদের কণ্ঠ প্রশংসায় কল্লোলিত হয়ে উঠল।

'মানসী', 'ভারতী,' 'প্রবাসী' এবং 'সবুজপত্র' হল রবীন্দ্রবাণীর প্রধান বার্তাবহ। এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবি-সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন।

একদা 'ভারতী'গোষ্ঠী তো রবীন্দ্রভক্তদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' যেমন একদিকে সংস্কারমুক্ত তারুণ্যের জয়গান করেছে, তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যের যজ্ঞসত্রেও পরিণত হয়েছে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রতিভা ও প্রভাব শিক্ষিত বাঙালীসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু এর পর থেকেই নবীন সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রপন্থা ছেড়ে দিয়ে নতুন পথের সন্ধানে অগ্রসর হলেন। অবশ্য ১৯৩০ সালের কিছু আগে থেকেই এই নতুন পথের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন নবীন কবি ও সাহিত্যিক কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন পথের বার্তা আনলেন। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' (ঢাকা থেকে প্রকাশিত) প্রভৃতি পত্রিকায় নব্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে বাংলা সাহিত্যে নবীনতা ও প্রগতির বার্তা সাড়ম্বরে ঘোষিত হল, আর রবীন্দ্রপক্ষচ্ছায়া ত্যাগের পরিকল্পনা চলল। প্রধানত কাব্যক্ষেত্রেই রবীন্দ্রমার্গ ছেড়ে অভিনব পথের অভিসারে বেরুলেন নবীন কবির দল। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'। ১৯৩২ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' প্রকাশিত হলে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন, রবীন্দ্রসূর্যের পাশেই কয়েকটি নক্ষত্র নিজেদের শক্তি অনুসারে নতুন আলো বিকিরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। অবশ্য গগনাঙ্গন-আকীর্ণ সূর্যপ্রতিভার আলোক-প্লাবনে ক্ষীণদীপ্ত ক'টি তারকার যে স্বতন্ত্র আলোকপন্থা রয়েছে, সে যুগে তার উজ্জ্বলতা বড়ো কারও চোখে পড়েনি। ১৯৩০ সালের কিছু পর থেকেই এই ব্যাপার ক্রমেই নবীন পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সে কথা আমরা রবীন্দ্র-উত্তরকালের সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে বলব। বর্তমান অধ্যায়ে রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করা হল।

প্রথম উপচ্ছেদ : কাব্য-কবিতা

কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে যেমন মাঝে মাঝে সুকঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তেমনি আবার তিনি প্রথম থেকেই কয়েকজনের আনুগত্য লাভ করেছিলেন, যাঁদের কেউ কেউ তাঁর সমসাময়িক কালে তাঁরই প্রভাবে কাব্য রচনায় কিছু সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ'রা কবিগুরুর দীপবর্তিকা থেকেই আলোক জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। ভাব, বস্তু, প্রকাশভঙ্গিমা,—সব দিক থেকেই তাঁরা রবীন্দ্র-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৯০০), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪), রমণীমোহন ঘোষ

(মৃত্যু-১৯২৮), ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০)—এ'রা সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন এবং নিজ নিজ রচনায় সাগ্রহে রবীন্দ্রপ্রভাব বরণ করেছিলেন। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪১), রজনীকান্ত সেন, (১৮৬৫-১৯১৯), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)—এ'রাও কবিতা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কবিগুরুর পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। এ'দের মধ্যে প্রমথনাথের 'পদ্মা' (১৮৯৮), 'আরতি' (১৯০২), রজনীকান্তের 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০) এবং অতুলপ্রসাদের 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১) একদা যথেষ্ট গৌরব অর্জন করেছিল। অবশ্য অতুলপ্রসাদের গানগুলি মূলতঃ গান, গৌণতঃ লীরিক। কিন্তু রজনীকান্তের অধিকাংশ গানে সঙ্গীতের অতিরিক্ত একটা লীরিক স্বাতন্ত্র্য ও মাধুর্য আছে। প্রেম, ভক্তি ও স্বদেশপ্রেম অবলম্বন করে রচিত রজনীকান্তের গান এককালে সারা বাংলাদেশকেই মাতিয়ে দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যদিও গোড়ার দিকে ঘোরতর রবীন্দ্রবিদ্বেষী ছিলেন, তবু কাব্যক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনমেজাজের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যাবে। তাঁর 'আর্য গাথা' (১ম-১৮৮২, ২য়-১৮৯৩), 'আলেখ্য' (১৯০৭), 'ত্রিবেণী' (১৯১২) এবং 'মন্দ্রের' (১৯০২) কয়েকটি কবিতা উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার ছাড়পত্র পাবে। তাঁর 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে'র গান ও কবিতা বাংলা সাহিত্যের একটি অপরিসর শাখাকে শক্তি দান করেছে। রঙ্গব্যঙ্গের কবিতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ'রা ছাড়াও আমরা এখানে পৃথগ্‌ভাবে এমন কয়েকজন কবির কথা বলব, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করলেও পরিমিত ক্ষেত্রে কিছু কিছু মৌলিকতাও দেখিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—এ'রা সকলেই রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু কাব্যের নানা ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভার অনুকূল অনেক বৈচিত্র্যের প্রমাণ রেখে গেছেন।

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

বুদ্ধিকেন্দ্রিক বাতায়ন থেকে এবং সংস্কারমুক্ত নির্মোহ মন নিয়ে যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবাদী চৈতন্যের বিচিত্র রূপ নির্মাণ করেছিলেন সেই মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ বিধাতার কোন্ অভিপ্রায়ে কবি

সাধনা করেছেন। প্রেম, দেশপ্রেম, প্রকৃতি ও অতীত ইতিহাস, আর তার সঙ্গে কদাচিৎ বৈষ্ণব ভক্তিরস—মোটামুটি এই ক'টি কেন্দ্রের চারিদিকে তাঁদের কাব্যবৃত্ত তৈরি হয়েছে। কল্পনা, চিন্তা ও বাক্‌রীতিতে তাঁরা কবিগুরুর প্রভাব মেনে নিয়েছেন, সূর্যের আলোকেই তাঁরা জ্যোতির্ময়—একথা তাঁরাও স্বীকার করেছেন, তাঁদের পাঠকেরাও স্বীকার করবেন।

এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ('ঝরাফুল'—১৩১৮, 'শান্তিজল'—১৩২০, 'ধানদূর্বা'—১৩১৮) এবং একখানি কাব্যসঙ্কলন ('শতনরী'—১৩৩৭) একদা রসিক পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছিল। মধুর শব্দবিন্যাস, সুখশ্রাবী ছন্দ, প্রেম ও প্রকৃতির সৌন্দর্যময় প্রতীকতা, বাস্তব পৃথিবীতে স্বপ্নসর্গ রচনার প্রয়াস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এক-সময়ে পাঠকদের বিস্ময় আকর্ষণ করেছিল। স্বপ্নময় রোমান্টিক গীতিকবিতার নানা বৈচিত্র্য তাঁর কাব্যগ্রন্থকে একটা স্বাদুতার স্বাদ দিয়েছে। তাঁর কবিতার ছন্দের কারুকর্ম থাকলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো আতিশয্যে পরিণত হয়নি, রোমান্টিকতা থাকলেও তা মর্ত্যলোক ছেড়ে স্বপ্নপুরে অভিপ্রয়াণ করেনি। বস্তুত বাস্তবজগতের বস্তুপ্রতীতিকে ক্ষুণ্ণ না করেও তিনি যে রোমান্টিক জগতের রূপ অঙ্কন করেছেন, উপভোগের দিক থেকে তার মূল্য নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), করুণানিধানের অল্প পরে কাব্য-সাধনায় ব্রতী হয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে সেই আদর্শে নিজের কাব্যতরণীকে নিয়ন্ত্রিত করে 'অপরাজিতা' (১৯১৯), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'নীহারিকা' (১৯২৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যের সাহায্যে একদা পাঠকমনে নতুন রস সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ইতিহাস-চেতনা, ভারতের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগ—এই সমস্ত উপাদান তাঁর কবিতাকে একটা বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। প্রেম, সৌন্দর্য, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম—তাঁরও কাব্য-উপাদান মূলত এইগুলি; কিন্তু তার সঙ্গে একটা সুস্থ বাস্তব জীবনবোধ তাঁর কবিতাগুলিকে, রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিতে পেরেছে। তাঁর কাব্যসঙ্কলন 'কাব্যমালঞ্চ' এখনকার পাঠকসমাজেও প্রচলিত আছে। আবেগব্যাকুল রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ইতিহাসবোধের শক্ত মৃত্তিকাযোগ আছে বলে তাঁর কবিতা এখনও প্রশংসার দাবি রাখে।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক কিছুদিন পূর্বে গত হয়েছেন (১৮৮২-১৯৭০), কবিশেখর কালিদাস রায়ও (১৮৮৯-১৯৭৫) তিন বছর পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন। পল্লী-প্রবণতা, বৈষ্ণব ভাবরস, বাংলার গ্রামীণ সংস্কার—এই সমস্ত উপাদান তাঁদের কবিতাকে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মতোই একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য দান করেছে। কুমুদরঞ্জনের 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮) 'অজয়' (১৯২৭), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে তাঁর বৈষ্ণবরসসিক্ত মনটি চমৎকার ফুটেছে, তুলসীমঞ্জরীর মৃদু সুবাসের মতো তাঁর কবিতাও পবিত্র সদ্‌গন্ধে বড়ো মনোরম। কিন্তু বাক্‌রীতি, কাব্যপ্রত্যয় ও প্রকাশসুষমায় তাঁর কবিতাও যে কালজীবী হবে তা মনে হয় না। তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ আর মুদ্রিত হয় না, স্কুল-কলেজ ছাড়া অন্যত্র তিনি বিশেষ পঠিত হন না। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলনগ্রন্থটি না থাকলে এ কালের পাঠক তাঁর কবিতাকে ভুলেই যেত।

কবিশেখর কালিদাস রায় কবি ও সমালোচক হিসেবে কিছুদিন পূর্বেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের ('পর্ণপুট'—১৯১৪, 'ব্রজবেণু'—১৯১৫, 'বল্লরী'—১৯১৫, 'বৈকালী'—১৯৪০) কিছু কিছু কবিতা এখনও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁর কাব্যজীবনের নিয়ামক শক্তি বৈষ্ণব প্রীতিরস, পল্লীবাংলার শান্ত মাধুরী, প্রেম ও প্রকৃতি। কোন কোন কবিতায় তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আধুনিক পাঠকও তার থেকে উপভোগের রস খুঁজে পাবেন। তবে পূর্বেই আমরা বলেছি, রবীন্দ্র-প্রভাবেই এঁদের কাব্যযাত্রা। তাই খুব নতুন একটা মৌলিকতা তাঁদের কাব্যে চোখে পড়ে না। কবিশেখর কলিদাস রায় শুধু কবি নন, রসপ্রমাতা সমালোচকও বটে। অবশ্য তাঁর সমালোচনায় সনাতন দৃষ্টি থেকে সাহিত্যবিচার করা হয়েছে, এ বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ স্বরূপ চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রযুগে কবিগুরুর আদর্শে এই গোষ্ঠীর কবিদের যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম পরিচালিত হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলা কবিতার পালাবদল হয়েছে, রূপরীতি ও বিষয়বস্তুর বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা এঁরা বিচলিত হননি, এখনও সেই পুরাতন তথা সনাতন রীতিতেই কাব্যসাধনা করে চলেছেন। আরও দু' একজন (যেমন—কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ; ১৮৮৭-১৯৩১) এই একই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের কবিতাও একদা পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছিল,

কিন্তু আধুনিক পাঠকের রুচির মোড় ফিরেছে বলে তাঁদের অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে। এবার আমরা এই যুগের এবং এই ভাব ও ভাবনার মধ্যে বর্ধিত এমন কয়েকজন কবির নাম করব যাঁরা কোন কোন ব্যাপারে নিজস্ব মৌলিকতা দেখিয়ে গেছেন এবং এখনও তাঁরা কবিহিসেবে পাঠক সমাজে জীবিত আছেন। আমরা মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা বলছি।

৩. মোহিতলাল, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ

এই তিনজন কবি রবীন্দ্রযুগে বর্ধিত হয়েছেন, রবীন্দ্রবাণীকণিকা থেকেই রস আহরণ করেছেন, কিন্তু নিজস্ব কতকগুলি মৌলিক চিন্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে যে সমস্ত কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন,, তার ভাবভঙ্গিমায় রবীন্দ্রানুসরণ লক্ষ্য করা গেলেও বক্তব্যের মধ্যে অদ্ভুত অভিনবত্বের সূচনা হয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রপন্থা পরিত্যাগ করে আধুনিক বাংলা কবিতা যে নতুন পথে যাত্রা করেছে, তার প্রথম পথিক হলেন এই কবিত্রয়। আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে তাঁদের মৌলিক পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রপ্রভাব ছাড়িয়ে নতুন পথে যাবার ইঙ্গিত তাঁরাই প্রথমে দিয়েছেন, তা স্বীকার করতে হবে।

কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) একাধারে কবি ও সমালোচক। জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁর ম্যাথু আর্নল্ড্‌সুলভ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্লাসিকনিষ্ঠ প্রত্যয় আছে। কাব্য, জীবন ও কাব্যবিচার—এই তিনটিকে তিনি কখনও পৃথগ্‌ভাবে দেখেননি, বা ঐহিক প্রয়োজনে সারস্বত জীবনকে বলি দেননি। সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি অতিশয় নির্ভীক এবং মুক্তকণ্ঠ। প্রেমতন্ময় জীবনধর্ম, তার সঙ্গে সুদৃঢ় ক্লাসিক নিষ্ঠা মিশিয়ে মোহিতলাল বাংলা কাব্যের স্বাদ ফেরাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য দল বেঁধে কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নতুন 'স্কুল' বা যুগপ্রতিষ্ঠায় তাঁর কোন অভিরুচি ছিল না। বলিষ্ঠ পৌরুষ এবং কামনার রক্তরাগ নিয়ে যেদিন তিনি কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেদিন রবীন্দ্রপ্রভাবে বিমুগ্ধ পাঠকসমাজও চমকে উঠেছিল। প্রেম, সৌন্দর্য, রোমান্টিকতা—তার সঙ্গে প্রশ্নসঙ্কুল নাস্তিকতা, তান্ত্রিকের মতো দেহযন্ত্রে রসোপলব্ধি, ইন্দ্রিয়াসক্তের তীব্র কামসাধনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁর সমগ্র কবিজীবনকে একপ্রকার দলছাড়া পার্থক্য দিয়েছে। ইদানীন্তন কালে বাংলার কাব্যসাধনা

দুইবৃত্তে আবর্তিত হয়েছে, একটি বৈষ্ণব রসসাধনার বৃন্দাবনলীলা, আর একটি রবীন্দ্র-কবিচেতনালব্ধ ঔপনিষদিক সীমা-অসীমতত্ত্ব। মোহিতলাল সেই প্রেম, আবেগ ও অধ্যাত্মমার্গ থেকে বেরিয়ে এসে বলিষ্ঠ জীবনের মধ্যে কামনার কবোষ্ণ উত্তাপ নতুন করে সঞ্চারিত করলেন। ইতিপূর্বে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের যে আবেগ থেকে স্থূলত্বের স্পর্শ ঘোচেনি, তাকেই তিনি একটা সূক্ষ্ম রসবিলাসে পরিণত করলেন। ত'ার 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্তগোধূলি' (১৯৪১), 'ছন্দ চতুর্দশী' (১৯৪১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বাংলার কাব্যরসিকমহলে সুপরিচিত। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের বন্যায় অনেক প্রতিষ্ঠাবান কবি ভেসে গেলেও মোহিতলাল কবি হিসেবে আজও জনপ্রিয়তা রক্ষা করেছেন। তাঁর কাব্যে, জীবনবোধ ও সাহিত্যবিচারে যে বলিষ্ঠ দেহবাদের অকুণ্ঠ প্রকাশ হয়েছে, এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব বেধেছে, তার নতুন ভাব অনেক বাঙালী পাঠকের কাছে খুব প্রীতিকর মনে হয় না। তাই অনেকেই তাঁর কাব্যালোচনায় অস্বস্তি বোধ করেন, কাব্য বিচারেও সব সময় পক্ষপাতহীন মনোভাব রক্ষা করতে পারেন না। ফলে ত'ারা কাব্য-বিচারের স্থলে তাঁর নির্জলা নিন্দা প্রচার করেন। কিন্তু সংস্কারের চশমা খুলে ফেললে দেখা যাবে, ক্লাসিক ও রোমান্টিকতার এমন সার্থক সমন্বয় এযুগের আর কোনও কবির মধ্যে হতে পারেনি। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধরনের মনোভঙ্গীর এমন বিচিত্র প্রকাশই-বা কার মধ্যে হয়েছে? কেই-বা দেহকে অবলম্বন করেও দেহাতীতের জন্য বিলাপ করেছেন, কোন্ কবির কাব্যে 'রাধা ও ম্যাডোনা' একাকার হয়ে গেছেন, জগতের দুঃখবেদনার হলাহল পান করে এমন করে বিষামৃতকে কে অমৃতফলে পরিণত করতে পেরেছেন, রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতীতির মোড় ফিরিয়ে দিতে কোন্ কবিই বা এতটা সার্থক হয়েছেন, আগামী কালের পাঠক এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ব্যস্ত হবে। কিন্তু রবীন্দ্রযুগে কাব্যসাধনা করে কবি মোহিতলাল যে সম্পূর্ণ নতুন কবিভঙ্গী ও কাব্যপ্রত্যয়ের আমদানী করেছেন, একথা বাংলা সাহিত্যের চক্ষুষ্মান পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬) এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে বীরত্বপূর্ণ রুদ্রভাবের কবিতা লিখে যে অভিনবত্বের সূচনা করেন, তার বিস্ফোরণে কিছুকাল স্বয়ং কবিগুরুও কিছু ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। নজরুলের জীবন ও কাব্য—দুই-ই বিস্ময়কর, অভিনব, উৎকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রযুগে প্রেম, অধ্যাত্মবাদ,

সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি শান্তরসাস্পদ কাব্যপ্রত্যয় ছেড়ে হাবিলদার-কবি নজরুল ইসলাম একেবারে সামরিক হুঙ্কার দিয়েই কাব্যপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় পোশাকীভাবে বেশী অগ্রসর হননি, কিন্তু শিক্ষার যে ফল জ্ঞানলাভ ও ভূয়োদর্শন, তা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল অবলীলাক্রমে। প্রথম মহাযুদ্ধে নাম লিখিয়ে নজরুল কিছুকাল সামরিক আবহাওয়ায় বাস করে নিজের কাব্যবোধকে শানিয়ে নিয়েছিলেন। ফিরে এসে ঘর বাঁধলেন বটে, কিন্তু ঘরের মায়া তাঁকে কখনও বেঁধে রাখেনি। বন্ধুবৎসল নজরুল বন্ধুদের আড্ডায় ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হতেন, ওষ্ঠাধরে পানের রস এবং কণ্ঠে সুরের রেশ নিয়ে তিনি সঙ্গীতে ডুবে যেতেন, যৌবধর্মের অতিরেকে সারা দেশটাকে যেন চষে বেড়াতেন। তাজী ঘোড়ার মতো দুরন্ত দুর্মদ যৌবনবেগ তাঁকে কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি। বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতা ও গান লিখে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা পেয়েছিলেন সমগ্র বাংলার জনসাধারণের কাছ থেকে। স্বয়ং কবিগুরু যৌবনমূর্তি নজরুলকে অতিশয় স্নেহ করতেন। একদা তিনি পাঠকসমাজের নয়নতারাস্বরূপ গণ্য হয়েছিলেন। বিদেশী সরকারের রক্ত চক্ষু অবহেলা করে দুরন্ত কবি কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও সাময়িক পত্রে আগুনের ফুলকি ছড়াতে লাগলেন, যার সামান্যতম স্পর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শুরু হতে পারত। এর জন্য কিছুকাল তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। বোধহয় রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে ইদানীং আর কোন কবি ও লেখক এতটা উদ্দীপনা, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস সঞ্চার করতে পারেননি। তাঁর কাব্য ও গানে যে বীর্যবান প্রাণবহ্নি নিত্য দীপ্যমান, যাতে জাতিসম্প্রদায়হীন ভারত-ঐক্যের নিবিড় উপলব্ধি বিশুদ্ধ স্বাদেশিক মনোভাব সৃষ্টি করেছে, যে-কবিতাসমূহ জরা-মরণ-ব্যাধি-স্থবিরতায় বজ্রাঘাত করে সর্ববিধ শাসন-নাশক যৌবনকে বরমাল্য দিয়েছে, তার সমধর্মী কোন দৃষ্টান্ত ইদানীং চোখে পড়ে না। হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক ভেদবিচারকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে নজরুল যে শুভ আদর্শ প্রচার করেছেন তার দাম দেবে ভাবীকাল। কিছুকাল পূর্বে তাঁর অবসান হলেও এখনও যেন আমরা তাঁর কাব্য ও গানের উত্তাপ পাচ্ছি। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধির তাড়নায় তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছিল। সে বীর্যবান কবিকণ্ঠে আর গান বাজত না। জীবন্মৃত অবস্থায় বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইসলাম দেহে বেঁচে ছিলেন, কিন্তু মনে বেঁচে ছিলেন না—বাঙালী জাতির এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না।

শুধু বিদ্রোহ ও বীর্যের হুঙ্কার দিয়েই নজরুলের কাব্যজীবন সমাপ্ত হয়নি। প্রেম ও প্রকৃতির এমন আবেগপূর্ণ কবিতাও বড়ো একটা চোখে পড়ে না। সর্বোপরি এই বিদ্রোহী মানুষটির অন্তরে যে ভক্তির নীড় রচিত হয়েছিল তা তাঁর শ্যামা-সঙ্গীত ও ইসলামী গান থেকেই বোঝা যাবে। প্রেমের গজলগান তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। নজরুল-গীতিশাখা বলে একপ্রকার গায়কীপদ্ধতি ও সঙ্গীত-কলা এখন জনপ্রিয় হয়েছে, তার দ্বারা সঙ্গীত ও কাব্যে তাঁর প্রভাব সহজেই বোঝা যাবে। কিন্তু উপসংহারে বাধ্য হয়ে একটা কথা বলতে হচ্ছে।

নজরুল ইসলামের কবিতা একযুগে প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল, অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল; কিন্তু একটু বাজিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি বড়ো অল্প। এই ধরনের আদি আবেগের উচ্ছ্বাস, যার পিছনে মননের গভীরতা নেই, তা ক্ষণিকের উত্তেজনা সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অগোচরে চলে যায়। নজরুল ইসলামের একদা-জনবল্লভ কবিতাগুলির এখন আর ততটা জনপ্রিয়তা নেই। কারণ বিশেষ দেশ ও কালের সঙ্গেই তাঁর কবিতার একান্ত সম্পর্ক; সমাজ ও রাজনীতির কিছু বদল হলেই সে কবিতার কদর কমে যায়। সর্বোপরি, তাঁর কবিতা ভাবায় না, কোন সূক্ষ্ম ভাবরসের ব্যঞ্জনা দেয় না, শুধু সাময়িক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টির পর স্বাভাবিকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা "বিদ্রোহী"-র কেন্দ্রীয় বিষয়ে সঙ্গতি নেই—শুধু উত্তেজনার অগ্নিবাণী এতে সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছে। কালে নির্বাপিত হয়ে যাওয়া অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম। নজরুলের 'অগ্নিবীণা'ও (১৯২২) হয়তো সেই দুর্ভাগ্যের কবলিত হবে বলে আশঙ্কা হয়। তাঁর 'ভাঙার গান' (১৩৩১), 'বিষের বাঁশী' (১৩৩১) প্রভৃতি কাব্য-সংগ্রহ ও সঙ্গীত-সঙ্কলনে প্রচুর রৌদ্ররসের আমদানি করা হয়েছে, কিন্তু এগুলি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মানববাদের কবিতার মতো দীর্ঘজীবী হবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য নজরুল ইসলামের ভক্তিসঙ্গীত ও প্রেমসঙ্গীত, যার কথা আগে বলেছি, সেগুলির কিছু স্থায়ী মূল্য আছে। সে যাই হোক, তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য-কবিতা কালক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকলেও একদা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, এবং সে প্রয়োজনকে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের দ্বারা সার্থক করে তুলেছিলেন তা স্বীকার করতেই হবে।

প্রায় সমসাময়িক কালের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এইযুগে

একটা বিশিষ্ট শাখাপথ সৃষ্টি করে এমন একধরনের কবিতা লিখেছেন যে, রবীন্দ্রযুগে আপন মহিমায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, ইট-কাঠ-পাথর নিয়েই তাঁর কারবার। সুতরাং তাঁর হাতুড়ির ঘায়ে ভাবজগতের ভাববিলাস বিলকুল নিপাত যাবে, এই ছিল তাঁর অভিলাষ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবের সাবেকী সংস্কারকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। প্রেম-প্রকৃতি, ভগবান, রোমাণ্টিকতা প্রভৃতি কৃত্রিম সংস্কারের চশমা খুলে ফেলে নির্ভেজাল, আবেগবর্জিত, কঠিন বাস্তবের দৃষ্টি দিয়ে জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী কঙ্কালমূর্তিকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই এক ধরনের রবীন্দ্র-বিরোধিতা, রবীন্দ্রানুগত্যের প্রতিক্রিয়া। তথাকথিত উত্তর-রবীন্দ্র কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব কাছাকাছি ছিল, এবং একদা 'কল্লোলগোষ্ঠী'তে তিনি খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯২৮), 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) এবং 'অনুপূর্বা' (১৯৪৬—কাব্যসংকলন) প্রভৃতি কবিতাসংগ্রহে কবির এক বিচিত্র ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করা যাবে। বৈজ্ঞানিক ও নিঃস্পৃহ দৃষ্টির দ্বারা জগৎ ও জীবনকে দেখে এই ইঞ্জিনিয়ার-কবি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি দেখলেন, দুঃখ, লাঞ্ছনা, নৈরাশ্য ও মৃত্যু মানবভাগ্যের নিদারুণ এবং অনিবার্য পরিণাম। সুখ, আনন্দ, স্বপ্ন, প্রেম, প্রকৃতি—এগুলি চৈতন্যের ছলনা ছাড়া আর কিছু নয়। জীবন কত ভয়াবহ, সেটা দেখাবার জন্যই যেন তথাকথিত প্রেম প্রভৃতির সমাবেশ। তাঁর কাছে প্রেম, প্রকৃতি, নারী বিশুদ্ধ রকমের ফাঁকি ছাড়া কিছু নয়, সত্য শুধু অনন্ত যন্ত্রণা। ভগবানকে আমরা লীলাময় বলি বটে, আসলে ঐ নামে কেউ থাকলেও তিনি নিদারুণ স্বেচ্ছাচারী ও সীমাহীন নির্মম। তিনি নিরীহ মানুষকে সুখের টোপে গেঁথে অনন্ত দুঃখজলধির মধ্যে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ধরনের 'অ্যাণ্টি-রোমাণ্টিক', নৈরাশ্যপূর্ণ ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক বিচিত্র কবিতা লিখে যতীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল ও শিক্ষিত মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছিলেন। আলোড়নের কারণ শুধু বিষয়বৈচিত্র্য নয়, দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যের পীড়নও নয়। বিষয়বস্তুতে তিনি যেমন শুষ্ক বুদ্ধিবাদী বাস্তব ব্যাপারের আমদানি করলেন, তেমনি রচনাভঙ্গিমাতে সনাতন রীতি

অনুসরণ করলেও চলতি, অমসৃণ, রূঢ় ধরনের শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র কার্পণ্য করলেন না। অর্থাৎ কাব্যের পোশাকী সংস্কার ত্যাগ করে তার বিষয় ও প্রকাশের রীতিতে একবারে কঠোর জীবন-রসের দ্বারা ধোলাই করে নিলেন। ফলে আবেগ-প্রবণ বাংলা কাব্যে এই বুদ্ধিকেন্দ্রিক, যুক্তিপূর্ণ ও চিরাচরিত সংস্কারবর্জিত কাব্য-কবিতা পাঠকচিত্তে যে প্রবল চমক সৃষ্টি করেছিল, এখনও তা মুছে যায়নি। তিনি পৃথিবীতে শুধু দুঃখ আর নৈরাশ্যই দেখেছেন বলে 'দুঃখবাদী কবি' এই খেতাব পেয়েছেন। এদিক থেকে বুদ্ধিবাদী নিঃস্পৃহ ইংরেজ কবি জন ডানের (১৫৭৩—১৬৩১) সঙ্গে তাঁর বেশ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এ সাদৃশ্য তাঁর ইচ্ছাকৃত।

অবশ্য একটু মনোযোগের সঙ্গে ভেবে দেখলে তাঁর অভিনব মতবাদকে খুব মৌলিক বলে মনে হবে না, অনেক সময় নিছক দুঃখবাদ তাঁর সমগ্র সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে যায়নি। মুখোস যেমন মুখকে ঢেকে রাখলেও মুছে ফেলতে পারে না, তেমনি কবিও দুঃখবাদের মুখোসের দ্বারা নিজ স্বভাবসিদ্ধ কবিধর্মকে পুরোপুরি আড়াল করতে পারেননি। গোড়ার দিকে তিনি তাল ঠুকে দুঃখবাদকে সামনে তুলে ধরেছেন, কিন্তু তিনি অংশত নৈরাশ্যবাদী হলেও নিরীশ্বরবাদী নন। তাঁর ঈশ্বর এক নির্মম শক্তি। তিনি কবির বন্ধু, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক নয়, শুধু আঘাতের সম্পর্ক। কবি যত ব্যথা পান ততই নিবিড়ভাবে দুঃখের দেবতাকে আঁকড়ে ধরতে চান। এই আসক্তির আকর্ষণ থেকেই তিনি উত্তরজীবনে দুঃখনৈরাশ্যের জগৎ ছেড়ে আবার প্রেমপ্রীতির জগতের আলোকরেখা দেখতে পেলেন, যার আভাস 'সায়ম', 'ত্রিজামা' ও 'নিশান্তিকা'য় পাওয়া যাবে। 'মরু' আখ্যাযুক্ত দুঃসহ উত্তপ্ত কাব্যমণ্ডল ছেড়ে তিনি সায়াহ্ন, রাত্রি ও রাত্রি-প্রভাতের শান্ত, বিষণ্ণ ও নব-আশার অরুণোদয় লাভ করলেন। সুতরাং তাঁকে বিশুদ্ধ দুঃখবাদী কবি বলা যায় না, কারণ শেষজীবনে তাঁর কবিতা থেকে যুধ্যমান দুঃখবাদের হুঙ্কার বিদায় নিয়েছে, সেখানে চিরাচরিত প্রেমপ্রীতির সংসারই উঁকি দিয়েছে। এইজন্য কেউ কেউ একটু তীব্রভাবেই বলেন, যতীন্দ্রনাথের তথাকথিত দুঃখবাদ একধরনের 'পোজ্' বা কৃত্রিম সংস্কার মাত্র, কিছুদিনের মধ্যেই যা খসে পড়েছে। সে যাই হোক, ১৯৩০ সাল থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবের পরিমণ্ডল ছেড়ে যে-সমস্ত নবীন কবি নতুন পথে যেতে চাইছিলেন তাঁদের অগ্রজ হিসেবে মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

দ্বিতীয় উপচ্ছেদ ঃ নাটক

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজক প্রভাবে কলকাতায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচিত ও মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে, ছোট বড়ো অনেক নাট্যকার সেই উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু নাটক সাময়িক আবেগ ও দেশপ্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছিল, পেশাদারী নাট্যমঞ্চেরও বেশ উন্নতি হয়েছিল। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে দু'জনের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, একজন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অপরজন ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (নাটকের ক্ষেত্রে যিনি নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর ডি. এল. রায় নামে পরিচিত) ভালো ছাত্র হিসেবে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যয়নের অবকাশে তিনি পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্য ও নাট্যা-ভিনয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। অবশ্য এর পূর্বেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার উদ্‌গম হয়েছিল, বিদেশে গিয়ে তিনি স্বদেশীভাব নিয়ে ইংরেজী কবিতা লিখে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছিলেন। পরবর্তী কালে দেশে ফিরে সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অবশ্য প্রথমে তাঁর আবির্ভাব হয় প্রহসনকার হিসেবে, তারপর তিনি যথার্থ নাটক লিখে বাংলা ও বাংলার বাইরে জনপ্রিয় নাট্যকাররূপে সম্মান লাভ করেন। ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও ডি. এল. রায়ের নাটকের অনুবাদ হয়েছে। তাঁর গীতিকাব্যসংগ্রহ ও হাসির গান ও কবিতার সঙ্কলন বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভাঙতে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছে। বিশেষত তাঁর হাসির গান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন কয়েকখানি প্রহসন নিয়ে। 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১৯) প্রভৃতি প্রহসনগুলি একদা অভিনয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল—অবশ্য সবগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। 'কল্কি অবতার' এবং 'বিরহে'র হাস্যপরিহাস মোটামুটি মন্দ হয়নি, কিন্তু তাঁর হাসির গানের তুলনায় রঙ্গনাট্যগুলিতে রঙ্গরহস্য বেশী খোলেনি। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নানা কারণে

রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) নামে একখানি রঙ্গপ্রহসনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে রুচিবান পাঠক ও দর্শকের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। মারমুখী জনতার প্রতিবাদে প্রথম অভিনয়ের রাত্রিতেই কর্তৃপক্ষ এই নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন, নাট্যকারও (যিনি উপস্থিত ছিলেন) কিছু অপমানিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত এবং কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রহসন হিসেবে 'আনন্দবিদায়' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক আবহাওয়াকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর 'পাষাণী' (১৯০০) 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকগুলিতে পৌরাণিক কাহিনীকে নতুনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা দেখা যায়—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই তিনি ভক্তিরসেপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে খানিকটা আধুনিক ছাঁচে ঢেলে নিয়েছেন। ফলে পৌরাণিক চরিত্রে আধুনিক যুগের ভাববৈশিষ্ট্য, বিশেষত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু নাটকীয় অভিনয়-যোগ্যতায় এগুলি বিশেষ ঐশ্বর্যবান নয়। তাঁর দু'খানি সামাজিক ও পারিবারিক নাটক ('পরপারে'—১৯১২, 'বঙ্গনারী'—১৯১৬) খুব সার্থক না হলেও উত্তেজক ঘটনায় (খুন-জখম-ফাঁসি ইত্যাদি) পূর্ণ বলে একদা কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু এ দুটির নাট্যলক্ষণ বিশেষ নেই, সাহিত্যলক্ষণ আরও কম।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাংলা ও বাংলার বাইরে পরিচিত হয়েছেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, এর কারণ তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবারপতন' (১৯০৮) এবং 'সাজাহান' (১৯০৯)—রাজপুত বীরত্ব ও মুঘলযুগের কাহিনীগুলিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি হিন্দুযুগের—দু'খানি নাটক রচনা করেন, 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। এর মধ্যে 'নূরজাহান', 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' সে যুগে কি রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তার সাক্ষ্য দিতে পারেন। এখনও পেশাদারী ও সৌখীন নাট্যসমাজে দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। বাংলার বাইরে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় এই সমস্ত নাটক অনূদিত হয়ে বাঙালীর নাট্যপ্রতিভাকে জয়যুক্ত করেছে। ১৯০৫ সালের স্বাদেশিক উত্তেজনাপূর্ণ আত্মত্যাগের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই বীররসাত্মক উদ্দীপনাসঞ্চারকারী আদর্শবাদের অপূর্ব নাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, নিজের নাট্যপ্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার

করেছেন এবং গিরিশচন্দ্রের মূলত ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের স্থলে রণরঙ্গমুখর ইতিহাসকে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনে নাটকের ক্ষেত্রে একপ্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন। নূরজাহানের ক্ষমতালাভের সঙ্গে নারীহৃদয়ের দ্বন্দ্ব, সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার বিরোধ, পরিশেষে পিতৃসত্তার জয়লাভ, 'চন্দ্রগুপ্ত' চাণক্যচরিত্রের হৃদয় ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নাট্যকার অতি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের রৌদ্র রসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত হলেও সমসাময়িক ঘটনা ও জনরুচির তাড়নায় তিনি প্রায় কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেননি। অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে বাধ্য হয়ে তাঁকে খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু অযথা এবং বিনা কারণে তিনি ইতিহাসকে অতিক্রম করেননি। এই রকম একটা অভিযোগ চলে আসছে বটে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি নাটকের অনুরোধে ইতিহাসকে বদলে নিয়েছেন। অবশ্য শেক্সপীয়রও নাটকের জন্যই ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন, ইতিহাসের জন্য নাটক লেখেননি। আমাদের নাট্যকারও সেই রীতিতে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, একটু-আধটু ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলে তাতে নাটক বা ইতিহাসের মারাত্মক ক্ষতি হয় না। সব দিক বিবেচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার বলা যেতে পারে।

তাঁর এই ধরনের নাটকের চরিত্রচিত্রণরীতি, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতিতে শেক্সপীয়রীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শেক্সপীয়রের ভক্তপাঠক। কিন্তু আবেগতরল এবং উত্তপ্ত বাগ্‌ধারা, ভাষারীতির উত্থানপতন (ক্লাইম্যাক্স-অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স), অপূর্ব কাব্যধর্মী গদ্যগন্ধে সংলাপ—এসব তিনি জার্মান নাট্যকার শীলারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর নাটকে অভিনয়ের অতিরিক্ত পাঠযোগ্য সাহিত্যগুণও খুব উচ্চস্তরের হয়েছে। গিরিশচন্দ্রকে ছেড়ে দিলে তাঁকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার পথিকৃৎ বলতে হবে। ইতিহাসকে এমনভাবে চাক্ষুষ করে তোলা, ঐতিহাসিক নরনারীকে জীবন্ত করা এবং তারই সঙ্গে সমসাময়িক বাংলাদেশের সঙ্গে নাটকগুলির আন্তরিক যোগস্থাপন করা—এতে তিনি অনন্যসাধারাণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সীমা ও প্রভাব সম্বন্ধেও অনবহিত হয়ে থাকা যায় না। অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও কোন কোন স্থলে তাঁর চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত কৃত্রিম বলে মনে হয়, গালভরা শব্দবিন্যাসও শূন্যগর্ভ হয়ে ওঠে। ভাষায় কৃত্রিমতা

ও অতিনাটকীয়তা ত'ার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মৌলিক ত্রুটি। সংলাপের নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের দ্বারা কুশীলবেরা সকলেই এক ধরনের কাব্যময় অলঙ্কারবহুল ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করে যে চরিত্রগুলির সংলাপজনিত স্বাতন্ত্র্য মুছে যায়। উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক সময়ে নাটকীয় পরিস্থিতির বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ন করেছেন। এই ত্রুটিগুলি বোধ হয় শীলারের প্রভাবে এসে থাকবে, কারণ শীলারের নাটকেও এই ত্রুটি আছে। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাংলা-দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার তাতে সন্দেহ নেই—তার বড়ো প্রমাণ, এখনও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ জাতীয় নাটকাভিনয় দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়ে থাকে।

২. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)

একদা কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও হালকা চালের রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য লিখে নাট্যামোদী দর্শক সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যেন নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি করবেন এবং দর্শকদের রুচির মোড় ফেরাবেন—এই ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন ; ক্ষীরোদপ্রসাদের সে রকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে পেশাদার নাটকলিখিয়ে হিসেবেই তিনি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ত'ার 'কিন্নরী', 'আলমগীর', 'রঘুবীর' 'রঞ্জাবতী' 'প্রতাপাদিত্য' এখনও জনপ্রিয়তা হারায়নি। তবে 'আলিবাবা' শীর্ষক গীতি-নৃত্যবহুল চটুল নাটিকার জন্যই তিনি অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। নাটক ছাড়াও আরও নানা ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি ত'ার প্রতিভার বৈচিত্র্যই প্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব ত'ার রচনায় বেশ পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও গীতিনৃত্যবহুল নাটিকা ও ঐতিহাসিক নাটকের জন্য তিনি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'আলমগীর' (১৯২১) প্রভৃতি নাটকে অভিনেতব্য নাটকের সার্থক দৃষ্টান্ত আছে। অবশ্য এই সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশী আবেগের বশে নাট্যকার এমন সমস্ত মেলোড্রামাটিক কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন যা আমাদের

এখন হাস্যোদ্রেক করে। অভিনয়ে উতরে গেলেও নাটক হিসেবে 'আলমগীর' খুব উচ্চস্তরের নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি কোন বৃহৎ আদর্শের জন্য কলম ধরেননি, জনমনোরঞ্জনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তাঁর নাটকগুলিতে অতিনাটকীয়তার বাড়াবাড়ি থাকলেও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের বাহ্য আড়ম্বর নেই। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'নরনারায়ণে'র অতি-নাটকীয়তা, আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা বাদ দিলে অভিনয়ে এ নাটক মন্দ লাগে না। 'নরনারায়ণে'র কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বটি চমৎকার ফুটেছে, অবশ্য তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে'র ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'ভীষ্ম' প্রায় পুরোপুরি যাত্রার ঢঙে লেখা, আধুনিক রুচি এতে পীড়িত বোধ করবে। নাট্যকার তাঁর কালের অল্পশিক্ষিত এবং স্থূলরুচির জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করতে গিয়েছিলেন বলে অনেক নাটকীয় মুহূর্তকে সস্তা ভাবালুতার মোহে একেবারে মাটি করে ফেলেছেন। সংলাপ রচনায় এবং রঙ্গরহস্যে তিনি প্রাকৃতরুচির বেশী প্রশ্রয় দিতেন বলে মার্জিত মনের দর্শক-পাঠক তাঁর অধিকাংশ নাটক থেকে বিশেষ কোন তৃপ্তি খুঁজে পান না। তবে তাঁর 'আলিবাবা' (১৮৯৭) এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরব্য-উপন্যাসের সুপরিচিত আখ্যানকে অসাধারণ কৌশলে নৃত্যগীতিমুখর অপেরার ধাঁচে ঢেলে সেজে আবার তার সঙ্গে নাটকীয় বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলা নাটকে অদ্ভুত বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর যুগে তো বটেই, এখনও এ লঘু নাটকটির জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন আছে। অসম্ভব অদ্ভুত কাহিনী, রঙ্গকৌতুক, ভাষার মজাদার কায়দা প্রভৃতি এ নাটককে অভিনয়ে অসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যে লঘুচিত্ততা তাঁর অন্যান্য 'সীরিয়াস' নাটকে দোষের কারণ হয়েছে, এই নাটিকায় সেটাই হয়েছে গুণ। তিনি তথাকথিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের বহর কমিয়ে যদি 'আলিবাবা'র মতো আরও খানকতক হালকা-চালের নাটক লিখতেন, তা হলে বাংলা নাট্যসাহিত্য লাভবানই হত।

৩. সমসাময়িক নাট্যকার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যেমন নাটক ও নাটকাভিনয়ের বান ডেকেছিল, তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বিশেষত গোড়ার দিকে বহু নাট্যকার নাটক

রচনা করে বাংলা নাটকের গুণগত গৌরব বাড়াতে না পারলেও সংখ্যাগত গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের কর্ণধার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) শুধু অভিনয় করবার জন্যই কিছু রঙ্গ কৌতুকনাট্য, গীতিনাট্য এবং *Hamlet*-এর অনুসরণে 'হরিরাজ' রচনা করে কিছুকাল রঙ্গমঞ্চের ক্ষুধা মিটিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলির সবই তাঁর রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। সাধারণ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এবং সৌখীন নাট্যসমাজে সে যুগে রবীন্দ্রনাথের নাটক বড়ো একটা অভিনীত হত না। তবে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা' কোন কোন সময়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এবং সাধারণ সমাজেও অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সে যুগে খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ যে-সুরে নাটকের তার বেঁধে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক যেন ঠিক তার বিপরীত। বিশেষত তাঁর তত্ত্বনাটক ও রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক সাধারণের কাছে একেবারেই বোধগম্য হয় না, সেইজন্য শান্তিনিকেতন এবং মার্জিতরুচির অভিজাত সমাজ ভিন্ন সে যুগে রবীন্দ্রনাথের নাটক বড়ো একটা অভিনীত হত না।

বিংশ শতাব্দীর দু-তিন দশক থেকে আরও কয়েকজন নাট্যকার এসে ঈষৎ নতুনভাবে নাটকের মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নিশিকান্ত বসু রায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল এ'দের নাটক অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা এবং এগুলির মঞ্চসাফল্যও সন্দেহাতীত।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) নাট্যাভিনয় ও নাটমঞ্চের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজনানুসারে তিনি কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলি ('আহুতি'—১৯১৪, 'রাখীবন্ধন'—১৯২০, 'অযোধ্যার বেগম'—১৯২১) একদা খুব সমারোহের সঙ্গে শহরে ও গ্রামে অভিনীত হত। অভিনয়ে আনন্দবিতরণ ছাড়া নাট্যকারের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলে সাহিত্যাংশে এগুলি অতি দুর্বল। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও (বাংলা ১২৯০-১৩৪৮) মূলত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্যই কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক ('সীতা'—১৯২৪), 'দিগ্বিজয়ী', 'বাংলার মেয়ে'—(১৯৩৪)

রচনা করেছিলেন, কিন্তু এগুলিতে কিছু কিছু প্রশংসনীয় নাট্যগুণ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) 'সীতা' অবলম্বনে সর্বপ্রথম দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেন, নাট্যকারও গৌরবান্বিত হন।

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কয়েকখানি পৌরাণিক নাটকে ('দেবাসুর'—১৯২৮, 'কারাগার'—১৯৩০, 'অশোক'—১৯৩৪) নতুন ধরনের রীতি অবলম্বন করেছেন, পুরাতন পৌরাণিক কাহিনীকেও নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক রাজনৈতিক পটভূমিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে এবং পৌরাণিক চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাবেশ করে তিনি এই শ্রেণীর নাটক রচনায় চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করেছেন। এদিক দিয়ে তাঁর 'কারাগার' নাটকটির পৌরাণিক পটভূমিকায় স্থাপিত হলেও এর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ইঙ্গিত আবিষ্কার দুরূহ নয়।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও (১৮৯২—?) যুগের অনুরোধে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করে ('গৈরিক পতাকা'—১৯৩০, 'সিরাজদ্দৌলা', 'ধাত্রী-পান্না,' 'রাষ্ট্রবিপ্লব') নাট্যমঞ্চে স্বাদেশিকতার আবেশ সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য তাঁর সামাজিক নাটকগুলিও একদা অভিনয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ('স্বামী-স্ত্রী,' 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'নার্সিং হোম') তবে তাঁর কোন কোন ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিক আবেগ প্রবল হয়ে ঘটনার ঐতিহাসিকতা মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করেছে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক নাটকে সমাজঘটিত কোন বড়ো সমস্যারও আমদানি হয়নি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিধায়ক ভট্টাচার্য (তিনি নিজেও নিজের নাটকে অভিনয় করে থাকেন) কয়েকখানি পারিবারিক নাটক লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁর 'মাটির ঘর,' 'মেঘমুক্তি,' 'বিশবছর আগে' প্রভৃতি অতিশয় মঞ্চসফল নাটক এখনও অদ্ভুত জনপ্রিয়, শহর থেকে পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর নাটকের জয়জয়কার। সে যুগের গিরিশচন্দ্র যেমন দর্শকের মন বুঝতে পারতেন—সাধারণে কি চায়, তেমনি আধুনিক কালের এই নাট্যকার একালের জনসাধারণের মনের কথা জানেন এবং সেই চাহিদা মেটাবার জন্য তিনি সুলভ করুণ রস, উত্তেজক ঘটনা, অতিনাটকীয় আকস্মিকতা, কাব্যধর্মী ভাষা প্রভৃতির সমাবেশে যে সমস্ত নাটক রচনা করেছেন, সাধারণ দর্শকের

কাছে তার জনপ্রিয়তা যে সীমাহীন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে উচ্চশ্রেণীর নাট্যলক্ষণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী সাহিত্যলক্ষণ তাঁর নাটকে বিশেষ নেই, তাই আধুনিক যুগে তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তাও কমতে আরম্ভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও তিনজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা শুধু পেশাদারী থিয়েটারের জঠরপূর্তির জন্য কলম ধরেননি, উচ্চশ্রেণীর নাটক ও রঙ্গপ্রহসন সৃষ্টির অভিলাষেই তাঁরা কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক ও ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা লিখেছেন। তাঁরা হচ্ছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), প্রমথনাথ বিশী ও মনোজ বসু। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' (১৩৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১) জীবনীনাটক হিসেবে বিশেষ গৌরব দাবি করতে পারে। এর নাট্যগুণ ও সাহিত্যগুণ উভয়েই অতি চমৎকার। দুঃখের বিষয় পেশাদারী নাটমঞ্চে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক রাতের পর রাত অভিনীত হলেও এরকম উৎকৃষ্ট নাটক অভিনীত হতে পারল না। এর দ্বারা বাংলার দর্শকের এবং নাটমঞ্চ-পরিচালকদের স্থূল রুচিই প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় প্র. না. বি. এই ছদ্মনামে অতিশয় শক্তিশালী কয়েকখানি ব্যঙ্গনাটক রচনা করেছেন। 'ঋণং কৃত্বা' (১৯৩৫), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩৯), 'মৌচাকে ঢিল,' (১৯৪৮) প্রভৃতি ব্যঙ্গনাটকগুলি বাঙালী-সমাজের পক্ষে একপ্রকার অদ্ভুত সৃষ্টি। সমাজের দোষত্রুটি ও অসঙ্গতিকে এমন নির্মমভাবে অথচ সরস কৌতুকের সঙ্গে আর কোনও নাট্যকার নাটমঞ্চে উপস্থাপিত করতে পারেননি। বাংলার নাটমঞ্চে কৌতুক-নাট্যের নামে নিছক ভাঁড়ামি চলে, ট্রাজেডির নামে চোখের জলের প্লাবন বয়ে যায়, কমেডির নামে পরীস্থানের গল্পের আমদানি হয়। সেখানে এরকম বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতুকরসে পূর্ণ ও চটুল উইটের চমৎকার সন্নিবেশ খুব অল্প নাটকেই পাওয়া যায়। অবশ্য বার্নার্ড শ'য়ের (জি. বি. এস.) মতো প্রমথনাথও (প্র. না. বি.) সমাজের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেবার জন্য নাটকে এমন চাবুক চালিয়েছেন যে, অনেক সময় এ সমস্ত নাটক অভিনয় করা খুব নিরাপদ নয়। কারণ অভিনয় করলে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ না কেউ অল্প-বিস্তর আহত হতে পারেন। শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয় কথাসাহিত্যিক হলেও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কয়েকখানি আবেগধর্মী নাটক লিখে রঙ্গমঞ্চেও কিছু খ্যাতি লাভ করেছেন। 'প্লাবন' (১৩৪৮), 'নূতন প্রভাত' (১৯৫০), 'রাখি-বন্ধন' প্রভৃতি নাটকে হৃদয়দ্বন্দ্ব ও ঘটনার দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'নূতন প্রভাতে' স্বাদেশিক মনোভাবকে এমন চমৎকারভাবে নাটকীয়তা অতি-নাটকীয়তার সঙ্গমস্থলে স্থাপন করা হয়েছে যে, একদা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ পর্যন্ত এই নাটক অভিনয়ে বেশ আনন্দ বোধ করত। বলিষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাদেশিক অনুপ্রেরণা, ত্যাগ প্রভৃতি আদর্শবাদকে মনোজ বসু আবেগধর্মী ভাষায় ও সংঘাতময় কাহিনীর মারফতে বেশ ভালোই উপস্থাপিত করেছেন। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) কয়েকখানি নাটক সৌখীন সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। শরদিন্দুবাবুর আধা-ডিটেকটিভ, আধা-কমেডি নাটকগুলি ('বন্ধু', 'ডিটেকটিভ') খুব জনপ্রিয়, এখনও পর্ব উপলক্ষে এগুলি খুব আড়ম্বরের সঙ্গেই অভিনীত হয়ে থাকে। অবশ্য এখানে শরৎচন্দ্রের কথা না বললে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনিও রঙ্গমঞ্চের চাহিদার তাগিদে এবং শিশিরকুমারের অনুরোধে নিজের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ('ষোড়শী', 'রমা', 'বিজয়া' প্রভৃতি)।* কিছুকাল পূর্বেও এই নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চ মাতিয়ে রেখেছিল। এখন সৌখীনসমাজে এগুলির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে।

তৃতীয় উপচ্ছেদ : উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পকে নিখুঁত আর্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাকে কতটা বলশালী করে গেছেন তা সকলেই অবগত আছেন। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' যে-কোন প্রথমশ্রেণীর বিশ্ব-উপন্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তবু তাঁর উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলি উচ্চ সমাজে যতটা খ্যাতনামা হয়েছে, সাধারণ পাঠকসমাজে ঠিক ততটা জনপ্রিয় হয়নি। কাব্যধর্ম, আদর্শবাদ, রোমান্টিকতা, কবিচেতনার গহন ও সূক্ষ্ম অনুভূতি উক্ত উপন্যাসগুলিকে ঠিক কঠিন মৃত্তিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেতে পারেনি। বরং তাঁর যুগে তাঁর শিষ্যকল্প কয়েকজন ঔপন্যাসিকের ঈষৎ নিম্নগ্রামে-সুরবাঁধা গ্রন্থগুলি সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকের মন জয় করেছিল সর্বাধিক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের পরম গৌরব ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্নে রচিত হয়ে

* শোনা যায় শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী এই নাট্যরূপদানের ব্যাপারে বিশেষভবে জড়িত ছিলেন।

বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ'দের সে জনপ্রিয়তা, বিশেষত শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি, যদিও ইদানীং নব্য ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কলারীতি নিয়ে অভিনব গবেষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্র-সমসাময়িক উপন্যাসের এবং ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেখব, রবীন্দ্রযুগেও এ'রা যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, এর কারণ কি।

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মাঝখানে অবস্থান করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্নিগ্ধমধুর করুণরসসিক্ত ও হাস্যোজ্জ্বল গল্পকাহিনী লিখে শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে অসাধারণ প্রীতি লাভ করেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও গল্পগুলি রচিত হয়ে গেছে, শরৎচন্দ্রও বর্মামুলুক থেকে কলকাতায় এসে যাদুমন্ত্রের মতো পাঠককে মুগ্ধ করে ফেলেছেন। তা সত্ত্বেও প্রভাতকুমার খানকতক বড়ো উপন্যাস এবং বহু ছোটগল্প লিখে নিজের যথাযোগ্য ঠাঁই করে নিয়েছিলেন।

একদা প্রভাতকুমার ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া লাভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছু কবিতা লিখলেও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং নির্দেশে বুঝতে পারেন কথাসাহিত্যই তাঁর স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র। প্রভাতকুমারের মোট উপন্যাস চৌদ্দখানি—'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীনসন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭), 'সিন্দূরকৌটা' (১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২), 'আরতি' (১৯২৪), 'সত্যবালা' (১৯২৫), 'সুখের মিলন' (১৯২৭), 'সতীর পতি' (১৯২৮), 'প্রতিমা' (১৯২৯), 'গরীব স্বামী' (১৯৩৮), 'নব দুর্গা' (১৯৩৮), 'বিদায়বাণী' (১৯৩৩)। এই উপন্যাসের কয়েকখানি একসময়ে সাধারণ পাঠকসমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর প্রধান আদর্শ হল স্নিগ্ধ পল্লীজীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মানসিক জীবনের বৈচিত্র্য, একান্নবর্তী পরিবার, পরিবারকেন্দ্রিক নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা ইত্যাদি ঘরোয়া ধরনের পারিবারিক চিত্র, প্রেমপ্রণয়ের গল্পরস এবং বাৎসল্যের প্রীতি তাঁর কথাগ্রন্থের প্রধান সুর। অবশ্য একথা ঠিক, তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কাহিনীর ঠাসবুনানি ও কল্পনাবৈচিত্র্য নেই, রবীন্দ্রনাথের মতো গভীর,

ব্যাপক ও বিরাট কোন প্রত্যয়ও তাঁর কল্পনা এবং কল্পনাসৃষ্ট নরনারীকে ব্যাকুল করেনি, শরৎচন্দ্রের বিশাল মানবিকতা ও সুগভীর করুণরস আর তার সঙ্গে সমাজজীবন সম্বন্ধে নতুন কোন জিজ্ঞাসা তাঁকে বিচলিত করেনি। তাঁর উপন্যাসে আধুনিক কালের মতো উৎকট সামাজিক, রাজনৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কোন সঙ্কটমুহূর্ত সৃষ্টি করেনি; এককথায় তাঁর উপন্যাসের ফুলগুলিকে কোন চিন্তাকীট দংশন করেনি, কথারসের ঝরণাধারা তত্ত্বের পাষাণ প্রাচীরে কোথাও বাধা পায়নি। সহজ, সরল, সরস—স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মতো তাঁর কাহিনী বয়ে যায়, মাঝে মাঝে দু'চারটি বাধাবিপত্তির উপলখণ্ডে আহত হয়ে সে স্রোতোধারা কোথাও কোথাও ঈষৎ ঘূর্ণি সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তার আয়ুও যেমন পরিমিত, চাঞ্চল্যও তেমনি স্বল্প। আসল কথা প্রভাতকুমার বাস্তব বাংলাদেশের পল্লী ও নগরজীবনকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বসংঘাতহীন প্রসন্ন বাঙালী-জীবনের সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত দৃশ্যপরম্পরাই তাঁর রোমান্সপ্রিয় চিত্তকে একটা সহজ জীবনরসে ভরিয়ে তুলেছে। কথার রসে মুগ্ধ করে বয়োধর্মনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষভেদে সমগ্র পাঠকসমাজকে একরকম আবিষ্টের মতো টেনে নিয়ে যাওয়ার দুর্লভ শক্তি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রেরও নেই। তাঁর গল্পকাহিনীতে যেন সাহিত্যশিল্পের, বাস্তব-অবাস্তবতার মাধ্যাকর্ষণশক্তি কিছু শিথিল হয়ে গেছে, যে-কোন ঘটনা যে-কোন ব্যক্তির জীবনে যখন খুশি ঘটতে পারে। তাঁর কাহিনীটি বাস্তব পটভূমিকায় জন্মগ্রহণ করে রূপকথার জগতেই অভিপ্রয়াণ করেছে। এতে তত্ত্ব নেই, তর্ক নেই, আদর্শবাদের বাহ্বাস্ফোট নেই, বিরহের অশান্ত হাহাকার নেই, মিলনের উদ্দাম-উল্লাস নেই, অসাধারণ মহত্ত্ব নেই, আবার ঘৃণ্য নীচতাও নেই। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মতো ভাবায় না; চরিত্রগুলি চিত্তাকর্ষী হয়, কিন্তু মনের গহনে কোন ঢেউ তুলতে পারে না। এ ধরনের রূপকথাধর্মী অথচ বাস্তব জীবনচিত্র গল্পবুভুক্ষু পাঠকসমাজের কাছে যে অতিশয় রমণীয় বলে মনে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর গল্পগুলির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর উপন্যাসের মূল্য নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাঁর ছোটগল্পগুলি যে শিল্প হিসেবেও গ্রহণযোগ্য, তা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। কেউ কেউ তাঁকে বাংলার 'মোপাসাঁ' খেতাব দিয়েছেন। এ একধরনের দাসমনোবৃত্তিসুলভ

পরমুখাপেক্ষিতা। কেউ বাংলার মিল্টন, কেউ শেলী, কেউ বায়রন, কেউ স্কট, কেউ-বা মোপাসাঁ—এরকম হাস্যকর তুলনা এক যুগে খুব চলত। দেব-দেবীরা যেমন বাহন ছাড়া চলতে পারেন না, এক যুগের বাঙালী সাহিত্যিকেরাও তেমনি কোন-একটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকের পুচ্ছাগ্র না ধরলে চলতে পারতেন না। বিদেশীর প্রতি অতিভক্তি এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অনীহাই একরকম আত্মদীনতার সুযোগ দিয়েছিল—এই মনোভাবের বশেই প্রভাতকুমারকে মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) ও প্রভাতকুমারের মধ্যে গভীর কোন সাদৃশ্য নেই। মোপাসাঁর রচনাভঙ্গিমার তীব্র, তীক্ষ্ণ, তির্যকতা এবং আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার সাহস 'টিমিড' সমাজ-সংস্কার-নীতি আদর্শের প্রচ্ছায়ে মানুষ প্রভাতকুমারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সরস ভঙ্গীতে বিবৃত প্রভাতকুমারের লঘুধরনের গল্পকাহিনীর সঙ্গে মোপাসাঁর বাস্তবধর্মী উৎকট গল্পের গোত্রগত কোন মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সে যাই হোক, প্রভাতকুমার শ'খানেকেরও বেশী ছোটগল্প লিখে একদিকে যেমন পাঠকের চিত্ত জয় করেছেন, তেমনি অপরদিকে বাংলা ছোটগল্পের বৈচিত্র্যও বর্ধিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি কাব্যধর্ম ও অন্তর্নিহিত গভীর ব্যঞ্জনায় বিশ্বসাহিত্যেও বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত হয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমার গল্পে কোন গভীর তাৎপর্য এবং জীবন-জিজ্ঞাসার কোন দুরূহ প্রশ্নের অবতারণা না করলেও সহজ জীবনরসের গল্পগুলি সহজভাবে বলেছিলেন বলে পাঠকসমাজে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অখণ্ড প্রভাব সত্ত্বেও নিজের যথাযোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় ১১৪টি গল্প 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গহনার বাক্স' (১৯২১) প্রভৃতি সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি করুণ ও প্রীতিঘন অনেকগুলি চমৎকার ছোটগল্প লিখেছিলেন, তাতে অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ কোন গভীরতা না থাকলেও সুখপাঠ্য কথারসে সেগুলি যে ভরপুর, তার সাক্ষ্য এ যুগের পাঠকসমাজ থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)

শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাবের কথা সেকালের পাঠকসমাজের হয়তো মনে পড়বে। যখন একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য এবং প্রভাতকুমারের রচনার প্রসন্ন মাধুর্য নিয়ে পাঠকসমাজ নিজ

নিজ প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসারে খুশি হয়েছিলেন, তখন তাঁরা বুঝতেও পারেননি কোন্ গগনে, কোন্ ঘনান্তরালে ওষধিনাথ চন্দ্রের উদয় হয়েছে। এই যুগে 'ভারতী' গোষ্ঠীর কয়েকজন ঔপন্যাসিক আবেগব্যাকুল জীবনের সুন্দর সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করেছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ('আলপনা'—১৯১০, 'ঝাঁপি'—১৯১২), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ('শেফালি'—১৯১০, 'নির্ঝর'—১৯১১, 'মাতৃঋণ,' 'বন্দী, অসাধারণ') চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ('বরণডালা'—১৯১০, 'পুষ্পপাত্র'—১৯১০, 'সওগাত'—১৯১৩, ধূপছায়া—১৯১২, 'আগুনের ফুলকি'—১৩২১, 'পরগাছা'—১৯১৭, 'দুই তার'—১৯১৮) হেমেন্দ্রকুমার রায় ('পসরা'—১৩২২, মধুপর্ণা) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ('ময়ূখ', 'ধর্মপাল,' 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস) সে যুগে গল্পপ্রিয় পাঠকের মনস্তুষ্টি করেছিলেন। কয়েকজন মহিলা-ঔপন্যাসিকও বাঙালী-সমাজে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮), 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১), 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫), 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০) প্রভৃতি গুরুগম্ভীর পুরুষালি ছাঁদের উপন্যাসগুলি গম্ভীর প্রকৃতির পাঠকসমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' (১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১০), 'শ্যামলী' (১৯১৮) উপন্যাসগুলিতে আবেগবাহুল্য ছিল এবং আবেগপ্রবণ ও গল্পপ্রিয় পাঠকসমাজ এর থেকে একদা প্রচুর আনন্দ পেতেন। বাংলা উপন্যাস ও গল্পের ধারা এই পথেই বয়ে চলেছিল। সহসা শরৎচন্দ্রের উদয়ের ফলে চারিদিকে যেন সাড়া পড়ে গেল।

১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'মন্দির' শরৎচন্দ্রেরই রচনা। তখন কেউ অনুমান করতে পারেননি, এই গল্পলেখকই কালে রবীন্দ্রনাথকেও জনপ্রিয়তায় ম্লান করে দেবেন। ১৩১৯-২০ সনের 'যমুনা' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে শরৎচন্দ্রের একটি বড় গল্প প্রকাশিত হলে এর অপূর্বত্বে সাধারণ পাঠক মনে করেছিল, রবীন্দ্রনাথই বোধহয় ছদ্মনামে এ কাহিনী রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ে দেখলেন, এ গল্প যিনি লিখে থাকুন, তিনি একজন অসাধারণ শিল্পী। ক্রমে ক্রমে অপরিচয়ের মেঘ সরে গেল, শরৎচন্দ্র স্নিগ্ধ আলোক নিয়ে রবির পাশেই উদিত হলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়, এবং তাঁর জীবিতকালের শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' ১৯৩৫ সালে মুদ্রিত হয়। মোট

বাইশ বৎসরের মধ্যে তাঁর তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্পসঙ্কলন পাঠকসমাজে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শুভদা' (১৯৩৮) এবং 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯)। শেষোক্তটি অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁর মৃত্যু হয়। এর অবশিষ্ট অংশ রচনা করেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। এ ছাড়াও শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ('ষোড়শী'—১৯২৮, 'রমা'—১৯২৮, 'বিরাজ বৌ'—১৯৩৪, 'বিজয়া'—১৯৩৫)। তাঁর দু'একখানি প্রবন্ধগ্রন্থ ('নারীর মূল্য';—১৩৩০, এটি তাঁর দিদি অনিলা দেবীর নামে প্রকাশিত হয়; 'তরুণের বিদ্রোহ'—১৯১৯, 'স্বদেশ ও সাহিত্য'—১৯৩২) এবং কয়েকটি বক্তৃতাও ('শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ') ছাপা হয়েছিল। তাঁর কিছু কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তিরিশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এতগুলি শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করে শরৎচন্দ্র অদ্ভুত মানসিক 'দমের' পরিচয় দিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইদানীং দেখছি অনেক বড়ো বড়ো কথাসাহিত্যিক অল্প কিছুদিন, সাহিত্যগগনে, আতশ বাজির রোশনাই সৃষ্টি করেই নিভে যান। কিন্তু শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন কথাসাহিত্যের সাধনা করেছেন, দীর্ঘতর দিন জনপ্রিয়তা রক্ষা করেছেন, এবং সম্প্রতি বাংলা কথাসাহিত্যের অভূতপূর্ব রূপান্তর হলেও সাধারণ পাঠকসামাজে এখনও তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

শরৎচন্দ্রের জীবনকথা সম্বন্ধে ত'ার পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন অনেক কাহিনী লিখে গেছেন, যে কাহিনীর মধ্যে এমন সমস্ত অদ্ভুত বর্ণনা আছে যে, স্বতঃই পাঠক বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। তিনি নিজে খুব ঘটা করে নিজের জীবনকাহিনী বলেননি, ভক্ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই নিয়ে যে সামান্য আলোচনা করতেন তার ওপর পালিশ পড়ে তা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য ও বিচিত্র রূপ ধরেছে। জীবনে দরিদ্রের সন্তান হয়ে এবং কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য তিনি বাংলার বাইরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তার মধ্যে বর্মার স্মৃতি ত'ার সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ছন্নছাড়া জীবন যাপন করে, নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে যে জীবনধারা অনুসরণ করেছেন, তার প্রতি আমাদের মতো বদ্ধজীবের প্রবল আকর্ষণ থাকলেও সে জীবন সমাজ-সংসারে সংসারী মানুষের পক্ষে খুব লোভনীয় নয়, তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজ, সংসার প্রভৃতি

সংস্কার ও বন্ধনের দ্বারা কোন দিনই নিয়ন্ত্রিত হননি। তাঁর এই বন্ধন-অসহিষ্ণু 'বোহেমিয়ান' জীবনযাত্রা সে যুগে নীতিবাগীশদের ততটা মনঃপূত হয়নি। এ ধরনের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে উপন্যাস-গল্পে সেই জীবনকে অবলম্বন করে তিনি নতুন সাহিত্যরস ও শিল্পাদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর চরিত্র ও শিল্পজীবন বড়ো বিচিত্র। কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে বিচরণ করেও তিনি নিজের চারিদিকে একটা অদৃশ্য যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন। এইজন্য অনেক সময় তাঁর অন্তরঙ্গেরাও তাঁর জীবনের গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারতেন না, তাই তাঁকে নিয়ে গালগল্পও কম সৃষ্টি হয়নি।

তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলি কোন্ গুণে এত অসাধারণ জয়প্রিয়তা লাভ করেছে এবং রবীন্দ্রনাথকেও কিছু খর্ব করে ফেলেছে, তার কারণ আলোচনা করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, তিনি বাংলাদেশের নিতান্ত পাঁচাপাঁচি সাধারণ নরনারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকেই উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকচারী প্রেম ও রোমান্সের বিপুল ঐশ্বর্য নেই বললেই চলে। চরিত্রগুলিতে বাইরের দিক থেকে কোন অভাবনীয়ত্বের চমক নেই, প্রচণ্ড 'প্যাসন' নেই, বিপুল আবেগ নেই, কোন আকাশস্পর্শী আদর্শ নেই, বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড উত্তাপ নেই। সমাজজীবন সম্বন্ধেও তিনি মৌলিক কোন তত্ত্ববাদের অবতারণা করেননি। তবু কোন্ মন্ত্রে তিনি পাঠককে বশ করেছেন। যদি বলা যায়, গল্পবুভুক্ষু সাধারণ স্তরের পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করার সুলভতম পন্থা অর্থাৎ ভাবপ্রবণ পারিবারিক কাহিনীর ঠাসবুনানির দ্বারা তিনি পাঠককে মাৎ করেছিলেন, তাও ঠিক নয়। কারণ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনীগত ত্রুটি ও শিথিলতা তাঁর অতিবড় ভক্তও স্বীকার করবেন। কিন্তু মানবজীবনের সুখদুঃখ ও অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেননি। শুধু বাস্তব জীবনের কাহিনী হলেই তাঁর গ্রন্থ এত জনপ্রিয় হতে পারত না। গত যুগের রমেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও বাস্তব জীবনের কাহিনী লিখেছিলেন, কিন্তু তার আকর্ষণ তো এত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করে অতি বিচিত্র কৌশলে তার সঙ্গে রোমান্সের অদ্ভুত মিল ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর গল্প-আখ্যানে ডিটেকটিভ গল্পের মতো নেশা ধরে যায়। উপরন্তু চরিত্রগুলি সাধারণ স্তর থেকে উঠলেও কম বিস্ময়কর নয়। তবে সে বিস্ময়

সূক্ষ্মভাবে বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বলে তাতে প্রভাতকুমারের গল্পের মতো বাস্তব প্রতীতি খণ্ডন হয় না। বরং পরিচিত বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের অপরিচয়ের রহস্য কিঞ্চিৎ জড়িত থাকার জন্য পাঠক তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। সর্বোপরি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি ও আবেগের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দুঃখের মধ্যে নেমে গিয়ে তাকে আপন করে নিয়েছেন, তার অপরাধ ও ত্রুটির জন্য তাকে নীতি-দুর্নীতির মাপকাঠির সাহায্যে পরিমাপ করতে যাননি। মানুষের দুঃখবেদনা, তা সে তার নিজের দোষেই ঘটুক, বা সমাজ ও সংস্কারের চাপেই আসুক, তাকে তিনি এতটা সহানুভূতি ও আবেগের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, পাঠক পড়তে পড়তে সেই চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, কখনও-বা সেই দীনদরিদ্র দুঃখভারাতুর ছায়ামূর্তিগুলিকে নিজের পাশেই উপলব্ধি করে। ঘটনাকাহিনী ও চরিত্রকে তাঁর আগে কেউ পাঠকের দরবারে এতটা রিক্তবেশে আনতে পারেননি। তাই তাঁর চরিত্রগুলি দুঃখ-লাঞ্ছনা ও বেদনার দ্বারাই পাঠকচিত্তে আপন অধিকার স্থাপন করে। তত্ত্ব-তর্ক নয়, মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নয়, সমাজতত্ত্বের আন্দোলনও নয়—শুধু দুর্ভাগ্য, দুঃখ ও দুর্ভাবনার দ্বারাই তারা পাঠকের এত কাছে এসে পড়ে।

শরৎচন্দ্র বাস্তব উপাদান গ্রহণ করলেও বাস্তবধর্মী লেখক নন। তিনিও আদর্শবাদী ও রোমান্টিক ঔপন্যাসিক, কিন্তু রচনার গুণে বাস্তবের পটভূমিকাকে এত সজীব করে তুলেছেন যে, তাঁর এ ছদ্মবেশ সহজে ধরা পড়ে না। তাঁর বড়ো গুণ—বড়োকে তিনি বড়ো বলেননি, সমাজের অখ্যাত অবহেলিত নরনারীগুলির বিবর্ণ চরিত্রের মধ্যে তিনি এমন দুটি-একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিতান্ত তুচ্ছ সাধারণ ব্যক্তিও অসাধারণ হয়ে ওঠে। তবে যেখানে তিনি সব কিছুকে ছাড়িয়ে বিশেষ মত প্রকাশ করতে গেছেন, সেখানে সে উপন্যাস কিছুটা প্রচারধর্মী এবং শিল্পরসে দুর্বল হয়ে পড়েছে। 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস' সম্বন্ধে সে কথা বলা চলতে পারে। কিন্তু যখন তিনি সুকৌশলে সাধারণকে অসাধারণের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন, স্বৈরিণীকে আত্মত্যাগে পরিশুদ্ধা করেছেন, লম্পটকে বেদনাসমুদ্রে স্নান করিয়ে তার মনুষ্যত্বের মহিমাকে উজ্জ্বল করেছেন, মদ্যপ দুষ্ক্রিয়াসক্তকেও সহানুভূতির রসে অপূর্বতা দান করেছেন, তখন সে কাহিনী ও চরিত্রগুলি পাঠকের মনের মধ্যে অক্ষয় আসন অধিকার করেছে।

তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে নিছক পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে কোন সামাজিক বা নীতিঘটিত প্রশ্ন নেই, কোন বিরাট আবেগ বা হাহাকার নেই। 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৭), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৫), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭)—এ সমস্তই বাংলাদেশের পরিচিত ঘটনা। কেবল 'পল্লীসমাজে' সমাজবিরোধী প্রেমের প্রসঙ্গ ও সমাজঘটিত প্রশ্ন ও মীমাংসার কথা আছে। এ কাহিনীগুলি অনুত্তেজক পারিবারিক কাহিনী হলেও এর মধ্যে জীবন্ত মানবজীবন আছে, অত্যন্ত সহানুভূতি ও বাস্তব ধরনের পটভূমিকার জন্য এর একটা সার্বজনীন আকর্ষণও আছে। সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি, ঈষৎ মান-অভিমান, মনোমালিন্য—তারপর একটু অশ্রুবর্ষণের পর সে মেঘ কেটে গেলে সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল,—এই ধরনের ঘরোয়া কাহিনীগুলি রচনার সহজ প্রসন্নতায় এবং সহানুভূতির রসে আর্দ্র হয়ে একেবারে পাঠকের চিত্ত-অন্তঃপুরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

উল্লিখিত সহজ জীবনরসের কাহিনীগুলি ছাড়াও তিনি সমাজ ও নীতি-ঘটিত যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছিলেন, তার ওপরেই তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতি নির্ভর করছে, এর জন্যই তিনি একদা নীতিবাগীশ সমালোচক ও পাঠকের দরবারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ সাহিত্যে তাঁর প্রবর্তিত তথাকথিত দুর্নীতিজনিত অস্বাস্থ্য দূর করবার জন্য 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' (যতীন্দ্রমোহন সিংহ রচিত) লিখে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, কেউ কেউ প্রকাশ্যেই তাঁর নিন্দা করতে শুরু করেছিলেন, আবার প্রগতিবাদী নতুনের দল তাঁর মধ্যে এমিল জোলা, ওয়াল্ট হুইটম্যান, ডস্টয়ভস্কির প্রতিফলন দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'শ্রীকান্ত' (১ম-১৯১৭, ২য়-১৯১৮, ৩য়-১৯২৭, ৪র্থ-১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি যেমন খুব জনপ্রিয় কাহিনী ফেঁদেছিলেন, তেমনি সমাজের তথাকথিত চারিত্রনীতি, সতীত্ব, সংযম প্রভৃতি বাঁধাগতের আদর্শকে উড়িয়ে দিয়ে এই সমাজের অনাচার-অবিচার এবং সেই অবিচারের রথচক্রতলে পিষ্ট মানবমানবীর মর্মন্তুদ কাহিনী লিখে সমাজের শিষ্ট ও শিক্ষিত স্তরে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন। বিধবার অন্যপুরুষে আসক্তি, কিন্তু নিজের ভিতর থেকে

প্রতিবাদ ওঠার জন্য নতুন জীবন আরম্ভে ভীরুতা, অসতী-কুলটা বলে পরিচিত নারীর মধ্যে সতী-শিরোমণির মহত্ত্ব, লম্পট কুক্রিয়াসক্তের মধ্যে মহত্তর ঔদার্য, অধঃপতিতের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয় এই শতাব্দীর চার-পাঁচ দশক আগে যে শিক্ষিতসমাজে ততটা উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেউ কেউ মনে করেন, শরৎচন্দ্র সমাজশাসনের জন্য, সমাজের দুষ্টক্ষত দেখিয়ে দেবার জন্যই কলম ধরেছিলেন। তাঁরা বলেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নীতি, চরিত্র ও সমাজঘটিত অনেক সমস্যা ও প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নের তো উত্তর দেননি। মনে হয় এ যেন আধখানা লেখা। তার উত্তর হচ্ছে, শরৎচন্দ্র সর্বোপরি আর্টিস্ট, শিল্পী। সমাজ ও নীতি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বা কোন জটিল মীমাংসা তাঁর কাজ নয়—সে কাজ করবেন দেশনেতা, সমাজনেতা, দেশের-দশের মাতব্বরেরা। তাঁর কাজ মানবজীবনের সুখদুঃখ লিখে যাওয়া, বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে অপূর্ব শিল্পরস পরিবেশন করা। সেদিক থেকে তিনি যথার্থ পন্থাই ধরেছিলেন। তাই তাঁর গ্রন্থে হুইটম্যান বা ডস্টয়ভস্কির মতো মানবসমাজের কাছে মানব-দুঃখ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলশ্রুতি হচ্ছে শিল্পসৃষ্টি, রসের আনন্দদান। তিনি বলতে চেয়েছেন, সমাজ ও চারিত্র-নীতির চাপে কত নরনারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেই বিনাশ ও ব্যর্থতার বেদনামধুর ছবি এঁকে তিনি যুগোপযোগী একপ্রকার নব্য-মানবতাবাদের (neo-humanism) রসরূপ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রচুর আদর্শ ও রোমান্সের সংমিশ্রণ হয়েছে, মনে মনে তিনি প্রচণ্ড রকমের আদর্শবাদী ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাই বলে মানবজীবনকে বাদ দিয়ে তিনি নীতি ও তত্ত্বকথা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেননি; যেখানে সেরকম চেষ্টা করেছেন সেখানে তা ব্যর্থ হয়েছে—যেমন 'শেষপ্রশ্ন,' 'বিপ্রদাস,' 'পথের দাবী'। কিন্তু যেখানে তিনি মুখ্যত মানববেদনার কথা বলেছেন, সেখানে তা সকলেরই চিত্ত দ্রবীভূত করে দিয়েছে। অবশ্য সে বেদনা যে নিতান্তই করুণরস—pathos সৃষ্টির আর্দ্র উপাদান মাত্র তাও অস্বীকার করা যায় না। ট্রাজেডি বলতে মানবভাগ্যের যে নিদারুণ ব্যর্থতা ও পরাজয়কে বোঝায়, একমাত্র 'গৃহদাহ' বাদ দিলে তাঁর অন্য কোন উপন্যাসে সে দুর্লভ গুণটি পাওয়া যায় না। চোখের জলের ওপরই তাঁর প্রতিষ্ঠা, ভাবাবেগের বাষ্পাকুললোচনই তাঁর কাহিনীর একমাত্র সমঝদার। এইজন্য কোন কোন প্রতিকূল সমালোচক বলেন

যে বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ অশ্রুপাতপ্রবণ হৃদয়ে সুলভ করুণরসের তরঙ্গ তুলে শরৎচন্দ্র অতি সহজে বাজি মাৎ করেছেন। অবশ্য এটা শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত নয়। সমস্ত বাঙালী চরিত্রেরই এটা একটা বৈশিষ্ট্য, যাকে কেউ কেউ বলেন—ত্রুটি। যদি এ ত্রুটি থেকেও থাকে, তাহলে বাঙালীর চরিত্র ও মানস থেকে একে তো আর মুছে ফেলা যাবে না। সে যাই হোক, শরৎ-সাহিত্যে মানুষের বেদনার ছবি যে ভাবে ফুটেছে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালীর চরিত্রের স্বাভাবিকতা যত দিন থাকবে, শরৎচন্দ্রও ততদিন পাঠকের হৃদয়রাজ্যে একাধিপত্য করবেন। ইদানীং তো কত লেখক কত অদ্ভুত ও উদ্ভট বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস লিখছেন, কতরকম রচনাকৌশল, বক্তব্যের মারপ্যাচ আমদানি করছেন। ত'ারা কেউ কি শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন? পাঠকের দরবারই যদি লেখক বিচারের শেষ আপীল-আদালত হয়, তা হলে শরৎচন্দ্র যে সে বিচারে অসাধারণ গৌরবের সঙ্গে জয়লাভ করেছেন তা স্বীকার করতে হবে।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র কোন মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি, যা সমস্ত সমাজ ও জীবনকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেবে? তিনি কি বাঙালী-জীবনের ঘরোয়া পরিবেশ ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছেন, যেমন করে কালজয়ী ঔপন্যাসিকেরা ছড়িয়ে পড়েছেন? একথা অবশ্য ঠিক, বিশাল বিরাট ও মহৎ কিছু সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল না। তিনি সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করেছেন, অঙ্গারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বহ্নিকণাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, ধূলিমুষ্টির মধ্যে স্বর্ণরেণু খুঁজে পেয়েছেন—আর তা ছাড়া এযুগ বিশাল সৃষ্টির অনুকূল নয়। স্বপ্নভঙ্গের যুগে স্বপ্নসৃষ্টি কি করে সম্ভব হবে? দ্বিতীয়ত, ত'ার ঘটনাকাহিনী একান্তভাবে বাঙালী-জীবনকেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে বহুস্থলেই ভূগোল-ইতিহাসের সীমা মুছে গিয়ে চিরকালের মানুষের শোভাযাত্রাই ফুটে উঠেছে। তা না হলে বাংলার বাইরে ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় ত'ার গ্রন্থ 'বেস্ট্ সেলার' হয় কি করে? বাঙালীর সমাজজীবন ও পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গে পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কেরল, অন্ধ্রের কতটুকু মিল? তবে সেই সমস্ত প্রদেশে অনুবাদের মারফতে ত'ার উপন্যাস ও গল্প এত জনপ্রিয় হয়েছে কেন? এমন কি ইংরেজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় ত'ার গ্রন্থ অনূদিত হয়ে ভারতের বাইরে ছড়িয়েছে, প্রশংসা অর্জন করেছে,

সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহল জাগিয়েছে। তিনি শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে বাংলার চিত্র আঁকলে বাংলার বাইরে, ভারতেরও বাইরে কখনই সমাদর লাভ করতে পারতেন না। আসল কথা, যে কারণে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ ও অনভ্যস্ত জীবনের চিত্র হলেও বিদেশী উপন্যাস পড়ে আমরা মুগ্ধ হই, ঠিক সেই কারণে আমাদের শরৎচন্দ্রের উপন্যাসও অন্যদেশের পাঠকের বুকে ঢেউ তুলতে পারে, আবেগ ও সহানুভূতি সঞ্চার করতে পারে। উপন্যাসের ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী একটা বিশেষ দেশকালের দ্বারা সীমাচিহ্নিত হলেও তার মধ্যে দেশকালাতীত চিরন্তন মানবরসের জন্যই তা দেশে দেশে প্রচার লাভ করে। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে সেই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই উন্নাসিক 'ইনট্যালেক্‌চুয়ালে'র ধমক সত্ত্বেও পাঠকসমাজে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি, অদূরভবিষ্যতেও যে হবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি, আবেগের সামঞ্জস্য, মৌলিক তত্ত্ব—এতে শরৎচন্দ্রের অধিকার থাক বা না থাক, তাঁর গল্পকাহিনী মানবীয় রসে পূর্ণ বলেই আগামী যুগেও মানব-মানবীর চিত্তাকর্ষী হবে। তবে যদি কোন দিন গল্প-আখ্যানে আমাদের রুচি চলে যায়, চরিত্র পরিকল্পনা ছেলেমানুষী বলে পরিত্যক্ত হয়, জীবনের আবেগ ও বাস্তব সমস্যাই উবে যায়, তা হলে অবশ্য শরৎচন্দ্রও নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন—অনেকেরই সে রকম দুর্ভাগ্য ঘটবে। সুতরাং ভবিষ্যতের করকোষ্ঠী দেখে লেখকের ভাগ্যনিরূপণ না করে বর্তমানের দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পারে এখনও বহুদিন, বহু যুগ ধরে শরৎসাহিত্য পাঠককে আনন্দ দান করতে পারবে।

৩. শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের সমকালে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর ধরে অন্তত অর্ধশত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের ধারা অনুসরণ করে, কেউ-বা য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,

সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ('বনফ্‌ল'), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নাম করা যেতে পারে। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ ত'াদের কালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, সাময়িকপত্রে নিত্য বিরাজ করতেন। এ'দের কারও কারও কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সমস্ত সাহিত্যকেন্দ্র তৈরী হয়েছিল এখানে তার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' গোষ্ঠী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতী' গোষ্ঠী, দীনেশরঞ্জন দাসের 'কল্লোলগোষ্ঠী'—এই তিনটি সাময়িক পত্রকেন্দ্রিক সাহিত্যগোষ্ঠীর নাম উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের কেন্দ্র 'সবুজপত্র' এবং 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর কেন্দ্রপতি ছিলেন 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী। 'ভারতী'র গোষ্ঠীর সভ্যগণ বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে না গিয়ে মোটামুটি রবীন্দ্রছায়াতলেই বাস করতেন, চিরাচরিত প্রেম ও রোমান্সের কাহিনী লিখতেই অধিক অভ্যস্ত ছিলেন। এই 'ভারতী' গোষ্ঠীতে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে হাজির হতেন, কিন্তু বিশেষ কোন দলের সঙ্গে ত'ার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। 'কল্লোল' পত্রিকায় একদল নব্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের, বিশেষত রুশ ও ফরাসী সাহিত্যে নমুনা থেকে। তাঁরা এমন সমস্ত সঙ্কীর্ণ গলিপথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, য'ারা সনাতনী পন্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা এতে প্রমাদ গুণলেন। সে সময়ে চারিদিকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও এই নবীন কথাসাহিত্যিকের দল তৎকালীন য়ুরোপীয় আদর্শে প্রতিদিনের বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের ওঠাপড়া নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, উপন্যাসেও তার প্রতিফলন দেখাতে চাইলেন। ফলে এমন অনেক নিষিদ্ধ কথা বলতে হল যে, অচিরে দারুণ তর্কের ঝড় উঠল। সেই তর্কবিবাদের সময় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই তার সঙ্গে অল্পবিস্তর জড়িয়ে পড়লেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির (১৯১৮) পর মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২০), যুদ্ধান্তে দারুণ অর্থনৈতিক মন্দার জন্য দেশে বেকার সমস্যার উৎকট আকার ধারণ (১৯৩০ সালের কিছু পূর্ব থেকে), সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অব্যাহত গতি, সাম্যবাদী-মতে-বিশ্বাসী যুবশক্তির বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার, বিদেশ থেকে এসে জওহরলাল নেহরুর সৌখীন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

ঘোষণা, কংগ্রেসের দোলাচল মনোবৃত্তির ফলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুবশক্তির নবকর্মোদ্যম, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কংগ্রেসের ভাবের ঘরে চুরি, শাসক শক্তি কর্তৃক হিন্দু-মুসলমানের ভেদকে আরও ব্যাপক করার অপচেষ্টা—তার বিরুদ্ধে মহাত্মার অনশন এবং বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ (কলকাতা টাউনহলে বক্তৃতা)—চারদিকেই আবেগহীন, আনন্দহীন চিত্তসঙ্কট দেখা দিল। এই দ্রুতধাবমান কালপ্রবাহের মধ্যে ঔপন্যাসিকগণ আবির্ভূত হলেন।

গোষ্ঠীপতি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) মননশীল প্রাবন্ধিক হলেও কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণেও কিছুদিন পদচারণা করেছিলেন। তাঁর 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬) এবং আরও দু-একটি ছোটগল্প (যেমন—'আহুতি') এক ধরনের বিশ্লেষণশক্তির নিপুণ চেষ্টা বলে গণনীয় হবে। অবশ্য তিনি ছিলেন মূলত প্রাবন্ধিক। চিন্তার পথই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তাই তার গল্পগুলি মাপকাঠির মাপে নিশ্চয়ই উতরে গেছে, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসৃত হওয়ার জন্য এগুলি মনের গভীরে আঁচড় কাটতে পারে না। মণীন্দ্রলাল বসু বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আধুনিক যুগ ও জীবনের পটভূমিকায় প্রয়োগ করে লিখলেন 'রমলা' (১৩৩০), 'সহযাত্রিণী' (১৩৪১)। তাঁর গল্পে রোমান্সপ্রিয়তার সঙ্গে অলৌকিকতাও দেখা দিয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল' গোষ্ঠীর একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন, যিনি কিছুকাল পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর ভাষাভঙ্গিমার বৈচিত্র্য ও রোমান্টিক রীতিপ্রকরণ, প্রতীকীধরনের আঙ্গিক, এবং বে-আব্রু দেহসম্পর্ককে তিনি এমনভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, একযুগে তরুণসমাজে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর 'বিবাহের চেয়ে বড়' অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও উপন্যাস হিসেবে বড়ো সৃষ্টি নয়। তিনি বড়ো গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু রচনাভঙ্গীর চটক দিয়ে যে শ্রেষ্ঠ কিছু সৃষ্টি করা যায় না, তাঁর দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-সাধনাই তার প্রমাণ। জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর প্রত্যয়ের অভাব এবং সে অভাব পুরণের জন্য বিচিত্র কাহিনী ও ব্যক্তির সাহায্য নিলেও তিনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোন একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করতে পারবেন না। কিছুকাল ধরে তিনি আবার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবন ও সাধনাকে আবেগবহুল সাহিত্যের ভাষায় সরল তরল করে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। এগুলি পাঠকসমাজে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু এগুলিও এক ধরনের যুগের হুজুগ। এখনকার রীতি—

মহাপুরুষ-জীবনকে প্রতীক ধরনের ইঙ্গিত, পরস্পর-বিরোধী উক্তির খোঁচা ও কাব্যধর্মী ভাষায় এমনভাবে সাহিত্যের আওতায় আনতে হবে যাতে ধর্মের জাত যায়, আবার সাহিত্যের জাতকুল দুই-ই যায়। ফ্যাসনের খাতিরে তিনি এই সমস্ত লোকলোভন রূপকথা রচনায় মেতে উঠেছেন। এগুলির শিল্পমূল্য যে বেশী নয় তা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে। অবশ্য 'পরমপুরুষ' ও 'পরমাপ্রকৃতি'র কথা বলতে বসে তিনি যে আদিরসের গল্প-উপন্যাস ছেড়ে অধ্যাত্মরাজ্যে যাত্রা করেছেন, তা বলা যাবে না। কারণ একহাতে তিনি লিখেছেন পবিত্র মহাপুরুষ কথা, আর একহাতে লিখেছেন আদিরসের নারীপুরুষের কথা। একই সঙ্গে পেশা ও নেশার এমন সেবা করা প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। তবে পাঠকচিত্তে রংদার বাক্যপ্রবন্ধের দ্বারা তিনি যে সমস্ত 'ধর্মীয় স্টান্ট্' সৃষ্টি করেছেন, তার আয়ু যে অতিশয় পরিমিত, তা সঙ্কোচের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে।

কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০১-৭৪) রোমান্সের স্বর্গদূত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একযুগে জেহাদ ঘোষণা করলেও তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে কৃত্রিম রোমান্সের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। প্রথম যুগে লেখা 'সাড়া' (১৯৩০) সত্যই নবীনপাঠকের স্বাদবৈচিত্র্যলোভী চিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর 'যেদিন ফুটল কমল' (১৩৪০), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১), 'মৌলিনাথ' (১৯৫২), 'তিথিডোর' (১৩৪৯) প্রভৃতি উপন্যাসে বাঙালী জীবনের বাস্তব-সম্পর্কহীন রোমাণ্টিক রূপাঙ্কন একশ্রেণীর নবীন এবং নবীনায়িত প্রবীণদের প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, রোমাণ্টিক ধারাকে পরাভূত করে বুদ্ধদেব নতুন রিয়ালিজ্‌মের ধারা আনছেন। তাঁদের সে আশা নিষ্ফল হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ও গল্পের কাহিনী চরিত্র ও প্রতিবেশ যথার্থ রিয়ালিজ্‌মের ঘোর প্রতিবাদী। তিনি মূলত কবি, সুতরাং তাঁর গল্প-উপন্যাসে কবিজনোচিত আবেগ ও রোমান্সের প্রভাব পড়লে বিস্ময়ের কারণ নেই। তবে সে রোমান্স নীরক্ত পাণ্ডুরতায় প্রাণহীন বলে মনে হয়। এই সমস্ত ড্রয়িং রুম-বিলাসী রোমান্সধর্মী কল্পকাহিনীর স্থলে কয়েকজন ঔপন্যাসিক কঠোর জীবনের বাস্তবচিত্র এঁকে কথাসাহিত্যের আর এক নতুন পথ দেখাতে চেয়েছেন। এঁদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'কালিকলম' নামে প্রগতিশীল পত্রের সম্পাদক গল্পকার ও ঔপন্যাসিক

শৈলজানন্দ (১৯০১-১৯৭৬) উপন্যাসে সম্পূর্ণ নতুন সুর আমদানি করে গতানুগতিক উপন্যাস-সাহিত্যের কৃত্রিম ধারার মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন। কয়লাকুঠির শ্রমিক-সাঁওতালের ম্লানবিবর্ণ জীবনকথাকে তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন, বাস্তব চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সহানুভূতি ও আবেগ। তাঁর 'নারীমেধ' (১৩৩৫), 'বধূবরণ' প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে যে নির্মম বাস্তবতার চিত্র আছে, বাংলা সাহিত্যে তাকে একপ্রকার অভিনব আগন্তুক বলতে হবে। তবে মানব-জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন গভীর বক্তব্য নেই বলে তাঁর অপূর্ব উপন্যাসগুলিও পাঠকচিত্তে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পারে না। জগদীশ গুপ্তও (১৮৮৬-১৯৫৭) শুষ্ক কঠিন ও নির্মম বাস্তবতাকে অবলম্বন করে অভিনব গল্পকাহিনী লিখেছিলেন। 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মনোবিকলনতত্ত্বাশ্রয়ী নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন—বাংলা সাহিত্যে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব মর্মজ্ঞ পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধারে কথাসাহিত্যিক, কবি ও রচনাকার। একদা তিনি অতি আশ্চর্য গল্প ও উপন্যাস লিখে নবীন সমাজের নেতৃত্বের ভার পেয়েছিলেন। কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে কতকগুলি দিক থেকে তিনি পথিকৃৎ, তেমনি গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্য অসাধারণত্বে পূর্ণ, মৌলিকতায় ঐশ্বর্যবান। তাঁর 'পাঁক' (১৯২৬) এবং 'মিছিল' (১৯৩১) অতি-আধুনিক উপন্যাসের সার্থক প্রয়াস বলে উচ্চ প্রশংসা দাবি করতে পারে। সাধারণ ও নিম্নমধ্যবৃত্ত জীবনের এমন নিপুণ বাস্তব বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ বললেই চলে। তাঁর ছোটগল্পগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিয়ম মাফিক রচনা হয়েও এগুলি আদর্শ ছোটগল্প হিসেবে এখনও পাঠকের অপার বিস্ময় আকর্ষণ করতে পারে। 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) জীবনপ্রত্যয়ে খুব গভীর রসের কারবারী না হলেও রচনার বিচিত্র ভঙ্গিমায় পাঠকসমাজের মন লুঠ করে নিয়েছেন, তা স্বীকার করতে হবে। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তিনি অবলীলাক্রমে বিহার করেছেন। তাঁর 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২), 'মৃগয়া' (১৯৪০), 'দ্বৈরথ' (১৩৪৪) 'নির্মোক' (১৩৪৭), 'জঙ্গম' (১৩৫০), 'স্থাবর' (১২৫৮) প্রভৃতি বিচিত্র উপন্যাস পাঠকসমাজে সুপরিচিত। তাঁর গল্পগুলিও রীতির দিক থেকে অতি উৎকৃষ্ট (বৈতরণীর তীরে—১৩৪৩, 'বাহুল্য'—১৩৫০, 'বিন্দুবিসর্গ'—১৩৫১)। বনফুলের রঙ্গব্যঙ্গের কবিতাগুলিও অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত। এখনও তাঁর ঔপন্যাসিক

প্রতিভা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি, কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'হাটে বাজারে'ই তার প্রমাণ। নানা অভিজ্ঞতা জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা শাস্ত্র (তিনি নিজেও ডাক্তার)-সম্বন্ধীয় বিচিত্র বিস্ময়কর তথ্য ও অদ্ভুত রচনারীতি অবলম্বনে তিনি যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তার জনপ্রিয়তাই তার মূল্য ঘোষণা করছে। তবে কিছু স্থির হয়ে চিন্তা করলে মনে আশঙ্কা জাগে, তিনি জীবনের বৈচিত্র্যকে যতটা ফুটিয়েছেন, গভীরতার দিকে ততটা আকৃষ্ট হননি। এর পরিণাম হল সাময়িক জনবল্লভতা এবং পরবর্তী কালে নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া।

অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় বুদ্ধিবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতাকে অবলম্বন করে, অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২), 'অজ্ঞাত-বাস' (১৯৩৩), 'কলঙ্কবতী' (১৯৩৪) 'দুঃখমোচন' (১৯৩৬), 'মর্ত্যের স্বর্গ' (১৯৪০), 'অপসরণ' (১৯৪১) উপন্যাসগুলি এপিক ধাঁচে একত্রে 'সত্যাসত্য' নামে পরিচিত হয়েছে। এতে য়ুরোপীয় তত্ত্ব-উপন্যাসের অনুকরণে সমাজ, নীতি, মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বকথা এবং মানসিক জটিলতা বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য স্পষ্টত কোন মত বা তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য ফাঁদলে তা কিছু কৃত্রিম হয়ে পড়ে। এগুলিতে নানা তত্ত্বকথা থাকলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ সমস্ত গুরুতর তত্ত্বকথা মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি। অনেক স্থলে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী লেখকের 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে' পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ছাড়া আর কোন গ্রন্থকেই এপিক নভেলের গৌরব দেওয়া যায় না। অন্নদাশঙ্করের 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০) এবং 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৯) যতই চটকদারী হোক, কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির খুব একটা স্পৃহণীয় স্থান নেই। তবে তাঁর কয়েকখানি প্রবন্ধগ্রন্থে, বিশেষত ভ্রমণকাহিনীতে সত্যকারের বিদগ্ধ রচনাকারের পরিচয় ফুটে উঠেছে। অবশ্য ইদানীং যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে তাতে আর পূর্বের মতো মনোরম মুহূর্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বড় বেশী 'গুরুমশাইগিরি' করছেন, উপদেশ বিতরণ করছেন, পথনির্দেশের গুরুদায়িত্ব বেছে নিয়েছেন। ফলে তাঁর এই ধরনের রচনা থেকে আর প্রসন্ন আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বিচিত্র প্রতিভাধর দিলীপকুমার বৈদেশিক পটভূমিকায় কয়েকখানি জনপ্রিয় উপন্যাস লিখে একদা খুব খ্যাতনামা হয়েছিলেন।

এর পর আমরা এই যুগের তিনজন ঔপন্যাসিককে একটু পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করব। কারণ আমরা মনে করি, শরৎচন্দ্রের যুগে বা তার পরে যাঁদের উপন্যাসে যথার্থ মৌলিকতা ফুটেছে, শক্তি প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক—তিনজনেই বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার আমরা যে ক'জন ঔপন্যাসিকের কথা আলোচনা করব, তাঁরা শরৎচন্দ্রের যুগে এবং পরবর্তী কালে বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশে যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, অন্য কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। অচিন্ত্য-কুমারের বিচিত্র বিষয়বস্তু, অন্নদাশঙ্করের মননপ্রধান তত্ত্বকথা, বুদ্ধদেবের কাব্যধর্মী রোমান্টিক কাহিনী, শৈলজানন্দের বাস্তব মানুষের জীবনচিত্র, জগদীশ গুপ্তের কঠোর বাস্তবতার নির্মম আধিপত্য, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখদুর্ভর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক দিনলিপি—বাংলা উপন্যাসের গঠনে এর মূল্যও বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। কিন্তু সমগ্র বাঙালী-মানসকে যাঁরা শরৎচন্দ্রের মতোই নাড়া দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছেন, তারাশঙ্করও কিছুদিন পূর্বে (১৯৭১) জীবনলীলা সংবরণ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের মতোই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর। সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে সারাজীবন স্কুলমাষ্টারী করে বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাসে যে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করেছেন তা ভাবলেই অবাক হতে হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বাঙালী-জীবনের যথার্থ এপিক 'পথের পাঁচালী' "বিচিত্রা" পত্রিকায় (১৯৩৫-৩৬) প্রকাশিত হবার সময়ে এর প্রতি অনেক কৌতূহলী পাঠক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গ্রন্থটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল ১৯২৩ সালে। তারপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৯৩৬-৩৮) অনেক দিন ধরে 'পথের পাঁচালী'র উত্তরকাণ্ড 'অপরাজিত' নামে প্রকাশিত (গ্রন্থাকারে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত) হলে পাঠক ও সমালোচক উভয়েই বুঝতে পারলেন, বাংলা উপন্যাসের মহাকাশে নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। এরপর তাঁর অনেকগুলি স্নিগ্ধমধুর সরস গল্প পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করল, তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৩৪২), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৪৭), 'দেবযান' (১৯৫১), 'ইচ্ছামতী' (১৩৫৬) প্রভৃতি উপন্যাস

পাঠককে আবিষ্ট করল। তাঁর কয়েকখানি গল্পসংগ্রহও ('মেঘমল্লার'—১৩৩৮, 'মৌরীফুল'—১৩৩৯, 'যাত্রা-বদল'—১৩৪১) বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র গল্পরস সৃষ্টি করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তরুণ-নাতিতরুণ-অতিতরুণ ঔপন্যাসিকেরা নব নব সৃষ্টি-কর্মে ব্যস্ত থাকলেও কোন্ গুণে অখ্যাত-অবজ্ঞাত বিভূতিভূষণ অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হলেন, পাঠক-পাঠিকার মনে সে প্রশ্ন জাগবেই। বিভূতিভূষণ বাংলাদেশের (এবং বাংলার বাইরের—'আরণ্যক') ভূপ্রকৃতির বুকে যে সমস্ত বালক, শিশু, যুবক, বৃদ্ধের ছবি এঁকেছেন, তার মূল রস হল রূপকথার রস। পরিচিত বিবর্ণ দেশকালের অন্তরে অপূর্ব কল্পলোকের রসবস্তু লুকিয়ে আছে, কঠোর বাস্তবের মধ্যেই একটি রূপলোকের স্বপ্নমাধুরী নিহিত রয়েছে। শিশুর মতো কৌতূহল এবং কবির মতো কল্পনার প্রলেপ দিয়ে বিভূতিভূষণ অননুকরণীয় ভাষায় এমন গ্রামীণ জীবনের চিত্র এঁকেছেন যে, চিত্র হিসেবে তা অনবদ্য এবং অনতিক্রমণীয়। দুঃখদারিদ্র্যের ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু সে ছবি কোন সমাজ বা অর্থনীতিঘটিত প্রখর প্রশ্ন উত্থাপন করে না; কিছু কিছু প্রেমের চিত্রও এঁকেছেন, কিন্তু তাতে রোমাণ্টিক বৈচিত্র্য ও উত্তপ্ত কামনার চেয়ে স্নিগ্ধমধুর শান্ত ও গার্হস্থ্য রূপটি বেশী প্রকাশ পেয়েছে। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতের' মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধা পথ অবলম্বন করেননি, একটি বালকচিত্ত কীভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল, জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তার সে রূপকথার জগৎ হারিয়ে গেল না, তারপর তার পুত্রের মধ্যেও সেই জীবন-প্রতীতি বয়ে চলল—সেই কথাটাই বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত বিশাল অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রহস্যময় যোগাযোগের নিবিড় অনুভূতি বিভূতিভূষণের একপ্রকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেই রহস্যময়তা অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেছে 'আরণ্যকে'। তাঁর রূপাতীতলোকের প্রতি পিপাসা 'দেবযানে' অলৌকিক লোকে উপস্থিত হয়েছে। প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে যে রোমান্সের রস এবং ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির রহস্যময় ব্যঞ্জনা রয়েছে, বিভূতিভূষণ তার প্রতি তর্জনী তুলেছেন। রোমাঁ রোলাঁর *Jean Christophe*-এর সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বস্তুত বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিমা কোন কোন দিক দিয়ে রোমাঁ রোলাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয়। সেই প্রকৃতি ও মানুষের আদিম সম্পর্ক, ভূলোকের মধ্যেই দ্যুলোকের ব্যঞ্জনা, যা ফরাসী মনীষীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভূতিভূষণের পরিকল্পনা কতকটা সেই ধরনের। ড্রায়িং রুমের

কৃত্রিমতা, অতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাব, সমাজ ও নীতিঘটিত কোন প্রখর প্রশ্ন বিভূতিভূষণকে বিচলিত করেনি, চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সেই মানসিক সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিবর্তন—এসব চিরাচরিত ঔপন্যাসিক কৌশলও তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি রূপকথাপ্রিয় কৌতূহলী শিশুর দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত কিছুকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে আমরা যেন হারানো শৈশব ও বাল্যের স্মৃতির মধ্যে আবার ফিরে যাই। ইছামতীর নদীর মতো তাঁর কাহিনী ধীরমন্থরভাবে বইতে থাকে, ক্বচিৎ তাতে বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব ওঠে, তারপরে সে প্রবাহ নিরুদ্বেগেই বয়ে যায়। কেউ কেউ তাঁর মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য ও বক্রতা দেখতে পান না বলে, বিভূতিভূষণের কাহিনীগুলিকে বিশুদ্ধ উপন্যাস বলতে চান না। এক দিক দিয়ে অবশ্য এরকম যুক্তির অবতারণার অবকাশ আছে। উপন্যাসের বাঁধাগতের আঙ্গিক অনুসারে বিচার করলে অবশ্য তাঁর উপন্যাসকে যথার্থ উপন্যাস বলা দুরূহ হয়ে পড়বে। কিন্তু আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপন্যাসের আঙ্গিকও তো বদলে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপীয় উপন্যাসের রচনারীতি ও আঙ্গিকগত কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, তা পাঠক-পাঠিকা অবগত আছেন। সে দিক থেকে বিভূতিভূষণের উপন্যাস রচনার রীতিটি নতুন প্রকরণ বলেই অভিনন্দনের যোগ্য। চরিত্র, ঘটনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাত্ত্বিক সংঘাত, সামাজিক প্রশ্ন,—তাঁর উপন্যাসে এসবের বিশেষ বাহুল্য নেই। আছে চেনা পৃথিবীর মধ্যে, পরিচিত মানুষের মধ্যে, দৈনন্দিন জীবনধারণের মধ্যে, অচেনা, অরূপ জগতের মধ্যে সৌন্দর্যময় ইঙ্গিত, রহস্যময় ব্যঞ্জনা। সে দিক থেকে বিভূতিভূষণ শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিশেষ স্থান অধিকার করবেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এখন আমাদের মধ্যে জীবিত না থাকলেও, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মনের দিক দিয়ে জীবিত আছেন, নিজের নব নব সৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন। উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার তাতে আজ আর দ্বিধা নেই। তাঁর উপন্যাস ও গল্প শুধু যে বাংলাদেশে জনপ্রিয় তা নয়, বাংলার বাইরে ভিন্ন প্রদেশের পাঠকেরাও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী—এ আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে যে দুর্লভ বলিষ্ঠতা ও তীব্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে, যে বিশাল মানববোধের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সমসাময়িক দেশ-কালের

ঐতিহাসিক জীবনচিত্র যে-ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাতে শরৎচন্দ্রকে হারিয়ে আমাদের আর ক্ষোভ নেই, তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারিত্ব তারাশঙ্করের মধ্যে রয়ে গেছে। তারাশঙ্কর একদা 'কল্লোলে'র দলে ঠাঁই পেয়েছিলেন, কিছু কিছু কবিতাও লিখেছিলেন; কিন্তু পরে তিনি নিজের প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হন। মানবজীবনের বিশাল রূপ কথাসাহিত্যের মারফতে ফুটিয়ে তোলাই যে তাঁর একমাত্র ব্রত তা তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন এবং 'কল্লোল'গোষ্ঠীর খোপ থেকে বেরিয়ে বিশাল প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁর উপন্যাসে মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি, জীবন ও সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায়-মমতায় বর্ণিত হয়েছে। একটা যুগের অবসান হচ্ছে, আর একটা যুগ আসছে। পুরাতন গ্রামীণ জমিদারী আবহাওয়া চলে যাচ্ছে, আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে আসছে শিল্পপতির দল। গ্রাম-জনপদ রাতারাতি যন্ত্রদানবের কৃপায় আধা-শহরে পরিণত হচ্ছে। চিমনির ধূম-নিশ্বাসে গ্রামের আকাশ ও মাটি মলিন হয়ে যাচ্ছে, আবিলতা বাড়ছে, চরিত্রভ্রষ্ট নরনারী বিত্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে গাঁয়ের গ্রামীণ মাটি মুছে কারখানাঘরের কালিঝুলি মাখছে। সেই সামাজিক মূল্যমানের পরিবর্তন তারাশঙ্কর অপূর্ব দক্ষতার সহিত ফুটিয়েছেন তাঁর প্রধান প্রধান উপন্যাসে ও ছোটগল্পে। অবশ্য সেই ভাঙাচোরা পটভূমিকায় তিনি আবার নবজীবনের চিত্রও এঁকেছেন, নৈরাশ্যবাদী বিষণ্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর একদিকে তিনি বীরভূম অঞ্চলের অতি সাধারণ শ্রেণীর বেদিয়া, বাজিকর, সাঁওতাল, আউল-বাউল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি রহস্যময় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করে তাদের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাও এতদিন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। তাঁর 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৪০), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৫০), 'গণদেবতা' (১৯৪২) 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪০), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) এবং আধুনিক কালে রচিত তাঁর আরও অনেক উপন্যাসে আধুনিক যুগে, বাংলাদেশের সমগ্র জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সে চিত্রাঙ্কনের সময় তারাশঙ্কর নিজের মধ্যে এমন একটা ধ্যানীরূপ ফুটিয়ে তোলেন যে, তখন তাঁকে তান্ত্রিক সাধক বলে মনে হয়। জীবনের বিশালতা ও গভীরতা এভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, মাংসপেশীর সে জোর ইদানীং বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, সারা ভারতেও তার জুড়ি মিলবে না। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প ('জলসাঘর', 'বেদেনী', 'ছলনাময়ী' প্রভৃতি)

বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বোধহয় রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তাঁর মতো এত দক্ষতার সঙ্গে ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে আর কেউ বিশাল বিচিত্র জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। সত্য কথা বলতে কি, 'গোরা'র পরে যদি কাউকে মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের রচনাকার বলে নির্দেশ করতে হয়, তবে সে গৌরবের সবটাই তারাশঙ্কর দাবী করবেন। কাহিনীর বিশাল পটভূমিকা ও আঞ্চলিকতা (হার্ডি'র ওয়েসেক্স্‌ নভেলের মতো), চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য ব্যক্তির মনোদ্বন্দ্ব, এবং সমাজপরিবেশ ও মূল্যমানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব, অনতিক্রান্ত যুগের সঙ্গে চলমান যুগের সংঘাত —প্রভৃতি গভীর ব্যাপার তাঁর উপন্যাসে যে ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে শুধু কথাকার বলেই তাঁকে বিদায় করা যায় না, তিনি অধুনাতন বাঙালী-জীবন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। ছোট-বড়ো ইতর-ভদ্র, ভূস্বামী-অভিজাত ও ভূমিহীন রায়ত-কৃষক-সকলের জীবন-চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি যে বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষরীতির সাহায্য নিয়েছেন, ইদানীং টেকনিক-সর্বস্ব বাংলা কথাকারেরা তার নাগাল ধরতে পারবেন না। তারাশঙ্কর বাংলা-দেশের গৌরব, ভারতবর্ষেরও প্রধান কথাকার। তবে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর প্রতিভা ও শক্তির সীমাটুকুও জেনে রাখা উচিত। শরৎচন্দ্র অবলম্বন করেছিলেন পারি-বারিক ও সামাজিক নীতিদুর্নীতিঘটিত প্রভাব-প্রতিবেশে বর্ধিত কয়েকটি নরনারীর ব্যক্তিগত সমস্যা। তারাশঙ্কর সেই সমস্যা ও সীমার চৌহদ্দি অনেক বাড়িয়ে দিয়ে বিদায়ী পুরাতন এবং নবীন আগন্তুকের সংঘর্ষের বিশালতর পটভূমিকা এঁকেছেন। কিন্তু স্বল্পতর পরিবেশে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য যতটা গভীর ও একমুখী হয়েছে, বিস্তৃতত প্রান্তরে তারাশঙ্করের অনুরূপ বক্তব্য ততটা গভীর হতে পারেনি। উপরন্তু, তাঁর কাহিনীবিন্যাস কোন কোন স্থলে শিথিল, চরিত্রগুলি তাঁরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাপ্রসূত। অনেকস্থলে তাদের শূন্যস্থানগুলি তিনি পূরণ করেননি। কোথাও কোথাও বিশ্লেষণ অতিতীক্ষ্ণ, কোথাও বা বাগ্‌বাহুল্য বক্তব্যের ঘনত্ব নষ্ট করেছে; ইদানীং আবার তিনি উপন্যাসে নানা ধরনের দার্শনিক তত্ত্বকথা (বিশেষত মৃত্যুবিষয়ক মন্তব্য) প্রচার করেছেন। এ সব বৈশিষ্ট্য তাঁর কোন কোন উপন্যাসে, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে রচিত উপন্যাসে বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। সে যাই হোক সমগ্রভাবে বিচার করলে তাঁকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ উত্তর-শরৎযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলতে হবে,

তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের কোন কোন জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যেও কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

তারাশঙ্করের সঙ্গেই আর একজন বিচিত্র প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক ও গল্প-কারের নাম করা উচিত। তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬)। তাঁর আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু সাহিত্য-জগতে তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত, অধিকাংশ পাঠকই তাঁর আসল নাম জানে না। একদা তিনি পূর্ববঙ্গের নদীনালা পার হয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন এবং অল্পকালের মধ্যে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রধান লেখকে পরিণত হন। ১৩৩৫ সন থেকেই তিনি গল্প রচনা শুরু করেছিলেন। তারাশঙ্কর যেমন পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের মানুষদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের পরিবেশে ঐ অঞ্চলের সাধারণ লোকের জীবনচিত্রকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সময়ে এদেশে ফ্রয়েডপন্থী মনোবিকলন ও মনো-বিকারতত্ত্ব সাহিত্যিক মহলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর এক শ্রেণীর উপন্যাসে বিশাল নদীপ্রান্তরে সাধারণ মানুষের বাস্তবনিষ্ঠ জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, আবার মানুষের কাম পিপাসার এক জান্তবমূর্তি এঁকে তিনি আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন। নরনারীর জৈবসত্তা এবং তার বিকারের নানা রেখাচিত্র লেখককে আকৃষ্ট করেছিল, যার কিছুটা ছিল বে-আব্রু বর্ণনা। কিন্তু অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের জীবনচিত্র এঁকে গেছেন, তাদের জীবনসমস্যার গ্রন্থিমোচনে তৎপর হয়েছেন, কলকাতার অধিবাসীরা সেই সমস্ত আদিম জীবনচিত্র ও মনোবিকারের ছবি দেখে চমকে উঠেছিলেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেহ-মনে ছিলেন বলিষ্ঠ, তাঁর গল্প-উপন্যাসেও সেই পেশল হাতের স্পর্শ এবং শিরাধমনীর মধ্যে প্রবাহিত রক্তের উত্তাপ উপলব্ধি করা যাবে। 'দিবরাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'শহরতলী' (১৯৪০), 'অহিংসা' (১৯৪৮) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'অতসী মামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা-কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ আধুনিক পাঠকমহলে সুপরিচিত। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে মানুষকে দেহজীবী মানুষরূপেই দেখেছেন; তার বাসনাকামনা, সমাজজীবন প্রভৃতিকে তিনি কোন সূক্ষ্ম ভাবরসে নিমজ্জিত করতে চাননি। তারাশঙ্কর যেমন মাটির মাধুর্যকে আরও একটা বড়ো সত্তার

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরকম কোন দার্শনিক প্রবণতা বা আদর্শবাদ ছিল না। ফলে দেহে-মনে বলিষ্ঠ অদ্ভুত কতকগুলি মানুষকে আঁকলেও তাঁর মনঃপ্রকৃতি ও সৃষ্টিকলার মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলো ভাব অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পের রসরূপ ক্ষুণ্ণ করেছে। শেষজীবনে তিনি বিশৃঙ্খল জীবনের ঘূর্ণির তলে তলিয়ে গিয়েছিলেন, এ যুগে লেখা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাই সেই উন্মত্ত ঘূর্ণিবেগের স্পর্শ আছে, যা যথার্থ শিল্পসৃষ্টির পরিপন্থী। তাঁর মধ্যে অদ্ভুত শক্তি বিস্ময়কর সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জন্মলগ্নেই বুঝি বিধাতা তাঁর কপালে নিয়মরাহিত্যের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। শেষজীবনে তিনি যেন নিজের হাতেই নিজের শিল্পীপ্রতিভার শেষকৃত্য করলেন—বাংলা সাহিত্যের এ একটা বড়ো রকমের দুর্ঘটনা। এত বড়ো শক্তিমান স্রষ্টা এলোমেলো ঝড়োহাওয়ার দ্বারা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কখনও মানুষের জৈবসত্তাকে সম্মুখে স্থাপন করে তার জয়গান করলেন, কখনও বামাচারী শোভাযাত্রা পুরোভাগে ঝাণ্ডা হাতে অবতীর্ণ হলেন, প্রগতির নামে উৎকট রাজনীতি ও উদ্ভট সমাজনীতির কচ্‌কচির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন—এইভাবে তাঁর শিল্পী-জীবনের অপমৃত্যু হল। সে যাই হোক বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের সঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে সমপর্যায়ে স্মরণীয়, এবং উত্তর-শরৎযুগের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যের আর একটি শাখার উল্লেখ করি—সেটি হল লঘুরসের গল্পকাহিনী। রবীন্দ্রনাথ লঘুরসের কথাগ্রন্থের যে মার্জিত রীতি বেঁধে দিয়েছেন, এই যুগে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু) সে বিভাগে অদ্ভুত প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। হাস্যরস, কৌতুক, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যে কথাসাহিত্যকে কতটা জনপ্রিয় করতে পারে এঁদের গল্প, উপন্যাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রবীণ কেদারনাথের দীর্ঘজীবন কেটেছে কাশীধামে; অল্প বয়সে যৎসামান্য লিখলেও উত্তরকালে একটু প্রবীণ বয়সে তাঁর হাস্যরঙ্গময়, যমকের চমকদেওয়া গল্প ও উপন্যাসে পরিপক্ব প্রবীণবুদ্ধিজাত মজলিসী রসিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। অনেকটা সেকেলে চণ্ডীমণ্ডপঘেঁষা রঙ্গপরিহাসে তিনি পিতামহের মতো (নবীন সাহিত্যিকদের তিনি ছিলেন সরকারী দাদামশাই) কৌতুক চিত্র এঁকেছেন। তাঁর কৌতুকের একটা বড়ো অংশ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। উইটের মারপ্যাঁচ। অনুপ্রাস

ও যমককে তিনি হাস্যকর অসঙ্গতির কৌতুকরসে ব্যবহার করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯), 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩২), 'আই হ্যাজ' (১৯৩৫) একদা পাঠকমহলে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিল। গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'কবুলতি' (১৯২৮), 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭) এখনও জনপ্রিয়তা হারায়নি। তবে অনেকস্থলে তাঁর কাহিনী কিছু কৃত্রিম, হাস্য-পরিহাস সব সময়ে স্বাভাবিক নয়। তাঁর 'চীনযাত্রী' (১৯২৫) ভ্রমণকাহিনী আকারে ক্ষুদ্র হলেও রসের দিক থেকে একটি দুর্লভ ভ্রমণসাহিত্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এখনও অজস্র সৃষ্টিপ্রাচুর্যে পাঠকসমাজে তাঁর প্রসন্ন জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যথার্থ হিউমার বা হাস্যরসের গল্প-কাহিনীর তিনি একমাত্র অধিপতি। যথার্থ হিউমারের অর্থ—হাস্যতরঙ্গের সঙ্গে সূক্ষ্ম বেদনার স্পর্শ। এ ধরনের হাস্যরসের গল্পকাহিনী বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ অসঙ্গতিকে হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল করেছেন বটে, কিন্তু তার হাসির আড়ালে যে একফোঁটা অশ্রু লুকিয়ে আছে, সে কথা বুঝে নিতে পাঠকের একটুও বিলম্ব হয় না। এ বিষয়ে তিনি পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকের সমতুল্য। এই অকালপ্রবীণ ও চিন্তাভারগ্রস্ত বাঙালী-সমাজে নির্মল হাস্য বিকীর্ণ করে বিভূতিভূষণ সাহিত্যে মুক্তবায়ু প্রবাহিত করেছেন। মানুষের আচার-আচরণ ও ব্যবহারের অসঙ্গতি হল হাস্যরসের মূল উপাদান। সে অসঙ্গতি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হাস্যরস কখনও উদ্ভট রসে (grotesque), কখনও তীব্র ব্যঙ্গরসে পরিণত হয়। সুখের বিষয় বিভূতিভূষণের রসসৃষ্টি এই দুই অতিরেক বর্জিত। তাঁর শিবপুরের গণেশ-ঘোঁতনাকে কি সহজে ভোলা যায়, না কল্যাণীয়া রাণুকে ভুলে থাকার উপায় আছে? শুধু ছোটগল্পই নয়, বিশাল উপন্যাস রচনাতেও তাঁর মানসিক প্রসন্নতা নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ', দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, 'রাণুর কথামালা' (১৩৪৪-১৩৪৮), 'বরযাত্রী' (১৩৫৯), 'নীলাঙ্গুরীয়' (উপন্যাস, ১৯৪২) প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস যে কত জনপ্রিয় তা সমালোচক-পাঠক সকলেই অবগত আছেন।

একদা 'পরশুরাম' ছদ্মনামের আড়ালে যিনি মাসিকপত্রে হাস্যরসের গল্প লিখেছিলেন, তাঁর নাম রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)। বিজ্ঞান, বিশেষত রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত হলেও রচনায় তিনি এমন চমক সৃষ্টি করেন যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উচ্চকিত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন।

চরিত্রের আচার-ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতি কৌতুককর সন্নিবেশে তাঁর গল্পগুলি শুধু রসিকতাপ্রিয় পাঠকের সাময়িক চিত্তবিনোদন করেই মুছে যায়নি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির উজ্জলতা কোথাও কোথাও অসামান্য ব্যঙ্গরস পরিবেশনে তাঁর 'গড্ডলিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭), এবং পরবর্তী কালের গল্পসংগ্রহগুলি রুচিমান পাঠকসমাজে এখনও অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু হয়ে আছে। হাস্যকৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তাঁর প্রতিভা যে কতটা বৈচিত্র্যধর্মী, তা বোঝা যাবে তাঁর অন্যান্য 'সীরিয়স' গ্রন্থের পরিচয় নিলে। বানানসমস্যার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক। তাঁর সঙ্কলিত অভিধান ('চলন্তিকা') এখনও সাহিত্যিকদের বানান-সংক্রান্ত হ্যাণ্ডবুক হয়ে আছে। সরস চলতি গদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করে তিনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে শেষদিকের গল্পে তাঁর প্রতিভা যে খানিকটা শিথিল হয়ে গেছে, তা স্বীকার করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে এখানে কয়েকজন মহিলা কথাসাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। এখন বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে মহিলারা অসঙ্কোচে পদচারণা করেছেন, জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁদের দান স্মরণীয়। কিন্তু গল্প-উপন্যাসেও তাঁরা যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী তা আমরা সানন্দে স্বীকার করি। সম্প্রতি কিছুকাল ধরে আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বাণী রায় ও 'সুকন্যা' বাংলা গল্প ও উপন্যাসে নিপুণ ও পরিপক্ব প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা মহিলাসুলভ হলেও কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি এবং দেশকালের ছবি ফোটাতে তিনি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মতোই সাফল্য লাভ করেছেন। মৃদু পরিহাস তাঁর লেখার একটি মনোরম আকর্ষণ। প্রতিভা বসুর লেখায় এমন একটি মৃদু স্নিগ্ধ নারীসুলভ স্পর্শ আছে যে, পাঠকে তাঁকে এক মুহূর্তেই আপনার জন বলে মনে করে। বাণী রায় ঠিক চলতি পথের পথিক নন, অনভ্যস্ত পথে যাতায়াতেই তাঁর অধিকতর আকর্ষণ। তাঁর কিছু কিছু গল্প-উপন্যাসে পুরুষালি ঢঙের বলিষ্ঠতা ও উৎকেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য অনেকগুলি উপন্যাস লিখে পাঠক সমাজে খুব জনপ্রিয়, হয়েছেন, তাঁর বিষবস্তুও খুব বিচিত্র। কিন্তু লেখার বাঁধুনি কিছু শিথিল ও বক্তব্যও অগভীর, একথা স্বীকার করতে হবে। 'সুকন্যা'র দু-একখানি উপন্যাসে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় আছে।

প্রকার নিঃস্পৃহ ঔদাসীন্য তাঁর লেখক-সত্তাকে পরিচালিত করেছে বলে, তিনি গদ্যনিবন্ধে খেয়ালের বশে অবতীর্ণ হলেও এ শাখায় ততটা মনোযোগ দিয়ে পদচারণা করেননি। তাই তাঁর কাছ থেকে মুষ্টিমেয় মণিমাণিক্য পেয়ে মনে হয়, যিনি মনে করলে রাজার রত্নভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারতেন, তিনি সামান্য দুটি-চারটি রত্ন দিয়ে আমাদের পাওয়ার আর্তিকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

২. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের এক বিচিত্র বিস্ময়। তাঁর চরিত্র, বিদ্যাবত্তা, ভূয়োদর্শন, স্বাদেশিক মনোভাব প্রভৃতি বিস্ময়কর গুণ তাঁকে সমসাময়িক সমাজের অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। সে যুগের সাহিত্য পরিষদের প্রাণস্বরূপ, রিপন কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ, বিজ্ঞানের ক্রান্তদর্শী অধ্যাপক এবং বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিরল পথের লেখক রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রীতির পাত্র ছিলেন, তিনি নিজেও কবিগুরুকে বিশেষ ভক্তি করতেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে স্যার উপাধি পরিত্যাগ করেন, মৃত্যুশয্যাশায়ী রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সে পত্রের বজ্রবাণী শুনবার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে সেই ইংরেজী পত্রখানি তাঁকে পড়ে শোনালেন, তারপর এই মহামনীষী মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মৃত্যুশয্যার একান্তে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বসে ছিলেন। সক্ষোভে তিনি বলেছেন, "আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।" তাঁর পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে অভিনন্দনসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন পাঠপ্রসঙ্গে আচার্যকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।" দু'জনের উক্তি থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র ও সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে। হরপ্রসাদ তাঁকে বলেছেন, 'জ্ঞানের জাহাজ.' রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে 'সুন্দর'-কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আচার্যদেব জ্ঞানের কথাকে সুন্দর করে বলেছেন, হিতকথাকে করেছেন মনোহারী। অসাধারণ মেধাবী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনা করে সে যুগের ছাত্রসমাজে শুভসুন্দর জ্ঞানালোচনার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

ইংরাজীতে যাকে 'এন্‌সাইক্লোপিডিক' (অর্থাৎ সর্ববিদ্যাবিশারদ) প্রতিভা বলে, রামেন্দ্রসুন্দর তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। মনেপ্রাণে একনিষ্ঠ স্বদেশী রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন, কারণ তিনি সে আন্দোলনকে বাঙালী তথা ভারতীয়ের সর্বাঙ্গীণ জাগরণ বলেই মনে করেছিলেন, কিন্তু কোন দিন উত্তপ্ত রাজনীতির উগ্র আন্দোলনে যোগদান করেননি। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান—এই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। তাঁর সমসাময়িক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও চিন্তার রাজ্যে ছিলেন নাবিক কলম্বাস। অজ্ঞাত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জ্ঞানের রত্নদ্বীপ আবিষ্কারই ছিল তাঁর নেশা, পাণ্ডিত্য ছিল জ্ঞানসমুদ্র-তরণের অভিযান। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর পাণ্ডিত্যের নখদন্ত ভেঙে দিয়ে তাকে মনোহারী করে তুলেছিলেন। বাংলার মননশীল সাহিত্যে এই হল তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্য' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' ভিন্ন আর কোন লেখকের সমগোত্রের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাঁর 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০), 'শব্দকথা' (১৩২৪), 'বিচিত্রজগৎ' (১৯২০), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) —চলতি ভাষায় বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে রচনা, 'শব্দকথা' (১৯১৭), 'জগৎকথা' (১৯২৬) এবং আরও অনেক গ্রন্থ ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। প্রথমে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে সরস ভাষায় অনেক প্রবন্ধ লিখে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার একটি আদর্শ রীতি প্রবর্তন করেছেন। বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে কৌতুকরসের সমন্বয় করে তিনি দুরূহ ব্যাপারকেও রমণীয় করে তুলেছেন। এর পর তিনি বিজ্ঞান থেকে দর্শন-চিন্তায় উত্তীর্ণ হলেন। বস্তু থেকে নির্বস্তুর জগতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জীবন-প্রত্যয়ের এক বিপুল রহস্যের দ্বারে উপনীত হলেন, নানা জিজ্ঞাসায় তাঁর অন্তর্জীবন ব্যাকুল হয়ে পড়ল। বস্তুজগতের মধ্যে রয়েছে অপূর্ণতা, সংশয়, খণ্ডতা ; দর্শনের জগৎ সেই খণ্ডতা ও অপূর্ণতাকে জ্ঞানের দ্বারা ঐক্যের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু জ্ঞানেও তো আত্মার ক্ষুধা মেটে না, সমুদ্রবারি পান করলে তৃষ্ণা মেটে না, বরং বেড়েই যায়। তখন আচার্য দর্শন থেকে বেদান্তে পৌঁছলেন. সমস্ত অনৈক্য একসূত্রে মিলিত হল—ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি জীবজীবনের শেষ নিদান বলে গ্রহণ করে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্বে বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক চিৎস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বেও শান্তি পাননি, বিশুদ্ধ ও নিঃশ্রেয়স ভক্তির

মধ্যেই তাঁর অন্তর্জ্বালা, জ্ঞানের প্রদাহ ও মুমুক্ষু ব্যাকুলতা চিরশান্তি লাভ করেছে। তাঁর মানসবিবর্তনের এই ইতিহাস অদ্ভুত ও রহস্যময়। সে যাই হোক, এতবড় জ্ঞানতাপস, মহামনীষী, ক্রান্তদর্শী অথচ শিশুসরল ব্যক্তি আর এদেশে জন্মাবেন কিনা জানি না। প্রাচীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও হেলেনিক (গ্রীক) বিশ্বের প্লেটো-সক্রেটিসের যথার্থ আত্মার দোসর হচ্ছেন ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। আমাদের গদ্য-সাহিত্য তাঁর মতো অসাধারণ ব্যক্তির স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে। দুঃখের বিষয় তাঁর চিন্তার সমিধভার বহনের আরণ্যক ঐতিহ্য আমরা জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে গ্রহণ করতে পারিনি। তাঁর সিদ্ধি ও সাধনাকে আমরা অঞ্জলি পেতে নিতেও পারিনি। খর্বমানসের অধিকারী, চিন্তাদুর্বল, হুজুগপ্রিয়, আন্দোলন-মাতোয়ারা একালের বাঙালী-সমাজে আচার্যদেবের বাণী অরণ্যে রোদন করে ফিরছে। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের দুর্বলতা ঘোচাতে, চিন্তার সামগ্রীকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলে ধরতে এবং সমস্ত জাতির মনোধর্মের আমূল রূপান্তরের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর যা করে গেছেন, তার মূল্য বুঝবে আগামীকালের বাঙালীসমাজ। আজকের এই ভ্রষ্টতার দিনে তাঁকে অন্যগ্রহ থেকে নিক্ষিপ্ত বিচিত্র জীব বলেই মনে হবে।

৩. প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

'সবুজপত্রে'র বিখ্যাত সম্পাদক, যিনি "বীরবল" এই ছদ্মনামের আড়ালে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন তিনি প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে এলেও তাঁর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি, বরং কোন কোন বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন (যেমন সর্বক্ষেত্রে চলতি ভাষার ব্যবহার)। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে, বিদেশে শিক্ষালাভের পর দেশে ফিরে বিষয়কর্মে বিশেষ আত্মনিয়োগ না করে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে অবতীর্ণ হন এবং 'সবুজপত্র' প্রকাশ করে অভিনব রচনারীতির যেমন প্রচলন করেন, তেমনি নানা ব্যাপারে তরুণদলের নেতৃত্ব করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদের পরিচয় দেন। তাঁর বাসভবনটি তরুণ সাহিত্যিক, চিন্তাশীল ও প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছিল। দু'বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন নবনবীনের পূজারীরা। এক—ভাষা বিষয়ে, দুই—সংস্কারবর্জিত আধুনিক মনোভাবে। প্রমথ চৌধুরী গোড়ার দিকে দুটি-একটি লেখা সাধুভাষায় লিখলেও পরবর্তী কালে তাঁর যাবতীয়

রচনা কলকাতার চলিত ভাষায় রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভাষাগত পর্বত-প্রমাণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তির অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল মুখের কথাই সাহিত্যের একমাত্র ভাষা হওয়া উচিত। সাধুভাষা হচ্ছে কৃত্রিম ও কেতাবী ভাষা, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের পন্থা। তাঁর এই মত নবীনের দল সাগ্রহে গ্রহণ করলেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর মন্তব্য মেনে নিলেন এবং নিজেও সেই রীতি সানন্দে গ্রহণ করলেন। অবশ্য পুরাতনপন্থী পণ্ডিতের দল মৌখিক ভাষাকে সর্ববিধ কর্মে প্রয়োগ করার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তবু প্রমথ চৌধুরীর জয় হল, তাঁর শিষ্য অনুরাগীর দল, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। এখন তো দেখছি প্রায় যাবতীয় কার্য কলকাতার ভাষায় নির্বাহ হচ্ছে—মায় সংবাদপত্র পর্যন্ত।* প্রমথ চৌধুরী এবিষয়ের পথিকৃৎ বলে চিরদিন শ্রদ্ধা পাবেন।

দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুতেও তাঁর প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত তরুণ মহলে কম জনপ্রিয় হল না। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন যৌবধর্মের অগ্রদূত, গলিত সমাজ ও সংস্কারের নির্মম শত্রু, সাহিত্যের নামে ভণ্ডামির কঠোর সমালোচক। যা স্থবির ও জরাজীর্ণ, তাকে প্রবীণতার ছদ্মবেশে ঢেকে পূজা না করে তিনি নিশ্ছিদ্র যুক্তির সাহায্যে সমাজ, সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের পক্ষে যা মঙ্গলকর, তা নিজেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন, এবং শিষ্য ও বান্ধবদেরও গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন। যথার্থ আধুনিকতা—সংস্কারের দাসত্ব থেকে মনের মুক্তি; এটাই হল চৌধুরী মশাইয়ের সবচেয়ে বড়ো দান।

প্রমথ চৌধুরী শুধু সম্পাদক নন, প্রাবন্ধিকও নন; তিনি একাধারে কবি ও ছোটগল্পকার। তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং 'পদচারণা'র (১৯১৯) কথা পাঠকসমাজের নিশ্চয় মনে পড়বে। বৈঠকী মেজাজে তিনি কয়েকটি অতি চমৎকার সনেট লিখেছেন, কয়েকটি অন্য কবিতাও তাঁর বিচিত্র প্রতিভাকে সুপ্রমাণিত করেছে। গদ্যের মতো পদ্যেও তিনি ব্যঙ্গরঙ্গের খোঁচা দিয়ে বাঙালীর অকালপক্ক প্রবীণতাকে বিদ্রূপ করেছেন। তবে তাঁর অধিকাংশ কবিতা ও সনেটে বুদ্ধির দীপ্তি, অভাবনীয় বাক্‌রীতির চমক ও ব্যঙ্গের অম্লমধুর ছোঁয়া থাকলেও, এ শুধু "চৌদ্দয় চেনা যায়"। এতে চৌদ্দপংক্তির সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের আঁটসাঁট

* এখন বাংলাদেশেও সবক্ষেত্রে কলকাতাই চলতি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, পূর্ববঙ্গীয় ভাষা নয়।

বাঁধুনি নিখুঁত হয়েছে, কিন্তু যথার্থ কল্পনা ও আবেগ তাতে প্রায় উবে গেছে বলে তা যতটা চমক দেয়, ততটা দোলা দেয় না। তিনি বলেছেন যে তাঁর কবিতায় আর কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রাইম (rhyme) অর্থাৎ ছন্দ এবং রিজ্‌ন (reason) অর্থাৎ যুক্তিশৃঙ্খলা থাকে। কিন্তু কবিতার আসল বস্তু—কল্পনার আবেগকে (imagination ও emotion) তিনি ইচ্ছে করেই অবহেলা করেছেন, কোথাও কোথাও কল্পনার উদ্দামতা ও আবেগের বাড়াবাড়িকে তিনি ব্যঙ্গই করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেকটা বিদগ্ধ ফরাসী মানসের সহযাত্রী। 'সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্'—তা ঠিক বটে। কিন্তু কল্পনা ও আবেগকে বাদ দিয়ে যথার্থ কবিতা হয় কিনা সন্দেহ। এ ব্যাপারেও তিনি যেন চিরাচরিত কাব্য-সংস্কারকে শুধু রাইম ও রিজ্‌ন-এর খোঁচা দিয়ে ধরাশায়ী করতে চেয়েছেন। এতে তাঁর যুক্তিবাদী উইট-আশ্রয়ী মনটি চমৎকার ফুটেছে কিন্তু এগুলি যথার্থ কবিতা হয়েছে কিনা তা নিয়ে পাঠকে এবং পণ্ডিতে প্রচুর তর্ক করতে পারেন।

তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প ও বড়গল্প ('চার ইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'আহুতি' 'ফার্স্টক্লাস ভূত', 'বড়বাবুর বড়দিন' ইত্যাদি) গল্পসাহিত্যের আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুঁত হলেও এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশভঙ্গিমা ছোটগল্পের রূপ ও রীতিকে পূর্ণ শিল্পরূপ দিতে পারেনি। এই ধরনের গল্পে তাঁর প্রতিভার সবটা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য যথার্থ প্রকাশিত হয়েছে কয়েকখানি প্রবন্ধ-সংগ্রহে। 'তেল-নুন-লকড়ী' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'নানা চর্চা' (১৯৩২) প্রভৃতি প্রবন্ধ-সঙ্কলনে তাঁর ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত মন ফরাসী বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সহ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, রাজনীতি—এমন কোন বিষয় নেই যার প্রতি তাঁর কৌতূহল আকৃষ্ট হয়নি। আমাদের জড়তাগ্রস্ত সমাজের স্থবিরতাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও উইট-হিউমারের লবণাক্ত ছিটে দিয়ে নাস্তানাবুদ করেছেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি আর তার সঙ্গে শাণিত ব্যঙ্গ—এই হল তাঁর প্রধান হাতিয়ার। বাংলা দেশ, সমাজ ও সাহিত্যে, বিশেষত চিন্তাশীল মহলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পর যদি কেউ শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তুলে থাকেন, তবে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিভার সীমাটুকুও জেনে রাখা ভালো। তিনি চলিত ভাষার হয়ে 'ব্রীফ' নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু, সহজবোধ্যতা চলিত ভাষার

চিন্তা, মনন ও প্রকাশভঙ্গীর বক্রতা ও বৈদগ্ধ্য তাঁকে বাংলা চিন্তাশীল সাহিত্যে দীর্ঘজীবী করে রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এইকালের মধ্যে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের নানা গুণ ছিল, চিন্তার বলিষ্ঠতাও ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য আদর্শে এঁরা এমন সমস্ত তত্ত্বকথার আমদানি করেছিলেন যে, সেযুগের বাঙালীর পক্ষে তা কিছু দুষ্পাচ্য হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে অথবা পক্ষে কলম ধরতে গিয়ে প্রাবন্ধিক হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার দিনে একদল ছিলেন পুরাতনপন্থী সাধুভাষাঘেঁষা, ট্রাডিশনে বিশ্বাসী সনাতন পথের পথিক। বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ('নারায়ণ' পত্র), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় —এঁরা মূলত পুরাতন ও চিরাচরিত পন্থা নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথক উল্লেখ দাবি করতে পারেন। 'সবুজপত্র' ও আধুনিকগণ যে ভাবধারা বহন করে চলেছেন, পাঁচকড়ি ছিলেন তার ঘোরতর বিরুদ্ধাচারী। তিনি বৃত্তিতে ছিলেন সাংবাদিক এবং বুদ্ধিতে ছিলেন বঙ্কিমপন্থী। সাংবাদিক-সুলভ নানাপ্রকার রচনা ও অপরচনায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন—এবিষয়ে নিষ্ঠার চেয়ে জীবিকাই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর মূল্যবান। সেইজন্য সাংবাদিক-জীবনে তিনি ছিলেন বেপরোয়া "ফ্রি ল্যান্সার" (Free Lancer)। কড়ি পেলে যে-কোন পক্ষে মিঠে বা কড়া কথা বলতে তিনি পিছপাও হতেন না। কিন্তু তাঁর আরও একটা ব্যক্তিগত জগৎ ছিল, তা হচ্ছে তাঁর আপন এক্তিয়ার-ভুক্ত নিজস্ব মনোজগৎ। সেখানে তিনি অপূর্ব বিশ্লেষণে বাংলার চারিত্রিক ও ঐতিহ্যের স্বরূপ বিচার করেন। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমপ্রতিভার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান, য়ুরোপের তুলনায় বাঙালীর জীবন ও সাধনা যে অধঃপতিত নয়, তা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন। বাঙ্গালীর প্রাচীন, মধ্যযুগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধনাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঋজু ভাষা, যুক্তিধারা ও সিদ্ধান্তগুলি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচনা সাময়িক পত্রে বন্দী হয়ে আছে বলে (সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত) এ যুগের পাঠকেরা তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন। উপরন্তু তিনি রবীন্দ্রভাবধারা ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষার আদর্শ থেকে দূরে ছিলেন, এবং দূরে থাকাটাই সমীচীন মনে করেছিলেন। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীকেই তিনি জীবন

ও চিন্তায় গ্রহণ করেছিলেন। তাই আধুনিক নবযুগপ্রবাহে তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও চিন্তারাজি দিগন্তরে ভেসে গেছে। কিন্তু তাঁর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত না হলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমগ্র পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যাবে।

সর্বশেষে কবি-সমালোচক মোহিতলালের উল্লেখ করে আমরা রবীন্দ্র-সমসাময়িক পর্বের ইতিহাস সমাপ্ত করব। পাঁচকড়ির মতো মোহিতলালও এক বিরল-প্রতিভার ব্যক্তি, পাঁচকড়ির মতো তিনিও পাঠকসমাজের কাছ থেকে কিছু অবহেলা পেয়েছেন, এমন কি প্রবীণ সমালোচকেরাও তাঁকে বিচার করতে গিয়ে ব্যক্তি-গত সঙ্কীর্ণতার ওপরে উঠতে পারেননি। ইতিপূর্বে আমরা সংক্ষেপে তাঁর কবিপ্রতিভার অনন্যসাধারণ মৌলিকতা আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, ম্যাথ্‌ আর্নল্‌ডের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার নানাদিক দিয়েই সাদৃশ্য আছে। আর্নল্‌ড সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি সুগভীর প্রত্যয়, মানসিক ঐতিহ্য ও জীবনের আদর্শ মেনে চলতেন এবং জীবনের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাহিত্যেও প্রতিফলিত দেখতে চাইতেন। শেলীর সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয়নি বলে তাঁর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক উনার্থক মন্তব্য করেছিলেন এবং অবিশ্বাসী নাস্তিক ফিলিস্টাইনদের সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। ম্যাথ্‌ আর্নল্‌ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমালোচনার ক্ষেত্রে মোহিতলালের আবির্ভাব হয়। তিনি রবীন্দ্রযুগরসে লালিত হলেও বঙ্কিমরসধারায় অবগাহন করেছিলেন প্রাণভরে। বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শ, যার সঙ্গে জীবনাদর্শের কোন বিরোধিতা বা বিপক্ষতা নেই, মোহিতলাল সারা জীবন সেই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্য ও সাহিত্যবিচারে তিনি আপসরফা জানতেন না। তাই কোনও প্রকার হুজুগ বা অনাচার সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশ করলে তিনি রোষে দিশেহারা হয়ে যেতেন, তখন তাঁর লেখনী হয়ে উঠত ক্ষুরধার, তাথা থেকে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হত। রবীন্দ্রনাথও মোহিতলালের তীব্র মন্তব্য থেকে রেহাই পাননি। তৎকালীন প্রগতির নামে স্বেচ্ছাচারকে তিনি ঘৃণাপূর্ণ কোপকটাক্ষে দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বালখিল্যদের সাহিত্য নিয়ে ছেলেখেলাকে যে সমস্ত প্রবীণের দল প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে বাহবা দিতেন, মোহিতলাল তাঁদেরও ছেড়ে দেননি। সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য তিনি এমন সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার ফলে বন্ধুও শত্রু হয়ে গিয়েছিল। শেষজীবনে এজন্য তাঁকে দারুণ অবজ্ঞা ভোগ করতে হয়েছে। কথা উঠবে, সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষায় মহৎ গুরুদায়িত্ব তাঁকে কে

দিয়েছে। তার উত্তর হল, প্রত্যেক সারস্বত সাধক সে দায়িত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব মত ও মন্তব্য প্রকাশে যে-কোন সাহিত্য-রসিকেরই অধিকার আছে। তবে দেখতে হবে, সেকথা বলবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মোহিতলাল প্রথম জীবনে স্কুল-মাষ্টারী করে-ছিলেন, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক হয়েছিলেন। অধ্যাপক হয়ে দেখেছিলেন, বাংলার সমালোচনা-সাহিত্য ইংরেজীর মতো আদৌ সুগঠিত নয়, সাহিত্যবিচার-সংক্রান্ত বিশেষ কোন আদর্শই নেই। তখন তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করে এবং নিজস্ব প্রতিভার সাহায্যে Theory of Poetry বা কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন—এ'দের ওপরেই তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এ দিক দিয়ে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'শ্রীমধুসূদন', 'বঙ্কিমবরণ', 'সাহিত্য বিতান', 'বাংলার নবযুগ' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিন্তার সঙ্গে মনস্বিতা, সাহিত্যবিচারের সঙ্গে সাহিত্যের রসভোগ প্রভৃতি আলোচনা করলে মোহিতলালকে রবীন্দ্রসমসাময়িককালে বাংলা সাহিত্যালোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল বলে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর 'সাহিত্যকথা'য় তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের রূপ ও রীতি যেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে তাঁকে ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ ও পেটারের সমকক্ষ মনে হবে। তাঁর অসাধারণ ভূয়োদর্শন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে স্বেচ্ছাবিহার ও বিশ্লেষণী শক্তি ত'াকে বাংলা সাহিত্যের যথার্থই রসপ্রমাতা রূপেই গড়ে তুলেছে। বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যের বালকত্ব ঘুচিয়ে তাকে যৌবনের দার্ঢ্য দান করার প্রধান গৌরব ত'ার প্রাপ্য।

তবে কোন কোন বিষয়ে তিনি অকারণ পারুষ্য প্রকাশ করেছেন, মত ও মন্তব্যে অশোভন উগ্রতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় সাহিত্য ত'ার আদৌ রুচিকর ছিল না, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বসাহিত্যের প্রগতিকেও তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চাননি। রুচি ও মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ধ্রুবসাহিত্যের পাঠক, উনিশ শতকের রোমান্টিকতার সমঝদার। যে সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্যবোধ ছেড়ে উগ্র রাজনীতি, প্রচারধর্মী সমাজদর্শন এবং উদ্ভট মনোবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত, তিনি তাকে কখনও সহ্য করতে পারতেন না—কাজেই আধুনিক কালে নানা সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানসিক

কারণে য়ুরোপের যে সাহিত্য বিবর্তন হয়েছে, তার প্রতি ত'ার বিশেষ কোন আস্থা ছিল না। তারই অনুকরণে যখন বাংলদেশে তথাকথিত প্রগতি-সাহিত্যের বান ডাকল, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে বালখিল্য ও তরুণম্মন্যদের স্বেচ্ছাচারকে ক্রোধের আগুনে যেন ভস্মীভূত করতে চাইলেন। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' হল ত'ার ক্রুশেডের অস্ত্রাগার। ফলে ত'ার বিরুদ্ধে নবীন এবং প্রবীণের দল গোপনে এবং প্রকাশ্যে নিন্দাবিদ্রূপ করতে লাগলেন, রবীন্দ্রানুরাগীদেরও কেউ কেউ তাতে প্রচ্ছন্নভাবে যোগদান করলেন। এর ফলে এই নির্ভীক, আদর্শবাদী ও সাহিত্যপাগল সমালোচক জীবিতকালে ত'ার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 'দুয়ো' দেবার লোকের অভাব আর যেখানেই থাক, অন্তত বাংলাদেশে নেই। মতের মিল না হলে মনের অমিল হওয়া এ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের মারাত্মক ব্যাধি। নানাবিষয়ে মোহিতলালের সঙ্গে অনেকের মতভেদ হয়েছে, এবং মতভেদকে ত'ারা মনোভেদ বলে ধরে নিয়ে মোহিতলালের প্রতি অন্যায়, অহেতুক ও অযুক্তিযুক্ত অভিযোগ তুলেছেন। 'সত্যসুন্দর দাস' এই ছদ্মনামে মোহিতলাল অনেক প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। সাহিত্যে তিনি ছিলেন 'সত্য' ও 'সুন্দরের' দাস। এক বিশুদ্ধ আদর্শবাদ ও নীতিবোধ, যা ছিল ত'ার আত্মার সামগ্রী, সেই উত্তুঙ্গ শীর্ষচূড়া থেকেই তিনি সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে একটি বুদ্ধিজীবী, আদর্শবাদী সাহিত্যকেন্দ্রিক বিচারপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। ত'ার মতের সঙ্গে আজকের চরিত্রভ্রষ্ট বাঙালীর কোনও প্রকার মনের মিল হবে না। এদেশ এমনই হতভাগ্য যে, প্রবীণ সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণও ত'াকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছেন, এবং কেউ তার প্রতিবাদও করেন না। কিন্তু কালে আমরা বুঝতে পারব, রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালে কবি মোহিতলাল বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারপদ্ধতিকে কতটা শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ করে গিয়েছেন।

নির্ঘণ্ট

—